মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১২শ ভাগ] শ্রাবণ, ১৩১৩ ; আগষ্ট, ১৯০৬। [১ম সংখ্যা।

মহিলা — দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম।

বর্ত্তমান শ্রাবণ মাসে মহিলার দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম আরম্ভ। বিগত আষাঢ় মাসে ইঁহার একাদশ বর্ষ পূর্ণ হইয়াগিয়াছে। এক্ষণ মহিলা দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকামাত্র। গত বৎসর এই বালিকা মহিলা অনেক বিপৎ পরীক্ষায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন। বিপন্নিবারণ বিঘ্নবিনাশন মঙ্গলময় পরমেশ্বরের কৃপায় ইনি সকল বিঘ্ন বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া নব বর্ষে নবোত্থনসহকারে স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

বঙ্গমহিলাদের সেবা করা মহিলার জীবনের বিশেষ ব্রত। কোন বিষয়ে তাঁহাদের অমঙ্গল আশঙ্কা করিলে ইনি পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া থাকেন। গত বৎসর যখন বঙ্গসমাজে রাজনৈতিক আন্দোলনের ভীষণ তরঙ্গ সমুত্থিত হয়, রাজ্যশাসনসম্বন্ধীয় বিশেষ ব্যবস্থার জন্য ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধির উপর চতুর্দ্দিক্ হইতে বঙ্গহিতৈষী আন্দোলনকারী পুরুষগণ কটূক্তিবাণ বর্ষণ করিতে থাকেন; তাঁহাদের উত্তেজনায় ও দৃষ্টান্তে বহু বঙ্গমহিলা সভা সমিতি করিয়া সেই আন্দোলনে যোগদানে সমুত্থিত দেখিয়া মহিলা তাঁহাদের ঘোরতর অনিষ্ট আশঙ্কা করেন, তাঁহারা বা পরুষভাষী অহঙ্কারী পুরুষদিগের ন্যায় বড় লাট ও ছোট লাটের উপর তীব্র মন্তব্য প্রকাশ ও কটূক্তি শেল নিক্ষেপ করিয়া বিকৃত স্বাধীনতার পরিচয় দান করেন, ইহা ভাবিয়া তাঁহাদিগের সাবধানতার জন্য তখন (গত ভাদ্র মাসে) "তুমুল আন্দোলন ও মহিলাদিগের প্রতি নিবেদন" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত করা হয়; উহা দ্বিতীয় ফর্ম্মায় মুদ্রিত হইয়াছে মাত্র, সমগ্র মহিলা মুদ্রিত হইয়া সাধারণ পাঠিকাদিগের জন্য প্রকাশিত না হইতেই কোন সূত্রে স্বদেশপ্রেমিক আন্দোলনকারী মহোদয়গণ তাহা জানিতে পান, এবং উক্ত প্রবন্ধ ছিন্ন করিয়া ফেলিবার জন্য ১৬।১৭ জন আন্দোলনকারী দলবদ্ধভাবে মহিলাকার্য্যালয়ে হঠাৎ উপস্থিত হন, এবং উহা ছিঁড়িয়া ফেলিবার জন্য আমাদিগকে

অনুরোধ করেন, এবং ভয় প্রদর্শন করিয়া চলিয়া যান। তাঁহারা "বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ" কোন উপায়েই নিবারণ করিতে পারেন নাই, দীনা ক্ষীণা মহিলার অঙ্গচ্ছেদে তাঁহাদের উদ্যোগ ও জোলুম জবরদস্তী হইল। বিবেকের আলোকে যে কার্য্য করা হইয়াছে, অন্যায় ভয়প্রদর্শন এবং অনুরোধ উপরোধে তাহার অন্যথাচরণ করিতে পারা যায় নাই। পরে রাজ-ব্যবস্থার ও রাজপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে অনেক অন্যায়াচরণ হইতে লাগিল, যাহাতে বঙ্গ মহিলারা এই রাজনৈতিক বিষম বিপ্লবে প্রকৃতিস্থ থাকেন, তাঁহারা স্বাভাবিক কোমল-ভাব, বিনয়, নীতি ও সত্য পথ পরিত্যাগ করিয়া না চলেন, এ পর্য্যন্ত মহিলা কর্ত্তব্য বোধে তদ্বিষয়ে আপন ক্ষীণ স্বরে তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া আসিয়াছেন। তন্নিমিত্ত স্বদেশ-প্রেমিকদিগের বিষ-দৃষ্টিতে পতিত হইয়া ইঁহাকে পুনঃ পুনঃ সামান্য নিগ্রহ সহ্য করিতে হয় নাই। এই বালিকা মহিলার উপর অনেক প্রকার উৎপাত ও অত্যাচার হইয়াছে, একজন স্বদেশ-প্রেমিক গ্রাহকও স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান বক্তা ক্রোধভরে "লর্ড কুর্জ্জন অহঙ্কারী অত্যাচারী ও দুর্ব্বিনীত" বলিয়া এবং আমাদিগকে "পক্ষপাতী" বলিয়া গালি দিয়া তাঁহার নিকট মহিলা পাঠাইতে নিষেধ লিখিয়াছেন। যাহা হউক এই ভয়ানক বিরুদ্ধাচার ও বিপ্লবের মধ্যে সেই একজন গ্রাহক ব্যতীত অন্য কেহ স্পষ্টতঃ বিপক্ষতাচরণ করিয়া মহিলার সংস্রব পরিত্যাগ করেন নাই, বরং সম্বৎসরব্যাপী ঘোরতর আন্দোলনের সময়মধ্যে অনেকগুলি নূতন গ্রাহক হইয়াছে। অন্য কোন বৎসর এরূপ গ্রাহকবৃদ্ধি হয় নাই। কোন কোন স্বদেশপ্রেমিক পত্রিকা-সম্পাদক মহিলাকে উপলক্ষ করিয়া পুনঃ পুনঃ আমা-দিগকে অতিশয় কুৎসিতভাবে গালি দিয়াছেন; তাহাতে তাঁহাদের নিজ-চরিত্রই সাধারণের নিকটে বিদিত হইয়াছে, সেই অসদ্ব্যবহারে আমাদের কিছুই ক্ষতি হয় নাই, সেই গালি আমাদের অন্তরকে স্পর্শও করে নাই। এ দিকে অনেক নিরপেক্ষ সুবিজ্ঞ লোক অসত্য ও অন্যায় আন্দোলনের বিরুদ্ধে লিখিত মহিলার প্রবন্ধ সকল পড়িয়া সমুচিত ভাব ব্যক্ত ও সত্য প্রকাশিত হইতেছে বলিয়া প্রশংসা করিয়া আমাদিগকে পত্র লিখিয়াছেন। একখণ্ড মহিলা পোড়াইবার উদ্যোগ হইয়া-ছিল, তাহাতে আর কি? বড় বড় গণ্য মান্য লোকের মূর্ত্তি গড়িয়া প্রকাশ্য স্থানে মহা ঘটা করিয়া পোড়ান হইয়াছে, এক খানা কাগজ পোড়ান অধিক ব্যাপার কি? মঙ্গল-ময় বিধাতা আমাদিগকে যে হিংসা বিদ্বেষ হইতে রক্ষা করিয়া গত বৎসর কর্ত্তব্যপালনে সহায়তা করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ দান করি।

বঙ্গ মহিলাদিগের প্রকৃত স্বদেশী দ্রব্য।

বঙ্গমহিলাদিগের কোন্ কোন্ বস্তু প্রকৃত স্বদেশী, তাহা নির্ব্বাচন করিয়া ব্যবহার করিলে তাঁহাদের কল্যাণ, জাতীয় উন্নতি ও স্বদেশের গৌরব হয়। স্বদেশী কাপড় বা লবণ বাহিরের জিনিষ, তাহা ব্যবহার করিলে বা না করিলে বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। এ দেশের মহিলাগণ আর্য্যকুলসম্ভূত, আর্য্য

মহিলাদিগের আদরণীয় সামগ্রী দেবভক্তি, পতিভক্তি, সতীত্ব, লজ্জা, বিনয়, ক্ষমা, প্রেম, উদারতা, পরসেবা ও সহিষ্ণুতা ইত্যাদি। এই সকল সদ্গুণ ও ধর্ম্মনিষ্ঠায় তাঁহারা জগতে পূজিতা হইয়াছেন। ইহা আমাদের স্বদেশী নয় বিলাতের, অতএব আমরা এ বস্তু গ্রহণ ও ব্যবহার করিব না, এ প্রকার ভেদ-বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া নব্যমহিলাগণ প্রাচীন আর্য্য নারীদিগের চরিত্রের সদ্গুণ ও জীবনের ভূষণস্বরূপ সামগ্রী সকল নিজ নিজ-জীবনে আদর করিয়া গ্রহণ করুন, সুখী হইবেন ও ধন্ত হইবেন। এ দেশের মহামান্য শাস্ত্র যোগবাশিষ্ঠ বলেন ;—

"অয়ং বন্ধুরয়ং নেতি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্॥"

অর্থাৎ ইনি বন্ধু ইনি পর ক্ষুদ্রচিত্ত ব্যক্তিরাই এরূপ গণনা করে, কিন্তু উদারচিত্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে জগতের সকলেই আত্মীয়।

আমাদের স্বদেশী আদরের সামগ্রী কোন্ কোন্ বস্তু? আর্য্য পুরুষ ও আর্য্য নারীগণ যে সকল জীবনে গ্রহণ ও আদর করিয়া দেব দেবীপদে বরিত হইয়াছিলেন, সেই সকল বস্তু। তাহা অসার অনিত্য স্থূলবস্তু নয়, নিত্য আধ্যাত্মিক অমূল্য বস্তু। আমরা নব্য মহিলাদিগকে সে সকল জীবনে গ্রহণ ও আদর এবং চরিত্রের ভূষণ করিতে অনুরোধ করিতেছি। আমরা বিবিধ শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া এ স্থলে সে সমস্ত বস্তুর কিয়ৎ পরিমাণ প্রদর্শন করিতেছি।

"আক্রুশ্যমানো ন বদামি কিঞ্চিৎ
ক্ষমাম্যহং তাড্যমানশ্চ নিত্যম্।
শ্রেষ্ঠং হ্যেতদ্ যৎ ক্ষমামাহুরার্য্যাঃ
সত্যং তথৈবার্য্যবমানৃশংস্যম্॥"
শান্তিপর্ব্ব।

অর্থাৎ কেহ আমার প্রতি ক্রোধ করিলেও আমি কিছু বলিব না, আমাকে কেহ তাড়না করিলেও আমি ক্ষমা করিব। আর্য্যগণ ক্ষমা, সত্য, সারল্য ও অহিংসাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন।

"ক্ষমাবন্তশ্চ ধীরশ্চ সর্ব্বকার্য্যেষুচোত্থিতাঃ।
মঙ্গলাচারসম্পন্নাঃ পুরুষাঃ স্বর্গগামিনঃ।"
অনুশাসন পর্ব্ব।

যাঁহারা ক্ষমাশীল, ধীর সর্ব্বকার্য্যে সমুন্নত সদাচারসম্পন্ন তাঁহারা স্বর্গগামী হন।

"সর্ব্বহিংসা নিবৃত্তাশ্চ নরাঃ সর্ব্বসহাশ্চ যে।
সর্ব্বস্যাশ্রয়ভূতাশ্চ তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ॥"
ঐ।

যাঁহারা সমুদায় হিংসা হইতে নিবৃত্ত, সকল সহ্য করিতে সমর্থ এবং সকলের আশ্রয় তাঁহারা স্বর্গগামী হন।

"অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধং
অসাধুং সাধুনা জয়েৎ।
জয়েৎ কদর্য্যং দানেন,
জয়েৎ সত্যেন নানৃতম্।"
উদ্যোগ পর্ব্ব।

অক্রোধ দ্বারা ক্রোধকে জয় করিবে, সাধু কার্য্য দ্বারা অসাধু কার্য্যকে জয় করিবে, বদান্যতা দ্বারা নীচতাকে জয় করিবে। সত্য দ্বারা অসত্যকে জয় করিবে।

"বাঙ্মনোভ্যাং শরীরেণ, শুচিঃ স্যাদনহঙ্কৃতঃ।
প্রশান্তো জ্ঞানবান্ ভিক্ষুর্নিরপেক্ষশ্চরেৎ সুখম্।"
শা।

নিরহঙ্কার হইয়া কায়মনোবাক্যে শুদ্ধ থাকিবেক, এবং প্রশান্ত জ্ঞানী ও সর্ব্বত্যাগী

হইয়া নিরপেক্ষ ভাবে সুখে বিচরণ করিবে।

"অহিংসা সত্য বচনং সর্ব্বভূতেষু চার্জ্জবম্।
ক্ষমা চৈবাপ্রমাদশ্চ যস্যৈতে স সুখী ভবেৎ॥"

শা।

অহিংসা, সত্য বাক্য, সর্ব্বভূতে সারল্য, ক্ষমা অপ্রমাদ এই সকল যাঁহাতে আছে, তিনি সুখী হয়েন।

"নাপধ্যায়েন্নস্পৃহয়েৎ নাবদ্ধং চিন্তয়েদসৎ।
অথামোঘ প্রযত্নেন মনোজ্ঞানে নিবেশয়েৎ॥"

শা।

অসদ্বিষয়ের অনুধ্যান করিবেক না, অসদ্বিষয় স্পৃহা করিবেক না, আবদ্ধ ভাবে অসদ্বিষয়ের চিন্তা করিবেক না, সর্ব্বপ্রযত্নে ব্রহ্মজ্ঞানে মনোনিবেশ করিবে।

"শত্রুং মিত্রঞ্চ যে নিত্যং তুল্যেন মনসা গিরা।
ভজন্তি মৈত্র্যাসঙ্গেভ্যস্তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ॥

অনু।

যে সকল ব্যক্তি প্রীতিসহকারে মিলিত হইয়া নিত্য বাক্য ও মনে সমভাবে শত্রু ও মিত্রের সেবা করেন তাঁহারা স্বর্গগামী হয়েন।

"ক্ষমা ধৃতিরহিংসাচ সমতা সত্যমার্জ্জবম্।
ইন্দ্রিয়াভিজয়ো দাক্ষ্যমার্জ্জবং হ্রীরচাপলম্।
অকার্পণ্যমসংরম্ভঃ সন্তোষপ্রিয়বাদিতা।
অবিহিংসানসূয়াচাপোষাং সমুদয়োদমঃ॥"

শা।

ক্ষমা, ধৈর্য্য, অহিংসা, সমভাব, সত্য, সরলতা রিপুদমন, দক্ষতা, কোমলতা, লজ্জাশীলতা, স্থিরতা, দানশীলতা, অক্রোধ, সন্তোষ, প্রিয়বাক্য, অহিংসা, ও অনুসূয়া এই সকলকে আত্মসংযম বলা যায়।

"অহিংসা ক্ষমা শান্তিঃ সন্তোষঃ প্রিয়বাদিতা।
কাম ক্রোধপরিত্যাগঃ শিষ্টাচার নিষেবনম্॥
কর্ম্মচ শ্রুতসম্পন্নং সতাং মার্গমনুত্তমম্।
শিষ্টাচারং নিষেবন্তে নিত্যং ধর্ম্মমনুব্রতাঃ॥"

বনপর্ব্ব।

অনুসূয়া, ক্ষমা, শান্তি, সন্তোষ, প্রিয়বাক্য, কাম ক্রোধপরিত্যাগ, সদাচরণ ও শাস্ত্রানুযায়ী সৎকর্ম্ম সাধুজনগণের অত্যুৎকৃষ্ট এই সকল পথ। ধর্ম্মানুগামী সাধকগণ নিত্য সাধুজনসমূহের অনুবর্ত্তী হয়েন।

"যা সাধ্বী নিয়তাচারা সা ভবেদ্ধর্ম্মচারিণী।
শ্রুত্বা দম্পতীধর্ম্মং বৈ সহধর্ম্মকৃতং শুভম্॥"

অনু।

যে সাধ্বী স্ত্রী সদাচারা হইয়া দম্পতীধর্ম্ম শ্রবণপূর্ব্বক উত্তমরূপে তদ্ধর্ম্ম সাধন করেন, তিনিই ধর্ম্মচারিণী হয়েন।

"শুশ্রূষাং পরিচর্য্যাঞ্চ দেবতুল্যং প্রকুর্ব্বতী।
বশ্যাভাবেন সুমনাঃ সুব্রতা সুখদর্শনা।"

অনু।

সদাচারা প্রিয়দর্শনা নারী সন্তুষ্ট চিত্তে দেবতুল্য স্বামীর বশ্যভাবে সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকেন।

"পরুষাণ্যপি চোক্তা যা দৃষ্টা ক্রুদ্ধেন চক্ষুষা।
সুপ্রসন্নমুখী ভর্ত্তুর্যা নারী সা পতিব্রতা।"

অনু।

কঠোর কথা বলিলে, ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে দেখিলেও ভর্ত্তার প্রতি যিনি প্রসন্নমুখী, তিনিই পতিব্রতা।

"দরিদ্রং ব্যাধিতং দীনমধ্বনা পরিকর্ষিতম্।
পতিং পুত্রমিবোপাস্তে সা নারী ধর্ম্মচারিণী॥"

অনু।

যে নারী প্রীতমনে বিনীত ভাবে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট চিত্তে পতির সেবা শুশ্রূষায় তৎপর সেই নারীই ধর্ম্মভাগিনী হয়েন।

"বিভর্ত্ত্যন্নপ্রদানেন কুটুম্বঞ্চৈব নিত্যদা,
ন কামেষু ন ভোগেষু নৈশ্বর্য্যে ন সুখে তথা
স্পৃহা যস্যা তথা পত্যৌ সা নারী ধর্ম্মভাগিণী॥"
অনু।

যে নারী নিত্য অন্নদান করিয়া কুটুম্ব দিগকে প্রতিপালন করেন. পতিতে যেমন স্পৃহা এমন ভোগ ঐশ্বর্য্য সুখ ও কামনা-বিষয়ে স্পৃহা নাই। সেই নারীই ধর্ম্মভাগিণী হয়েন।

"শ্বশ্রূ শ্বশুরয়োঃ পাদৌ তোষয়ন্তি গুণান্বিতা।
মাতা পিতৃপরা নিত্যং যা নারী সা তপোধনা॥"
অনু।

যে গুণসম্পন্না নারী শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের সেবা করেন, মাতা পিতাকে নিত্য ভক্তি করেন, তিনিই তপস্যাচরণ করিয়া থাকেন।

"ব্রতং চরন্তি যা নিত্যং দুশ্চরং লঘুসত্বরা।
পতিচিত্তা পতিহিতা সা পতিব্রতভাগিনী।"
অনু।

যে নারী পতির প্রতি অনুরক্তা ও মঙ্গলা-কাঙ্ক্ষিণী হইয়া আত্মাকে সংযত করত নিত্য দুশ্চরব্রত আচরণ করেন, তিনিই পতির ব্রত-ভাগিনী হয়েন।

"পুণ্য মেতত্তপশ্চৈব স্বর্গশ্চৈব সনাতনঃ।
যা নারী ভর্ত্তৃপরমা ভবেৎ ভর্ত্তৃব্রতা সতী।"
অনু।

যে সতী স্ত্রী স্বামীর প্রতি ভক্তি করেন, এবং স্বামীর ব্রতই যাঁহার একমাত্র ব্রত তাঁহার সেই ভক্তি ও ব্রতই তাঁহার পক্ষে তপস্যা, পুণ্য ও নিত্য স্বর্গ।

"সুখে তু বর্ত্তমানে বৈ দুঃখে চাপি নরোত্তম।
স্ববৃত্তাদেব ন চলতি শাস্ত্রচক্ষুঃ স মানবঃ॥"
শা।

সুখেই থাকুন আর দুঃখেই থাকুন যিনি তজ্জন্য নিজের সচ্চরিত্রতা হইতে বিচলিত হয়েন না, তিনিই শাস্ত্রচক্ষু।

"বসন্ বিষয়মধ্যেঽপি ন বসত্যেব বুদ্ধিমান্।
সংবসত্যেব দুর্ব্বুদ্ধিরসৎসু বিষয়েষ্বপি॥"
শা।

বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিষয়মধ্যে বাস করিয়াও তাহাতে বাস করেন না, কিন্তু নির্ব্বোধেরা বিষয়মধ্যে থাকিয়া কেবল অসদ্বিষয়েতেই অবস্থান করে।

"বীতরাগো জিতক্রোধঃ সম্যগ্ ভবতি যঃ সদা
বিষয়ে বর্ত্তমানেঽপি ন স পাপেন যুজ্যতে।"
শা।

যিনি আসক্তিশূন্য, যাঁহার ক্রোধ সম্যক্ পরাজিত হইয়াছে, তিনি বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াও পাপে লিপ্ত হয়েন না।

উপরে শাস্ত্রীয় বচন সকলে যে সমস্ত চরিত্রের সদ্গুণ, উচ্চ জীবনের ধর্ম্মভাব ব্যক্ত হইয়াছে তাহা স্বদেশী সামগ্রী। এই সকল স্বদেশী অমূল্য সামগ্রী জীবনে সঞ্চয় করিতে আমরা পাঠিকাদিগকে অনুরোধ করি। ইহা কি স্বদেশী বস্ত্র ও লবণ অপেক্ষা অশেষ গুণে উৎকৃষ্ট স্বদেশী সামগ্রী নয়? সামান্য স্বদেশী সামগ্রীর পক্ষপাতী হইয়া বিদেশী ভ্রাতাদের সঙ্গে বিবাদ বিসম্বাদ ও তাঁহাদের প্রতি দ্বেষ হিংসা কেন হইবে?

পারিবারিক শাস্ত্রপাঠ।

হিন্দু মোসলমান খ্রীষ্টান প্রভৃতি প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্র আছে। তাঁহাদের মধ্যে যে সকল পরিবার ধর্ম্মনিষ্ঠ

সেই সমস্ত পরিবারে নিয়মিতরূপে ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ হয়। স্ব স্ব ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি তাঁহাদের অতিশয় শ্রদ্ধা ও ভক্তি। প্রাচীন আর্য্যেরা আপন আপন সন্তানদিগকে বাল্যকালেই বেদবেদান্তাদি ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য উপযুক্ত আচার্য্যের নিকট প্রেরণ করিতেন। তাঁহারা গুরূপদেশে শাস্ত্রের গূঢ় মর্ম্ম অবগত হইবার নিমিত্ত গুরুগৃহে স্থিতি করিতেন। প্রত্যেক আর্য্যপরিবারে নিত্য বেদাদি শাস্ত্র নিষ্ঠাপূর্ব্বক পঠিত হইত। কালক্রমে হিন্দু-সমাজে সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চার বিলুপ্তির সঙ্গে বেদবেদান্তাদি শাস্ত্রের চর্চ্চা বিলুপ্ত হইয়াছে। তথাপি প্রাচীন শ্রেণীর বাঙ্গালী হিন্দু মহিলা-দিগের শাস্ত্রপাঠ শ্রবণে বিশেষ শ্রদ্ধা ও স্পৃহা দেখা যায়। বঙ্গভাষায় বিরচিত রামায়ণ ও মহাভারতাদি পুস্তককে ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞানে তাঁহারা তৎপাঠ শ্রবণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। কোন পরিবারে কোন পণ্ডিত নিয়মিতরূপে নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ভাগবতাদি গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতে নিযুক্ত হইলে পল্লীর সমুদায় মহিলা প্রত্যহ তৎশ্রবণের জন্য আগ্রহ সহকারে তথায় সমবেত হন। বড় ঘরের হিন্দু মহিলারা শাস্ত্র পাঠ সমাপ্তি হওয়ার দিনে উৎসব করেন, দ্বিজ-ভোজন ও দীন-ভোজন এবং দান বিতরণাদি করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা সচরাচর হয় না। আমরা বাল্যকালে প্রতিদিন অপরাহ্ণে গৃহে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে বাঙ্গলা মহাভারত বা রামায়ণ পাঠ করিতাম, পরিবারস্থ সমুদায় মহিলা নিকটে বসিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করিতেন। সেই সমস্ত পুরাণ শাস্ত্রের ঐতিহাসিক তত্ত্ব সকল তাঁহাদের অনেকের কণ্ঠস্থ ছিল। এক্ষণ সে দিন চলিয়া গিয়াছে। প্রাচীন শ্রেণীর মহিলাদিগেরও শাস্ত্রশ্রবণে তাদৃশ অনুরাগ নাই। নব্য মহিলারা রামায়ণ মহাভারতাদির কথা শুনিতে চাহেন না। তাঁহারা সে সকল পুস্তকের অনেক কথা বিশ্বাস করেন না, কুসংস্কার ও মিথ্যা গল্প বলিয়া উপহাস করেন। কিন্তু অসত্যের সঙ্গে সত্য ও নীতি যে তাঁহারা পরিত্যাগ করেন ইহা বুঝেন না, অতিশয় দুঃখের বিষয়। রামায়ণ মহাভারতাদিতে অনেক অমূল্য সত্য আছে, সুনীতির আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত সকল রহিয়াছে, তাহাতে অনেক শিক্ষা পাওয়া যায়। কুসংস্কাররূপ আবর্জ্জনার ভিতর হইতে সত্য-রত্নকে উদ্ধার করিয়া লইতে হয়। নব্য শ্রেণীর পরিবার সকলে শাস্ত্রপাঠ এক প্রকার বন্ধ। কিন্তু অনেক মহিলা আমোদজনক নাটক ও গল্পের পুস্তক এবং উপন্যাসাদি সময়ে সময়ে অনুরাগ সহকারে পাঠ করেন, তাহা পড়িয়া তাঁহাদের উপকার হয় না, বরং তাঁহাদের মন অতিশয় লঘু হইয়া যায়, চিত্ত-চাঞ্চল্যবৃদ্ধি হয়। বর্ত্তমান সময়ে রচিত বাঙ্গলা কাব্য নাটক উপন্যাসাদির অনেক-গুলি নিতান্ত কুরুচির উদ্দীপক, তাহা পড়িলে হৃদয় বিষাক্ত হয়। মহিলাদের তাহা স্পর্শ না করাই কর্ত্তব্য। নব্য বাবুদিগের পারিবারিক নিত্য শাস্ত্রপাঠের স্থান সংবাদপত্র অধিকার করিয়াছে। নিত্য খবরের কাগজ পড়িতে অনেকের বিষম উৎসাহ। সংবাদপত্রে স্বদেশী আন্দোলনের তত্ত্ব সকল পরনিন্দা ও পরচর্চ্চা এবং বড় লাট ছোট লাটের উপর মতামত প্রকাশ তাঁহাদের প্রতি নিন্দা কটূক্তি এক্ষণ প্রধান পাঠ্য হইয়াছে। এইরূপ খবরের কাগজ পড়িয়া তাঁহারা যে কিরূপ গভীর জ্ঞান

লাভ করিয়া উন্নত হইতেছেন তাঁহারাই জানেন। খবরের কাগজই উনবিংশ শতাব্দীর শাস্ত্র। তাহার ভিতরকার উল্ল সংবাদগুলি বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ হয়, অন্তঃপুরিকারাও এই নেশার বশবর্ত্তিনী হইয়া পড়িয়াছেন। আধ্যাত্মিক গভীর বিষয়—গূঢ় শাস্ত্রার্থের আলোচনা ও চিন্তা করেন, বাঙ্গালী পরিবারে এরূপ লোক বিরল। তাঁহাদের ভিতরে প্রবেশ নাই, তাঁহারা কেবল বহির্দ্দেশেই বিচরণ করেন। আর্য্য পূর্ব্বপুরুষদিগের বিশেষত্ব যে আধ্যাত্মিকতা ছিল, তাঁহাদের বংশধরদিগের জীবনে তাহা বিলুপ্ত প্রায়, অসার বাহ্যিক ভাবই প্রবল।

মোসলমান সম্প্রদায়ের বিশেষ ধর্ম্মপুস্তক কোরাণ গ্রন্থ। এই গ্রন্থকে তাঁহারা অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন। বিস্তীর্ণ কোরাণ পুস্তক অনেকের আদ্যোপান্ত মুখস্থ। যাঁহারা কোরাণ মুখস্থ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে "হাফেজ" বলে। ধার্ম্মিক মোসলমানেরা সন্তানদিগকে কোরাণ পাঠ শিক্ষা দিয়া থাকেন। মহাপুরুষ মোহম্মদের প্রচারবন্ধু মহাত্মা ওস্‌মান প্রতি শুক্রবার কোরাণ পাঠ আরম্ভ করিয়া বৃহস্পতিবার সমাপ্ত করিতেন। কোরাণপাঠ মোসলমানদের পারিবারিক শাস্ত্রপাঠের মধ্যে গণ্য। তাঁহারা হদিস ইত্যাদি ধর্ম্মশাস্ত্রও পড়েন, এবং তাহার আলোচনা করিয়া থাকেন। শাস্ত্রাধ্যয়ন মোসলমানদিগের একটি প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও ধর্ম্মকর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত। যে সকল মোসলমান-মহিলা লেখা পড়া জানেন তাঁহারাও ধর্ম্মগ্রন্থপাঠে অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

ধর্ম্মানুরাগী খ্রীষ্টবাদিগণ তাঁহাদের মূল ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেলকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিত্য অধ্যয়ন করেন। খ্রীষ্টবাদীদিগের পারিবারিক শাস্ত্রপাঠের মধ্যে বাইবেলপাঠই প্রধানরূপে গণ্য।

ব্রাহ্মদিগের নির্দ্দিষ্ট কোন বিশেষ ধর্ম্মগ্রন্থ নাই। তাঁহারা কোন ধর্ম্মগ্রন্থকে অভ্রান্ত ও পূর্ণ বলিয়া বিশ্বাস করেন না। বেদ বেদান্ত পুরাণ কোরাণ বাইবেলাদি সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্রে ঐশ্বরিক বাণী, স্বর্গীয় জ্যোতি ও অমূল্য সত্য সকল আছে, সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশাস্ত্র পরিত্রাণের সহায়, কিন্তু কোন গ্রন্থই অভ্রান্ত নহে, ব্রাহ্মদিগের বিশেষতঃ নববিধানবাদী ব্রাহ্মদিগের এরূপ বিশ্বাস। তাঁহারা হিন্দুদিগের বেদ বেদান্ত পুরাণাদিকে যেরূপ আদর করেন, মোসলমানদিগের কোরাণ এবং খ্রীষ্টবাদীদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেলকে তদ্রূপ আদর করিয়া থাকেন। নববিধানবিশ্বাসিগণ সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের শাস্ত্র হইতে সত্য সংগ্রহ করিয়া "ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রতিপাদক শ্লোকসংগ্রহ" নামক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। প্রাত্যহিক ও সামাজিক উপাসনার সময় তাহার কিয়দংশ পঠিত হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন তাঁহাদের কর্ত্তৃক ইংরাজি ও বাঙ্গলা ভাষায় উচ্চ শ্রেণীর রাশি রাশি ধর্ম্মপুস্তক প্রণীত হইয়াছে; কিন্তু সেই সকলের পাঠক বিরল। পারিবারিক শাস্ত্রপাঠ নাই বলিলেই হয়, প্রায় ব্রাহ্ম যুবক যুবতীদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রপাঠে অনুরাগ নাই, নূতন সত্যলাভে স্পৃহা নাই, তাঁহাদের বহির্ম্মুখীন চঞ্চল মন, জীবনে সাধন ভজন নাই, ইহা দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইতেছে। আমরা আমাদের পরিবারস্থ মহিলাদিগের মধ্যে সাপ্তাহিক শাস্ত্রপাঠের নিয়ম করিয়াছিলাম। কুটীরে যোগ ও ভক্তিশিক্ষার্থীর প্রতি

আচার্য্যের অমূল্য উপদেশ সকল যে ব্রহ্মগীতোপনিষদ নামে গ্রন্থে নিবদ্ধ হইয়াছে; সপ্তাহান্তে তাহা পাঠ ও তদ্বিষয়ে আলোচনা হইতেছিল। কিন্তু মহিলাদিগের অনুরাগের অভাবে অধিক দিন সেই পারিবারিক শাস্ত্রপাঠ চলিতে পারে নাই। সপ্তাহান্তে তাঁহারা এক ঘণ্টা কাল এই উচ্চ ও উপকারী বিষয়ে সময় ব্যয় করিতে কষ্টবোধ করিয়াছেন। আমরা বহু যত্ন চেষ্টার পর নিরুৎসাহ হইয়া দুঃখের সহিত তদ্বিষয়ে নিবৃত্ত হইয়াছি। লাহিরিয়া সরাইস্থিত নববিধানপ্রচারক শ্রদ্ধেয় ভাই দীননাথ মজুমদার মহাশয় নিত্য উপাসনা, শাস্ত্রপাঠ ও ধর্ম্মালোচনাদি দ্বারা পরিবারে ধর্ম্মভাব জাগরিত রাখিতে বিশেষ যত্নবান্। ঈশ্বরকৃপায় তিনি এ বিষয়ে সফলকাম হইয়াছেন। সম্প্রতি আমরা তাঁহাকে নবরচিত দুই খানা পুস্তক উপহার দিয়াছিলাম। তিনি তাহা পাইয়া আমাদিগকে এরূপ লিখিয়াছেন, "এই মাত্র পুস্তিকা দুইখানা হস্তগত হইল। আমাদের পারিবারিক শাস্ত্রপাঠের সময় প্রতিদিন পুস্তক দুই খানা সপরিবারে পাঠ করিব। আচার্য্যের জীবনপাঠ সম্প্রতি চলিতেছে, শেষ হইলেই ইহা পাঠের জন্য গ্রহণ করা যাইবে মনে করিতেছি। পাঠান্তে মন্তব্য জানাইব। ত্রৈলোক্য বাবুর ব্রহ্মগীতা খানি অতি সুন্দর, দুই মাসে গ্রন্থখানির পাঠ সাঙ্গ করিয়াছিলাম। পরিবারস্থ সকলেই গ্রন্থখানি পড়িয়া আনন্দিত ও উপকৃত হইয়াছেন। সাধারণ নরনারীর পাঠ্য ওরূপ গ্রন্থ আমাদের আর আছে বলিয়া মনে হয় না। ব্রাহ্মপরিবারের মধ্যে ধর্ম্মালোচনা, শাস্ত্রপাঠ প্রভৃতির বড়ই অভাব হইতেছে। যুবাদের মধ্যে উপাসনাদি বন্ধ হইতেছে, বড়ই দুঃখের বিষয়। আপনারা গ্রন্থ লিখিয়া কি করিবেন? পড়িবার লোক অতি বিরল।"

যাহা হউক বাঁকিপুরস্থ আমাদের একটী স্নেহের কুমারী কন্যা আমাদের হইতে এক খানা ক্ষুদ্র পুস্তক (ধর্ম্মবন্ধুর প্রতি কর্ত্তব্যপুস্তক) উপহার পাইয়া তৎপ্রতি অতিশয় সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহার ধর্ম্মপুস্তকাদিপাঠে বিশেষ অনুরাগ আছে, এরূপ বোধ হইল। তিনি পুস্তক খানার প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া অনন্দের সহিত এরূপ লিখিয়াছেন;— "পুস্তকখানি যথার্থই বড় সুন্দর ও সত্য। পড়িতে লাগিলে ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না; অত্যন্ত ভাল লাগে, ইহা অত্যন্ত উপকারী পুস্তক বলিয়া মনে হয়। আমি ইহা চার পাঁচ বার পড়িলাম, তবুও ইচ্ছা হয় আবার পড়ি, প্রায় কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছে। যেখানে যেখানে বড় ভাল লাগিয়াছে, নিজের মনের কথাগুলির সঙ্গে ইহার ভাবগুলি মিলিয়া গিয়াছে, সেখানে সেখানে অল্প দাগ দিয়া রাখিয়াছি। তাই ভাবিতে ছিলাম, আমাদের উন্নতির জন্য আমাদের জীবনকে এক একটি ধার্ম্মিক জীবন করিবার জন্য চারি ধারে কতই সহায়তা রহিয়াছে। এই সকল নানা ধর্ম্ম পুস্তকও আছে। ইহা ব্যতীত আপনাদের ন্যায় ভক্ত জনের মঙ্গলকামনা, স্নেহদৃষ্টি, সঙ্গসহবাস ইহাও কি কম আশীর্ব্বাদ। আপনাদের নিকট হইতে আশীর্ব্বাদ লাভ করিলে আমরা অধিক উৎসাহিত হই। মনে হয় সে দিন অধিক পরিমাণে অগ্রসর হইয়া গেলাম। আপনাদের উপদেশ শ্রবণ করিলে আমা-

দের চক্ষু খুলিয়া যায়, মন জাগ্রত হইয়া উঠে। তাই আপনাদের কাছে থাকিতে, কথা বার্ত্তা বলিতে, পত্র লিখিতে এত ভাল-বাসি। এবার পথ খুলিয়া গেল। যখন তখন মনে হইলেই আপনার কাছে আসিতে পারিব। হৃদয়ের যে উচ্চ স্থানে আপনাদের স্থান দিয়াছি তাহা যেন কেবল আপনাদের জন্য রাখিতে পারি। আমাদের অন্তরের সেই ভক্তি শ্রদ্ধা দিন দিন যেন আরও গভীর হয়। আপনারা আশীর্ব্বাদ করিবেন।" * *

"আমাদের বাড়ীতে কিছু কিছু পুস্তক আছে। সব নাই। ভক্তিভাজন স্বর্গীয় দাদা মহাশয়ের বোধ হয় সব পুস্তকই আছে। পরম ভক্তিভাজন স্বর্গীয় আচার্য্য দেবেরও কিছু কিছু পুস্তক আছে। শ্রদ্ধাস্পদ উপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত যে তাঁহার জীবনী তাহা আমাদের বাড়ীতে নাই, বাবাকে বলিয়াছি কিনিবার জন্য, তিনি সম্মত হইয়াছেন। শ্রদ্ধাস্পদ ত্রৈলোক্য বাবু মহাশয়ের পুস্তক এখানে বড় কম দেখিলাম, তাঁহার সঙ্গীত পুস্তক ছাড়া আর কি কি পুস্তক আছে ঠিক জানি না। ভাবিয়াছি এবার উৎসবের সময় যে তালিকা বাহির হইবে আপনার আদেশমত তাহা হইতে পুস্তক সংগ্রহ করিব। ছোট একটি পুস্তকের আলমারিতে বাঙ্গলা এবং ইংরাজি কতক-গুলি পুস্তক আমি সাজাইয়া রাখিয়াছি, এবং তাহা হইতে সময়মত লইয়া পড়ি। এখন আমি শ্রীচৈতন্যের জীবনী পড়ি। মনে হইতেছে তাঁহার বিষয় আমাদের আরও ভাল করিয়া জানা দরকার। সন্ধ্যা বেলায় আমাদের ছোট বড় সকলে মিলে একটী প্রার্থনা হয়, দুইটী গান হয় ও শ্লোক-সংগ্রহ হইতে শ্লোক বলা হয়। ইহার পরে আমি কোন ধর্ম্ম পুস্তক পড়ি, এবং প্রায়ই মার কাছে পড়ি। শ্রীচৈতন্যের জীবনী খানি প্রায়ই শেষ হইয়া আসিল। আপনার কি ইচ্ছা হয়, ইহার পরে কি পড়ি।"

আমরা দেখিয়াছি প্রতিদিন প্রাতঃকালে পারিবারিক উপাসনার সময় এই কন্যা ও তাঁহার জেষ্ঠ্যা ভগিনী তাঁহাদের পিতৃদেব ও মাতৃদেবী যে প্রার্থনা করেন তাহা খাতায় যত্নপূর্ব্বক লিখিয়া রাখেন। ইঁহাদের ধর্ম্ম-বিষয়ে মতি ও যত্ন আগ্রহ দেখিয়া আমাদের অতিশয় উৎসাহ ও আনন্দ হয়।

দুর্ভিক্ষ ও বঙ্গমহিলাগণ।

গত বারে আমরা পূর্ব্ববঙ্গের নানা স্থানে লোকদিগের ভীষণ অন্নকষ্ট হওয়ার সংবাদ পাঠিকাদিগকে জ্ঞাপন করিয়াছি। পূর্ব্ব হইতে সাবধান হওয়াতে অনাহারে অধিক লোকের মৃত্যু হইতে পারে নাই। দুর্ভিক্ষের সূচনাতেই বহু দয়াবান্ লোক ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে দুর্ভিক্ষক্ষেত্রে যাইয়া অন্নাভাবে ক্লিষ্ট লোকদিগের সেবাতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। চাউল খরিদ করিয়া বিতরণ করিবার জন্য কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে প্রচুর অর্থ প্রেরিত হইয়াছে। পূর্ব্বাঞ্চলের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর যে সকল স্থানের লোকের অধিক অন্নকষ্ট হইয়াছে শুনিয়াছেন, স্বয়ং সেই সকল স্থানে যাইয়া কষ্টনিবারণের যথোপযুক্ত উপায় বিধান করিয়াছেন, রাজকোষ হইতে অকাতরে অর্থসাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া-ছেন। যশোহর জিলার নানা বিভাগে

লোকদিগের বিষম অন্নকষ্ট ঘটিয়াছে। কিন্তু তথাকার সুযোগ্য মাজিষ্ট্রেট B. C. Sen স্বয়ং গ্রামে গ্রামে বাড়ীতে বাড়ীতে ভ্রমণ করিয়া ও কতক বিশ্বস্ত লোকের দ্বারা অনুসন্ধান লইয়া অন্নাভাবগ্রস্তদিগকে ৩।৪ বৎসর মেয়াদে গবর্ণমেণ্ট হইতে স্বল্প সুদে টাকা ধার দিতেছেন। যাহাদের ঋণ পরিশোধ করিবার কোন উপায় নাই, তাহাদের জীবনরক্ষার জন্য অর্থদান করিতেছেন। কিছুদিন হইল আমরা যশোহরে গিয়াছিলাম, লোকের দুঃখকষ্টনিবারণ ও জীবনরক্ষার জন্য মাজিষ্ট্রেটকে সর্ব্বদা ব্যস্ত দেখিয়া আসিয়াছি। যেদিন আমরা তথায় পঁহুছিয়াছিলাম, সেই দিন তিনি পাল্কী যোগে পল্লী গ্রামে প্রায় বিশ মাইল পথ স্বয়ং ভ্রমণ করিয়া অন্নাভাবগ্রস্ত লোকদিগের অবস্থার অনুসন্ধান লইয়া আসিয়াছিলেন। সম্প্রতি যশোহর হইতে একজন বন্ধু আমাদিগকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, "এখনও দুর্ভিক্ষ কম নহে, মাজিষ্ট্রেট সাহেবও যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া গরিব প্রজাদের প্রাণ রক্ষা করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট হইতে অগ্রিম টাকা দিয়া লোক বাঁচাইতেছেন। প্রত্যহ তাঁহার নিকট ৪।৫ শত লোক টাকার প্রার্থী হইতেছে।" আমরা যশোহরে যাইয়া তথাকার মাজিষ্ট্রেট বি, সি, সেনের দয়া, সুবিচার, কার্য্যদক্ষতা ও সৌজন্যাদির বিশেষ প্রশংসা লোকমুখে শুনিতে পাইয়াছিলাম। সকল লোক মুক্তকণ্ঠে তাঁহার গুণকীর্ত্তন করে। ইহা অতি আহ্লাদের বিষয়। ভাদ্রমাসের ফসল উঠিলে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ অনেক পরিমাণে নিবারিত হইবে, এরূপ আশা করা যায়, কিন্তু এবার বৃষ্টির অভাবে শস্যের অবস্থা সুখজনক নহে।

মণিরামপুর গ্রামের একটী সদয়হৃদয়া মহিলা যে পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষ থাকিবে সে পর্য্যন্ত তিনি মাসিক পঞ্চাশ টাকা দান করিবেন, এরূপ প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। বালিগঞ্জ হইতে একটী সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলা দুর্ভিক্ষ নিবারণের সাহায্যার্থ ৫০৲ টাকা পাঠাইয়া দিয়াছেন। দুর্ভিক্ষক্ষেত্রে অন্নবিতরণার্থ আরও নানা স্থান হইতে দয়ার্দ্রহৃদয়া নারীগণ অর্থসাহায্য যে করিয়াছেন সন্দেহ নাই, আমরা তাহার সকল সংবাদ পাই নাই। লোকে অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছে, অনেকের মৃত্যু হইতেছে এই সংবাদ পাইয়া নারীর প্রেমার্দ্র কোমলহৃদয় যে অত্যন্ত আহত হইয়াছে, নিম্নলিখিত পত্র তাহা প্রমাণ করিতেছে। এই পত্র বাঁকিপুর হইতে একটী স্নেহের কন্যা ১৬ই জুলাই তারিখে আমাদিগকে লিখিয়াছেন।

"কাগজে দেখিলাম দাদাজী ও সাধুবাবু মহাশয় দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের সাহায্যার্থ গমন করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষের ভীষণ সংবাদ পড়িতে গেলে যেন বুক ফাটিয়া যায়। আমাদের মনে হয় সুখের অন্ন গ্রহণ করা উচিত নয়। কেবল যত টুকু প্রয়োজন, না হইলে জীবন ধারণ হয় না, তত টুকু লইয়া বাকি যাহা বাঁচিবে তাহাদের জন্যই যেন আমরা পাঠাইয়া দিতে পারি। বাঁকিপুর হইতে ২০০৲ শত টাকা সে স্থানে প্রেরণ করা হইয়াছে। গত রবিবারে ছেলেরা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার ঝুলি লইয়া গান গাহিয়া গাহিয়া বেলা ৩টার সময় ১৫০৲ টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। শুনিতেছি শীঘ্র তাহাও পাঠান হইবে। কিন্তু সে ঘোর অভাবের মধ্যে ইহাতে কতটুকু

সাহায্য হইবে? আমাদের ক্ষুদ্র সমিতি হইতে সামান্য ১০টী টাকা দেওয়া হইয়াছে।"

উক্ত কন্যার দ্বিতীয় পত্র, (২৩শে জুলাই);—

"ধর্ম্মতত্ত্ব ও মহিলায় দুর্ভিক্ষের বিষয় অনেক পড়িলাম। মহিলার ঘটনাটী পড়িয়া অত্যন্ত কষ্ট হয়। কলিকাতায় তাঁহারাও ত অনেক অর্থ সাহায্য করিতেছেন। এখন এখানে আবার আমাদের দেশের—কৃষ্ণনগরের দুর্ভিক্ষের জন্য চাঁদা উঠাইতেছে। এখানে বড় বড় হিন্দু উকিলগণ খুব দান করিতেছেন, এবং তাঁহারাও আমাদের সঙ্গে একমত হইয়া খুব উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছেন। অল্প সময়ের মধ্যে অধিক টাকা সঞ্চিত হইতেছে; এই দুর্ভাগ্যের মধ্যে ইহা একটি সৌভাগ্যেরই বিষয়।"

লীলা ও মেজদাদা।

ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ড।

লীলা। মেজদা, তুমি সে দিন ব'লেছিলে যে উপরে ঐ অসীম আকাশে কোটি কোটি গ্রহ নক্ষত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমাদের পৃথিবীও ঘুর্‌চে। আচ্ছা, এরা সব এত ছুটোছুটি কর্‌চে, কিন্তু কখনও একটা আর একটার উপর গিয়ে পড়্‌চে না—আশ্চর্য্য নয় কি?

মেজদা। ব্রহ্মাণ্ডের যে দিকে তাকাবে সে দিকেই এরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখ্‌তে পাবে। একটা ক্ষুদ্র বীজ মাটীতে পুতে রাখ্‌লে, উহাতে অঙ্কুর জন্মাল, পাতা হ'ল, ক্রমে উহা প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হ'ল। আমরা এরূপ যে কত অসংখ্য ব্যাপারের মধ্যে ডুবে আছি তার শেষ নাই। ঐ যে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহাদির কথা বল্লে, উহাদের প্রত্যেকের নির্দ্দিষ্ট গতিপথ রয়েছে, তারা ঠিক সেই নিয়মে চ'লে আস্‌চে—তাইতে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ হ'তে পাচ্ছে না। কেবল যে আকাশের গ্রহগুলিই সে নিয়মের অধীন, তা নয়, ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি ক্ষুদ্র অংশ, সামান্য একটা ধূলিকণাও সেই নিয়ম পালন ক'রে আস্‌ছে।

লীলা। একটা ধূলিকণার মধ্যেও সে নিয়ম রয়েছে?

মেজদা। অবিশ্যি। এতে আশ্চর্য্য হ'লে কেন?

লীলা। আমি তা বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

মেজদা। আচ্ছা, বুঝিয়ে বল্‌ছি। আমরা পদার্থকে সাধারণতঃ তিন প্রকার অবস্থায় দেখ্‌তে পাই। বৈজ্ঞানিকেরা তাদের নাম দিয়েছেন, কঠিন, তরল ও বায়বীয়। কিন্তু যদি কেউ বলে, কঠিন পদার্থ ব'লে কোন পদার্থই নাই—তা বিশ্বাস কর্‌বে কি?

লীলা। এরূপ অসম্ভব কথা কি ক'রে বিশ্বাস করা যেতে পারে? এক টুক্‌রো পাথর বা লোহাকে কি তা হ'লে কঠিন বল্‌বে না?

মেজদা। এ প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে, তোমাকে জিজ্ঞেস কর্‌চি—কঠিন পদার্থ বল্লে তাতে কি বুঝায়?

লীলা। এও আবার জিজ্ঞেস কর্‌তে হয়? কঠিন পদার্থকে, কঠিন, শক্ত, দৃঢ় এরূপই বুঝায়, আবার কি বুঝাবে?

মেজদা। কথাটা বুঝ্‌তে পার নি।

যাক্, আমিই বল্‌ছি। পদার্থমাত্রই কতক গুলি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের সমষ্টি মাত্র, অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের সম্মিলনে এক একটি পদার্থ হইয়াছে। ঐ ক্ষুদ্র অংশগুলি (বৈজ্ঞানিকেরা উহাদিগকে "পরমাণু" ব'লে-থাকেন) যখন পরস্পর দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন থাকে, তখনই ঐ পদার্থসকলকে কঠিন বলা হয়। কেমন, কঠিন পদার্থ বল্লে এরূপই তো বুঝ?

লীলা। হাঁ তা বই কি?

মেজদা। বেশ! কিন্তু আমি দেখাব যে কোন পদার্থেরই ঐ ক্ষুদ্র অংশগুলি পরস্পর দৃঢ়সংলগ্ন নহে এমন কি একটীর গায়ে আর একটী লেগে নাই।

লীলা। সে কি কথা—আমরা যে দেখ্‌তে পাচ্ছি, তা কি ভ্রম?

মেজদা। সম্পূর্ণ ভ্রম। ঐ ক্ষুদ্র অংশ-গুলি এত সূক্ষ্ম যে চোখে দেখা যায় না, সে জন্যেই ঐ ভ্রম জন্মে থাকে। একটা উদাহরণেই তা বুঝ্‌তে পার্‌বে। তুমি যে টেবিলের উপর হাত রেখে শেলাই কর্‌ছ—উহাকে অবিশ্যি কঠিন পদার্থ বল্‌বে।

লীলা—বল্‌বো বই কি? কঠিন ব'লেই তো এর উপর আবার বনাত এঁটে একটু নরম করা হয়েছে।

মেজদা। আচ্ছা, এই টেবিলের শক্ত কাঠের ভিতর একটা প্রেক্ বিঁধিয়ে দেওয়া যেতে পারে, তা জান?

লীলা। হাঁ—তাতে কি হ'ল?

মেজদা। তাতে এই বুঝাচ্ছে যে, টেবি-লের ক্ষুদ্রতম অংশগুলির মধ্যে মধ্যে অবশ্য ফাঁক রয়েছে, চাপ পেয়ে উহারা পরস্পর অধিকতর নিকটবর্ত্তী হ'য়ে তাদের মধ্যে পেরেক্‌টির স্থান ক'রে দিয়ে থাকে।

লীলা। কাঠের টেবিল ব'লে তা হতেও পারে, কিন্তু পাথর বা লোহার ন্যায় শক্ত জিনিষের মধ্যে উহা সম্ভবপর নয়।

মেজদা। লোহার ভিতর একটা প্রেক বিঁধিয়ে দেওয়া শক্ত হ'তে পারে বটে, কিন্তু তা ব'লে যে উহার ক্ষুদ্রতম অংশগুলি পরস্পর পৃথক্ নয়, ইহা অস্বীকার করা যেতে পারে না। তাপ দিলে লোহার ন্যায় কঠিন জিনিসের আয়তনও এ টু বেড়ে যায়; তার মানে এই যে, উহার অংশগুলি তাপ পেয়ে পরস্পর হ'তে অধিকতর পৃথক হ'য়ে পড়ে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়েছে, জগতের সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ় পদার্থকেও চাপ দিয়ে অপেক্ষা-কৃত ক্ষুদ্রতর আকারে আনয়ন করা যেতে পারে। ইহাতে এই বুঝায় যে, ঐ পদার্থের অতি ক্ষুদ্র অংশগুলির একটি অপরটিকে প্রকৃত প্রস্তাবে স্পর্শ করে না—তাহারা পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথক্—একটির গায়ে অপরটি লেগে নাই। তবেই পদার্থকে কঠিনই বল, তরলই বল, আর বায়বীয়ই বল, সকল অব-স্থায়ই উহাদের ক্ষুদ্রতম অংশগুলি পরস্পর পৃথক্ ও বিচ্ছিন্ন থাকে।

লীলা। তাই যদি হয়, তবে ঐ ক্ষুদ্র অংশগুলি বালির ন্যায় ঝরে পড়ে না কেন? অথবা বায়ুর ন্যায় উড়ে যায় না কেন?

মেজদা। সে কথাই তোমাকে বল্‌তে যাচ্ছি। প্রকৃতিতে সমস্ত পদার্থই পরস্পরকে আকর্ষণ ক'রে থাকে। আকাশস্থ সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ উপগ্রহাদির মধ্যে যে আকর্ষণ, সাধা-রণতঃ তাহাকে "মহাকর্ষণ" বলা হয়। যে জিনিষটা যত বড়, তদনুসারে তার আকর্ষণও

বেশী হয়ে থাকে। এ কথায় প্রশ্ন হ'তে পারে, চন্দ্র ও পৃথিবী হ'তে সূর্য্য এত বড় থাকা সত্বেও উহারা সূর্য্যের আকর্ষণে তাহার উপর গিয়ে পড়ে না কেন। তা নিশ্চয়ই পড়ত—কিন্তু উহাদের উপর আর একটা শক্তি কাজ কর্‌ছে—যে শক্তিতে উহারা প্রথম চালিত হ'য়েছিল, ঐ শক্তি উহাদিগকে কেবলই সোজা ভাবে নিয়ে যেতে চায়—মাঝ খানে সূর্য্যের আকর্ষণে উহাদের গতি বক্র হ'য়ে তাহারই চারি দিকে বর্ত্তুলাকারে উহারা ভ্রমণ ক'রে থাকে—একেবারে তাহার উপর গিয়ে পড়্‌তে পার্‌ছে না। অপরাপর গ্রহাদির সম্বন্ধেও সেকথা। এই জন্যই আকাশের গ্রহনক্ষত্রাদির মধ্যে ঠুকোঠুকি হচ্ছে না।

লীলা। ভাল, বুঝিলাম। কিন্তু তুমি আমার পূর্ব্ব প্রশ্নের উত্তর দিলে না।

মেজদা। সে কথাও বল্‌ছি। আকাশের গ্রহাদির মধ্যে যেমন "মহাকর্ষণ" রয়েছে, তদ্রূপ পদার্থের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলির মধ্যেও একটা আকর্ষণ আছে। বৈজ্ঞানিকেরা উহাকে "সংহতিবল" বলেন। যে পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশগুলির মধ্যে সংহতিবল বেশী, তাহা আমাদের নিকট দৃঢ় বলে মনে হয়। জলের ন্যায় তরল পদার্থে সংহতি বল অপেক্ষাকৃত কম, বায়ুতে খুবই কম। এই সংহতিবল আছে ব'লেই কাঠ, লোহা, পাথর প্রভৃতির ক্ষুদ্রতম অংশগুলি বালির ন্যায় ঝ'ড়ে পড়ে না, কিংবা ধূমের ন্যায় উড়ে যায় না।

লীলা। আচ্ছা, তুমি বলেছিলে সামান্য একটী বালুকাকণাও ভগবানের নিয়ম প্রতিপালন কর্‌ছে, সে কোন্ নিয়ম?

মেজদা। আকাশের গ্রহগুলি যে নিয়মের অধীন, আমি সে নিয়মের কথাই ব'লেছি। গ্রহগুলি যেমন সতত গতিশীল, একটীও স্থির নহে, সেই রূপ সমস্ত পদার্থই গতিশীল। একটা বালুকাকণাকে দৃশ্যতঃ স্থির ব'লে মনে হয় বটে; কিন্তু যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের মিলনে, ঐ কণাটী হ'য়েছে, উহাদের প্রত্যেকে অবিশ্রান্ত সঞ্চরণ কর্‌ছে, এবং গ্রহাদির ন্যায় তাদেরও নিজ গতি-পথ র'য়েছে। তবেই দেখ্‌তে পাচ্ছ, আমরা যাকে নিশ্চল কঠিন পদার্থ বল্‌ছি, উহা সম্পূর্ণরূপে চঞ্চলাবস্থাপন্ন, উহার প্রতি ক্ষুদ্রাংশ নিয়ত অবিচ্ছেদ্য গতিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

লীলা। তা'হলে কি জগতের কোন পদার্থই প্রকৃত প্রস্তাবে স্থির নহে?

মেজদা। ব্রহ্মাণ্ডের যে দিকে চাও সে দিকেই এক অনন্ত অবিশ্রান্ত গতি ও জীবন দেখ্‌তে পাবে। এই ব্রহ্মাণ্ড এমনই অদ্ভুত ও রহস্যময়ী শক্তিতে সঞ্চারিত যে, ইহাকে একটা জীবন্ত প্রাণী বল্লেও চলে। ইহা প্রতি বিন্দুতে বিন্দুতে প্রাণময়।

লীলা। এ আবার কি বল্‌চো। আমাদের চারি দিকে যে কত অচেতন পদার্থ র'য়েছে, তাদিগকেও কি তুমি প্রাণময় বল্‌বে?

মেজদা। আমরা স্থূলভাবে কতকগুলি পদার্থকে অচেতন নাম দিয়েছি বটে, কিন্তু সূক্ষ্ম অনুসন্ধানে জানা গিয়েছে, তাহারাও সম্পূর্ণ প্রাণময়।

লীলা। তা কি ক'রে হ'তে পারে, বুঝিয়ে বল।

মেজদা। সে বুঝাতে গেলে অনেক

সময় লাগবে, আর সে সঙ্গে আরও কয়েকটা বিষয়ের আলোচনা করা আবশ্যক হবে। আমি সংক্ষেপে তার কিছু আভাস দিচ্ছি। একটু পূর্ব্বে "পরমাণুর" কথা ব'লেছি, রসায়ন শাস্ত্রের সূত্রে, ইহার অস্তিত্ব স্বীকার ক'রে লওয়া হ'য়েছে; তদনুসারে পরমাণু, পদার্থের ক্ষুদ্রতম কঠিন অংশ। কিন্তু আমরা যখন উহাকে ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি কর্ত্তে যাই, তখন উহাকে কোথাও খুঁজে পাই না। তবে অণুবীক্ষণ বল, কিংবা তদ্রূপ অন্য যে যন্ত্রই বল, তাদের সাহায্যেও পরমাণুর অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না। তবে এমন একটা কিছু পাওয়া যায়, যাহা পূর্ব্ব কথিত পরমাণুর সংজ্ঞার মধ্যে আসে না। একজন বিখ্যাত পণ্ডিত উহাকে "শক্তি-বিন্দু" এই নাম দিয়াছেন। আবার কেহ কেহ উহাকে "সতত সঞ্চরমান কম্পন" ব'লেছেন। যে নামেই উহাকে বলা হউক না কেন, ঐ শক্তি বা কম্পন সর্ব্বত্র সর্ব্ব পদার্থে বিদ্যমান। আমাদের দেশপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ও এ বিষয়ে অনেক পরীক্ষা ও প্রমাণ ক'রেছেন।

লীলা। একটা শক্তি বা কম্পন থাকিলেই কি প্রাণের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়?

মেজদা। কেবল তা নয়। পদার্থের যে ক্ষুদ্র অংশগুলি এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হ'য়েছে, তাদের এরূপ অদ্ভুত কার্য্য-প্রণালী দেখা গিয়েছে যে, উহাদিগকে আর নির্জ্জীব "জড়" ব'লে উপেক্ষা করা চলে না। অধিক কি, ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত জড়বাদী পণ্ডিত বল্‌তে বাধ্য হ'য়েছিলেন যে, পদার্থের প্রত্যেক ক্ষুদ্র অংশ একটু একটু মনোভাবযুক্ত। জর্ম্মাণ দেশেরও একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত "আণবিক আত্মার" কথা উল্লেখ ক'রেছেন। কারণ, ইহা স্বীকার না কল্লে পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশগুলির সর্ব্ব প্রকার আচরণ ব্যাখ্যা করা অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়ায়।

লীলা। তাইতো, এ যে ভারি আশ্চর্য্য ব্যাপার!

মেজদা। তোমাকে পূর্ব্বেই ব'লেছি, এই বিরাট বিশ্ব সর্ব্বত্রই আশ্চর্য্য ব্যাপারে পরিপূর্ণ। আমরা তার অতি অল্পই জান্‌তে পেরেছি। অধিক দূরে যাবার আবশ্যক নেই, আমাদের এই দেহ-যন্ত্রের ভিতর যে কত অত্যদ্ভুত কৌশল, কত শিল্প নৈপুণ্য, কত সূক্ষ্ম জ্ঞানের পরিচয় র'য়েছে তাহা ভাবতে গেলে বিস্ময়ে অভিভূত হ'তে হয়। আমাদের শরীরের রক্ত স্বভাবতঃ লাল নহে, উহা এক প্রকার বর্ণবিহীন তরল পদার্থ। তবে যে উহাকে লাল দেখায় তার মানে এই, ঐ তরল পদার্থে লালবর্ণ বিশিষ্ট এক জাতীয় অতি ক্ষুদ্র ডিম্বকোষ সর্ব্বদা ভেসে বেড়াচ্ছে, তাহারা এত ছোট যে শুনলে অবাক্ হবে। একটি ছুঁচের অগ্রভাগে যতটুকু রক্ত ঝুলিয়ে রাখা যেতে পারে, তাহাতে ঐরূপ দশ লক্ষ ডিম্বকোষ থাকতে পারে। এখন ভেবে দেখ উহারা কত ক্ষুদ্র। তদ্ভিন্ন আমাদের দেহের ভিতর আরও কোটি কোটি জীবাণুর বাসস্থান। শোণিতবহা স্নায়ুর ভিতর দিয়ে উহারা দলে দলে, হাজারে হাজারে দেহের এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্তে নিরন্তর যাতায়াত করে।

লীলা। এই জীবাণু বা ডিম্বকোষের তুলনায় আমরা তাহ'লে কত বড়?

মেজদা। সে তুলনায় আমরা প্রায় ব্রহ্মাণ্ডেরই মত। আচ্ছা মনে কর, ঐ

সমস্ত জীবাণুর কোন একটিকে যেন আমাদের ন্যায় চিন্তাশক্তি প্রদান করা হল। উহার নিকট আমাদের শোণিতপ্রবাহিকা স্নায়ুগুলিকে সুপ্রশস্ত পদ্মা নদীর মত এবং অস্থিপঞ্জরের মধ্যস্থ ছিদ্রগুলিকে বিশালায়তন পর্ব্বতের সুড়ঙ্গের ন্যায় প্রতীয়মান হইবে। ঐ জীবাণু ঐ সকলের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে হৃৎপিণ্ডের নিকট উপস্থিত হ'য়ে উহার অংশ বিশেষের কার্য্য প্রণালী দেখে যদি দেহটাকে একটা জ্ঞানময় বিরাট প্রাণী ব'লে ভাবতে থাকে, তাহ'লে তখন উহার নিকট এই দেহকে তেমনি বিরাট বিশাল ও দুর্ব্বোধ্য মনে হবে, আমাদের নিকট যেমন এই বিশ্ব বিরাট বিশাল ও দুর্ব্বোধ্য মনে হয়। ঐ জীবাণুর নিকটে যেমন আমি, আমাদের নিকটেও ব্রহ্মাণ্ড ঠিক তদ্রূপ। আমি যেমন এই দেহ-যন্ত্রের জ্ঞান মন ও আত্মাস্বরূপ ঈশ্বরও তেমনি এই বিশ্বের জ্ঞান মন ও আত্মাস্বরূপ।

লীলা। ঈশ্বর তা হ'লে সমস্ত বিশ্ব জুড়ে আছেন, বল্‌তে হবে।

মেজদা। তিনি সর্ব্বত্র সকল সময় বিরাজমান। আমি যেমন যে কোন মুহূর্ত্তে আমার দেহের প্রতি অংশ—কেশাগ্র অবধি পদাগ্র পর্য্যন্ত অধিকার ক'রে আছি, ঈশ্বরও তেমনি সকল সময় এই বিরাট বিশ্বের সর্ব্ব স্থান পূর্ণ ক'রে আছেন। তিনি কোনও অনন্ত দূরবর্ত্তী স্বর্গলোকে অবস্থিত নহেন, উহা ভ্রান্ত ধারণা, তিনি আমাদের চির সন্নিহিত।

মহিলার জনৈক পাঠিকার প্রতি।

বিগত আষাঢ় মাসে আমরা "ভিখারিণী" স্বাক্ষরিত পত্রপ্রেরিকার পত্রসম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি। এবার আবার "মহিলার জনৈক পাঠিকা" উপস্থিত। ভিখারিণী যেমন আমাদের নিকটে আত্মপরিচয় দান করেন নাই, জনৈক পাঠিকাও আত্মপরিচয় গোপন করিয়াছেন। উভয় পত্রের লেখা একরূপ বোধ হইল; একজনের হস্তাক্ষরই আমরা এরূপ বুঝিতে পারিলাম। ভিখারিণীই রূপান্তরে উপস্থিত, আমাদের এরূপ প্রতীতি হইতেছে। ভিখারিণীর পত্র প্রকাশ না করার অন্যতর কারণ তাঁহার নিজের পরিচয় দান না করা, আমরা আমাদের মন্তব্যে আভাসে তাহা এক প্রকার জ্ঞাপন করিয়াছি। জনৈক পাঠিকার পত্র প্রকাশসম্বন্ধেও সেই আপত্তি। বিশেষতঃ উভয় পত্র স্ত্রীলোকের লেখা নয়, আমরা প্রতারিত হইতেছি, এরূপ মনে হইতেছে। বর্ত্তমান আন্দোলনবিষয়ে আমাদের আর কিছুই লিখিবার ইচ্ছা হয় না, আমরা ইতিপূর্ব্বে ইহা জ্ঞাপন করিয়াছি। তথাপি ভিখারিণী এবং জনৈক পাঠিকা মহিলায় প্রকাশ করিবার জন্য দীর্ঘ দীর্ঘ পত্র লিখিয়া পাঠাইতেছেন। সম্প্রতি ভিখারিণী স্বাক্ষরিত অন্যতর পত্রও আমাদের হস্তগত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় আমরা সেই পত্রসম্বন্ধে কিছুই মনোযোগ বিধান করিতে পারিতেছি না। তবে মহিলার জনৈক পাঠিকার ২।৩টি প্রশ্নের সংক্ষেপে উত্তর দান করা যাইতেছে। আমরা আর জনৈক পাঠিকা বা ভিখারিণীর সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনবিষয়ে

কোন সম্পর্ক রাখিতে ইচ্ছুক নহি। তাঁহারা আর এ বিষয়ে যত্ন পরিশ্রম করিয়া আমাদিগকে কিছু লিখিয়া পাঠাইবেন না। আন্দোলনের ব্যাপারে সম্বৎসর অতীত হইল, মহিলা আর এই অরুচিকর বিষয়ের পত্র নিজের ক্ষুদ্র কলেবরে স্থান দিয়া উত্তর প্রত্যুত্তর ও মতামত ব্যক্ত করিতে প্রস্তুত নহেন। কখনও নিতান্ত কর্ত্তব্য বোধ হইলে এ বিষয়ে কিছু প্রকাশ করা যাইতে পারে, নতুবা নয়।

জনৈক পাঠিকা বলিতেছেন,—"রাজা যদি পিতা হন, তবে প্রত্যেক প্রজারই কর্ত্তব্য পিতার পন্থ সরণ করা। অতএব তাঁহার আচার ব্যবহার অনুসরণ করাও উচিত। উপরন্তু পিতার ধর্ম্মও গ্রহণ করা একান্ত কর্ত্তব্য।"

সন্তান প্রতিপালনের জন্য পিতা, প্রজাপালন ও শাসনের জন্য রাজা বিধাতা কর্ত্তৃক নিযুক্ত। উপকৃত পুত্র কন্যা পিতাকে ভক্তি করিবে, প্রাপ্ত উপকারের জন্য তাঁহার নিকটে বিনয়াবনত ও কৃতজ্ঞ থাকিবে, তদ্রূপ পুত্র কন্যা স্থানীয় প্রজা রাজাকে ভক্তি করিবে ও তাঁহা হইতে প্রাপ্ত উপকারের জন্য তাঁহার প্রতি বিনয় ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে, ইহা স্বাভাবিক। তাঁহাদিগকে জনসমাজে নিন্দিত ও ঘৃণিত অপমানিত করা পুত্র ও প্রজার পক্ষে গর্হিত পাপ। রাজা স্বয়ং ঈশ্বর নহেন, পিতাও ঈশ্বর নহেন। তাঁহারা অপূর্ণ মনুষ্য। তাঁহাদের অপূর্ণতা—ভুল ভ্রান্তি দোষ ত্রুটি আছে। তাঁহাদের দোষ ত্রুটি ও ভ্রম ভ্রান্তি কুসংস্কারাদির অনুকরণ করিতে হইবে, তাহা না করিলে তাঁহাদের প্রতি ভক্তি করা হয় না, ইহা নিতান্ত অবোধ বালকের কথা। পিতা অশিক্ষিত কুসংস্কারপূর্ণ জড়োপাসক, তাঁহার আচার ব্যবহার অসভ্যোচিত; কুসংস্কারবর্জ্জিত জ্ঞানোন্নত উচ্চ ধর্ম্মাশ্রিত সদাচারী পুত্র কি পিতাকে ভক্তি করিতে গেলে তাঁহার সেই নীচভাব ও অবস্থার অনুকরণ না করিলে ভক্তি করা হইবে না? আমি পুত্র হইয়া পিতার দোষচর্চ্চা করিব না, আমি দোষের বিচার করিব না, বিচারকর্ত্তা বিধাতা আছেন। আমি কেবল অবনত মস্তকে পিতার পিতৃত্বকে শ্রদ্ধা করিব। আমি দীন প্রজা, রাজার সম্বন্ধেও আমার এই কথা। রাজার রাজপদের জন্য রাজাকে ভক্তি করিব, তাঁহা হইতে প্রাপ্ত উপকারের জন্য বিনয়াবনত ও কৃতজ্ঞ থাকিবে। আমি তাঁহার অধীনস্থ প্রজা হইয়া তাঁহাকে উপহাস বিদ্রূপ ও নিন্দা করিতে পারি না। তাহা করিলে আমি রাজভক্ত প্রজা নহি, রাজবিদ্রোহী ও ঘোরতর অপরাধী। রাজা খ্রীষ্টবাদী আমাকে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে, তাঁহার পানাহারে মদ্য মাংসের যোগ হয়, আমাকেও সেরূপ পান ভোজন করিতে হইবে, তাহা না করিলে আমার রাজভক্তি হইবে না। এ কথার কোন মূল্য নাই। বড় বড় সাধু মহাজনও ভ্রম প্রমাদ শূন্য নহেন। সাধুকে সম্মান দিতে ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা করিতে গেলে কি তাঁহাদের ভ্রম প্রমাদ কুসংস্কারাদির অনুসরণ করিতে হইবে? তাহা না হইলে কি তাঁহাদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ হইবে না? অত বড় পুণ্যাত্মা যীশু খ্রীষ্ট, তাঁহার ভূতে বিশ্বাস ছিল, মহাপুরুষ মোহম্মদ বহু বিবাহ করিয়াছিলেন,

এবং তিনি ধর্ম্মপ্রচারে করবাল চালাইয়াছিলেন। ভূতে বিশ্বাসী না হইলে এবং বহু বিবাহাদি না করিলে কি সেই দুই মহা পুরুষের প্রতি ভক্তি করা যায় না? অন্য সহস্র দেবভাব ও সদ্গুণের জন্য তাঁহারা আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের কোন দোষ দুর্ব্বলতা পাকে থাকুক, আমাদের তাহা দেখিবার ও বিচার করিবার প্রয়োজন কি? আমাদের যে অশেষ দোষ দুর্ব্বলতা আছে; নিজের প্রতি অন্ধ হইয়া অন্যের বিচার করাতে মূর্খতা প্রকাশ পায়—ইহা অনধিকার চর্চ্চা। আমরা পিতার ও রাজার এবং সাধু মহাজনদিগের কেবল গুণ গ্রহণ করিব ও তাঁহাদিগকে ভক্তি করিব।

"যদি রাজা ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিযুক্ত এবং পিতৃস্থানীয় হন। তবে যে দেশে এবং কালে যে রাজা রাজত্ব করিয়াছেন তাঁহারাও পিতৃবৎ পূজ্য। ইহাই যদি সত্য হয় তবে এই পত্রিতাতে 'পাঠিকে, তুমি কোন্ রাজার রাজ্যে বাস করিতে ইচ্ছা কর?' এই প্রশ্ন উত্থাপন করা কি যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে? পিতা ভাল সময় ও জীবিতাবস্থায় সন্তানের নিকটে যেরূপ ভক্তিভাজন অবস্থাগতিকে দরিদ্র হইলে বা লোকান্তরিত হইলেও তদ্রূপ। যখন যে রাজা আমাদের উপর আধিপত্য করিয়াছেন, তিনি ঈশ্বরপ্রেরিত। অতএব তাঁহারা অবিচারকই হউন তাঁহাদিগকে নিন্দা না করিয়া সকল প্রকার শাসন মাথায় পাতিয়া লওয়া কি উচিত?"

"পাঠিকে তুমি কোন্ রাজ্যে বাস করিতে ইচ্ছা কর।" এই শিরোনামাঙ্কিত প্রবন্ধ মহিলাতে কি উপলক্ষে, কি ভাবে লেখা হইয়াছিল অনেকে তাহা না বুঝিতে পারিয়া বড় ভুল করিতেছেন। যখন পূর্ব্ববঙ্গের নানা স্থানে অবাধ্য ছাত্রগণ গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠিত স্কুল কলেজের নিয়ম বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া—শিক্ষকদিগকে অমান্য ও অগ্রাহ্য করিয়া স্কুল কলেজের শান্তি ভঙ্গ করিতেছিল, এবং পথে ঘাটে সাহেব বিবীদিগকে ও মাজিষ্ট্রেটকে পর্য্যন্ত অপমান এবং স্বদেশীগণ হাটে বাজারে উৎপাত করিতেছিল, তখন পূর্ব্ববঙ্গের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর উত্তেজিত হইয়া অত্যাচারনিবারণের জন্য কোন কোন স্থানে গোরখা সৈন্য প্রেরণ এবং এক সার্কুলার বাহির করিয়া অত্যাচারী ও অত্যাচারের সহায়তাকারীদিগের প্রতি তীব্র শাসন অবলম্বন করিলেন, এবং অনেকে শাস্তিগ্রস্ত হইল। কোন কোন স্থানে পুলিশ ও সিপাহী অত্যাচার করিল। তখন "রুসের মুল্লুক, ঘোরতর অরাজকতা" উপস্থিত বলিয়া চারি দিকে চীৎকার আরম্ভ হইয়াছিল, আন্দোলনের স্বপক্ষ সংবাদপত্রগুলি লাট সাহেব ও বিশেষ বিশেষ স্থানের মাজিষ্ট্রেটের প্রতি যৎপরোনাস্তি গালি কটূক্তি বর্ষণ করিতে লাগিলেন, অনেক বঙ্গমহিলা কি উত্তেজিত হইয়া "অরাজকতা অরাজকতা" বলিয়া চীৎকার করেন নাই? তখন আমরা কতকগুলি স্বাধীন ও করদ এবং মিত্ররাজ্যের শাসনপ্রণালীর প্রকৃত চিত্র প্রদর্শন করিয়া এই ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলাম, ইংরাজরাজ্যে অরাজকতা হইয়া থাকিলে, পাঠিকে, তুমি কোন্ রাজ্যের প্রজা হইয়া সুখী হইবে? সেই সকল রাজ্যের রাজাদিগের নিন্দা করা আমা-

দের উদ্দেশ্য ছিল না। আমরা সেরূপ কোন রাজ্যে কখনও বাস করি নাই, বাস করিলে যে, রাজার অবাধ্য অভক্ত প্রজা হইতাম, তাঁহার নিন্দা করিয়া বেড়াইতাম, কে বলিতে পারে? সেই সকল রাজ্যের প্রজা কি অবাধ্যতাচরণ করিয়া কোনরূপে নিস্তার পাইতে পারে? রাজা ও রাজপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে একটী কথা বলিলে প্রজা গুরুতর শাস্তি প্রাপ্ত হয়, তাহার দেহকে আর মস্তকের ভার বহন করিতে হয় না। ইংরাজরাজ্যের প্রজা রাজাকে, রাজপ্রতিনিধি ও রাজপুরুষদিগকে শত সহস্র গালি দিয়া, তিরস্কার করিয়া, রাজবিরুদ্ধে নানাপ্রকার বিপ্লব ও রাজ্যে অশান্তি আনয়ন করিয়া সহজে নিস্তার পাইতেছেন, এরূপ স্বাধীনতা কোন্ রাজ্যে আছে? এরূপ ক্ষমা কোন্ রাজা করিয়া থাকেন?

একজন বন্ধুর জীবনকাহিনী উপলক্ষ করিয়া মহিলার জনৈক পাঠিকা নিতান্ত অবোধ বালিকার ন্যায় নিজের পত্রে অপ্রাসঙ্গিক কথা লিখিয়াছেন। তাঁহার পরলোকান্তে তাঁহার জীবনে মহিলাদিগের যাহা শিক্ষণীয় ও জ্ঞাতব্য তদ্বিষয়ে আমরা দুই চারিটী কথা সঙ্ক্ষেপে লিখিয়া জীবনকাহিনী সমাপ্ত করিয়াছি। তিনি স্বদেশী আন্দোলনের অনুকূলে বক্তৃতাদি করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে আমাদের কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই, উহা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক। কাহারও কোন বিষয়ে দুর্ব্বলতা থাকিলে তাহা বলিতেই হইবে, ইহার কোন অর্থ নাই। জীবন লিখিতে গিয়া কেহ এরূপ রীতি অবলম্বন করেন না। মহিলার পাঠিকা কি আমাদের সঙ্গে উপহাস করেন? রাজবিরুদ্ধে নিন্দা আন্দোলনাদির আমরা স্বপক্ষ নহি, আমরা উহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া মনে করি, মহিলার পাঠিকা কি ইহা জানেন না? দায়িত্ববিহীন ও বিদ্বেষপরায়ণ লেখক ও বক্তাদিগের লেখনী ও রসনা বিদ্বেষবিষ বিকীর্ণ করিয়া বঙ্গের বালক বালিকা ও যুবক যুবতীদিগের হৃদয় বিষাক্ত করিয়াছে, সকলকে নিন্দাপ্রিয় ও অশিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। এ দেশের দুর্দ্দশা ও দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

প্রাপ্ত।

স্ত্রী-স্বাধীনতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আমাদের মহিলায় মল্লিখিত "স্ত্রী-স্বাধীনতা" প্রবন্ধ সম্ভবতঃ অনেক স্ত্রী-স্বাধীনতাপ্রিয় ব্রাহ্মদিগের অন্তঃকরণে আঘাত প্রদান করিয়াছে। সত্য বলিতে ও সত্য লিখিতে গিয়া যদি কাহারও মনে আঘাত লাগে তবে উপায়ান্তর নাই। একটা হঠাৎ বাহিরের আড়ম্বর করিতে গিয়া যদি একটা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ভিত্তি শিথিল হইয়া পড়ে তবে সে সম্প্রদায়ের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য্য। পবিত্রতাই দলের প্রধান বন্ধন (Main spring)। এ বন্ধন শিথিল হইলে দল চলিবে কিরূপে? বিশাল বাষ্পীয় শকটের যদি চক্রবিশেষের একটী স্প্রিং (spring) শিথিল হইয়া পড়ে, শকট আর চলিবে না; অধিকন্তু দুর্ঘটনার সম্ভাবনা। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি পুরুষ স্বাধীনতারও সময় আসে নাই। যুবকেরাও যদি পিতা মাতার শাসন না মানিয়া

স্বেচ্ছা-প্রবৃত্ত ও স্বাধীন ভাবাপন্ন হইয়া বিচরণ করিতে থাকেন তাঁহাদিগেরও পতন অবশ্য-ম্ভাবী। ব্রাহ্মসমাজে এ দৃষ্টান্তও বিরল নহে। শাসন না মানিলে একটা পরিবার কেন, রাজার রাজ্যও অচল হইয়া পড়ে। আমি এরূপ স্ত্রী-স্বাধীনতা কেন পুরুষ-স্বাধীনতারও বিরোধী। আমি হিন্দুপরিবারেও অনেক কাল বাস করিয়াছি, ব্রাহ্মপরিবারেও ২টা যুগ কাটিয়া গেল। এখন দুইটা পরিবারের তুলনার বেশ সুবিধা হইয়াছে। সত্য বটে, হিন্দু পরিবারে যুবক-স্বাধীনতার সম্বন্ধে কোন আলোচনা হয় নাই। কিন্তু স্ত্রী-স্বাধীনতা-সম্বন্ধে হিন্দুপরিবারকে খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইয়াছিল। মহিলাদিগের সম্বন্ধে অজ্ঞাতসারেও একটা কলঙ্ক উপস্থিত হইলে পরিবারের নেতার মস্তক অবনত হইত। সীতা সাবিত্রীর উচ্চ স্ত্রীচরিত্র পাশ্চাত্য জগতেও কেন এত সমাদৃত হইল? চরিত্রের পবিত্রতার নিকট প্রাচ্য পাশ্চাত্য সকলের মস্তক অবনত। আমাদের সে ভূমি—সে দেশ নাই—সে নৈতিক প্রাণ নাই যে, আমরা আমাদের অপরিণতবয়স্কা মহিলাদিগকে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে দিতে পারি। ব্রাহ্ম এখনও নিজ পরিবারকে গড়িয়া উঠিতে পারিলেন না, ব্রাহ্ম এখনও নিজের ছেলে মেয়েদের দাঁড় করাইতে পারিলেন না, এখন এ স্বাধীনতার কথা কেন? মাটী প্রস্তুত করিবার আগেই যদি বীজ ছড়াইয়া দাও, সে বীজ কি অঙ্কুরিত হইবে? ব্রাহ্মসমাজে অনেক দিন হইয়া গেল, যাঁরা এক সময়ে "স্ত্রী-স্বাধীনতা স্ত্রী-স্বাধীনতা" করিয়া গগন-ভেদী চীৎকার করিয়াছিলেন তাঁহাদেরই ভিতর দেখিতেছি কেহ কেহ সেই মতকে সঙ্কোচ করিতেছেন, কেহ মুখে চীৎকার করিতেছেন, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে সে সাহসের পরিচয় দিতে পারিতেছেন না। আমি দেখিয়াছি যে, অনেক ব্রাহ্ম মুখে স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষসমর্থন করিতেছেন, কিন্তু নিজের পরিবারে সে মত খাটাইতে সাহসে কুলাইতেছে না। সত্য বটে, দুই এক জন অপরিণামদর্শী সীমা অতি অতিক্রম করিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু আমি বৃদ্ধ বয়সে বলিতেছি এক দিন তাঁহাদিগকে ঠেকিতে হইবে। আগে ভূমি কর্ষণ কর—পরিবার প্রস্তুত কর—দেশের যুবক যুবতী-দিগকে দাঁড়াইতে শিখাও, তবে স্বাধীনতার ধর্ম্ম ঘোষণা করিতে থাক। আমি পুরুষ স্বাধীনতা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা উভয়ের বিরুদ্ধে বলিতেছি। ব্রাহ্ম! তুমি কেশবচন্দ্রকে বুঝিলে না। তোমার বুঝিবার এখনও সময় হয় নাই। পবিত্রতার পক্ষ হইতে দেশের ও সমাজের অনুপযুক্ততা বুঝিয়া কেশবচন্দ্র সময়ের অপেক্ষা করিয়াছিলেন। পবিত্রতার জন্য যদি তোমার সে ব্যাকুলতা থাকিত তুমি বুঝিতে পারিতে কেশবচন্দ্র কেন এ মতে মৌনভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। যদি এ অনুপযুক্ত ভূমিতে স্বাধীনতার জন্য এতই ব্যস্ত হইয়া থাক, দেখিতে পাইবে ত্যাগশীল শ্রীচৈতন্যের দলের যে দশা ঘটিয়াছে এখানেও তাই হইবে। সেত বেশি দিনের কথা নয়, এই অল্প সময়ের মধ্যেই সে দলের কি দুরবস্থা ঘটিয়াছে!! ব্রাহ্মসমাজেও পরিবার-বিশেষে তাহার আভাস দেখা দিয়াছে। এ দলের প্রতি পূর্ব্বে লোকে এত শ্রদ্ধা করিত

কেন? মূল পবিত্রতা। কেশবচন্দ্রকে শিক্ষিত হিন্দুসন্তান বঙ্কিম বাবুও "ব্রাহ্মণ" বলিয়া গিয়াছেন। মূল তাঁহার পবিত্রতা ও ব্রহ্ম-পরায়ণতা। (ক্রমশঃ)

রন্ধন-প্রণালী।

(কটক নগরস্থ একটী উৎকল-কন্যা হইতে প্রাপ্ত।)

কাণ্ডি।

প্রথমে কলাই থেকে কাঁকর বাছিয়া জাঁতায় ভাঙ্গিয়া লইবে; ভাঙ্গা কলাই উত্তমরূপে ঝাড়িয়া লইবে, উহাতে যেন আস্ত কলাই না থাকে। তার পর এই ভাঙ্গা কলাই ৪।৫ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া খোসাগুলি উত্তমরূপে ছাড়াইয়া শীলে বাটিয়া লইতে হইবে। ইহা খিচ্‌শূন্য ভাবে বাটিবে। তাহার পর এই বাটা ডালে অল্প জল দিয়া ঐ শীলের উপর বা থালার উপর রাখিয়া তাহা উত্তমরূপে ফেণাইয়া লইবে ও তাহাতে অল্প লবণ দিবে।

তৎপর তাওয়ায় ঘি দিয়া পূর্ব্ব রক্ষিত ডাল বাটায় এক একখানি লুচির আকারে (এক আঙ্গুল পুরু করে) লাল্‌চে ধরণে ভাজিবে। অধিক আঁচে পুড়িয়া যায় ও ভিতর কাঁচা থাকে। এই পিঠা যখন জ্বাল হইতে নামাইবে, তখন তাহার দুই পিঠে কাশীর চিনি বা মিশ্রি গুড়া করিয়া মাখাইয়া দিবে। ইহা গরম গরম আহারে সুখাদ্য। ডাল বাটায় আস্ত জিরা ও গোল মরিচ দেওয়া হয়। এই পিঠা পুরির জগন্নাথ-মন্দিরে ঠাকুরের ভোজে ব্যবহৃত হয়।

দই কড়ি।

এই জিনিষটী ঘোলে প্রস্তুত হয়। সামান্য অম্লবিশিষ্ট ঘোলে একটু হলুদ, জিরা ও লঙ্কাবাটা, এবং সামান্য বেসম মিশ্রিত করিয়া জ্বালে চড়াইবে। ইহা ফুটিয়া উঠিলে লবণ দিবে। যত ক্ষণ কাঁচা ঘোলের গন্ধ থাকিবে তত ক্ষণ জ্বালে রাখিবে। তার পর লঙ্কা ও পাঁচ ফোড়নে সম্বার দিয়া নামাইয়া লইবে।

এই কড়িতে লাউ, বিলিতি কুমরা, চিচিঙ্গা, বেগুন, থোড়, ঢ্যাড়সও দেওয়া যায়। কিন্তু এগুলি সব এক সঙ্গে দেওয়া হয় না। দিতে হইলে প্রথমে জলে সিদ্ধ করিয়া পরে কড়িতে দিতে হয়। নচেৎ অম্ল জিনিষের মধ্যে এগুলি সিদ্ধ হইবে না।

মহিলাদিগের রচনা।

সেবা ও ধর্ম্ম।

সেবা ও ধর্ম্ম দুইটি স্বতন্ত্র নহে। সেবা ধর্ম্মেরই অন্তর্ভূত। ধর্ম্মসাধনের বহুবিধ উপায়ের ভিতর সেবাও অন্যতম উপায়। দীন দুঃখীর সেবা, আত্মীয় স্বজনের সেবা, পরসেবা এই সকল দ্বারা বিশ্বজননীর প্রেমের সুবিমল আনন্দজ্যোতিঃ বিকশিত হইয়া হৃদয়কে পবিত্র করিয়া তোলে।

সেবাপরায়ণ হইতে কাহারও বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। ধনী নির্ধন সকলেই ইচ্ছা করিলে জগতে সেবা ধর্ম্ম প্রচার করিয়া ভগবানের প্রীতি লাভ করিতে পারেন; এবং মনে নির্ম্মল সুখ অনুভব করিতে পারেন; পরসেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে পারিলে মন পবিত্র ভাবে কাটাইতে পারে।

সেবা করিতে কখন২ কোন২ সময় অর্থের প্রয়োজন হয় না, অর্থাৎ অর্থ ছাড়াও সেবা-ধর্ম্মে অনুরক্ত হইতে পারা যায়।

পাঁচদোনা। শ্রীমতী সু—

আমি ও মন।

———মন! তুমি কোথায় কোথায়?
দিবানিশি খুঁজে মরি, পাই না তোমায়!
কোন্ শেফালীর শাখে কোন্ পাপিয়ার ডাকে
আকুল উদাসভাবে উন্মাদের প্রায়।

অন্বেষণ কর যাঁর দেখা কি পেয়েছ তাঁর?
তথাপি ধরিতে তাঁরে প্রাণে সাধ যায়?
অবশ বিভল প্রাণে ছুটে যাও, হায়!

অথবা কি নিরাশার তীব্র বেদনায়—
ইতস্ততঃ বনে বনে কোন্ সুখ অন্বেষণে
ভ্রমিতেছ অহর্নিশ আকুল হিয়ায়?
আহা! মন! যাঁরে চাও, সে জন কোথায়?

আত্মহারা মন! তুমি কোথায় কোথায়?
ঘুরিয়া বেড়াও তুমি কিসের আশায়?
কোন্ শ্মশানের ঘাটে, কোন্ নিরজন মাঠে,
কোন্ তটিনীর স্রোতে ভাসায়েছ কায়?
তাই কি খুঁজিতে গিয়ে পাই না তোমায়?

যথেষ্ট হয়েছে মন! যেয়োনাক আর
ভ্রমিতে কল্পনারাজ্যে ছাড়িয়ে সংসার!
এস, শান্ত হও ভাই, আর ঘুরে কাজ নাই,
জান তুমি চির বন্দী সংসার-রাজার?
অলসের বেড়ী পায়, কত দূর যাবে? হায়!
তব অপেক্ষায় আছে গৃহকারাগার!
ভুলিয়ে আপন পর ত্যজি এ মায়ার ঘর,
যেয়ো না স্বপনরাজ্যে খেলিতে আবার!

(মনের উক্তি)

সোণার পিঞ্জরে ধরে রেখো না আমায়,
আমারে উড়িতে দাও দূর নীলিমায়!
খুঁজিব তারার দলে কোন্ গগনের তলে,
আমার সে নিরুমাতা রয়েছে কোথায়,
যে জন স্বপন ঘোরে পাগল করেছে মোরে,
এমন উদাসী যেই করেছে আমায়;
যাহার বাঁশীর স্বরে থাকিতে পারি না ঘরে,
যাহার যশের গান জগত শুনায়;
সে অনন্ত প্রেমময় কেন চাহে এ হৃদয়,
অলক্ষিত আকর্ষণে কোথা লয়ে যায়?
•দেখা দাও জগদীশ! রয়েছ কোথায়?

অতল জলধিতলে, বিকচ কুসুমদলে,
অথবা লুকায়ে আছ জলদের ছা'য়?
বল প্রভু, কোন খানে নীচু কিম্বা উচ্চ স্থানে—
গভীর গুহায় কিম্বা হিমাদ্রিচূড়ায়—
জুড়াতে তাপিত প্রাণ থাক কি হে ভগবান
ওয়েসিস্—বারিরূপে মরু সাহারায়?
শোকার্ত্তের ক্ষত হৃদি আরোগ্য করিতে বিধি,
শীতল প্রলেপরূপে বিরাজ তথায়?
দেখা দাও প্রেমময়! রয়েছ কোথায়?

কোথা আছ প্রেম-সিন্ধু জগত-ঈশ্বর?
আমি যদি হইতাম চারু সুধাকর,
শূন্য পথে ঘুরিতাম নীলাকাশে ভাসিতাম,
আমার আলোকে ধরা হ'ত মনোহর!
তুমি থাক কোন্ খানে পিপাসা-ব্যাকুল প্রাণে
তোমারে খুঁজিতে গিয়ে হতেম অমর!
জলদ পবনভরে উড়িয়ে গগন'পরে
আসিয়া পড়িত কভু আমার উপর।
ধূসর মেঘের তলে লুকাতাম কুতুহলে
বিস্ময়ে দেখিত চেয়ে তারকা-নিকর!
দেখা দাও প্রেম-সিন্ধু জগৎ-ঈশ্বর!

অথবা হতেম যদি আকাশের তারা—
তোমারি বিধান মতে ভ্রমিয়া অনন্ত পথে,
নীলাকাশে ছড়াতেম কনকের ধারা!
ঘুরিতে ফিরিতে কভু আপনা ভুলিয়া প্রভু
ছুটিতাম তব পানে হয়ে আত্মহারা!
হায়! কেন হই নাই আমি ক্ষুদ্র তারা!

অথবা হতেম যদি মলয় সমীর,—
তাপিতেরে জুড়াইয়া সৌরভের ভার নিয়া
ছুটিতাম তব আশে হইয়া অধীর!
তোমারে খুঁজিতে গিয়ে স্বর্গের অমিয়া পিয়ে,
অমর হতেম আমি সায়াহ্ন সমীর!
আমি কেন হই নাই মলয় সমীর?

আমি যদি হইতাম বাসন্ত কোকিল—
ললিত করুণ স্বরে সদা ডাকিতাম তোরে,
আমার গানের তান বহিত অনিল!
প্রীতি ভক্তি মাখা প্রাণে তব স্নেহ গুণগানে
রত থাকিতাম ভুলে সংসার জটিল।

সাহায্য করিলে বায় উড়িতাম নীলিমায়
দেখিতে বিস্তৃত কত গগণ সুনীল!

অথবা হতেম যদি যূথিকা-মুকুল—
স্নিগ্ধ সাঁঝে ফুটতাম, তোমারেই ভাবিতাম,
দেখিতে তোমায় বিভু, হতেম আকুল!
তৃষিত বিহ্বল প্রাণে চাহিয়া তোমার পানে,
জাগিয়া সারাটি নিশি আমি ক্ষুদ্র ফুল,
প্রাতে মরিতাম পেতে তব পদধূল!

দেখা দাও দীনবন্ধু! থাক হে কোথায়?
তুমি প্রভু থাক যথা সকলি অমর তথা,
বিকচ প্রসূনমালা তথা না শুকায়।
চির বসন্তের দেশে থাক কি মোহন বেশে?
অমিয়া সরসী বক্ষে শত দল প্রায়?

প্রাণ মনমুগ্ধকর কোকিলের কুহুস্বর,—
সঙ্গীত-দেবতা রূপে বিরাজ কি তায়?
ললিত লতিকাসনে খেলা করি ফুল্ল মনে,
যাও কি মিশিয়া ধীরে মৃদু মলয়ায়?

সুখের স্বপন হয়ে সুধা বর্ষ এ হৃদয়ে
দেখাও স্বরগধাম রচি কল্পনায়?
সুস্নিগ্ধ জলদ প্রায় ঢাল বারি এ ধরায়
ভাস কি তটিনী-স্রোতে লহরীমালায়?

করি প্রীতি বরিষণ জুড়াও তাপিত জন,
চাহিলে তোমার পানে শান্তির আশায়?
আশার তপন বেশে দেখা দাও পূর্ব্বদেশে
আঁধার বিনাশ কর সোণালি ছটায়?
অস্ত গেলে দিনমণি যবে থাকে এ ধরণী
আঁধারে ডুবিয়া ঘোর নিরাশ নিশায়,
সে সময় চাঁদ সাজে দেখা দাও নভো মাঝে,
ভূলোক প্লাবিত কর শুভ্র চন্দ্রিকায়?

একাই সহস্র কোটী নিজে তুমি, হায়!
না বুঝিয়া খুঁজি তোমা যথায় তথায়!
নানা ভাবে নানা জন পূজিতেছে ও চরণ,—
যে নামে যাহার রুচি ডাকিছে তোমায়!

দেখি গুণ নানা মত নাম দেয় শত শত—
কোটী শত কোটী রূপ ভাবে কল্পনায়!

তুমি ত রয়েছ মনে, বৃথা খুঁজি বনে বনে,—
বুঝিলাম—প্রেমময়! লুকাবে কোথায়?
হৃদয়ের ধন তুমি রয়েছ হিয়ায়!

R. S. Hosan,
(মোসলমান কন্যা।)

—

আবাহন।

দিন গেল ওগো দিন গেল চলি
গভীর আহ্বানে গেল ডেকে বলি
চলরে চলরে মন চল।
ফুরাইছে বেলা আর কেন বসি
লইতেছ শিরে পাপ তাপরাশি,
ভাব ভাব পরিণাম ফল।
এ ভবের হাটে কি করিতে এসে
কি যে করিতেছ মায়া মোহবশে
তেয়াগিয়ে প্রকৃত সম্বল।
এসেছিলে ল'য়ে পুণ্যের বসন
ফেলে তাহা নিয়ে পাপের ভূষণ
ঢালিতেছ নিত্য অশ্রুজল।
এসেছিলে ল'য়ে পুণ্যের কিরণ
আজ পাপ তাপে ভরেছে গগন
নিভিয়া গিয়াছে সব কালো।
ঘিরিয়াছে দিক্ ঘন অন্ধকারে
তাহার মাঝারে মৃত আপনারে
পাপ মসী মাখি করেছ কালো।
নাহি কোন পথ নাহি কোন আশা
নাহি নাহি সাথী নাহি কোন ভাষা
টানিয়া লইতে সেই দেশে।
ত্রাসিত তৃষিত এ হৃদয় মোর
কেমনে ছিঁড়িবে এ পাপের ডোর
জড়ায়েছি যাহা শত পাশে।
শুধু এ দারুণ জীবন প্রান্তরে
এক বাণী ডাকে দূর দূরান্তরে
কিন্তু—কাঁপে তা'ও শঙ্কা বায়ু ভরে।
কভু সে বাণীতে হৃদয় আমার
লভে শান্তিরাশি সুধা পারাবার
নিরাশা আগুনে কভু বা পোড়ে।

শুনিতেছি কাণে শুনিতেছি প্রাণে
জননী আমার নিত্য ক্ষমাদানে
আমারি মতন অধম জনে।

ডাকেন তাঁহার প্রসাদভবনে
অমল বিমল শুভ্র শ্রীচরণে
স্থান দিতে অতুল প্রেমে।

সেই ভরসায় সদা ভাবি বসি
হে চির আঁধারে চির পূর্ণ শশী
ফেলিবে না ফেলিবে না মোরে।

তুমি যদি মোরে ফেলগো জননী
দাও শিরে তুলি দণ্ডের অশনি
দিও তাহা তুমি তোমারি করে।

শুধু তোমা কাছে মাগে এই দীন
বুঝিবা [illegible] পারেগো সে দিন
তোমার করেতে পেয়েছি ব্যথা।

সুধু সেই দিন সে ঘোর সঙ্কটে
তব ছবি যেন জাগে হৃদি পটে
"মূক" যেন বলে তোমারি কথা।

খেরুওয়া, শ্রীমতী প্রি—

সংবাদ।

গত সপ্তাহে এই মহানগরীর পল্লীতে পল্লীতে হিন্দুপরিবারে মহাঘটা করিয়া অনেকগুলি বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এক এক জন স্কুলের ছাত্র এক একটী নয় দশ বৎসরের বালিকাকে বিবাহ করিয়াছে। বরের পিতা মাতা আত্মীয় কুটুম্ব নববধূকে পাইয়া আমোদ আহ্লাদ করিতেছেন। বিবাহোপলক্ষে অনেক বর ও কন্যার পিত্রালয়ে ইংরাজি বাজা, রোশন চৌকি, রোশনাই নাচ গান নাটক ও বন্ধুভোজাদির ঘটায় সামান্য অর্থ ব্যয় হয় নাই। বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসের মহিলাতে পাঠিকাগণ "উড়িষ্যার কতকগুলি পারিবারিক প্রথা" শীর্ষক প্রবন্ধে তথাকার ভদ্রপরিবারের বিবাহপ্রণালীর বিষয় পড়িয়া থাকিবেন। সে দেশে ভদ্রসমাজে বাল্যবিবাহ প্রায় হয় না। বাল্যকালে কন্যার বিবাহ হইলেও তাহা বাগ্দানস্বরূপ হয়। কন্যা বয়স্থা না হওয়া পর্য্যন্ত পিত্রালয়ে স্থিতি করে, তাহার স্বামিগৃহে বাস করিবার নিয়ম নাই। পাত্রী বয়স্থা হইলে পূর্ণ বিবাহ হয়, তদবধি স্বামীর সঙ্গে বাস করে। সভ্যতা ও জ্ঞানাভিমানী বাঙ্গালী উড়িষ্যাবাসীদিগকে "উড়িয়া" বলিয়া ঘৃণা করেন। কিন্তু উড়িষ্যাবাসীরা বাঙ্গালী অপেক্ষা নীতি ও আচারব্যবহারে অনেক উন্নত। বাঙ্গালী বাবুরা কেবল বক্তৃতাপটু। এত বাধা বিঘ্ন ও প্রতিবাদের পর সম্মতি আইন বিধিবদ্ধ হইল। আইনের উদ্দেশ্য কিছুই কার্য্যে পরিণত দেখা যায় না।

৬৪।২নং মেছুয়াবাজার রোডস্থ ভিক্টোরিয়া মহিলা বিদ্যালয়ভবনে প্রতিশনিবার অপরাহ্নে বয়স্থা ছাত্রী ও বালিকাদিগকে নীতিশিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। উক্ত নীতিবিদ্যালয়ে অনেকগুলি ছাত্রী নীতিবিষয়ে উপদেশ প্রাপ্ত হইতেছেন। দুইটী উপযুক্ত মহিলা শিক্ষাদানকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। পরিবারে সুনীতির দৃষ্টান্ত দর্শন না করিলে সপ্তাহান্তে কেবল এক দিন নৈতিক উপদেশশ্রবণে বিশেষ ফলোদয় হয় না। উক্ত মহিলাবিদ্যালয়সংক্রান্ত ধর্ম্মশাস্ত্রপাঠের একটী শ্রেণী আছে। গত বৎসর ২।৩টী ছাত্রী হিন্দু, খ্রীষ্টীয় ও বৌদ্ধ শাস্ত্রাদির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, বিগত ৮ই শ্রাবণ কলিকাতার অনাথাশ্রমের মাতৃস্থানীয়া ক্ষান্তমণি দেবী দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ১৩ বৎসর কাল পরম যত্নে নিঃস্বার্থভাবে মাতৃনির্ব্বিশেষে উক্ত অনাথাশ্রমের বালক বালিকাদিগের সেবা করিয়াছিলেন। ক্ষান্তমণি দেবী নিজে নিঃসন্তান ছিলেন। ইদানীং ৩০।৪০টী দুঃখী বালক বালিকাই তাঁহার সন্তানস্থানীয় হইয়াছিল। তাঁহার স্থান যে কে পূর্ণ করিবেন, বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। মঙ্গলময় পরমেশ্বর তাঁহাকে এই পবিত্র সেবার পুরস্কার বিধান

করুন। তজ্জন্য স্বর্গলোকে তিনি আদৃত হইতেছেন, সন্দেহ নাই। সম্প্রতি কান্তমণির পরলোকযাত্রা উপলক্ষে ভিক্টোরিয়া কলেজ-গৃহে মহিলাদের এক সভা হইয়াছিল,তাহাতে তাঁহার সেবাব্রতের আলোচনা ও প্রার্থনাদি হইয়াছে।

বোম্বাইয়ের একজন মোসলমান মহিলা এবং একটী বাঙ্গালী বিধবা জ্ঞানোন্নতিসাধনার্থ দুই বৎসরের জন্য বিলাতে যাইতেছেন। তাঁহাদের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ গবর্ণমেণ্ট দশ হাজার টাকা দান করিবেন।

রাজকীয় বিষয়ে পুরুষদিগের তুল্য অধিকার প্রাপ্ত হইবার জন্য বিলাতের কতিপয় স্বাধীনচেতা নারী পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় পতাকাসহ প্রবেশপূর্ব্বক অতিশয় আন্দোলন ও চীৎকার করিয়াছেন। এনিকেনীনাম্নী একটী মহিলা তাঁহাদের নেত্রী হইয়াছেন। তিনি পথে ঘাটে অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্যম সহকারে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেছেন।

আসাম ও পুর্ব্ববঙ্গ প্রদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর মাননীয় ফুলার সাহেব কার্য্যত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পদে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের প্রতিনিধি লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর মাননীয় হেয়ার সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন। পূর্ব্বে তিনি পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান নগর ঢাকাতে মাজিষ্ট্রেট ছিলেন, পরে ঢাকা ডিবিশনের কমিশনরের কার্য্য করিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গসম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে।

ইতিপূর্ব্বে জনরব হইয়াছিল যে, এবার মাননীয় কে, জি, গুপ্ত ছোট লাট হইবেন। কিন্তু তিনি যে এদেশীয়, ইংরাজ হইলে সম্ভাবনা ছিল। বিশেষতঃ নানা গোলযোগের জন্য বাঙ্গালি জাতির প্রতি প্রধান প্রধান ইংরাজরাজপুরুষদিগের আস্থা ও বিশ্বাস নাই। গুপ্ত সাহেব ভারত গবর্ণমেণ্টসংক্রান্ত এক্সাইস কমিশন কমিটীর মেম্বরের পদ হইতে অবসর প্রাপ্ত হইয়া এক নূতন পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। এ দেশে এ পদের সৃষ্টি পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। সেই পদের নাম Fishery (মৎস্যের ব্যবসায়)। গুপ্ত সাহেব সাগর ও নদী ইত্যাদি জলাশয়ে যাহাতে মৎস্যের উন্নতি ও বৃদ্ধি হয় তাহার উপায় বিধান ও তত্ত্বাবধানাদি করিবেন। মৎস্যপ্রিয়া বঙ্গমহিলাদের পক্ষে ইহা অতীব আনন্দের সংবাদ। বড়লাট কর্ত্তৃক যখন এত বড় একজন লোক মাছের ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইলেন, তখন অবশ্য মাছের স্বচ্ছলতা ও তাহা শস্তা হইয়া উঠিবে। যিনি কিছুকাল পুর্ব্বে উড়িষ্যা ডিবিশনের কমিশনর ছিলেন, ক্রমে নিজের যোগ্যতার পরিচয়দানে রেভনিয়ু বোর্ডের মেম্বর ইত্যাদির পদে উন্নমিত হইয়াছিলেন। আজ তিনি মৎস্য-ব্যবসায়ীর পদ প্রাপ্ত, ইহাতে তাঁহার উন্নতি না অবনতি হইল, আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের জন্মকাল মদের ব্যবসায় আছে। সম্ভবতঃ অচিরে নূতন বড়লাট মহোদয় কর্ত্তৃক মাংসের ব্যবসায়ও চলিবে।

মহিলার একাদশ বৎসর পুর্ণ হইয়া দ্বাদশ বৎসর চলিয়াছে। অধিকাংশ গ্রাহক গ্রাহিকাদের নিকট হইতে একাদশ বৎসরের মূল্য পাওয়া যায় নাই; অগ্রিম মূল্যদানের কথা দূরে থাকুক। আমাদের সানুনয় প্রার্থনা যে, তাঁহারা দয়া করিয়া অবিলম্বে গত বৎসরের প্রাপ্য মূল্য এবং যাঁহাদের নিকট পূর্ব্ব বাকি পাওনা, তৎ প্রেরণে যেন আমাদিগকে উপকৃত করেন। পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়া আমরা ক্লিষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি।

পুর্ণিয়া হইতে একটী কন্যা পূর্ব্ব বঙ্গের দুর্ভিক্ষ নিপীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ বিশ টাকা পাঠাইয়াছেন। সম্প্রতি বিনয়েন্দ্র বাবু চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা হইতে টেলিগ্রাফ পাইয়াছেন যে, জলপ্লাবনে সে দেশে দুর্ভিক্ষবৃদ্ধি হইয়াছে। অচিরে অর্থসাহায্য প্রয়োজন। কিছু দিন হইল দূরতর পঞ্জাব হইতে আর্য্যসমাজের দুইটি সহৃদয় উৎসাহী নবযুবক দুর্ভিক্ষবিপন্ন অনাথ বালক বালিকাদিগকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বরিশাল গিয়াছেন।

ভিক্টোরিয়ামহিলাবিদ্যালয়।

ফাহিয়েন ও হুয়েনসান *।

চীন পরিব্রাজকের ভারতবর্ষ ভ্রমণ।

আজকের বিজ্ঞাপনে কি নাম দেওয়া হয়েছে তা আমি দেখি নাই, ইহা দুটি লোকের নাম, ইহাদের উচ্চারণ ঠিক জানি না, যত দূর ঠিক করিয়া বলিতে পারি তাহাতে ফাহিয়েন ও হুয়েনসান বলা যায়। আমার ইচ্ছা ছিল যে, বিজ্ঞাপনে "চীন-পরিব্রাজকের ভারতবর্ষ ভ্রমণ" এই বিষয়টি লিখি। আমরা কলিকাতায় যে চীনেমান দেখি, ইহাদের কথা আমরা প্রায় বুঝি না; জুতা কিনিতে হইলে ইহাদের কাছে যাইতে হয়, আর ইহাদের কথা শুনিয়া হাসি। ইহাদের দেখে মনে হয় না যে ইহাদের সঙ্গে আমাদের কোন মিল আছে বা কোন সহানুভূতি আছে। চীনেমান কয়েক জন এদেশে পরিব্রাজক হয়ে এসেছিলেন, তাঁহারা সমস্ত তীর্থস্থান দেখেন, এবং দেশের অনেক স্থান ভ্রমণ করে সেই সব ভ্রমণবৃত্তান্ত তাঁরা তাঁদের দেশের ভাষায় লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এখন সেই সমস্ত বই পড়ে আমাদের দেশের অতীতের অনেক খবর পাই, সে প্রকার খবর আমরা আমাদের দেশের কোন পুস্তক হইতে পাই না। তখন আমাদের চীনেদের প্রতি আকর্ষণ হয়। অশোকের সময় বৌদ্ধধর্ম্ম চীনদেশে যায়। বৌদ্ধ ধর্ম্মের ভাব শিক্ষা অল্প পরিমাণ ভারত গ্রহণ করে, পরে ক্রমশঃ এদেশের সঙ্গে তার অনেক পার্থক্য হয়। ভারতেও মতের অনেক পার্থক্য হয়, মধ্যে মধ্যে এই জন্য বৌদ্ধসঙ্ঘ অর্থাৎ Council ডাকতে হয়েছে, তাহাতে মতের মীমাংসা করা হয়েছে। চীনের অনেক বৌদ্ধ এদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম জানিবার জন্য ও ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য আসেন। এক এক করিয়া ক্রমে ৩১ জন চীন পরিব্রাজক ভারতে আসেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য তীর্থস্থান দেখা। তাঁরা বুদ্ধের জন্মস্থান ও তাঁর সর্ব্বত্র যে স্তূপ ছিল তাহা দেখেন। যেখানে বুদ্ধ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন, এই সব দেখেন। এই সব স্থান দেখিবার জন্য, বৌদ্ধশাস্ত্র সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে এদেশে আসেন, অনেকে এই সব দেখে গিয়ে লিখে গেছেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে এই দুইজনের লেখাই আজ পর্য্যন্ত আছে, এবং তাতে অনেক জানা যায়। তাঁরা আমাদের দেশ দেখে গিয়ে যা লিখেছেন, সে বিষয়ে কয়েকটী কথা আজ বলিব। প্রথমে দেখা যাক তাঁরা কোথা দিয়ে এলেন, কখন এসেছিলেন। খ্রীষ্টীয় ৪০০ বছর পরে, অশোকের ২০০ বছর পরে, বুদ্ধের ৯০০ বছর পরে, ফাহিয়েন এদেশে আসেন। হুয়েনসান, ফাহিয়েনের ২০০ বছর পরে আসেন, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ৬০০ বছরে এদেশে আসেন। ফাহিয়েন ১৪ বৎসর ছিলেন, আর হুয়েনসান ১৬ বছর

---

* ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯০২ সাল। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের বক্তৃতা মূলক।

ছিলেন। দুজনেই নানা স্থান ভ্রমণ করেন ও অনেক তীর্থ স্থান দেখেন। তাঁরা সংস্কৃত শিখিবার জন্য, বৌদ্ধ শাস্ত্র নিজের দেশে নিয়ে যাবার জন্য এসেছিলেন। তখন তাঁরা এদেশের যে সব নাম লিখে গেছেন, তা থেকে এখনকার নাম ঠিক করা বড় শক্ত। তাঁরা চীনের পশ্চিম দক্ষিণ হইতে রওয়ানা হইয়া ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমা দিয়ে এদেশে আসেন। ফাহিয়েন যখন আসেন, তখন এদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম খুব বিস্তৃত ছিল। কত সঙ্ঘারাম ছিল, সঙ্ঘারাম অর্থাৎ একটা বড় বাগান যেখানে অনেক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী থাকতেন। কত মঠ ছিল, এক এক জায়গায় এমন কি ১০০। ২০০ মঠ ছিল, এবং এক এক মঠে ১০০০ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী থাকিতেন। কিন্তু যখন হুয়েনসান আসেন, তখন বৌদ্ধ ধর্ম্মের একটু অবনতি হইয়াছে, তখন তিনি বুদ্ধ মন্দিরের পাশে দেবমন্দির দেখিয়াছেন। কাবুলকে তখন উদ্যান বলিত,কন্দাহার কে গান্ধার, পেশোয়ারকে পুরুষপুর বলিত। তিনি কাবুলে আসিয়া তার পর সিন্ধুনদী পার হন, তার পর ক্রমে ক্রমে মথুরা, কান্যকুব্জ, অযোধ্যা, হয়মুট—এই স্থানটি কোথায় তাহা ঠিক হয় নাই. তার পর প্রয়াগ, শেষকালে উত্তরে বৌদ্ধ তীর্থ স্থানে যান, শ্রাবস্তিতে যান। ইহা নেপালের কাছে। তার পর তিনি কপিলাবস্তু যেখানে বুদ্ধ জন্মান, তার পর বৈশালী, তার পর দক্ষিণে পাটলীপুত্রে, রাজগিরিতে, গয়ায়, কুশীনগরে যান। এই সব স্থান প্রধান তীর্থ-স্থান। তার পর তিনি চম্পানগরে আসেন, চম্পা বর্ত্তমান ভাগলপুর। দক্ষিণে তিনি তাম্রলিপ্তে যান, এখন তমলুক বলে, এখন ইহা অতি সামান্য স্থান। তিনি সমস্ত জায়গা ঘোরেন, কত সঙ্ঘারাম, কত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী দেখেন ইহার মধ্যে পাটলীপুত্রে ও তাম্রলিপ্তে বৌদ্ধশাস্ত্র পান, এবং এই দুটি স্থানে তিনি অনেক দিন থাকেন। ফাহিয়েন এই সময় বাড়ী যাইবার জন্য ব্যস্ত হন, এবং সমুদ্র পথে ফিরে যান। তখন এদেশ হইতে বাণিজ্যের জন্য চীন প্রভৃতি স্থানে জাহাজ যাইত। হিন্দুরা ব্রাহ্মণেরা সব জাহাজ চালাইতেন। জাবা দ্বীপে তখন হিন্দু উপনিবেশ ছিল, বালী দ্বীপে এখনও হিন্দু মন্দির আছে। তমলুক থেকে ফাহিয়েন জাহাজে চড়েন। তখন তমলুক আরো সমুদ্রের কাছে ছিল, এখন একটু দূরে পড়ে গেছে। তখন তমলুক থেকে বাণিজ্য যাহাজ যাইত। তমলুক থেকে জাহাজে চড়ে ফাহিয়েন সিংহলে আসেন ; এখানে অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থ পান, এবং অনেক দিন বিলম্ব করেন। তার পর তিনি সিংহল হইতে জাহাজে করে যাবাদ্বীপে যান, সেখান হইতে আর একখান জাহাজে বাড়ী ফিরে যান। হুয়েনসান জাহাজে চড়েন নি। ইনি ফাহিয়েনের চেয়ে বেশী আরও কতকগুলি স্থান দেখেন। চম্পানগরের কাছে হিরণ্য পর্ব্বতে যান, চীনেদের বইতে এই নাম গুলো ঠিক এই রকম নাই, একটু পরিশ্রম করে ভেবে নামগুলি বাহির করিতে হয়। যেমন পুলোনসা অর্থাৎ বারাণসী, আর হিরণ্য পর্ব্বত ইলান্না পর্ব্বব বলে লেখা আছে। তিনি মুঙ্গের ও বঙ্গদেশের আরও অনেক স্থান দেখেন। যেমন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, কামরূপ সমস্ত উড়িষ্যা। তিনি

শেষকালে সিংহলে যান, সিংহল থেকে এসে আবার সেই পাহাড় পার হয়ে দেশে ফিরে যান। তখন এত ভ্রমণ করা এক আশ্চর্য্য জিনিষ। তখন ভ্রমণ করা আজ কালকার মত সহজ ছিল না, অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার ছিল। তবু এই সব বৌদ্ধ তীর্থ স্থান দেখিতে ও বৌদ্ধ গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া এদেশে আসেন।

এদেশে রেল হবার আগে বহু কষ্ট করে তীর্থ স্থানে যাইতে হইত। ফাহিয়েনের সঙ্গে আর ৩৪ জন লোক ছিলেন, যখন তিনি কাবুল দিয়া আসেন, সেখানে অত্যন্ত শীত ও বরফ পড়ে। সেই বরফের মধ্যে তাঁর একজন লোক মারা যায়। ফাহিয়েন যেখানে যাইতেন সেখানেই তাঁকে লোকে খুব সমাদর করিয়া লইত। তখন হিন্দু বৌদ্ধের মধ্যে কোন প্রভেদ ছিল না। ফিরে যাবার সময় সিংহল পর্য্যন্ত কোন বিপদ ঘটে নাই। তার পর সিংহল থেকে যখন তিনি জাহাজে রওয়ানা হইলেন, সেই জাহাজের তলা ফুটো হয়ে গেল, তখন সকলে জাহাজ পাতলা করিবার জন্য যার যাহা ছিল, সব ফেলিয়া দিতে লাগিল। ফাহিয়েন তাঁর আর সব জিনিষ ফেলে দিয়ে বইগুলি কেবল রাখলেন, ভয় হল, পাছে বা কেহ বই ফেলিতে বলে। তার পর জাহাজ এক ছোট দ্বীপে গিয়ে লাগিল, সেখানে জাহাজ মেরামত হয়। আবার যখন জাহাজ চলিল তখন ঝড় উঠিল। সে সময় সমস্ত হিন্দুদের ছিল, তারাই জাহাজে চালাইত। ঝড় উঠাতে সকলে বলিল, শ্রমণ বৌদ্ধ আছে বলেই এই ঝড় হচ্ছে, উহাকে ফেলিয়া দিতে হইবে। ফাহিয়েন দেখেন এত বড় বিপদ, এখন বাঁচা ভার। তখন হিন্দুদের মধ্যে একজন ফাহিয়েনের বন্ধু ছিল, সে ওঁর পক্ষ লইল, সে বলিল যে, তোমরা যদি ইহাকে ফেলিয়া দাও কখনও মঙ্গল হবে না, জান ইনি একজন সাধুলোক। যখন চীনে পৌছাইবে তখন আমি চীনের রাজাকে বলিয়া দিব, তিনি এইরূপ একজন শ্রমণের উপর অন্যায় ব্যবহারে তোমাদের শাস্তি দিবেন। তখন আর তারা কিছু বলিল না, ঝড় গেল, তার পর বাড়ী পৌছান।

হুয়েনসানেরও নানা রকম বিপদ হয়েছিল, মরুভূমি দিয়ে আসছিলেন, একজন পথ প্রদর্শক লোক সঙ্গে লইয়াছিলেন, কারণ তাহা ব্যতীত চলা অসম্ভব ছিল, কিন্তু সেই লোক কতক দূর আসিয়া আর কিছুতেই আসিল না, তিনি কত বলিলেন তবুও সে ছাড়িয়া গেল। তখন একাকীই মরুভূমিতে চলিতে লাগিলেন, একবার মরীচিকা দেখলেন, তার বর্ণনা করেছেন যে, একদল ঘোড়া ঘোড় সোয়ার সব আসিছিল এইরূপে অনেক কষ্টে মরুভূমি পার হয়ে এক রাজার রাজ্যে গেলেন। রাজা তাঁহাকে খুব যত্ন করিলেন, রাজার কাছে ওঁর ভ্রমণের উদ্দেশ্য বলিলেন। রাজা তখন বলিলেন, এখানে থাক, যাইতে পাইবে না, উনিও বলিলেন, না আমি যাবই, আমি যে জন্যে এসেছি এখানে থাকলে তা হবে না। রাজা তখন বন্দী করিলেন, হুয়েনসান সেখানে তিন দিন অবধি অনাহারে রহিলেন, খুব রোগা হয়ে গেলেন, তখন রাজা খুব সম্মানের

সহিত ছাড়িয়া দিলেন। সেখান থেকে তিনি কাশ্মীরে গেলেন, সেখানে তখন এক খাঁ ছিলেন, তিনি মুসলমান খাঁ নহেন, তিনি পার্সিদের মত অগ্নি উপাসক। সেই খাঁর হুয়েনকে খুব ভাল লাগিল, তাঁর ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। তার পর সেখান থেকে বেরিয়ে একদল দস্যুর হাতে পড়িলেন, তারা ওঁদের খুব মারিল, কাপড় জিনিষ সব লইয়া গেল। ইহাতেও তাঁর মুখ প্রশান্ত দেখিয়া একজন লোক অবাক্ হইয়া গেল, বলিল যে, তোমার সব লইল, তোমাকে মারিল তবুও তোমার এমন প্রশান্ত ভাব! তখন তিনি বলিলেন, জীবন পাইয়াছি, এর চেয়ে ভাল জিনিষ আর কি আছে? তখন সেই লোকটি উঁহাকে নগরে লইয়া গেল, সকলের কাছে সমস্ত ঘটনা বলিল, সব লোক উঁহাকে রাশি রাশি কাপড় আনিয়া দিল, উনি সকলকে ভাগ করিয়া দিলেন। সেখান হইতে নৌকা করিয়া অযোধ্যা ও প্রয়াগে গেলেন। পথে দশখানা দস্যুর জাহাজ ওঁকে আক্রমণ করিল, সব লুটপাট করে নিল। উহাঁকে ধরিয়া নিয়ে গেল। ভাবিল যে দুর্গাপূজায় বলিদরকার, এই শ্রমণ পেয়েছি বেশ ভালই হয়েছে। তার পর ওঁকে বেঁধে মারবার জন্য প্রস্তুত করেছে, উনি তখন বলিলেন যে, আমি একবার প্রার্থনা করে নিই, উনি এই বলিয়া সমাধিস্থ হইলেন। এমন সময় হঠাৎ ঝড় উঠিল, তখন সকলে ভয় পেল, এবং ভাবিল যে, ইহাকে মারিতে যাইতেছি তবুও ইনি একটুও বিকৃত হননি। তখন ভাবিল ইনি বোধ হয় খুব সাধু লোক, আর সেই জন্যেই বোধ হয় ঝড় উঠেছে, এই সব ভেবে ওকে ছেড়ে দিল এবং ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। তখনকার ভ্রমণ সহজ নয়, কখনও বা উটের উপর, কখনও ঘোড়ার উপর কখনও হাঁটিয়া যাইতে হইত। ইহাঁকে রাজারা অনেক সময় হাতী দিতেন, তাতেও যাইতেন। ফিরে যাবার সময় তিনি অনেক বই ও মূর্ত্তি জড় করেছিলেন তাহাতে মস্ত একটা বোঝা হয়। যখন সিন্ধুনদী পার হন, এক নৌকা ডুবে গিয়ে ৫০ খানা বই নষ্ট হয়। মরুভূমিতে ২০ টা ঘোড়া সব জিনিষ বহিয়াছিল।

(অশোক) অনেক স্তূপ গড়ে দেন। এক একটী ঘটনা ও গল্প মনে রাখিবার জন্য স্তূপ গড়িয়া দেন। স্তূপের বিষয় আমরা হুয়েনসনের ভ্রমণ বৃত্তান্তে দেখিতে পাই। সঙ্ঘারামেরও অনেক বর্ণনা আছে। হুয়েনসান বুদ্ধদেবের কথা ও বৌদ্ধ ইতিহাস বেশী লিখিয়াছেন, তীর্থ স্থানের অনেক বর্ণনা করিয়াছেন। তীর্থগুলির দুচারিটা গল্প আজ করিব। তিনি শ্রাবস্তিতে একটী স্তূপ দেখেন এখানে অঙ্গুলিমাল নামক দস্যু ছিল, তাহাদের ভয়ানক আচার ছিল মানুষ বলিদিত, এবং পূজার শেষে একজন সম্মানিত ব্যক্তিকে বলি দিলে অনেক পুণ্য হইত, এই জন্য সেই দস্যু ঠিক করিয়াছিল, তার মাকে বলি দিবে। এমন সময় বুদ্ধ তার কাছে আসেন, বুদ্ধকে দেখিয়া বলিল তবে আজ এই শ্রমণকে বলি দিব। কিন্তু তার পর বুদ্ধ তার দিকে তাকাতেই তার মন এত গলে গেল যে, সে তাঁর ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। এই যেখানে এই দস্যুকে উদ্ধার করেন, এই ঘটনাটী স্মরণ করিয়া দিবার জন্য একটি স্তূপ নির্ম্মিত আছে। এখানে জেতবন বলে, একটা জায়গায় বুদ্ধ অনেক সময় বলিতেন। ক্রমশঃ

মূল্যপ্রাপ্তি।

৯ম বৎসর।

শ্রীমতী মনোমহিনী বসু,	কলিকাতা	॥০
„ নিতম্বিনী দেবী,	গড়বেতা	২৲
শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন চৌধুরী,	চুওয়াপুর	২৲
„ পূর্ণচন্দ্র বসু,	কটক	২৲
„ কেদারনাথ বসু,	দিনাজপুর	২৲

১০ম বৎসর।

শ্রীমতী মনোমোহিনী বসু,		৸০
„ হেমলতা মজুমদার,	নওয়াখালি	২৲
„ নিতম্বিনী দেবী,	গড়বেড়া	২৲
„ [illegible]ৎকুমারী গুপ্ত,	কলিকাতা	২৲
„ সরলাবালা দত্ত,	আগড়তলা	২৲
„ মৃণালী ঘোষ,	বর্দ্ধমান	২৲
„ বনলতা রায়,	বহরমপুর	১৲
শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন চৌধুরী,	চুওয়াপুর	২৲
„ পূর্ণচন্দ্র বসু,	কটক	২৲
„ রাজা সচ্চিদানন্দ দেব,	বামড়া	২৲
„ কেদারনাথ বসু,	দিনাজপুর	২৲

১১শ বৎসর।

শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী সেন,	কলিকাতা	২৲
„ দীনতারিণী দেবী,	ভাগলপুর	২৲
„ হেমলতা মজুমদার,	নয়াখালি	১৲
যোগিনীবালা বসু,	ভাগলপুর	২৲
„ সরস্বতী সেন,	কলিকাতা	২৲
„ হেড়ম্বজননী সেন	জয়পুর	২৲
„ ব্রজবালা সরকার,	বালেশ্বর	২৲
„ কুমুদিনী দাস,	কলিকাতা	২৲
„ শরৎকুমারী গুপ্ত,	কলিকাতা	২৲
„ সুকোমলাঙ্গী,	কলিকাতা	২৲

শ্রীমতী সরলাবালা দত্ত,	আগড়তলা	২৲
„ প্রেমময়ী আইচ,	নয়াখালি	১৲
„ মৃণালিনী ঘোষ,	ইর্দ্ধমাম	২৲
„ ভূপেশ নন্দিনী,	চাপড়া	১৲
„ সুশান্তবালা বসু,	তারকেশ্বর	২৲
„ নিশিতারা সেন,	রাজশাহী	২৲
„ কুলদাসুন্দরী দেবী,	জলপাইগুড়ী	২৲
„ নির্ম্মলাসুন্দরী সেন,	পূর্ণিয়া	২৲
„ স্নেহলতা দত্ত,	কলিকাতা	২৲
„ আশালতা গুপ্ত,	চট্টগ্রাম	২৲
„ সরলাসুন্দরী দাস,	কটক	২৲
„ হেমপ্রভা দাস,	বাঁটরা	
„ ফুল্লকুমারী দেবী,	পিনমানা	২৲
„ সুলতা দেবী,	সম্বলপুর	২৲
শ্রীযুক্ত মধুসূদন সেন,	কলিকাতা	২৲
„ হরলাল শাহা,	কলিকাতা	২৲
„ রাজা সচ্চিদানন্দ দেব,	বামড়া	২৲
„ ভোলানাথ কুণ্ডু,	খগোল	২৲
„ শরচ্চন্দ্র লাহিড়ী,	কলিকাতা	২৲
„ বিমলচন্দ্র নাগ,	কলিকাতা	২৲
„ বাবুরাম লাল	গয়া	১৲
„ রাজেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়,	কলিকাতা	২৲
„ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়,	পেশওয়ার	২৲
„ বিনয়ভূষণ বসু,	লক্ষ্ণৌ	২৲
„ চুণিলাল বসু,	কলিকাতা	২৲
„ যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী,	কলিকাতা	১৲
„ গোপালচন্দ্র গুহ,	পিঙ্গনা	১৲
„ নিত্যগোপাল রায়,	গাজীপুর	২৲
„ ইন্দ্রচন্দ্র নাহাটী,	কলিকাতা	২৲
„ কেদারনাথ বসু,	দিনাজপুর	।৵০
„ সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী,	কলিকাতা	২৲
„ অবিনাশচন্দ্র সেন,	চাঁদপুর	২৲
„ মোহনলাল সেন,	কুচবিহার	

১২শ বৎসর।

শ্রীমতী ইচ্ছাময়ী দাস,	চট্টগ্রাম	২৲
„ যোগিনীবালা বসু,	ভাগলপুর	২৲
„ হেড়ম্বজননী সেন,	জয়পুর	২৲
„ ইন্দিরা দেবী,	কুচবিহার	১৲

ভ্রমসংশোধন।

গত জ্যৈষ্ঠ মাসে মূল্যপ্রাপ্তিস্বীকারে বাবু সিদ্ধেশ্বর সরকারের নামে একাদশ বৎসরের মূল্যপ্রাপ্তি ২৲ স্বীকার করা গিয়াছে। সেই মূল্য একাদশ বৎসরের না হইয়া ১০ম বৎসরের হইবে।

মহিলার নিয়মাবলী।

মহিলা পত্রিকার ডাকমাশুলসহ বার্ষিক মূল্য ২৲ মাত্র। গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ মহিলার মূল্য ও অর্থসম্বন্ধীয় পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নামে এবং প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকটে ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইবেন। প্রাপ্ত প্রবন্ধাদি উপযুক্ত হইলে শীঘ্র হউক বা বিলম্বে হউক প্রকাশিত হইবে। কাহারও প্রবন্ধ ফেরত দেওয়া যাইবে না।

অনেক মহিলা পত্রিকা বৎসরাধিক কাল গ্রহণ করিয়া মূল্য দান করেন না, বড় দুঃখের বিষয়। যাঁহারা মূল্যদানে অসমর্থ তাঁহারা যেন অবিলম্বে পত্রিকা ফেরত পাঠাইয়া দেন, অথবা আমাদিগকে তাহা পাঠাইতে নিষেধ লেখেন। তাহা হইলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইব না। পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়া প্রাপ্য মূল্য না পাইলে অনেক সময়ে আমরা সেই মূল্যের জন্য ভি, পিতে মহিলা পাঠাইয়া থাকি।

ও নারী আত্মার মিলনই প্রকৃত বিবাহ। সাধারণতঃ সংসারে স্বামী স্ত্রীর পরস্পর শারীরিক সম্পর্কই দৃষ্ট হয়। একটি শরীর আর একটি শরীরকে বিবাহ করে। ইহা অতিশয় নিকৃষ্ট বিবাহ। এক পক্ষের ক্ষণভঙ্গুর শরীর ভঙ্গ হইলেই অপর পক্ষ আর একটি শরীর গ্রহণ করিবার জন্য লালায়িত হয়; পত্নীর দেহপাত হইলে পতি তাহার স্থানে অন্য একটি নারীর দেহকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া সাদরে বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত করে, এই রূপ পতির দেহবিনাশে অনেক স্থলে পত্নীও আর একটি পুরুষের দেহকে পতি বলিয়া আশ্রয় করিয়া থাকে। শরীর লইয়াই ইহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ, শরীরস্থ অমরাত্মার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই, দেহনাশের সঙ্গে সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। এরূপ বিবাহ ক্ষণস্থায়ী, শারীরিক ও সাংসারিক এবং অবিশুদ্ধ। সচরাচর পশুভাবের উত্তেজনায় এই প্রকার বিবাহ হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে পবিত্রতা ও দেবভাবের অভাব। ভগবানের অনুগত হইয়া নিত্যকালের জন্য দুইটি আত্মার পরস্পর গ্রহণ ও মিলন উক্ত প্রকার বিবাহে হয় না। বিবাহযোগেই বিধাতার সৃষ্টিরক্ষা ও পরিবার গঠিত হয়। পারিবারিক সুখ-সমৃদ্ধির মূল স্ত্রী পুরুষের আত্মায় আত্মায় বিবাহ। বিবাহ দ্বারা পুরুষ ও নারীর পরস্পর যোগ না হইলে সংসার শ্মশানে পরিণত হইয়া থাকে। সংযতেন্দ্রিয় শুদ্ধচরিত্র বিশ্বাসী স্ত্রীপুরুষ পরস্পরকে বিবাহ করিয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হয়, সংসারকে স্বর্গধামে পরিণত করে। অবিশ্বাসী অজিতেন্দ্রিয় অসাধু লোকেরা বিবাহদ্বারা অধোগতি লাভ করে, পরন্তু তাহারা অধিকতর পশুপ্রকৃতি ও উচ্ছৃঙ্খলতা প্রাপ্ত হয়। অতএব আত্মার উন্নতি ও অবনতি, সুখ এবং দুঃখ বিবাহের শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতার উপর নির্ভর করে। এক্ষণ হিন্দু মোসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ভাবে যে প্রণালীতে বিবাহ হইয়া থাকে, তাহার ফলাফল যেরূপ হয়, তদ্বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে;—

পুরাকালে হিন্দু সমাজে ব্রাহ্ম, আর্ষ, প্রাজাপত্য প্রভৃতি অষ্টবিধ বিবাহ প্রণালী প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে ব্রাহ্ম আর্ষ প্রভৃতি দুই তিনটি বিবাহপদ্ধতি কথঞ্চিৎ উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ, রাক্ষস ও পৈশাচিক বিবাহাদি অতি অপকৃষ্ট ও জঘন্য। ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠ বর্ণে ব্রাহ্ম প্রাজাপত্য আর্ষ প্রভৃতি উত্তম বিবাহ প্রচলিত ছিল, এক্ষণও অনেক স্থানে পূর্ব্ববৎ বা রূপান্তরিতরূপে প্রচলিত আছে। পৈশাচ ও রাক্ষস প্রভৃতি অধম বিবাহ অন্ত্যজ কিরাত চণ্ডালাদি জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল, এক্ষণও অনেক স্থলে আছে। এই অষ্টবিধ বিবাহপ্রণালীর বিষয় একবার মহিলায় আলোচিত হইয়াছে, তাহার পুনরালোচনা অপ্রয়োজন।

আধুনা এদেশে হিন্দু সমাজে যে ভাবে বিবাহ হইয়া থাকে, তাহা অতিশয় দূষ্য ও নিন্দনীয়। বাল্যবিবাহ, বার্দ্ধক্যবিবাহ, বহুবিবাহ বাহুল্যরূপে প্রচলিত আছে।

পঞ্চম বর্ষীয় বা তন্ন্যূনবয়স্ক বালক বালিকারও বিবাহ হয়। পিতা মাতা সাধ করিয়া এরূপ বালক বালিকাদিগকে বিবাহিত করিয়া থাকেন। আবার এক জন পঞ্চাশ বৎসরবয়স্ক বৃদ্ধ পুরুষও একটী অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যাকে বিবাহ করে। পুরুষ বৃদ্ধ বয়সে বিপত্নীক হইলে অবিলম্বে একটী বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়া থাকে, স্থল ভেদে পত্নীসত্ত্বেও পত্ন্যন্তর গ্রহণ করে, এদিকে পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকা বিধবা হইলে তাহার পত্যন্তরগ্রহণের বিধি নাই, সে কঠোর ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে চিরজীবন বৈধব্যব্রতপালনে বাধ্য হয়। অধিকন্তু কৌলীন্য প্রথার অনুসরণ করিয়া এক জন পুরুষ শতাধিক স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিতে পারে। কোন কুলীন পুরুষ একটী পরিবারের ৫।৭টী ভগ্নীকে এমন কি পিসী মাসী প্রভৃতিকে পর্য্যন্ত এক দিনে এক যোগে বিবাহ করিয়াছেন, এরূপ শুনিতে পাওয়া গিয়াছে। বিবাহান্তে ঈদৃশ কুলীন পুরুষদিগের পত্নীর সঙ্গে প্রায় দেখা সাক্ষাৎ হয় না, পত্নী প্রচুর অর্থ দান করিলে পতির দর্শন ও সঙ্গলাভ করিতে পারেন। সাধারণতঃ বঙ্গদেশে হিন্দু সমাজের বিবাহে পাত্র বয়সে জ্যেষ্ঠ পাত্রী কনিষ্ঠা হইয়া থাকে। কিন্তু কৌলীন্যে তাহার বিচার নাই। পাঁচ বৎসর বয়সের বালক পঁচিশ বৎসরের যুবতী কন্যাকেও বিবাহ করিয়া থাকে। অবশ্য কৌলীন্যবিবাহ এক্ষণে পূর্ব্ববৎ নাই, কমিয়াছে। ইহা পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষাবিস্তারের শুভফল বলিতে হইবে। পঞ্জাবে বয়োজ্যেষ্ঠা পাত্রীর সঙ্গে বয়ঃকনিষ্ঠ পাত্রের বিবাহ প্রচলিত আছে, আট বৎসরের বালকের সঙ্গে ষোড়শবর্ষীয়া কন্যারও বিবাহ হয়। ইহা যে অতিশয় অস্বাভাবিক, কে অস্বীকার করিবে?

হিন্দুসমাজে পাত্রপাত্রীর পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থলে, এমন কি সবংশেও বিবাহ হওয়া নিষিদ্ধ। নিকটতর সম্বন্ধ ও রক্তের নৈকট্যস্থলে বিবাহে পাত্রপাত্রী উভয়ের শারীরিক মানসিক ক্ষতি ও অবনতি হয়, বিজ্ঞান তাহা প্রমাণ করে। কিন্তু স্থলভেদে এ নিয়মের অত্যন্ত ব্যভিচার হইয়া থাকে। মাদ্রাজে মামাত পিস্তুত ভাই ভগ্নীতে পরস্পর বিবাহ হইয়া থাকে। "উৎকলে দেবরঃ পতিঃ।" অর্থাৎ উড়িষ্যা দেশে বিধবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ করিতে বাধা নাই। এদেশে দেবর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূকে মাতৃতুল্য মনে করে, তাহার সঙ্গে বিবাহ হইতে পারে কেহ কল্পনাও করিতে পারে না। কিন্তু আবার এদেশে জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর মৃত্যু হইলে তাহার কনিষ্ঠা সেই ভগ্নীপতির সঙ্গে বিবাহিতা হইয়া জ্যেষ্ঠার স্থান অধিকার করিয়া থাকে। ভ্রাতৃবধূকে বিবাহ করা আর ভগ্নীপতিকে বিবাহ করা তুল্য কথা। খ্রীষ্টীয় সমাজে মামাত পিস্তুত ভ্রাতা ভগ্নীর পরস্পর বিবাহ হয়, কিন্তু শ্যালীকে বিবাহ করিবার বিধি নাই। মোসলমানসমাজে পুরুষের বহু বিবাহ করা প্রচলিত, কিন্তু স্ত্রীর বিদ্যমানতায় তাহার ভগ্নীকে বিবাহ করার ব্যবস্থা শাস্ত্রে নাই। ব্রাহ্মসমাজে শ্যালীকে অর্থাৎ মৃত পত্নীর সহোদরা ভগ্নীকে বিবাহ করার কোন
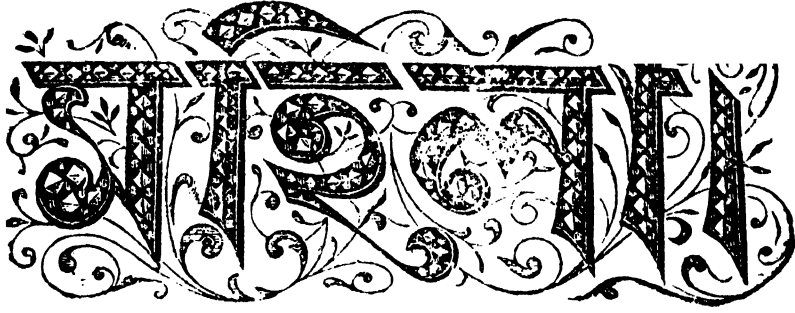
মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১২শ ভাগ]   ভাদ্র, ১৩১৩ ; সেপ্টেম্বর, ১৯০৬।   [২য় সংখ্যা।

স্ত্রী-নীতিসার।

আজ কাল পুরুষদের নিকটে বালক বালিকাদিগের নীতিশিক্ষা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। এ দেশের পুরুষগণ স্বদেশোদ্ধারে মত্ত হইয়া জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠদের নিন্দা করিয়া যেরূপ অবিনয় ও অশিষ্টতার পরিচয় দান করিতেছেন, এরূপ কোন যুগে হয় নাই। তাঁহাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়া বালক বালিকারা বরং উদ্ধত অবিনীত হইতেছে; মান্য গণ্য শ্রদ্ধেয় লোকদিগের কুৎসা নিন্দা করিয়া বেড়াইতেছে, জ্যেষ্ঠ গুরুজনদিগকে অমান্য ও অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে তাহারা কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না। তাহারা স্বদেশোদ্ধারের বড় বড় বক্তৃতা শুনিয়া গর্ব্বিত, বিকৃত ও অকালপক্ক হইয়া উঠিতেছে। এক্ষণ এদেশের অনেক মহিলা প্রকৃতিস্থ না হইলেও বড় বড় বক্তৃতা শুনাইয়া ছেলে মেয়েদিগকে বয়ে যেতে দিতেছেন না। মা প্রেমের সুদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া কোমল ভাবে কিঞ্চিৎ যত্ন চেষ্টা করিলে বালক বালিকাদের জীবনে অবিনয় ও ঔদ্ধত্যের হ্রাস এবং নীতির সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত হইতে পারে।

মা সুকোমলমতি বালক বালিকাদের সাক্ষাতে কাহারও নিন্দা করিবেন না, বরং জ্যেষ্ঠ গুরুজনদিগকে ভক্তি ও সম্মান করার আবশ্যকতা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন, নিজে তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবেন। লোকের সদ্গুণ গ্রহণ করিতে, উপকারী জন হইতে প্রাপ্ত উপকার স্বীকার করিয়া বিনীত ও কৃতজ্ঞ হইতে শিশুদিগকে শিক্ষা দিবেন।

বালক বালিকারা যাহাতে নিজেদের অবস্থা, বয়ঃক্রম অতিক্রম করিয়া ইচড়ে পক্ক কাঁটালের ন্যায় অস্বাভাবিক হইয়া না উঠে, মা তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। নারীজনসুলভ কোমলভাবে শাসন করিয়া মা বালক বালিকাদিগকে তাহাদের মস্তিষ্ক বিকার হইতে রক্ষা করিবেন, বিনয় ও শিষ্টতার পথে চালাইবেন। সন্তানের সম্বন্ধে জননীর গুরুতর দায়িত্ব। তাঁহার ভগবানের প্রতি দৃষ্টি থাকিলে, তিনি তাঁহার বাধ্য কন্যা হইয়া জীবনের সমুদয় কর্ত্তব্য সাধন করিলে সর্ব্বতোভাবে কল্যাণ হইবে।

পরিবারে ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা।

আমাদের ধর্ম্মপ্রাণ আর্য্য পূর্ব্বপুরুষগণ আপন আপন বালকদিগকে বাল্যকালে ধর্ম্মসাধন ও ধর্ম্মশিক্ষার জন্য আচার্য্যগৃহে প্রেরণ করিতেন। তাঁহারা যৌবনকাল পর্য্যন্ত গুরুগৃহে বাস করিয়া ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যয়নে ব্রত নিয়মাদিপালনে ব্যাপৃত থাকিতেন। পরাবিদ্যা শিক্ষা তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, অপরা বিদ্যা গৌণ লক্ষ্যের মধ্যে গণ্য ছিল। তাঁহারা দীক্ষিত ও উপদিষ্ট হইয়া উপযুক্ত ধর্ম্মজ্ঞানলাভ ও ধর্ম্মজীবনগঠনের পর গুরুর অনুমতিক্রমে সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিতেন, এবং বিবাহ করিয়া সস্ত্রীক গার্হস্থ্য ধর্ম্মপালনে প্রবৃত্ত হইতেন, ত্রিশ বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়সে এক প্রকার প্রৌঢ়াবস্থায় তাঁহাদের গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অবলম্বন হইত। পরা বিদ্যা শ্রেষ্ঠ বিদ্যা—ব্রহ্মবিদ্যা; অপরাবিদ্যা বৈষয়িক বিদ্যা। উচ্চশ্রেণীর আর্য্যগণ সমধিক যত্নসহকারে পরাবিদ্যা শিক্ষা করিতেন। কেবল বালকগণ যে, ধর্ম্মশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিতেন, তাহা নহে; বালিকারাও যথাবিধি ধর্ম্মশাস্ত্রে উপদিষ্টা ও শিক্ষিতা হইতেন। "নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালামজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাম্।" ধর্ম্মশাসন অজ্ঞাত এমন কন্যাকে পিতা বিবাহ দিবেন না। শাস্ত্রের এইরূপ স্পষ্ট নিষেধ বাক্য রহিয়াছে। বর্ত্তমান কালের ন্যায় সে কালে বাল্যবিবাহ ছিল না। ব্রাহ্মণাদি উচ্চ শ্রেণীর আর্য্যকন্যাগণ জ্ঞানধর্ম্মে সমুন্নতা ও বয়ঃপ্রাপ্তা না হইলে সচরাচর পরিণয়বন্ধনে বদ্ধ হইতেন না। তাঁহারা গৃহিণী হইয়া ধর্ম্মবিধি অনুসারে গার্হস্থ্য জীবন যাপন করিতেন; যথেচ্ছরূপে পান ভোজন ও শারীরিক সুখ বিলাসে মত্ত ও লক্ষ্যশূন্য হইয়া আপনাদিগকে নীচ ও হীন করিতেন না। দেবার্চ্চনা সাধুসেবা আতিথ্যসৎকার তাঁহাদের নিত্যকর্ম্ম ছিল। তাঁহাদের কর্ত্তব্য-পালন, ভোগবিরাগ গুরুজনভক্তি, পরসেবা দেখিয়া তাঁহাদের বালক বালিকাগণ বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মানুরাগী সুনীতিপরায়ণ হইয়া উঠিত। "স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু" স্ত্রী গৃহে লক্ষ্মীস্বরূপিণী এই শাস্ত্রীয় বচন সেই সকল সুগৃহিণী নিজজীবনে সার্থক করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পুণ্য প্রেমে সমুজ্জ্বল চরিত্র দর্শন করিয়া কে তাঁহাদিগকে দেবী বলিয়া ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারিত। "ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণঃ যদ্যৎকর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত, তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।" অর্থাৎ গৃহস্থ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবেন, তিনি যে যে কর্ম্ম করিবেন, তাহা পরব্রহ্মে সমর্পণ করিবেন। প্রাচীন আর্য্যপুরুষ ও আর্য্য কন্যাগণ নিজেদের গার্হস্থ্য জীবনে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের এই মহাবাক্যের সম্মাননা রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন।

এক্ষণ প্রায় সর্ব্বত্র আর্য্যকুলোদ্ভব নরনারীদিগের জীবনে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের জীবনের ঠিক বিপরীত ভাব লক্ষিত হয়। ইহারা যেন সেই উচ্চবংশের সন্তান নহেন। সাধারণতঃ নব্য আর্য্য পরিবার সকলে ধর্ম্মশাসন নাই, ধর্ম্মের প্রতি সম্মাননা নাই; কেবল পার্থিব ভাব, যথেচ্ছ পান ভোজন ও আমোদ উল্লাস আছে। গৃহে ভগবানের নাম হয় না, পূজা হয় না, গৃহ পরিবারে ভগবানের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই; তিনি তাড়িত। গৃহীণীই পরম জননীর

স্থান অধিকার করিয়া যথেচ্ছাচারে জীবন যাপন করেন, তাঁহার জীবনে বালক বালিকাগণ ধর্ম্মবৈমুখ্য ও সাংসারিকতা এবং পার্থিব সুখবিলাস ব্যতীত আর কি শিক্ষা পায়? আর্য্যকুলোদ্ভব পুরুষদিগের কথা পরিহার করি, সাধারণতঃ তাঁহাদের জীবনের ঘোরতর পতন, তাঁহাদের ধর্ম্মে দৃঢ়তা ও আস্থা বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অভাব। তাঁহাদের দ্বারা পরিবারমধ্যে ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা হইয়া উঠে না, তাঁহারা কেবল বাহিরে আড়ম্বর করিয়াই বেড়ান। যখন যে পরিবারে ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ভগবান্ আদৃত হইয়াছেন, বালক বালিকাদের মনে ধর্ম্মানুরাগ জন্মিয়াছে, ধর্ম্মভীরু গৃহিণী দ্বারাই হইয়াছে। কখনও পুরুষের দ্বারা হয় নাই। পুরুষেরা অনেক সময় অনিচ্ছাসত্ত্বে স্ত্রীর ভয়ে ও স্ত্রীর অনুরোধে পূজা পার্ব্বণাদিতে যোগ দান ও ধর্ম্ম কর্ম্মাদিতে অর্থ ব্যয় করেন। অনেক পুরুষ পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদের উচ্ছেদ সাধনপূর্ব্বক সমাজসংস্কার করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন বলিয়া বড় বড় বক্তৃতা করেন, কিন্তু এ দিকে স্ত্রী হিন্দু, স্ত্রীর ভয়ে পুতুল পূজা করিয়া বালক বালিকাকে জাতে জাতে বিবাহ দেন, উইলসনের হোটেলে খানা খাইয়া গৃহে আসিয়া জাত রক্ষার জন্য দলাদলি করেন। ইঁহারা উনবিংশ শতাব্দীর অদ্ভুত হিন্দু। ইঁহাদের মধ্যে ভারতোদ্ধারকারী বড় বড় বাগ্মী আছেন, যাঁহাদের বক্তৃতার তীব্র বেগে দেশ কম্পিত হয়। ইঁহারা বাহিরে সমাজসংস্কারক সিংহ, ঘরে স্ত্রীর নিকটে ভীরু শৃগাল কাপুরুষ। এরূপ তরল প্রকৃতি লোকের দ্বারা পরিবারে ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা আকাশকুসুমবৎ অসম্ভব। ইঁহাদের প্রকৃতির চঞ্চলতা, বাক্য ও কার্য্যের অনৈক্য দেখিয়া কোন বুদ্ধিমান লোক ইঁহাদের উপর আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না। পরিবারের বালক বালিকারা ইঁহাদের নিকটে নীতি ও ধর্ম্ম কি শিক্ষা করিবে? প্রাচীন শ্রেণীর হিন্দু মহিলারা অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হইলেও দৃঢ়ব্রত হইয়া স্থূল ও বাহ্যিক আকারে পরিবারে ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের দ্বারা পরিবারস্থ বালক বালিকাদিগের মন জ্ঞানমার্জ্জিত ও কুসংস্কারমুক্ত না হইলেও ধর্ম্মভাবে পরিচালিত হইয়াছে। ধর্ম্মনিষ্ঠা নৈতিক নিয়ম পালন দেবভক্তি গুরুজনভক্তি তাঁহাদের জীবনে দর্শন করিয়া পরিবারস্থ তরুণবয়স্ক লোকেরা স্থূলতঃ ধর্ম্মভাবে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে।

আমরা আমাদের বাল্যজীবন হিন্দুপরিবারে যাপন করিয়াছি। আমরা জননীর ধর্ম্মনিষ্ঠায় নিত্য পূজার্চ্চনায় দোল দুর্গোৎসবাদিতে মত্ত হইয়া উঠিতাম; গৃহে প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মী গোবিন্দ বিগ্রহের প্রতি অশেষ ভক্তি প্রকাশ করিতাম; সেই বিগ্রহকে স্বর্ণাভরণ নববস্ত্র ও শয্যা মশারি ইত্যাদি যোগাইতাম, বিগ্রহের চরণামৃত ও প্রসাদগ্রহণে ভক্তি প্রকাশ করিতাম; নিত্য ঠাকুর ঘরের দ্বারে যাইয়া ভূমিষ্ঠ প্রণত হইতাম। এ সকল মাতৃজীবনের ধর্ম্মনিষ্ঠার ফল বলিতে হইবে। মা ও পরিবারস্থ আত্মীয়া মহিলাগণ বিশেষ বিশেষ তিথিতে বিশেষ বিশেষ ব্রত নিয়ম পালন করিতেন। অনেক ব্রতেই ফলারের ঘটা হইত, পিষ্টক পায়স মিষ্টান্নাদির অংশ পাইয়া আমাদের উৎসাহ বাড়িত, এবং ব্রতাদির প্রতি ভক্তি

বৃদ্ধি হইত। শাক্ত পরিবারে আমাদের জন্ম, এবং প্রথম জীবন যাপিত হয়। কালীপূজা ও দুর্গোৎসবাদিতে বলিদান হইত, আমরা তদ্দর্শনে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিতাম। আমাদের গুরুতর পীড়া হইলে বন্দনীয়া জননী ও আত্মীয়া মহিলারা আরোগ্য প্রার্থিনী হইয়া অনেক দেবদেবীর উদ্দেশ্যে বলি মানত করিতেন। আমরা পাঁঠা বলির সময় উপস্থিত থাকিতাম; নিষ্ঠুর বলিদান ক্রিয়াদর্শনে মন ঘোরতর শাক্তভাবাপন্ন হইয়াছিল। সেই দৃষ্টান্তের অনুকরণে কদলী তরু ও কদলী কাণ্ড ছেদন করিয়া আনিয়া সে সকলকে এক প্রকার আকার দানে মহিষ ও পাঁঠা বলিয়া পুতুলের নিকটে বলিদান করিতাম। আমাদের ন্যায় অনেক শাক্ত বালকের দৌরাত্ম্যে কদলী উদ্যান উচ্ছিন্ন হইয়াছে। আমরা তাহা করিয়াও সন্তুষ্ট হই নাই। সময়ে সময়ে কুলায় হইতে পাখীর ছানা আনিয়া সে সকলকে বলির পারাবতস্থানীয় করিয়া বলিদান করিয়াছি। যাহা হউক সেই দিন চলিয়া গিয়াছে, এক্ষণ আর সেই শাক্তভাব নাই। বলিদান করিব দূরে থাকুক, পাঁঠা মহিষাদি বলির বিষয় স্মরণ করিলেও যেন হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। আমরা বলির প্রসাদ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভক্ষণ করিতাম, এক্ষণ আর এক টুক্‌রা মাংস বা এক বিন্দু মাংসের রস রসনায় স্পর্শ করিতে পারি না। গুরুতর পীড়া দৌর্ব্বল্যের সময় শক্তি পুষ্টিবিধানের জন্য ডাক্তারেরা এক বিন্দু কুক্কুটরস রসনায় অর্পণ করিতে পারেন নাই। তবে অন্তিমকালে তাঁহাদের যত্নবৈফল্য না হইতে পারে। শাক্তভাবাপন্ন ডাক্তরদের প্রভাবে সেই সভ্যতার গঙ্গোদকস্বরূপ কুক্কুটরস (ব্রথ) পানপূর্ব্বক অনেক নিরামিষভোজীকে নাড়ীশুদ্ধ করিয়া পরলোকে যাত্রা করিতে হয়। শাক্ত ডাক্তরদিগের হাত এড়াইবার উপায়ান্তর নাই।

উপরে প্রাচীন শ্রেণীর হিন্দুপরিবারের গৃহিণীদের দ্বারা ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার বিষয় উল্লিখিত হইল। বর্ত্তমান সময়ে জ্ঞানসভ্যতায় সমুন্নত বলিয়া প্রসিদ্ধ, এক নব্য দল দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। তাঁহাদের পরিবারে ঈশ্বর ও ধর্ম্মের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই, কোন প্রকার পূজার্চ্চনা ব্রত নিয়ম নাই, তাঁহারা সে সকলকে উপহাস বিদ্রূপ করিয়া উড়াইয়া দেন, ভগবান্ তাঁহাদের পরিবার হইতে তাড়িত। ভক্তি ও বিশ্বাসের কথা তাহারা কর্ণে স্থান দান করিতে চাহেন না, তাঁহারা সর্ব্বদা জড়রাজ্যে—ইন্দ্রিয়রাজ্যে বাস করেন। ইন্দ্রিয়াতীত অধ্যাত্মরাজ্যের সঙ্গে তাঁহাদের কোন যোগ নাই। তাঁহাদের পরিবারে ধর্ম্মশাস্ত্রের আদর নাই। কোনরূপ আধ্যাত্মিক চিন্তা তাঁহারা মনে স্থান দান করিতে পারেন না। পরিবারস্থ মহিলাদিগের পাঠ্য পুস্তক নাটক, উপন্যাস ও গল্পের বই। তাঁহাদের ঘর বাড়ী সুসজ্জিত; বৈঠকখানায় কুকুর বিড়াল ও ঘোড়ার ছবি এবং অর্দ্ধনগ্না নৃত্যকারিণী নারীর ছবি ইত্যাদি টাঙ্গান, কিন্তু ধার্ম্মিক মহাজনদিগের কোন ছবি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ধর্ম্মের প্রতি ও ঈশ্বরের প্রতি কোনরূপ আদর শ্রদ্ধা আছে, তাঁহাদের বাড়ী ঘর দেখিলে এবং পরিবারস্থ স্ত্রীপুরুষের আচার ব্যবহার দেখিলে কিছুতেই বুঝা যায় না। তাঁহাদের সৎপ্রসঙ্গের মধ্যে পরচর্চ্চা, সাধুনিন্দা। তাঁহারা হিন্দু নহেন, ব্রাহ্ম নহেন,

খ্রীষ্টীয়ান নহেন, কিছুই নহেন। সুবিধা বোধ করিলে স্ত্রীপুত্রাদির বিবাহোপলক্ষে হিন্দু বা ব্রাহ্ম হন। এক শ্রেণীর নব্য ব্রাহ্মপরিবার আছে সেই সকল পরিবারেরও অবস্থা প্রায় এইরূপ— এই আদর্শ। ব্রাহ্মপরিবার বটে, কিন্তু পরিবারে ব্রহ্মোপাসনা নাই, ধর্ম্মকর্ম্ম, ধর্ম্মচর্চ্চা নাই। বাড়ীতে নানা কার্য্যের নানা ঘর আছে, শয়নের ঘর, ভোজনের ঘর, বসার ঘর ইত্যাদি। কেবল ঠাকুর ঘর—পূজার ঘর নাই। কেবল বিলাস পরিচ্ছদ পান ভোজনাদির ঘটা। এ সকল দুর্দ্দশা ভাবিলে দুঃখভারে হৃদয় অবসন্ন হয়।

একদা আমরা ওয়াল্‌টিয়ারে গিয়াছিলাম। উড়িষ্যাপ্রদেশের নববিধানপ্রচারক স্বর্গগত ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের সহযাত্রী ছিলেন। পূর্ব্বাহ্নে ষ্টেশনে অবতরণ করিয়াই আমরা তত্রত্য একজন বাঙ্গালী বাবুর আবাসে আতিথ্যগ্রহণের জন্য উপনীত হই। গৃহকর্ত্তার সঙ্গে আমাদের কোন কালে আলাপ পরিচয় ছিল না। একজন পুরুষও বাড়ীতে ছিলেন না। অন্তঃপুরে মেয়েরা ছিলেন। নন্দবাবু বাহির হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "ওগো আমরা উপস্থিত, আমাদের জন্য যেন অন্ন প্রস্তুত হয়। আমরা নিরামিষভোজী।" মধ্যাহ্নে দুইটি যুবা পুরুষ উপস্থিত হন; এক জন কণ্ট্রাক্টর কাজ করেন, অন্য জন অদূরে বিশাখাপট্টন নগরে ব্যবসারের কার্য্য করিয়া থাকেন। অন্তঃপুরের সংলগ্ন একটি প্রকোষ্ঠে আমাদের উপাসনা হয়, ভাই নন্দলালের সুমধুর সঙ্গীতলহরীর সঙ্গে উপাসনা অতিশয় সরস ও মধুর হইয়াছিল। পরদিনও সকালে উপাসনা সঙ্গীত হয়। অপরাহ্নে আমরা কটক নগরাভিমুখে যাত্রা করি। তখন উক্ত পরিবারের একটি যুবা আমাদিগকে বিদায় দান করিবার জন্য আমাদের সঙ্গে ষ্টেশনে গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি বলিলেন, "ব্রাহ্মদিগের উপর আমাদের অতিশয় ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা ছিল। আমাদিগের এই রূপ সংস্কার ছিল যে, ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের ধর্ম্মকর্ম্ম কিছুই নাই, তাহারা কেবল বাবুর্চির রাঁধা ছাগল ও মুর্গী খায়। আপনাদিগের শুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাব দেখিয়া এবং ভক্তিবিগলিত সুমিষ্ট উপাসনা ও সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া সেই সংস্কার দূর হইয়াছে। আপনাদিগকে পাইয়া আমি অতিশয় কৃতার্থ হইয়াছি।" কিয়দ্দিন পূর্ব্বে ওয়ালটীয়রে কোন বড়লোক ব্রহ্মজ্ঞানী সপরিবারে ছিলেন, তাঁহার আচার ব্যবহার দেখিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মদিগের প্রতি তত্রত্য লোকদিগের মনে অতিশয় অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। তাহারা মনে করিয়াছিল ব্রাহ্মধর্ম্ম যথেচ্ছাচারের ধর্ম্ম।

বিহার প্রদেশস্থ শ্রদ্ধাস্পদ নববিধান প্রচারক ভাই দীননাথ মজুমদার মহাশয় সে দেশের ব্রাহ্মপরিবার সকলে যাহাতে ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠা হয় তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করিয়া থাকেন। ইহা তাঁহার জীবনের একটি প্রধান কার্য্য। তাঁহার অনুরোধ ও নির্দ্দেশ মতে সে দেশের প্রায় প্রত্যেক ব্রাহ্মপরিবারে এক একটি স্বতন্ত্র উপাসনা ঘর নির্দ্দিষ্ট, তথায় পারিবারিক বেদী, ধর্ম্ম পুস্তক, সঙ্গীত পুস্তক ও একতন্ত্রী এবং প্রত্যেক উপাসক ও উপাসিকাদের জন্য স্বতন্ত্র আসন ও গৈরিকাদি সংরক্ষিত। প্রত্যহ নিয়মিতরূপে পারিবারিক উপাসনা হয়, পরিবারস্থ নর নারী সকলে তাহাতে যোগদান করেন। গৃহস্বামী বা গৃহকর্ত্রী উপাসনা

করিয়া থাকেন। ইহাতে যে, পরিবারের কত মঙ্গল হইতেছে এই দৃষ্টান্ত বালক বালিকাদিগের অন্তরে যে, কত প্রভাব বিস্তার করিতেছে তাহা বলিয়া উঠা যায় না। উপাসনাবিহীন নিরীশ্বর ব্রাহ্মপরিবার দেখিলে আমাদের মনে বড় কষ্ট হয়। তবে উপাসনা যেন নিত্য নূতন ও জীবন্ত এবং প্রাণস্পর্শী হয়, গুরু ঠাকুরের মরা ফেলার ন্যায় যেন না হয়। এক চাষার বাড়ীতে গুরুঠাকুর উপস্থিত হইয়া তাহাকে মন্ত্রগ্রহণে বাধ্য করেন। চাষা নানা ওজর আপত্তি করিয়া মন্ত্রের দায় হইতে এড়াইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু গুরুঠাকুর ছাড়িলেন না, তিনি বলিলেন, "তাহা না হইলে তোমার গতি হইবে না, বরং তুমি স্নানান্তে আহারের পূর্ব্বে মূল মন্ত্র কয়েকটি অক্ষর জপ করিও, অন্য মন্ত্রাদির ভার আমার উপর রহিল। সাবধান! আহ্নিক না করিয়া কখনও আহার করিও না, তাহা করিলে অতিশয় পাপগ্রস্ত হইবে।" কৃষক অগত্যা সম্মত হইল। সে এক দিন দুপুর বেলা চাষের কাজ করিয়া আতপতাপে উত্তপ্ত শ্রান্ত ক্লান্ত ক্ষুধিত হইয়া গৃহে ফিরিয়া আইসে, এবং স্ত্রীকে ডাকিয়া বলে, "আমার পেট জ্বলে যায়, শীঘ্র ভাত আনিয়া দে।" তৎক্ষণাৎ স্ত্রী কড়াইয়ের ডাইল আর ভাত পাথরের থালায় করিয়া পরিবেশন করিল। স্নানান্তে ক্ষুধিত কৃষক ভোজন করিতে বসিল, গ্রাস উঠাইয়া মুখে অর্পণ করিবে, এমন সময় তাহার মনে হইল যে, আহ্নিক করে নাই। তখন সে কাঁদ কাঁদভাবে স্ত্রীকে বলিল, "দূর হ হতভাগী, খাব কি গুরুঠাকুরের মরা যে রহিয়াছে, এই মরা না ফেলে যে খেতে পারি না।" তখন সে দুঃখ ও বিরক্তির সহিত মরা ফেলিতে অর্থাৎ গুরু-প্রদত্ত মন্ত্র জপ করিতে লাগিল। ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকারা যেন সেই "গুরুঠাকুরের মরা ফেলার" ন্যায় ব্রহ্মোপাসনা না করেন, ইহাই আমাদের অনুরোধ; প্রাত্যহিক উপাসনাতে যেন জীবনে উন্নতি পুণ্য শান্তি লাভ করেন, তাহাতে নিজের ও পরিবারের অশেষ কল্যাণ হইবে।

বঙ্গমাতার ভাগ্যবান্ সুপুত্রগণ "বন্দে মাতরং" বলিয়া চিৎকার করিয়া দলে২ পথে মাঠে বেড়াইয়া ও সাহেব বিবীদিগকে তাড়াইয়া যান, তাহাতে ধর্ম্ম হয় না, মাতৃপূজা হয় না, একটা বৃহৎ জড় পদার্থকে, একটা প্রদেশকে সকলে মিলিয়া মা বলিয়া ডাকিয়া গীত গাহিয়া বেড়াইলে পরিবারে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা হয় না, জীবন্ত ঈশ্বরের নিত্য পূজার্চ্চনা ভিন্ন কোন পরিবারে প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। গৃহিণীগণ, জননীগণ, তোমাদের জীবনের গুরুতর দায়িত্ব। পরিবারে ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা, বালক বালিকাদের ভাবী ধর্ম্মজীবনগঠনের ভার ভগবান্ তোমাদের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন, তোমরা দায়িত্বহীনভাবে জীবন যাপন করিতে পার না।

পরিবারমধ্যে ধর্ম্মসাধনা ও পূজার্চ্চনা হইলে দৃষ্টান্তে ও উপদেশে শৈশব কাল হইতে বালক বালিকা কিরূপ ধর্ম্মপথ আশ্রয় করে, পারস্য ভাষায় রচিত কিমিয়ায়সাদতনামক মোহম্মদীয় ধর্ম্মপুস্তকবিশেষ হইতে তাহার একটি উদাহরণ এস্থলে প্রদর্শন করা যাইতেছে।

তত্তর দেশীয় জগন্মান্য পরম সাধু মহাত্মা সহল বলিয়াছেন,—

"আমি তিন বৎসর বয়ঃক্রমকালে যখন আমার মাতুল মোহম্মদ এব্‌ন সওয়ার নমাজ পড়িতেন তাঁহার প্রতি স্থিরনেত্রে চাহিয়া থাকিতাম। তিনি এক দিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "বৎস, যে ঈশ্বর তোমাকে সৃজন করিয়াছেন, তাঁহার বিষয় তুমি কি মনে করিয়া থাক?" তখন আমি বলিয়াছিলাম, মামা, আমি কেমন করিয়া মনে করিব? তিনি বলিলেন, "যখন তুমি রাত্রিতে ঘুমাইবার জন্য শয্যায় যাইবে, তখন তিন বার মুখে নয়, মনে মনে বলিবে, ঈশ্বর আমার সঙ্গে আছেন, আমার দিকে দৃষ্টি করিয়া আছেন, আমাকে দেখিতেছেন।" তদবধি মাতুলের কথানুসারে কিছুকাল আমি সেরূপ মনে মনে বলিয়াছিলাম। পুনর্ব্বার তিনি বলিলেন, "প্রতিদিন উহা সাত বার বলিবে।" কিয়দ্দিন পরে আবার বলিয়াছিলেন, "এগার বার বলিবে।" আমি সেই রূপ করিতেছিলাম। ক্রমে ক্রমে আমার মনে তাহার মিষ্টতা জন্মিল। এক বৎসর পরে তিনি বলিলেন, "আমি যাহা কিছু তোমাকে বলিয়াছি, যত কাল বাঁচিয়া থাকিবে তাহা পালন করিতে হইবে। ইহাতে তোমার চিরকালের সুখ শান্তি জানিবে।" আমি কয়েক বৎসর ক্রমশঃ তাহাই বলিতেছিলাম ও তাহার মধুর ভাবে মুগ্ধ হইতেছিলাম। অন্য এক দিন মাতুল মহাশয় বলিলেন, "ঈশ্বর যাহার সঙ্গে আছেন, যাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া আছেন, যাহাকে দেখিতেছেন, সে ঈশ্বরেরসম্বন্ধে অপরাধ করিতে পারে না। সাবধান! তুমি পাপ করিও না। যেহেতু ঈশ্বর তোমাকে দেখিতেছেন।" পরে তিনি আমাকে শিক্ষকের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। তখন আমার সাত বৎসর বয়স। আমি কোরাণ পাঠ করিতে লাগিলাম। তের বৎসর বয়ঃক্রমের সময় গুরুজনের অনুমতি গ্রহণ করিয়া ধর্ম্ম-বিষয়ে কোন প্রশ্নের মীমাংসার জন্য বসোরাতে গমন করি; একজন মহা তপস্বীর নিকটে যাই, তিনি আমার প্রশ্নের মীমাংসা করেন। তদবধি আমি সাধন আরম্ভ করি*।

আমেরিকানিবাসী পরম ধার্ম্মিক সুপ্রসিদ্ধ থিয়োডোর পার্কার, পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রম হইতে ভক্তিমতী সাধ্বী জননীর উপদেশ ও দৃষ্টান্তে বিশ্বাসের পথে চলিয়া অপূর্ব্ব ধর্ম্মজীবন লাভ এবং জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। জননী ইঁহাকে বিবেকবাণী অর্থাৎ ঈশ্বরের আদেশানুসারে চলিতে উপদেশ দিয়াছিলেন তদনুসারে তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া, সমস্ত কার্য্য বিবেকের আদেশানুসারে সম্পাদন করেন, এবং উচ্চ ধর্ম্মজীবন প্রাপ্ত হন।

প্রতিভাশালিনী শার্লোটি ব্রোণ্টি।

সাহিত্যজগতে জ্ঞান ও প্রতিভাবলে যে সকল মহিলা বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, শার্লোটি ব্রোণ্টি তাঁহাদের অন্যতম। ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে "জেন আয়ারের" রচয়িত্রীর নাম স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত ও চির স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

এই বিদুষী মহিলা রেভারেণ্ড পেট্রিক

* চতুর্থ ভাগ তাপসমালা পুস্তকে তাপসবর সহল তস্তরীর জীবন-বৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে।

ব্রোণ্টি নামক একজন আইরিশ ধর্ম্মযাজকের কন্যা। শার্লোটির মাতা, মেরিয়া ব্রেণওয়েল সাতিশয় ধীশক্তিসম্পন্না ও কোমলস্বভাবা রমণী ছিলেন। ব্রোণ্টি পরিবার প্রথমতঃ ইংলণ্ডের ইয়র্কশিয়রের অন্তঃপাতী হার্টশেড-নামক স্থানে অবস্থিতি করিতে ছিলেন। এই স্থানে শার্লোটির জ্যেষ্ঠা দুই ভগিনী মেরিয়া ও এলিজাবেথের জন্ম হয়। মিঃ পেট্রিক অতঃপর যখন থর্ণটননামক স্থানে স্থিতি করিতেছিলেন, তৎকালে ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে এপ্রিল শার্লোটি ব্রোণ্টি জন্ম ধারণ করেন, তৎপর তাঁহার একমাত্র ভ্রাতা পেট্রিক ব্রেণওয়েল ও কনিষ্ঠা দুই ভগিনী এমিলি ও এনের জন্ম হয়। এনের জন্মপরিগ্রহের অত্যল্পকাল পরই তাঁহার জননীর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া পড়ে। স্থান-পরিবর্ত্তন এবং সর্ব্ব প্রকার যত্ন চিকিৎসায় কিছুতেই কোন উপকার প্রদর্শিত হইল না। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে হওয়ার্থনামক স্থানে তিনি সংসারধাম হইতে চির বিদায় গ্রহণ করেন। এই সময় শার্লোটির বয়স মাত্র পাঁচ বৎসর ছিল। মাতৃহীনা শিশুদের শৈশব জীবনে স্বভাবতঃই একটা সুবিমল আনন্দ জ্যোতির অভাব থাকিয়া যায়—মাতৃ-প্রেমের মাধুর্য্য, কোমলতা ও শান্তিসুখের সুস্নিগ্ধ ছায়ায় সে জীবন পরিতৃপ্ত ও পরিস্ফুট হইবার অবকাশ পায় না। শিশুগণের শিক্ষা ও চরিত্রগঠন সুতরাং তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তি জননী কর্ত্তৃকই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই শিশুগন, জীবনের প্রারম্ভে সেই সৌভাগ্যে বঞ্চিত হইয়া নিজেদের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিল। এই প্রকার অননুকূল অবস্থায়ও এই ব্রোণ্টি পরিবারে কিরূপ আশ্চর্য্য শিক্ষা, শান্তি ও পরস্পরে গাঢ় প্রণয় ও সৌহার্দ্দ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

প্রথমতঃ মিঃ পেট্রিক স্বয়ং এই শিশুগণের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা ও কতকটা মস্তিষ্ক-বিকৃতি হেতু তিনি সে বিষয়ে যথোচিত মনোযোগ দিতে পারেন নাই। কাজেই অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা মেরিয়ার উপর এই গুরুভার ন্যস্ত হইল। মেরিয়ার এক মাতৃস্বসা এই পরিবারের গৃহ-কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, কিন্তু তিনি তাঁহার প্রকৃতি ও আচারগত বৈসম্যবশতঃ এই শিশুগণের প্রীতি, ভক্তি বা বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। ইঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি স্বভাবতঃই অতিশয় প্রখর ছিল। ইঁহাদের বাসগৃহের অবস্থা ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ দৃশ্য ইঁহাদের অন্তর্নিহিত শক্তি-নিচয়ের বিকাশে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। নিজপরিবারের ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর থাকিয়াও ইঁহারা কিরূপ সুখে, শান্তিতে ও সুন্দর প্রণালীতে সময়াতিপাত করিতেন, নিম্ন-লিখিত বিবরণ পাঠে তাহার কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে।

সর্ব্ব জ্যেষ্ঠা মেরিয়া সকল বিষয়ে শিশু-গণকে পরিচালনা করিতেন। প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তিনি তাহাদের সমক্ষে সংবাদ পত্র পাঠ করিতেন ও তাহা সকলকে বুঝাইয়া বলিতেন। ইহার ফলে এই হইয়া ছিল যে, অন্যান্য বালক বালিকাগণ যে বয়সে সচরাচর পুতুল বা তদ্রূপ ক্রীড়ণক লইয়া খেলা করিয়া বেড়ায়, সেই বয়সেই ইহারা রাজ্য ও রাজ-

নীতিবিষয়ক কঠিন প্রশ্নের সমালোচনায় নিযুক্ত থাকিত। তাহারা যখন সবে মাত্র লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছিল, তখনই ছোট ছোট গল্প ও নাটক রচনা করিয়া তাহার অভিনয় করিত। সেই সকল নাটকে সাধারণতঃ "ডিউক অব ওয়েলিংটন" নায়কের পদ লাভ করিতেন। সম্ভবতঃ এই বীর পুরুষের কর্ত্তব্যপরায়ণতার জন্যই শার্লোটি ইহাকে গল্পে ও নাটকে নায়কের পদে প্রতিষ্ঠিত করিতেন। শিশু-বয়সেই ইহারা বীরোপাসনায় দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ডিউক অব ওয়েলিংটন, নেপোলিয়ন বোনাপার্টি, হ্যানিবেল ও সীজরের শৌর্য্য বীর্য্যের তুলনা লইয়া ইহাদের মধ্যে গভীর সমালোচনা ও তর্কবিতর্ক হইত। তাঁহাদের পাঠপ্রবৃত্তি এত প্রবল ছিল যে, তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য গ্রন্থ ব্যতীতও অপর বহুবিধ গ্রন্থ প্রচুর পরিমাণে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে নিয়ত অধ্যয়ন করিয়া বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান সঞ্চয় করিতেন। শৈশবেই ইহাদের বুদ্ধিবৃত্তি কিরূপ পরিণত ও প্রখর ছিল, তৎসম্বন্ধে মিঃ পেট্রিক স্বয়ং একটী ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। একদা তিনি সন্তানগণে পরিবৃত হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন, তখন সর্ব্ব কনিষ্ঠা কন্যা এনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তাহার মত একটী ক্ষুদ্র শিশুর প্রধানতম অভাব কি? প্রত্যুত্তরে এন্ বলিল, "বয়স ও অভিজ্ঞতা।" তৎপর এমিলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার ভ্রাতা পেট্রিক ব্রেণওয়েল সময় সময় যেরূপ অন্যায়াচরণ করে, তৎসম্বন্ধে কি ব্যবস্থা সুসঙ্গত? এমিলি বলিল, "প্রথমতঃ তাহাকে যুক্তি দ্বারা ভাল ক'রে বুঝায়ে বল, তাহা না শুনিলে, বেত্রাঘাত করিবে।" তখন তিনি ব্রেণওয়েলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, স্ত্রী ও পুরুষ জাতির মনোবৃত্তির বিভিন্নতা জানিবার প্রকৃষ্ট উপায় কি? ব্রেণওয়েল বলিল, "তাঁহাদের দেহগত পার্থক্য দ্বারাই উহা জানা যাইতে পারে।" তৎপর শার্লোটিকে ক্রমান্বয়ে তিনটি প্রশ্ন করিলেন, জগতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ কোনটি? উত্তরে শার্লোটি বলিল, "বাইবেল।" তার পরে কোন্ গ্রন্থ উৎকৃষ্ট?—"প্রকৃতিগ্রন্থ।" স্ত্রীজাতির পক্ষে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা কি? "যে শিক্ষায় রমণী তাঁহার পরিবার সুশৃঙ্খল ও সুশাসনে রাখিতে পারেন, তাহাই তাঁহার পক্ষে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা।" মিঃ পেট্রিক সর্ব্বশেষে মেরিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সময় কাটাইবার প্রধান ও শ্রেষ্ঠ উপায় কি? একাদশ বৎসর বয়স্ক বালিকা মেরিয়া কহিল, "সুখময় অনন্ত জীবন লাভের আয়োজনে নিযুক্ত থাকা।" উক্ত অদ্ভুত প্রশ্নোত্তর হইতে স্পষ্টতঃ বুঝা যায়, এই ব্রোণ্টি পরিবারের বালক বালিকাগণের মানসিক বৃত্তিগুলি শিশু-বয়সেই কিরূপ গঠিত হইয়া উঠিতেছিল।

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে মেরিয়া ও এলিজাবেথকে একটি বোর্ডিং স্কুলে পাঠান হইল, সেই স্কুলে কেবল ধর্ম্মযাজকদের মেয়েরাই পড়িতে পাইত, এবং সেখানেই তাহাদের থাকিবার স্থান, আহার ও অধ্যয়নের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু উহা এরূপ মিতব্যয়িতার সহিত পরিচালিত হইত যে, সেখানে বালিকাগণকে একরূপ অনশনেই থাকিতে হইত।

শার্লোটি ব্রোণ্টি তাঁহার প্রসিদ্ধ "জেন আয়ার" নামক গ্রন্থে এই স্কুলের একটি অবিকল চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। মেরিয়া ও এলিজাবেথ উক্ত স্কুলে যাইয়া অবধি দিন দিন অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিলেন, কয়েক মাস পর শার্লোটি এবং এমিলিকেও সেই স্কুলে যাইতে হইল। তথায় অনশন অত্যাচারের মধ্যেও চারি ভগিনী পরস্পরের সহবাসে যথাসম্ভব চিত্তের প্রফুল্লতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু মেরিয়া শীঘ্রই এত পীড়িতা হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহাকে স্কুল ছাড়াইয়া বাটীতে আনয়ন একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িল। বাটী যাওয়ার কয়েক দিবস পরই এই হতভাগ্য কন্যার প্রাণবিয়োগ ঘটে, এবং তাহার পাঁচ ছয় সপ্তাহ পর এলিজাবেথও মেরিয়ার অনুগমন করেন। এই দুটী শোকাবহ ঘটনার পর শার্লোটি ও এমিলিকে উক্ত অস্বাস্থ্যকর স্কুলে রাখা সঙ্গত বোধ হইল না, তাঁহারা শীঘ্রই গৃহে প্রত্যানীত হইলেন। মেরিয়া ও এলিজাবেথের অভাবে শার্লোটিকে মেরিয়ার সমস্ত কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করিতে হইল। এতদবধি ক্রমাগত ছয় বৎসর কাল তাঁহাকে বাটীতে অবস্থান করিতে হইয়াছিল। এই দীর্ঘকাল মধ্যে নিজ গৃহই এই বালক বালিকাদের আমোদ প্রমোদের একমাত্র স্থান ছিল, নিজেরা ব্যতীত তাঁহাদের অপর সঙ্গী ছিল না। তাঁহারা এই সময়ে অনেক নাটক, কবিতা ও উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। যেখানে যে পুস্তক পাওয়া যাইত, তাহাই আনিয়া তাঁহারা পড়িতেন, এবং প্রায়ই মহৎ লোক ও ঐতিহাসিক ঘটনাদি লইয়া তাঁহাদের মধ্যে বেশ তর্ক বিতর্ক চলিত। কিন্তু সকল বিষয়েই শার্লোটি কর্ত্তৃক তাঁহারা পরিচালিত হইতেন। অতঃপর ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে শার্লোটি রোহেডনামক স্থানে অপর এক স্কুলে পড়িতে গিয়াছিলেন, তথায় তিনি এক বৎসর মাত্র ছিলেন। সেই স্কুলের শিক্ষয়িত্রী তাঁহার শিক্ষাসম্বন্ধে বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিতেন। শার্লোটির জীবনে এই এক বৎসর কাল অতি সুখে ও আনন্দে অতিবাহিত হইয়াছিল। বৎসরান্তে তিনি গৃহে ফিরিয়া পূর্ব্ব কর্ত্তব্যভার পুনর্গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি কিরূপে সময় কাটাইতেন তৎসম্বন্ধে তিনি নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন। প্রাতঃকালে বেলা নয়টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত তিনি ছোট ভগিনীদিগকে পড়াইতেন ও স্বয়ং চিত্রাঙ্কন অভ্যাস করিতেন। তৎপর মধ্যাহ্নাহার ও আপরাহ্নিক চা পান করার মধ্যবর্ত্তী সময়ে তিনি সুঁচ সুতা লইয়া বিশেষ পরিশ্রম সহকারে নানা প্রকার সেলাই কাজ করিতেন। তাহার পর প্রবন্ধ লিখন, অধ্যয়ন, চিত্রাঙ্কন অথবা কিছু কিছু ফ্যান্সি শিল্পের কাজ করিতেন। তিনি মুহূর্ত্তকালও অপব্যয় করিতেন না। বৃথা গল্পামোদ প্রভৃতিতে এই পরিবারের কেহ কখনও লিপ্ত হইতেন না। প্রতিবেশীদের মধ্যে কদাচিৎ কেহ চা পান করিতে আসিতেন। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে তাঁহাদের সময় নষ্ট হইত না। শার্লোটি প্রায় সর্ব্বদাই অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকিতেন। কেবল যে সাহিত্যে বা ইতিহাসেই তাঁহার পাঠ সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা নয়। তিনি সকল বিষয়ের

পুস্তকই বহুল পরিমাণে ও আশ্চর্য্য পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও অভিনিবেশসহকারে পাঠ করিতেন। কোন গ্রন্থ তিনি শুধু পড়িয়াই উহাকে ফেলিয়া রাখিতেন না, যাহা পড়িতেন, পাঠান্তে তাহার বিষয় বিভাগ করিয়া সংক্ষিপ্ত সার সঙ্কলন ও তৎসম্বন্ধে নিজের স্বাধীন মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। এই রূপে একদিকে যেমন তাঁহার বিবিধ বিষয়ে জ্ঞান সঞ্চয় হইত, অপরদিকে তেমনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ দর্শন ও সমালোচনার শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ক্রমশঃ

আমাদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

লাহোর।

গত বৎসর অর্থাৎ ১৩১২ সনের ২৯শে জ্যৈষ্ঠ আমরা পেশওয়ার হইতে রাউলপিণ্ডি নগরে প্রত্যাগত হই; তথায় তিন দিন অবস্থিতি করিয়া ১লা আষাঢ় সন্ধ্যার ট্রেণে লাহোর নগরাভিমুখে যাত্রা করি। রাউলপিণ্ডির দুই জন বাঙ্গালী বন্ধু আমাদিগকে বিদায় দান করিবার জন্য ষ্টেশন পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। তাঁহারা সেখানে আমাদের প্রতি অত্যন্ত সৌহৃদ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। পেশওয়ার হইতে রাউল পিণ্ডি নগরে আসিতে এবং রাউলপিণ্ডি হইতে লাহোরে যাইতে ধূমযানযোগে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টনেল পার্ব্বত্য সুড়ঙ্গ অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। তথায় বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে আমাদের গ্রামস্থ আত্মীয় শ্রীমান্ রোহিণী কুমার সেন লাহোরে বাস করিতেছিলেন। রাউলপিণ্ডি হইতে যাত্রা করার কয়েক দিন পূর্ব্বে আমরা তথায় যাইব বলিয়া তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিলাম। সেই পত্র পাইয়া তিনি তাঁহার আবাসে আতিথ্য গ্রহণ করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। পরদিন ৩রা জ্যৈষ্ঠ প্রাতঃকালে আমরা লাহোরে উপনীত হই। উক্ত বন্ধু ষ্টেশনে আমাদিগকে গ্রহণ করিয়া নিজ আবাসে লইয়া আইলেন। লাহোরে আমাদের প্রথম আগমন নহে। লাহোর পঞ্জাব প্রদেশের অতি প্রাচীন প্রসিদ্ধ রাজধানী। মহাপ্রতাপান্বিত জগৎবিশ্রুতবীরাগ্রগণ্য পঞ্জাবাধিপতি রণজিৎ সিংহ ইংরাজাধিপত্যের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে স্থিতি করিয়া স্বীয় অমিত প্রতাপে সমগ্র পঞ্জাব ও কাবোল কান্দাহর পর্য্যন্ত বিকম্পিত করিয়াছিলেন। আমরা ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে পঞ্জাবে ভ্রমণোপলক্ষে লাহোরে যাইয়া কয়েক দিন স্থিতি করিয়াছিলাম। তখন লাহোরের যাহা দর্শনীয় এক প্রকার দর্শন করা গিয়াছিল। এনগরের প্রধান দর্শনীয় মহারাজ রণজিৎ সিংহের প্রাসাদ, দুর্গ ও সমাধি মন্দির, সলিমের বাগ, লাহোরের যাদুঘর (Museum) ইত্যাদি। পূর্ব্বেই এসকল এক প্রকার দর্শন হইয়াছিল। এবার আর লাহোরে কিছু দেখিয়া বেড়াইবার ইচ্ছা ছিল না। যে সময়ে আমরা লাহোরে পঁহুছিলাম, তখন সেস্থান যেন অগ্নিকুণ্ড, উত্তাপে আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছিল। দিবারাত্রি বায়ু অবরুদ্ধ ছিল, অপরাহ্নে আকাশ ধূলীপটলে আচ্ছন্ন হইয়া ভীষণাকার ধারণ করিত। বীজন সঞ্চালন এবং শীতল শর-

বত পান করিয়া আমরা জীবন রক্ষা করিতে ছিলাম। প্রিয় রোহিণীকুমার পুনঃ পুনঃ শরবত এবং বরফ জল যোগাইতে ছিলেন। গ্রীষ্মকালে লাহোরের আনার-কলির বাজারে অনেক শরবতের দোকান খোলা হয়। দুই পয়সার বরফ সংযুক্ত ফলসা বা কমলালেবুর এক গ্লাস অত্যুৎকৃষ্ট শর-বতের যোগাড় হইয়াছে। শরবত পান করিয়া তখন আরাম বোধ করা গিয়াছে, কিন্তু পরক্ষণেই পিপাসা, গাত্রদাহ ও ঘর্ম্মোদ্গম হইয়াছে। ভিস্তি দ্বারা জল-সিক্ত করিয়া ছাদে উন্মুক্ত আকাশে নিশাযাপন করিতে হইত তথাপি সুনিদ্রা হইত না। পুরাতন নগরের বাহিরে নূতন নগর আনারকলির অন্তর্গত পল্লী বিশেষে ছিলাম, সেই স্থানেই এতদূর উত্তাপ ভোগ করা গিয়াছে, পুরাতন লাহোর নগরের উত্তাপের কথই নাই। উক্ত নগর প্রাকারে আবেষ্টিত, মহা জনাকীর্ণ; কোঠাঘর সকল ঘন সন্নিবিষ্ট, নগরবর্ত্ম অতিশয় সঙ্কীর্ণ, তাহাতে গাড়ী চালিত হইতে পারে না। নগরটি দেখিলে বোধ হয় যেন একটি প্রকাণ্ড মধুক্রম। ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে যাইয়া সেই পুরাতন নগরের ভিতরেই শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সাদর আতিথ্য গ্রহণে তাঁহার আবাসে কয়েক দিন স্থিতি করিয়াছিলাম। তখন শীতঋতুর প্রারম্ভ, বোধ হয় অগ্রহায়ণ মাস ছিল, কোন ক্লেশ হয় নাই। এই সময় আমরা তথায় থাকিলে গরমে মারা যাইতাম। সেস্থানে যেমন গ্রীষ্মাধিক্য তেমন প্রবল শীত। এই দুইটি ঋতুরই মহাপরাক্রম। তবে সে দেশের লোকদিগের শীত গ্রীষ্মের তাড়না সহ্য করিবার শক্তি অসাধারণ। পুরাতন নগরে গুরু নানকের এবং অমৃত-সরের গুরুদরবারের ছবি ক্রয় করিবার জন্য একদিন মাত্র প্রবেশ করা গিয়াছিল। আমরা নগরের ভিতরে অধিক দূর না যাইয়া অবিলম্বে বাহিরে চলিয়া আসিয়া-ছিলাম। এই নিদারুণ গ্রীষ্মের মধ্যে এক দিন সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে উর্দ্দু ভাষায় বক্তৃতা করা গিয়াছিল। তথা-কার প্রসিদ্ধ বারিষ্টার শাহদীন সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বক্তৃতার বিষয় হকৃতালা গায়েব নহি, বল্‌কে হাজের হ্যায়; অর্থাৎ ঈশ্বর অনু-পস্থিত নহেন, বরং উপস্থিত। সেই বক্তৃতা লাহোরে মুদ্রিত হইতেছে। উর্দ্দু ভাষায় আরও বক্তৃতা হওয়ার কথা ছিল, গ্রীষ্মাধিক্যবশতঃ শরীর মন অবসন্ন হইয়া পড়াতে তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া যায়। শুনা গিয়াছে সেবারের ন্যায় তীব্র উত্তাপ অনেক কাল হয় নাই। উত্তাপের জন্য আমরা সে দেশ হইতে অবিলম্বে সিন্ধুদেশের অন্তর্গত আরব সাগরের উপ-কূলবর্ত্তী করাচি বন্দরে যাইয়া সামুদ্রিক শীতল বায়ু সেবনে উদ্যোগী হই।

লাহোরে আর কিছু দেখিবার প্রবৃত্তি হয় নাই। তবে প্রিয় রোহিণীকুমারের অনুরোধমতে ৭ই আষাঢ় পূর্ব্বাহ্নে এক খানা টম্‌টমারোহণে শাহডেরায় যাওয়া যায়। রোহিণীকুমার ও তাঁহার প্রতিবেশী ব্রাহ্মযুবা প্রিয় বিনয়ভূষণ ঘোষ সহযাত্রী

হইয়াছিলেন। নগরের পূর্ব্বোত্তর প্রান্তে প্রবাহিত ঐরাবতী (বারি) নদীর অপর কূলে শাহডেরা। সেস্থানে সম্রাট্ জাহাঙ্গিরের সমাধি মন্দির। উহা আনার কলি হইতে ন্যূনাধিক ৫ মাইল দূরে। সে বার পারের নৌকায় পার হইয়া শাহডেরায় যাওয়া গিয়াছিল। তখন রেলওয়ে সেতু নির্ম্মিত হয় নাই। এবার টমটমে চড়িয়া সেতুর উপর দিয়া পরপারে উপস্থিত হওয়া যায়। নদীতে স্নান করিব মনস্থ করিয়া প্রস্তুত হইয়া যাওয়া গিয়াছিল কিন্তু নদীর জল বড়ই আবিল দেখা গেল, তজ্জন্য সেই জলে স্নান করিতে আর ইচ্ছা হয় নাই। বিশেষতঃ রাবিতে নামিবার সুবিধামত ঘাটও পাওয়া গেল না। পরপারে কলের জলে স্নান করা গেল।

শাহডেরার অর্থ রাজার গৃহ। সম্রাট্ জাহাঙ্গিরের শব একটি সুন্দর মন্দিরের অভ্যন্তরে সেস্থানে স্থাপিত বলিয়া তাহার নাম শাহডেরা হইয়াছে। উক্ত সমাধি-মন্দিরের অন্তর্গত স্থানে সুবিস্তৃত পরিস্কৃত ও নির্জ্জন এবং বিশাল পাদপরাজিতে সমাচ্ছন্ন, অতিশয় রমণীয়। সমাধিমন্দির বিচিত্র ও বৃহৎ, কিন্তু আগ্রার তাজমহল ও সম্রাট আকবরের সমাধি মন্দিরের সঙ্গে কোন তুলনাই হইতে পারে না। মন্দিরের যে প্রকোষ্ঠে সম্রাটের দেহ স্থাপিত, সেই প্রকোষ্ঠ নানা বর্ণের মূল্যবান্ প্রস্তর-খণ্ডে বিশেষ কারুকার্য্যযুক্ত। ২৭৬বৎসর পূর্ব্ব অর্থাৎ ১০৩৭ সালে সম্রাট জাহাঙ্গির ঐহিক লীলা সমাপ্ত করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় দীর্ঘ জীবনের অনেক সময় প্রিয়তমা রাজ্ঞী ভুবন বিখ্যাত নুরজাহান বেগমসহ ভূস্বর্গস্বরূপ কাশ্মীরে যাপন করিয়াছেন। অবশেষে কাশ্মীর হইতে পঞ্জাবে ফিরিয়া আসিবার সময় পথে পীড়িত হন, সেই পীড়াতেই দেহত্যাগ করেন। আমরা জাহাঙ্গিরের সমাধিমন্দিরের অদূরে তরু-তলে বসিয়া প্রার্থনাদি করিয়াছিলাম।

জাহাঙ্গিরের সমাধিমন্দিরের অনতিদূরে তাঁহার প্রিয়তমাপত্নী রাজ্ঞী নুরজাহান বেগমের অতি সামান্য ক্ষুদ্র সমাধিবেদী অরণ্য মধ্যে স্থাপিত। জাহাঙ্গিরশাহের পুত্রবধূ সম্রাট্ শাহজাহানের পত্নী রাজ্ঞী মম্‌তাজমহলের সমাধি মন্দির ভুবন বিখ্যাত পরম রমণীয় তাজমহলে, আর মহাসৌন্দর্য্য ও প্রতিভাশালিনী ভুবন বিখ্যাত নুরজাহানের সমাধির বিষম দুর্দ্দশাপন্ন,শৃগাল কুকুরে তাহাকে ময়লা করিয়া থাকে। লোকে বলে একজন ফকিরের অভিসম্পাতে রাজ্ঞী নুরজাহানের সমাধি এরূপ অনাদৃত হইয়াছে, ইহা বড় দুঃখের বিষয়। ঐহিক প্রভুত্বগর্ব্ব সম্পদৈশ্বর্য্য যে কি রূপ অনিত্য ও অসারের অসার এসকল অতুল বিভব ও প্রতাপশালী সম্রাট ও সম্রাট পত্নীর সমাধিক্ষেত্র দর্শন করিয়া স্বভাবতঃ মনে হয়। শাহাজাহান বাদশার সঙ্গে নুরজাহানের বিষম শত্রুতা হইয়াছিল। জাহাঙ্গির বাদশার পরলোকান্তে রাজ্ঞী নুরজাহান পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন শাহজাহান সম্রাটও তাঁহার একাধিপত্য। বোধ হয় তিনি বিমাতার সমাধির এরূপ অবমাননা করিয়া শত্রুতা সাধন করিয়াছেন।

আমরা জাহাঙ্গির বাদশার সমাধি মন্দির দর্শনান্তে উক্ত টম্‌টম যোগে আবাসাভিমুখে যাত্রা করি। মধ্যপথে টম্‌টমের চক্র বিকল হয়। সেই গাড়ীযোগে আমাদের বাড়ীতে ফিরিয়া আসা দুষ্কর হইয়া উঠে। বেলা অধিক হইয়াছে অতিশয় উত্তাপ। প্রায় তিন মাইল পথ অতিক্রম করিলে গৃহে পঁহুছিব। হাঁটিয়া এত দূর পথ যাওয়া অসাধ্য ব্যাপার ছিল। নিকটে গাড়ীর আড্ডা নাই,আমরা নিরুপায় হইয়া পড়ি। পথপ্রান্তে কিয়ংক্ষণ দণ্ডায়মান হইয়া কোন ফেরতগাড়ী পাওয়া যায় কিনা তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। ইতি মধ্যে একখানা গাড়ী পাইয়া আনন্দিত হই। সলিমের বাগে যাওয়ার জন্য রোহিণীর আগ্রহ ছিল। আমরা নানা কারণে সেখানে যাইতে সম্মত হই নাই। পূর্ব্বে সেই উদ্যান দর্শন হইয়াছে। উহা বাদশাহী আমলের রমণীয় উদ্যান। গ্যালেরীর আকারে নতোন্নত ৩।৪ থাকে বিভক্ত। তথায় শত শত ফোওয়ারা বিদ্যমান।

লাহোরেই পঞ্জাবের লেপ্টনেণ্ট গভর্ণর বাহাদুর স্থিতি করেন, শিমলা পর্ব্বতে গ্রীষ্মঋতু যাপন করিয়া থাকেন। পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত বড় বড় কার্য্যালয় লাহোরেই প্রতিষ্ঠিত। লাহোর নগরের অনতিদূরে মিয়ঁামিরনামক স্থানে বিস্তীর্ণ সেনানিবেশ।

একদিন মাধ্যাহ্নিক ভোজনের জন্য লাহোর নগরে একজন পাঞ্জাবী সম্রান্ত ভদ্রলোকের গৃহে আমাদের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, তাহা উল্লেখ যোগ্য। একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্ম বন্ধু কয়েকজন পঞ্জাবী যুবা এবং তত্রত্য ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্যও নিমন্ত্রিত ছিলেন। ভোজনের পূর্ব্বে হস্ত প্রক্ষালনের ব্যাপার কিছু কৌতুকাবহ। বেলা ১০টার সময় যাইয়া সংক্ষিপ্ত উপাসনান্তে ভোজন করিতে হইবে এরূপ কথা ছিল। নানা কথায় উপাসনা চাপা পড়িয়া যায়। উপাসনা আর হয় নাই। ১১টার সময় একজন ভৃত্য জলপূর্ণ একটি বৃহৎ জলপাত্র ও গামলা এবং গামছাসহ উপস্থিত হয়। তাহা দেখিয়া মনে হইল যেন ভোজনের পূর্ব্বেই আমাদিগকে আচমন করিতে হইবে। ভৃত্য সকলের হস্তপ্রক্ষালন করিয়া গামছা দ্বারা হাত মোছাইয়া চলিয়া গেল। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে এক এক খানা করিয়া ভোজ্যপাত্র উপস্থিত হইতে লাগিল। হস্তপ্রক্ষালন ব্যাপারের যেরূপ ঘটা হইয়াছিল, ভোজন ও ভোজনান্তে আচমনে সেরূপ ঘটা হয় নাই। ভোজনের পূর্ব্ববর্ত্তী হস্তপ্রক্ষালন ব্যাপার দেখিয়া সহজে লোকের মনে হইতে পারে তাহার পরবর্ত্তী ব্যাপারে মহা ঘটা হইবে। কিন্তু সেরূপ কিছুই হয় নাই। নিমন্ত্রিতদিগের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য দোকানে প্রস্তুত তন্দুরে রুটি এবং তদুপযোগী উপকরণ ছিল। যাহার দন্তমূল দৃঢ় নয়, সেই রুটি ছিন্ন ও বিদ্ধ করিতে দন্তস্খলন হওয়ারই সম্ভাবনা। পঞ্জাবী যুবকদের পক্ষেই উহা খাটে।

রোহিণী কুমারের পরিবার সঙ্গে ছিল না। এক জন কাশ্মীরী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ—জম্মুনিবাসী তাঁহার গৃহে রন্ধনের কার্য্য করি-

তেন। তাঁহাকে মিস্ত্রীজী বলিয়া সম্বোধন করা হইত। মিস্ত্রীজী একা পাচক, ভৃত্য ও মুটে। তিনি দুই বেলা রন্ধন ও জলখাবার প্রস্তুত করিতেন, গৃহ ঝাঁট দিতেন, কুটনা কুটিতেন এবং উচ্ছিষ্ট পাত্র মার্জ্জন করিতেন, অপিচ বাজার হইতে মোট এবং রাস্তার কল হইতে কলসপূর্ণ জল বহন করিয়া দ্বিতল গৃহে উঠাইতেন। সকল কার্য্যেই মিস্ত্রীজী উপস্থিত, আপত্তি নাই। দ্বিতীয় প্রহরে ভয়ানক উত্তাপ, মিস্ত্রীজী বাজার হইতে বরফ লইয়া আইস, তৎক্ষণাৎ মিস্ত্রীজী বাজারে দৌড়িলেন। মাহিয়ানা বোধ করি ৩ বা ৪৲। আমরা বিলাত হইতে প্রত্যাগত একজন আত্মীয়ের বাড়ীতে যাইয়া দেখিয়াছি, তাঁহার ৫০০৲ টাকা মাত্র মাহিনা। তিনি সপরিবারে বাস করিতেন। ৮। ১০ জন চাকর, চাকরের মাহিনায় ১২৫৲ টাকা খরচ। কোন চাকর রাঁধে ও বাজার করে, কোন চাকর ঘরে ঝাঁট দেয়, কেহ বা জল তুলিয়া আনে, কেহ বা আলোর বন্দোবস্ত করে, এক এক জনের জন্য এইরূপ এক একটা কাজ নির্দ্দিষ্ট, সে আর অন্য কাজ করে না। ৮। ১০ টাকা এমন কি কেহবা ১৫। ১৬ টাকা পর্য্যন্ত মাহিয়ানা পাইয়া থাকে, স্বল্প বেতনভোগী দুই জন চাকর দ্বারা যে কাজ চলে, সেস্থলে এরূপ মোটা বেতনে দশ জন চাকর নিযুক্ত। তাহারা এক প্রকার বসিয়া বসিয়া মোটা বেতন ভোগ করে। ইহা সামান্য অপব্যয় নহে। এদিকে গৃহস্বামীর সঞ্চয় কিছুই নাই বলিতে হবে। গৃহিণী গোছাল হইলে এরূপ ব্যয় হইতে পারে না। সুগৃহিণী সংসারে অপব্যয় হইতে দেন না, নানা উপায়ে অর্থ বাঁচাইয়া সঞ্চয় করেন।

পঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজের সভাশ্রেণীতে কয়েক জন অধিক বয়স্ক উচ্চপদস্থ কৃতবিদ্য পঞ্জাবী ব্রাহ্ম আছেন। পঞ্জাব কলেজের অন্যতর প্রফেসর লালা রুচিরাম এম্ এ উক্ত সমাজের সম্পাদক। প্রকাশচন্দ্র দেব মহাশয় মন্দিরে অনেক সময়ে উপাচার্য্যের কার্য্য করেন। ইনি ঠিক পঞ্জাবী নহেন। মিরাট অঞ্চলে ইঁহার জন্মস্থান। কয়েক জন উৎসাহী পঞ্জাবী ব্রাহ্ম যুবা দিন দিন অগ্রসর হইতেছেন। অল্পসংখ্যক বাঙ্গালী ব্রাহ্ম আছেন। তন্মধ্যে বাবু অবিনাশচন্দ্র মজুমদার অগ্রগণ্য। তাঁহার প্রতি সে দেশের লোকেরা বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাকে। পঞ্জাবের সেবার জন্য তিনি প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছেন। সেই সময়ে অবিনাশ বাবু কাঙ্গড়ায় ভূমিকম্পে বিপন্ন নরনারীদিগের সেবার জন্য সপরিবারে তথায় ছিলেন। লাহোরে আর্য্যসমাজের দল প্রবল, আর্য্যসমাজের সভ্যদিগের মত ভাব ও কার্য্যপ্রণালীর বিষয় রাউলপিণ্ডীর ভ্রমণবৃত্তান্তে উল্লিখিত হইয়াছে।

২২শে আষাঢ় রাত্রি ১০টার ট্রেণে করাচি অভিমুখে যাত্রা করা গেল। লাহোর হইতে করাচি পর্য্যন্ত পথের বৃত্তান্ত আগামীতে লিখিবার ইচ্ছা আছে।

শ্রমজীবীদিগের স্ত্রী-পরিবার।

বিহার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের শ্রমজীবী পুরুষদের তুল্য তাহাদের পরিবারস্থ স্ত্রীলোকেরা অর্থোপার্জ্জনের জন্য পরিশ্রম করিয়া থাকে। তাহারা মোট বহন করে, কৃষিক্ষেত্রে কিন্তু হল চালনা করে না, অন্যান্য কার্য্য করিয়া থাকে। দোকানে বসিয়া বা পল্লীতে পল্লীতে যাইয়া শাক শব্জী ফল মূল শস্যাদি বিক্রয় করে। বঙ্গদেশের শ্রমজীবীদের স্ত্রীলোকেরা গৃহে বসিয়া কেবল স্বামীর শ্রমোপার্জ্জিত অর্থ ভোগ করিয়া থাকে। পশ্চিম বঙ্গস্থ হাবড়া জিলার ও কটক নগরে উক্ত শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগকে মোট বহন করিতে দৃষ্ট হয়। ঢাকা নগরের ব্যবসায়ী শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা কসীদার কার্য্য ও অন্যান্য শিল্পকার্য্য করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করে। এইরূপে স্ত্রী-পুরুষে পরিশ্রম করিয়া তুল্যরূপে অর্থোপার্জ্জন করিলে পরিবার অর্থকষ্টে নিপীড়িত হয় না। দরিদ্র ভদ্রমহিলাগণ বিশেষতঃ ভদ্রকুলের দরিদ্র বিধবারা অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষার অভাবে কোনরূপে অর্থোপার্জ্জন করিতে না পারিয়া অন্নবস্ত্রাভাবে অতিশয় কষ্ট পাইয়া থাকেন, অনেকের জীবন রক্ষা দুষ্কর হয়। অন্নের গলগ্রহ না হইয়া তাঁহাদের উপায়ন্তর নাই। সম্প্রতি স্বদেশের শিল্পজীবীর উন্নতিসাধনার্থ যাঁহারা বিশেষ যত্ন করিতেছেন, সর্ব্বাগ্রে সেই দীনদুঃখী মহিলাদিগকে অর্থকরী শিল্পের শিক্ষাদানের উপায় বিধান করিয়া তাঁহাদের অর্থকষ্টনিবারণে প্রযত্নবান্ হন ইহা প্রার্থনীয়।

ভীষণ জলপ্লাবন ও দুর্ভিক্ষ।

আমরা গত শ্রাবণ মাসে "দুর্ভিক্ষ ও বঙ্গমহিলাগণ" শীর্ষক প্রবন্ধে পূর্ব্ববঙ্গের দুর্ভিক্ষ বিষয়ে লিখিয়াছিলাম। "ভাদ্রমাসের ফসল উঠিলে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ অনেক পরিমাণে নিবারিত হইবে এরূপ আশা করা যায়; কিন্তু এবার বৃষ্টির অভাবে শস্যের অবস্থা সুখজনক নহে।" কিন্তু এই ভাদ্র মাসেই তাহার বিপরীত অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, দুর্ভিক্ষের প্রকোপ চারিদিকে অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। বহুলোকের জীবন রক্ষা দুষ্কর হইয়াছে। আমরা নানা স্থান হইতে অত্যন্ত দুঃখজনক সংবাদ পাইতেছি।

ঢাকা জিলার অন্তর্গতপাঁচদোনা গ্রামে হইতে ত্রিশটি গ্রামের দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকদিগের সেবায় নিযুক্ত শ্রীমান্ প্রতাপচন্দ্র সেন বিগত ৯ই ভাদ্র লিখিয়াছেন ;—

"গত কল্য ৯৲ চাউলের দর ছিল, অদ্য ১০৲ হইল। আর বুঝি লোক বাঁচিবে না। ৬ই আগষ্ট (২১শে শ্রাবণ) তারিখে চাউলের দর বৃদ্ধি হইয়া ৫৷৷০ হইয়াছিল। ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া অদ্য ১০৲ টাকায় পরিণত হইল। চাউল এই মূল্যে সকলে পাইতেছে না। বৃহস্পতিবার রামচন্দ্রীর হাটে চাউলের জন্য ৭৫৲পাঠাইয়াছিলাম। কিন্তু খরিদ করিতে পারে

নাই। গত কল্য ডাঙ্গার হাটে চাউলের জন্য লোক পাঠাইয়াছি, এক্ষণ পর্য্যন্ত ফিরিয়া আইসে নাই। আমার ঘর বাড়ী লোকে পুরিয়া রহিয়াছে, চাউল চাউল করিতেছে। আমরা বুঝি আর লোক বাঁচাইতে পারিলাম না। এক্ষণ আমাদের কি করা কর্ত্তব্য উপদেশ দিবেন, টাকাও ফুরাইয়া আসিল। হাজার টাকা আমরা দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারের জন্য পাইয়াছি। খরচাস্তে এখন আমাদের হাতে দুই শত টাকার অধিক ১৫। ২০ টাকা হইতে পারে। মোট কথা যে টাকা আছে তাহাতে সেপ্টম্বরের এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত চলিতে পারে। আমরা হতবুদ্ধি ও অস্থির হইয়া পড়িয়াছি। কি যে করিব কিছু স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

* * *

"জলপ্লাবনে দেশ ভাসিয়া গিয়াছে। এত জল কেহ কখনও দেখে নাই! ভাদুরী ধান যাহা কিছু হইয়াছিল, তাহার অনেক নষ্ট হইয়াছে। যদি অগ্রহায়ণী ধান না হয় (এক্ষণ আশা করা যাইতে পারে না) তাহা হইলে কাহার সাধ্য আগামী সন লোকের জীবন রক্ষা করিতে পারে। তাহা হইলে আমাদের আর কিছু করিবার থাকিবে না। আমার এই অসুস্থ শরীরে ভয়ানক খাটুনি।'

প্রতাপচন্দ্র ১৩ই ভাদ্র তারিখে ঢাকা হইতে লিখিয়াছেন ;—

"আমি তিন দিন যাবৎ এখানে নানা কাজে আসিয়াছি। ১২৲ টাকা চাউলের মন, চাউল পাওয়া যাইতেছে না। আমরা বোধ হয় লোক বাঁচাইতে পারিব না। বলুন এখন কি করি?'

বিগত ৮ই ভাদ্র টাঙ্গাইল হইতে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ তালুকদার মহাশয় লিখিয়াছেন, "টাঙ্গাইলে নূতন বিপদ উপস্থিত, এখানে ভয়ানক বর্ষা। আমাদের বাসায় প্রায় সর্ব্বস্থানে হাটু জল। সব শহর প্লাবিত, মফঃস্বলের কষ্ট অবর্ণনীয়। আমরা নিজেরাই বিপন্ন, কে কাহার খবর নেব। * * চাউলের দর ৮॥০ হইয়াছে, ইহার পর কি হইবে বলিতে পারি না।" সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, পিঙ্গানা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকল জলমগ্ন। শত শত গ্রামের ভয়ানক দুরবস্থা, সহস্র সহস্র লোক বিপন্ন, তাহার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না, লিখিয়া অবস্থা জ্ঞাপন করে এমন লোক নাই। অনাহারে কতলোকের যে মৃত্যু ঘটিতেছে কে জানে? বালাম চাউলের জন্ম ভূমি বরিশালের জিলা জল মগ্ন। পুরাকালে নোহয়ার সময়ে পৃথিবী জল মগ্ন হইয়াছিল, এরূপ গল্প শুনিয়াছি এবার যেন এদেশে তাহাই ঘটিল না ঢাকা হইতে ভাই ঈশানচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন ঢাকা নগর প্রায় জলমগ্ন। অন্য অন্য বৎসর বুড়ী গঙ্গা নদীর পোস্তা ডুবিত না, এবার পোস্তার উপর দুই হাত আড়াই হাত জল। চাউলের দর ৷৲৮ টাকা। ঢাকার নবাব সাহেব এবং স্বর্গগত বদান্য লালমোহন শাহার পরিবার অপেক্ষাকৃত শস্তাদরে গরিব লোকদিগের নিকটে চাউল বিক্রয়ে তাহাদের প্রাণ রক্ষা করিতেছেন। শ্রুত হওয়া গিয়াছে বরিশালে সাধারণ দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডার

হইতে ১৫ হাজার লোক প্রত্যহ অন্ন পাইয়া জীবন ধারণ করিতেছেন, দয়ালু বাবু অশ্বিনীকুমার দত্তকে শত শত ধন্যবাদ। তিনি সহস্র সহস্র লোকের প্রাণরক্ষার উপায় হইয়াছেন।

এইত গেল পূর্ব্ব বঙ্গের অবস্থা। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, আসামে গোয়ালপাড়া অঞ্চলে অনেক স্থান জল মগ্ন। টাকায় ৪ সের অর্থাৎ ১০ টাকা দরে মণ চাউল হইয়াছে।

কোচবিহার রাজ্য কয়েক দিন জল মগ্ন ছিল। ২।৩ দিন রেলওয়ে বন্ধ ও ডাকবন্ধ ছিল। জলস্রোতে সেই রাজ্যের অনেকগুলি রেলওয়ে সেতু চূর্ণ হইয়াছিল, মহারাজ অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ে সংক্রান্ত রাজবাড়ী ষ্টেশন হইতে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত কয়েক মাইল রাস্তা নিমগ্ন হওয়াতে যাত্রিদিগকে নৌকারোহণে যাইতে হইয়াছিল। এক্ষণ নাকি জলের হ্রাস হওয়াতে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত অনায়াসে ট্রেণ চলিতেছে।

অতি বৃষ্টি ও অতি বন্যার পূর্ব্বাঞ্চলে এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে।

ইহা গেল পূর্ব্বাঞ্চলের কথা। ত্রিহুত প্রদেশের অন্তর্গত দ্বারভাঙ্গার লাহিরিয়া সরাইহইতে নববিধান প্রচারক শ্রদ্ধাস্পদ ভাই দীননাথ মজুমদার মহাশয় বিগত ৯ই ভাদ্র (২৫ আগষ্ট) লিখিয়াছেন ;

"এখানে অভূতপূর্ব্ব মহাবন্যায় প্রদেশ প্লাবিত হইয়া লোকের ঘর বাড়ী ক্ষেত্র ডুবিয়া অনেক বাড়ী ভগ্ন অনেক নিপতিত হইয়া লোকদিগকে লণ্ড ভণ্ড করিয়াছে। আমাদের সহরের মধ্যে ডোঙ্গা নৌকা রাস্তার উপর ও যেখান সেখান দিয়া চলিয়া লোকের গতায়াতের সুবিধা করিয়াছে। গরু মহিষাদি অনাহারে কষ্ট পাইতেছে। দুধ দুর্ল্লভ হইয়াছে, তরকারি দুষ্প্রাপ্য ও মহার্ঘ্য হইয়াছে। চাউল মোটা যাহা /৮ ছিল টাকায় /৬ সের হইয়াছে। গরিব দুঃখী ও মধ্যামাবস্থার গৃহস্থদের অচল হইয়া উঠিয়াছে। রেলের রাস্তার এখান হইতে সমস্তিপুরের মধ্যে তিনটা পুল ভাঙ্গিয়া রেল বন্ধ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফের কাজ বন্ধ ও রেলের টেলিগ্রাফ দুই দিন বন্ধ থাকিয়া সীতামড়হী হইয়া সংবাদ চালাইতেছে। ডাক দুই দিন বন্ধ ছিল। ইংরাজ সুপরিণ্টেডেণ্ট নিজে হারাঘাট পর্য্যন্ত অতিকষ্টে হাটিয়া গিয়া সেখান হইতে নৌকা লইয়া কতক বা চলিয়া কোন মতে ডাক চালাইতেছেন। অদ্ভুত ব্যাপার। দুই দিন হইল একদিন বিলম্বে ডাক পাইতেছি। ইত্যাদি।

সম্প্রতি উড়িষ্যা প্রদেশের প্রধান নগর কটক হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, সে দেশে জলাভাবে কৃষিকর্ম্ম বন্ধ। বৃষ্টি হইতেছে না। চারিদিকে হাহাকার। চাউলের দর /৫ বা /৬ সের। কোন দেশ জলে ডুবিয়া গিয়াছে, কোন দেশ একেবারে জল। ঠাকুর কি খেলাই খেলিতেছেন, তিনি যেন দুই দিক্ সামলাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না!

সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, এক্ষণ জলের বৃদ্ধি নয়, বরং কিছু হ্রাস। চাউলের মূল্যের বিশেষ হ্রাস হয় নাই।

গবর্ণমেণ্টের দ্বারা বর্ম্মা হইতে পূর্ব্ব বঙ্গে চাউলের আমদানি হইতেছে।

ইতিমধ্যে আমরা পূর্ব্ববঙ্গে গিয়াছিলাম, ঢাকা জিলার অন্তর্গত পাঁচদোনা পর্য্যন্ত যাওয়া হইয়াছিল। আমরা জলপ্লাবনের ভয়ানক দৃশ্য দেখিয়া আসিয়াছি। নদীতীরস্থ বহুলোকের ঘরবাড়ী জলমগ্ন। নদীকূল জলপ্লাবিত হইয়া মাঠের সঙ্গে একাকার হইয়াছে, লোকের ঘরবাড়ী ও পল্লী সকল যেন সাগরবক্ষে ভাসিতেছে। লোকজনের ক্লেশের একশেষ হইয়াছে, অনেক গৃহস্থ গৃহে মাচা নির্ম্মাণ করিয়া তদুপরি সপরিবারে বাস করিতেছে। গবাদি গৃহপালিত পশু সকল ঘাস না পাইয়া মারা যাইতেছে। লোকের অন্ন কষ্টের সীমা নাই। এরূপ জলপ্লাবন ও দুর্ভিক্ষ কেহ কখনও দেখে নাই ও শুনে নাই। অনেক স্থানে এক মণ চাউল ১০। ১২ টাকায় পাওয়া যায় নাই এরূপ হইয়াছে, হাট বাজার বন্দরে চাউলের দোকান লুট হইতেছে। এক্ষণ সে দেশে প্রচুর পরিমাণে রেঙ্গুণের চাউলের আমদানি হইতেছে লোকের জীবনরক্ষার উপায় হইয়াছে। রেঙ্গুনের চাউল ৬। ৭ টাকা দরে পাওয়া যায়। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, ঢাকা ময়মনসিংহ অঞ্চলে এবার পাঠ প্রচুর জন্মিয়াছে, এবং তাহা ত্রিগুণ চতুর্গুণ মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে যে, সকল কৃষক পাটের চাষ করিয়াছে তাহাদের বিশেষ অন্নকষ্ট নাই। তাহারা পাট বিক্রয় করিয়া অগ্নিমূল্যে চাউল ক্রয় করে, এবং জমীদারকে খাজনা দিয়া থাকে। বরিশালের জিলায় পাট জন্মে না, তজ্জন্য সাধারণ কৃষকদিগের অধিক কষ্ট হইয়াছে। জলপ্লাবনে আশুধান্য এক প্রকার সমূলে বিনষ্ট, এক্ষণ জল কমিয়া আসিতেছে, আমন ধান কিঞ্চিৎ পরিমাণে রক্ষা পাইতে পারে। পাঁচদোনা গ্রামে শ্রীমান্ প্রতাপচন্দ্র সেন, এবং শ্রীমান্ পূর্ণচন্দ্র সেনের উদ্যোগে পাঁচদোনা ইয়ুনিয়ন স্থাপিত হইয়া দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডার খোলা হইয়াছে। তাঁহারা চাউল বিতরণ করিয়া উক্ত পল্লী ও চতুর্দ্দিকের গ্রামবাসী দুঃখী দরিদ্রদিগের জীবন রক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা প্রত্যহ প্রায় পাঁচ শত লোককে চাউল বিতরণ করিয়া থাকেন। তাহাতে বহু উপায়হীন দুঃখিনী বিধবা ও বৃদ্ধ আতুর এবং বালক বালিকার জীবন রক্ষা পাইতেছে। আনন্দের বিষয় এই যে, সেই অঞ্চলের ক্ষমতাবান্ দয়ার্দ্র লোকেরা এই অন্নদান কার্য্যে মুক্তহস্তে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, প্রতাপচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র বিদেশ হইতে ও ব্রাহ্মসমাজকমিটী এবং নববিধান সমাজ হইতেও যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছেন। জিলার মাজিষ্ট্রেট স্বয়ং পাঁচদোনায় গিয়া ছিলেন, তিনি তথাকার দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারের কার্য্য দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন, এবং যথোচিত অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, এবং সর্ব্বদা সংবাদ লইতেছেন। পাঁচদোনা ইয়ুনিয়নের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুকূল ব্যবহার ও সদয় দৃষ্টি দেখা যাইতেছে। আরও মাসাবধিকাল সাহায্য দানের প্রয়োজন হইবে।

মোসলমান কন্যার পুস্তক সমালোচনা।

(নূতন পুস্তক ধর্ম্মসাধননীতি।)

অদ্য আমার সমালোচনা পাঠাইলাম। আপনার লেখার সমালোচনা আমি কি করিব? "সমালোচনা" বলিতে যেন একটা মুরুব্বিয়ানা ভাব থাকে; যেন সমালোচক নিজে একজন মান্য গণ্য লোক। তাই আমি আপনাকেই সম্বোধন করিয়া নিজ মন্তব্য ব্যক্ত করিলাম। আশা করি, ইহা মহিলায় প্রকাশিত করিবেন।

"ধর্ম্মসাধননীতিতে" নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আছে,—"ধর্ম্ম-সাধনা," "অন্তরানুরাগ," "অনুতাপ," "চিত্তসংযমের উপায়," "বাহ্যিক উপাসনা," "আন্তরিক উপাসনা," "জীবন্ত উপাসনা," "নামসাধন," "ধর্ম্ম-সঙ্গীত," "যোগ ও প্রেমাবেশ," "রোজা (সংযমব্রত)," "নির্ভরস্থাপন," "সাংসারিক সুখের অসারতা," "কৃতজ্ঞতাতত্ত্ব," "কামনা ও ক্রিয়া," "সাধুচরিত্র" এবং "পরিশিষ্ট—অনুতাপতত্ত্ব"। ইহার প্রত্যেকটি বিষয় কিরূপ মূল্যবান্, তাহা সূচীপত্র দেখিলেই বুঝা যায়। আমরা এই উপাদেয় পুস্তক খানি পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি।

পুস্তকের ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে, "সেই মহাগ্রন্থে (অর্থাৎ কিমিয়ায় সাদতে) রাশি রাশি সমুজ্জ্বল সত্যরত্ন শোভা পাইতেছে।" আমি বলি, আমাদের ধর্ম্মসংক্রান্ত সত্য সমূহ "রত্ন"ই বটে—তাই তাহা অতি যত্নে আরব্য ও পারস্য ভাষারূপ লৌহ-সিন্ধুকে আবদ্ধ; আর সমাজের কাটমোল্লাগণ উন্মুক্ত করবালহস্তে ঐ সিন্দুক রক্ষা করিতেছেন!—যেন একটি রত্নও ভাষান্তরিত হইতে না পারে! যেন আরব্য ও পারস্য ভাষানভিজ্ঞলোকে সেই জ্ঞানরত্ন লাভ করিতে না পারে।

যখন কোন উদারচেতা মোসলেম ভ্রাতা ঐ গ্রন্থের কোন এক অংশ উর্দ্দু বা বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ করিয়া সাধারণের সমক্ষে ধরেন, তখন আমাদের মনে হয়, যেন সেই রত্ন ভাণ্ডারের একটি গবাক্ষ খুলিয়া গিয়াছে, দর্শকেরা বাহির হইতে তৃষিত নয়নে তাহার শোভা কিছু কিছু দেখিতে পাইতেছে।

কিন্তু আপনি একি করিয়াছেন! রত্ন-ভাণ্ডারের অনেকগুলি বাতায়ন মুক্ত করিয়াছেন!—মোল্লাদের অতি যত্নে রক্ষিত লৌহসিন্ধুকও খুলিয়া ফেলিয়াছেন! সহজ সরল বঙ্গ ভাষারূপ ডালায় রত্ন বিতরণ করিতেছেন!! "যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে," এই নীতিবাক্যের মর্ম্ম আপনি বুঝিয়াছেন। আপনি বেশ জানেন, বঙ্গের দীনতম ব্যক্তিকেও থালাভরা মাণিক দান করিলেও মহামূল্য "কিমিয়ায় সাদতের" ভাণ্ডার শূন্য হইবে না! তাই অন্নছত্র খুলিয়াছেন, দেখি!

"মহাপুরুষ মোহম্মদ এবং তৎপ্রবর্ত্তিত এসলামধর্ম্ম" গ্রন্থে "আত্মমন্তব্যে" লিখিত হইয়াছে, "একজন (মোসলমান) বন্ধু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, "আমাদের পবিত্র ধর্ম্ম গ্রন্থের অনুবাদ একজন কাফের করিয়াছে, তাহাকে পাইলে তাহার শিরশ্ছেদন করিব।"

তাইত আপনার হাতে লৌহসিন্ধুকের চাবি আছে দেখিয়া যে, মোল্লাগণ ক্রুদ্ধ হইবেন, ইহা বিচিত্র নয়। আপনার কথা দূরে থাকুক, একজন মোসলমানও (বিখ্যাত "বানাতন্ নাশ" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা) উর্দ্দু ভাষায় কোরাণ শরীফের অনুবাদ করায় মোল্লাদের কোপে পতিত হইয়াছিলেন।

"মোসলমান জাতীয় ব্রাহ্মবন্ধু" কথাটা ভালমতে বুঝিতে পারিলাম না। জাতিতে মোসলমান, অথচ ধর্ম্ম বিশ্বাসে "ব্রাহ্ম" এরূপ লোকও আছে না কি ?

"ধর্ম্মসাধন নীতি"র "জীবন্ত উপাসনা" পাঠকালে আমাদের মনে পড়ে হজরত আলীর কথা। তাঁহার ন্যায় একাগ্রচিত্তে উপাসনা আর কে করিতে পারে ? অহোদের যুদ্ধের সময় তাঁহার পায় শরবিদ্ধ হইয়াছিল। সেই শরটা বাহির করিতে চেষ্টা করিলে তাঁহার অত্যন্ত যন্ত্রণাবোধ হইত, এমন কি তিনি কাহাকেও সেই আহত পদ স্পর্শ করিতে দিতেন না। তাঁহার বন্ধুরা পরামর্শ করিয়া এই স্থির করিলেন যে আলী মোর্ত্তজা যখন উপাসনা করিবেন, সেই সময় শরমোচন করা হইবে। * কার্য্যতঃ তাহাই করা হইয়াছিল। হজরত আলী উপাসনায় এমনই গভীর মগ্ন ছিলেন যে, শরমোচনের বিষয় জানিতেই পান নাই। ধন্য সেই উপাসনা। আর ধন্য সেই ভক্ত উপাসক।

গ্রন্থখানি এমন সর্ব্বাঙ্গীণ সুন্দর যে ইহার কোন্ অংশের উল্লেখ করিব, কোন্ অংশ ছাড়িব—ঠিক করা দুঃসাধ্য। আমরা আপনার বিষয়ে ততোধিক চমৎকৃত হই অর্থাৎ আপনি মোসলমান ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয়গুলি যে ভাষায় লিখেন, তাহা ভক্তের ভাষা—কূট সমালোচনার ভাষা নহে। সহজেই বুঝা যায় যে, আপনি পাদ্রীদের ন্যায় আমাদের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিধি বিধানের ছিদ্রান্বেষণে বদ্ধপরিকর নহেন। এজন্য আমরা আপনার নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। সে দিন আমার জনৈকা বন্ধুকে আমি এই গ্রন্থসম্বন্ধে লিখিয়াছি—"মাননীয় বাবু গিরিশচন্দ্র সেন মহাদয়ের অনুবাদিত অনেকগুলি পুস্তক আমার নিকট আছে। তাঁহার প্রেরিত "ধর্ম্মসাধননীতি" পাঠকালে আমার মনে হয়, তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক, না ইসলামধর্ম্ম প্রচারক ?"

"ধর্ম্মসঙ্গীত" সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না। "যে সকল সঙ্গীতে লোকের চরিত্র কলুষিত হইতে পারে, তাহা গান বা শ্রবণ করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। কিন্তু সাধকদিগের সাধনার প্রধান অনুকূল বলিয়া ধর্ম্মসঙ্গীত মোহম্মদীয় শাস্ত্রে সাধনার জন্য সমাদৃত হইয়াছে।" এই কথা লিখিয়া আপনি আমাদিগকে "সঙ্গীত বিরোধী" দুর্নাম হইতে রক্ষা করিয়াছেন। সাধারণের বিশ্বাস যে "মোসলমান ধর্ম্মটা বড় 'কট খটে'—কারণ সঙ্গীত হেন মধুর বস্তুটি উহাতে নিষিদ্ধ।" এখন আর বোধ হয় কেহ আমাদিগকে সঙ্গীতবিরোধী মনে করিবেন না।

মোসলমান-শাস্ত্র সঙ্গীতকে সুনীতির

* সেকালে কেহ ক্লোরফরম দ্বারা অজ্ঞান করিতে জানিতেন না।

শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া উহাকে অশ্লীলতা দোষ হইতে রক্ষা করিয়াছে।

সঙ্গীতশ্রবণে লোকের মন কি বিচলিত (disturbed) হয়? না, বরং উহাতে এমন একটী মোহিনী শক্তি আছে যে, শ্রোতা একাগ্রচিত্ত হইয়া পড়ে। প্রায় সকল দেশেই শিশুকে ঘুম পাড়াইবার জন্য শিশুরঞ্জক সুমধুর ছড়া গীত হইয়া থাকে। ইউরোপে রোগীর নিদ্রাকর্ষণের নিমিত্ত সেবিকাগণ গান করিয়া থাকেন। দুই জন মান্য গণ্য মোসলমান স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহারা সঙ্গীতশ্রবণকালে অত্যন্ত নিবিষ্ট মনে উপাসনা করিতে পারিয়াছিলেন। ইঁহাদের এক জন অশীতিপর বৃদ্ধ ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, একদা তিনি প্রাতঃকালীন নমাজের সময় গায়কদের ভৈরবী আলাপ শুনিতে শুনিতে যেমন একাগ্রমনে নমাজ পড়িতে পারিয়াছিলেন, সেরূপ আত্মহারা নমাজ জীবনে আর কখনও পড়েন নাই! তবে ঢাকের চড়চড়ি বা আনাড়ী গায়কের গর্দ্দভগর্জ্জনের কথা ভিন্ন! তাহাতে ত জল স্থল কম্পিত হয়—আর মানুষের মন চঞ্চল না হইবে কেন?

"কৃতজ্ঞতাতত্ত্বে" শিখিবার বিষয় অনেক আছে। যাহারা আপন অবস্থায় সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট থাকে, তাহাদের পক্ষে এ অধ্যায়টি ঔষধস্বরূপ।

"ধর্ম্মসাধননীতি" হিন্দু মোসলমান সকলেরই পাঠ্য হইয়াছে। যিনি একবার ইহা পাঠ করিবেন, তিনি মোহিত হইবেন।

মতীচুর রচয়িত্রী।

প্রাপ্ত।

স্ত্রী-স্বাধীনতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বর্ত্তমানে সময় ও ভূমির অনুপযোগিতা বুঝিয়া স্ত্রী-স্বাধীনতার বিষময়ত্ব সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিলাম এবং যুবক যুবতী দিগের মঙ্গলার্থে এ সম্বন্ধে যে সকল অভিযোগ উপস্থিত করিলাম, যদি ইহাতে সহৃদয় পাঠক পাঠিকাদিগের কোন অংশে বিরাগ উপস্থিত করে, আমি হিতাকাঙ্ক্ষী সেবকের ন্যায় তাঁহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। এখন জিজ্ঞাস্য মানুষ কি স্বাধীনতা চাহিবে না? স্বাভাবিক স্বাধীনতা ধর্ম্ম হইতে কি মানব-পরিবার বঞ্চিত থাকিবে? আমি অযথা স্বাধীনতার বিরোধী। স্বাধীনতার রূপান্তর বাস্তবিকই মানবপরিবারকে রূপান্তরিত ও পরিবর্ত্তিত করিয়া থাকে। পাঠক ও পাঠিকাগণ! আমি যখন স্বাধীনতার কথা ভাবি তখন মাঠের একটা তৃণ ও আকাশের একটা চড়াই পক্ষীকেও স্বাধীনতার জন্য ব্যস্ত হইতে দেখি। তোমরা যদি নিজকে ভুলে গিয়ে ধনমানের দাসত্ব অস্বীকার করে মাঠের নবীন তৃণের ন্যায় ধর্ম্মজীবনে উন্নত হইতে পার, যদি কল্যকার চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া মুক্ত পক্ষ চড়াইয়ের ন্যায় চিন্ময় আকাশে বিচরণ করিতে পার, যদি জর্জ্জ মুলারের ন্যায় ভগবানে ষোল আনা বিশ্বাস ও ষোল আনা নির্ভর করিয়া তাঁহাতে বাস করিতে পার, তাহা হইলে স্বাধীনতার যথার্থ গৌরব রক্ষিত হইবে।

স্বাধীনতার অর্থ অযথা মিশ্রণ ও অযথা বিচরণ নহে। স্বাধীনতার অর্থ গুরু ও জ্যেষ্ঠদিগকে ভক্তি শ্রদ্ধা না দিয়া সমান অধিকার স্থাপন জন্য ব্যস্ততা নহে, স্বাধীনতার অর্থ পিতামাতা প্রভৃতি পূজনীয়দিগের নিকট বাধ্যতার প্রত্যাখ্যান নহে, স্বাধীনতার অর্থ বিনয়ের অভাব নহে। মুক্তপক্ষ পক্ষীর ন্যায় ব্রহ্মে বিচরণ করাই প্রকৃত স্বাধীনতা। পৃথিবীতে অনেক স্বাধীনতা হইয়া গিয়া এ নবীন পরিবারে নবীন স্বাধীনতার সময় আসিয়াছে। শ্রদ্ধেয় ভাইগণ, ভগ্নীগণ! ব্রহ্মে বিচরণ কর, তোমাদের স্বাধীনতা অনিবার্য্য। এ স্বাধীনতা তোমাদিগকে চিরদিন রক্ষা করিবে।

বাঁকিপুর, ২৫।৭।১৯০ } শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

মহিলাদিগের রচনা।

প্রভু গো!

প্রভুগো! তোমারি মহা অমৃত সদনে,
বিশ্ব সভামূলে;
বসি যথা নিরন্তর বিতর কল্যাণ
বিশ্ব-সভা-জনে।
সে মহা অমৃত ধামে,—তব শ্রীচরণে
এসেছে অধম,
তোমারি শ্রীকরে আজি সে মহা কল্যাণ
কর বিতরণ।
সে মহা কল্যাণ হতে (তব) গৌরব পূরিত
প্রেম, পুণ্য, জ্ঞান,
ঝরি নিত্য নবভাবে করুক্ সুসিক্ত
এ অধম প্রাণ।
অধম জীবনে,—প্রভু! করগো সঞ্চার
(তব) শুভময়ী শক্তি:
অধম জীবনে,—প্রভু! কর গো সঞ্চারিত
(তব) মহিমা মহতী।
"সশরীরে স্বর্গধাম" অধম জীবনে
দেখিবে অধম;
দেখুক্ জগতজন মম ভাই ভগ্নী
প্রাণ—প্রিয়তম।
শ্রীমতী রে—

সান্ত্বনা।

না থাকিত যদি তব প্রেমসুধা
জীবের জীবনে তবে,
শত আর্ত্তনাদ আকুল প্রাণের
কেমনে ঘুচিত ভবে।
না থাকিত যদি! তব প্রেমবারি
তাপিত হৃদয়ে সখা,
দুর্নিবার হায়, রোগ শোক আর
যাইত কি প্রাণ রাখা।
না থাকিত যদি তোমারি মধুর
শীতল সান্ত্বনা ছায়,
বিষাদ বেদনা, মরম যাতনা
কেমনে ভুলিত হায়।
কত হাহাকার, দুঃখ অশ্রুজল
নিয়ত ধরণীতলে
(তুমি) প্রশান্ত,আননে প্রসারিয়ে কর
মুছাইছ আঁখি জল।
তোমারি করুণা অজস্রধারায়
বরষে অবনী পরে
তোমারি করুণা অজস্রধারায়
জীবের জীবনে ঝরে।

নহ দৃষ্টিহীন তুমি হে মহান্
দুঃখী তাপী পাপী তরে
সমভাবে লভে সবে প্রেম তব,
তোমারি আঁখির পরে।
তোমারি সান্ত্বনা মধুর মধুর
তব প্রেমে ভরে বুক
মোহিত হৃদয় নিরখি ও মুখ
দূরে যায় দুঃখ শোক।
পাঁচদোনা।—শ্রীমতী গ—

সংবাদ।

মহামান্য বড়লাট সাহেবের পত্নী লেডি মিণ্টো আগামী জানুয়ারি মাসে গড়ের মাঠে একটি সখের মেলা বসাইবেন এরূপ সঙ্কল্প করিয়াছেন। দশ দিন ব্যাপিয়া সেই মেলার কার্য্য চলিবে, মেলাতে নানাবিধ দ্রব্যজাত বিক্রয় হইবে, এবং আমোদ প্রমোদ হইবে। তাহাতে প্রচুর অর্থাগমের সম্ভাবনা। দয়াবতী বড়লাট পত্নী সেই অর্থে এ দেশের দুঃখী দরিদ্রদিগের অভাব মোচন করিবেন। ইহা অতিশয় আনন্দের সংবাদ।

বঙ্গদেশে যে জাতির মধ্যে যতগুলি স্ত্রীলোকের লেখাপড়া শিক্ষা ও অক্ষর জ্ঞান হইয়াছে, গত লোকসঙ্খ্যায় তাহার এক তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে, সহস্র মধ্যে;—প্রথম শ্রেণী ইউরেশিয়ান ৭৮৪, বৈদ্য ২৫৯, চীন ২২৬, সাঁওতাল (খ্রী) ১৫১, মোগল ২২৯। দ্বিতীয় শ্রেণী;—বৈশ্য ৯০, সুবর্ণবণিক্ ৮১, ক্ষত্রিয় ৭৩, কায়স্থ ৭৬, লেপ্‌চা (খ্রী) ৬৪, গন্ধবণিক্ ৬৩, আগওয়ান ৬১, ময়রা ৫৭, গাড়ো (খ্রী) ৫৪, পাঠান ৫১, হালুই ৫০, কাঁশারী ৪৯। তৃতীয় শ্রেণী;—মাহেশ্রী ৪০, আস্তরি ৩৪, আগরওয়ালা ৩০, উরাঁও (খ্রী) ৩০, ব্রাহ্মণ ২৬, সৈয়দ ২৪, করণ ২৩। দুঃখের বিষয় ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার নিতান্ত হীনাবস্থা।

ভারত সাম্রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জ্জন মহোদয়ের পত্নী লেডী কর্জ্জন পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি গত বৎসর গুরুতর রোগে আক্রান্ত হইয়া বহুদিনের বহু যত্ন ও চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন, এবার পুনর্ব্বার হঠাৎ রোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন। কোন চিকিৎসা সফল হয় নাই। তাঁহাকে ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে।

সম্প্রতি কলিকাতা কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে শ্রীমতী সরলা ঘোষালের উদ্যানে একটি শিল্প দ্রব্যাদির ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। দুই দিন পুরুষদিগের জন্য, দুইদিন মহিলাদের জন্য মেলার দ্বার খোলা ছিল। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, মেলার উপস্বত্ব পূর্ব্ববঙ্গ দুর্ভিক্ষ নিবারণ সাহায্যার্থ প্রদত্ত হইবে।

৬৪। ২নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে ভিক্টোরিয়া মহিলাবিদ্যালয়ের গৃহে একটী নীতিবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। প্রতি শনিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় এই বিদ্যালয়ের অধিবেশন হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা অনেকগুলি বালিকা নীতিশিক্ষা লাভ করিয়া থাকে।

ভিক্টোরিয়ামহিলাবিদ্যালয়।

ফাহিয়েন ও হুয়েনসান।

চীন পরিব্রাজকের ভারতবর্ষ ভ্রমণ।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

প্রসেনজিত রাজার মন্ত্রী অনাথপিণ্ডক উহঁাকে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। সে বুদ্ধকে ঐ স্থান ক্রয় করিয়া দিতে চাহিল, সে জমিটা এক জমিদারের ছিল, সে বলিল যদি এই জমিটা সোণা রূপা দিয়ে সমান ভরে দিতে পার তবে দেব। অনাথপিণ্ডক তাই করলেন, সর্ব্বস্ব দিয়ে সেই স্থান সোণা দিয়ে ভরিলেন তবুও খানিকটা স্থান ভরিল না তখন জমিদার বলিল, আর দিতে হইবে না, আমি এখানে একটা বিহার করে দি। বুদ্ধ—তোমরা দুজনে এই সুন্দর স্থান দান করে ধন্য হলে। এই ঘটনা স্মরণ করিবার জন্য সেখানে একটী স্তুপ আছে। আর একটী স্তুপ আছে; একবার একটী ভিক্ষুর ব্যামো হয়ে কষ্ট পাচ্ছে, বুদ্ধ তার কাছে গেলেন। তখন সেই ভিক্ষু বলিল, আমি কাহারও অসুখ হইলে কখনও সেবা করি নাই তাই এখন আমাকে কেহ সেবা করে না। তখন বুদ্ধ নিজে তার গা পরিষ্কার করে ধুয়ে দিলেন, তার অনেক সেবা করিলেন, তখন সে নূতন দেহ পাইল। তখন বুদ্ধ বলিলেন, এখন থেকে তুমি সকলের সেবা করিবে। এই ঘটনাটীর জন্য ঐ স্তুপ হয়। তারপর এখানে পাঁচটা নালা আছে কথিত আছে যে এখান দিয়ে পাঁচজন লোক স্বশরীরে নরকে যায়, একজন স্ত্রীলোকের নিন্দা করেছিল বলে, আর একজন দেবদত্ত (ওঁর কাকার ছেলে) বুদ্ধের ধর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছিল কিন্তু শেষকালে উহঁাকে মারিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিল। বিরোধক, প্রসেনজিতের ছেলে শাক্য জাতি ধ্বংস করেন। ৫০০ শাক্য স্ত্রীলোককে কেটে ফেলেন, ইহারা স্তুপ দেখে সব ঘটনা জানিতে পারেন। কপিলাবস্তু ইহার সমস্ত স্থানই মহা পবিত্র। এবং অনেক স্তুপ আছে। যেখানে জন্ম হয় যেখানে বাড়ী ছেড়ে চলে যান, তারপর যখন ছেলে মানুষ ছিলেন একদিন একটী গাছ তলায় বসে চিন্তা করিতে ডুবে যান শুদ্ধোধন গিয়া দেখেন, সমাধিস্থ হয়ে আছেন এবং ছায়া সেই স্থানে স্থির ভাবে রহিয়াছে। এই সমস্ত স্থানে এক একটী করে স্তুপ আছে। বুদ্ধের জন্মের পর অসিত ঋষি তাঁহাকে দেখতে আসেন, অসিত ঋষি হিমালয় পাহাড়ে বসে ধ্যান করছিলেন, হঠাৎ দেখেন যে দেবতারা আহ্লাদ করছেন, তখন জিজ্ঞাসায় জানিলেন কপিলাবস্তু নগরে বুদ্ধের জন্ম হইয়াছে সেই জন্য। তিনি তখন তাড়াতাড়ী বুদ্ধকে দেখিতে আসিলেন, দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, রাজা বলিলেন আপনি কাঁদিতেছেন কেন তখন ঋষি বলিলেন, ইনি অনেক জ্ঞান আনি· বেন কিন্তু আমি ততদিন বাঁচিব না আমি দেখিতে পাইব না এই জন্য কাঁদছি। এখানে একটী স্তুপ। একদিন বুদ্ধ যখন ছোট ছিলেন, তাঁর ধাত্রী কোলে করে এক দেবমন্দিরে লইয়া গিয়াছিল, তখন সেই পাষাণ মূর্ত্তি দাঁড়িয়ে উঠে বুদ্ধকে প্রণাম করে বুদ্ধ বলাতে আবার যায়। এখানেও একটী স্তুপ। এখানে রামগ্রাম ছিল এখানে ছন্দকের সারথীর কাছে বিদায় গ্রহণ করেন বহুমূল্য পরিচ্ছদ দান করেন। এই খানে একটী স্তুপ। তারপর আর একটু দূরে যেখানে এক ব্যাধের নিকট হইতে তার চর্ম্ম পরিধান করেন। এইরূপ লিখিত আছে যে একজন দেবতা, ব্যাধের বেশ ধরে তখনি এসে বুদ্ধের কাছে দাঁড়ালেন ও সেই মৃগচর্ম্ম দান করেন। তারপর যেখানে মস্তক

মুণ্ডন করেন, সেখানে একটী স্তূপ। ইন্দ্র তখন নাপিত হয়ে এসে মস্তক মুণ্ডন করেন, ইহা দ্বারা দেখাইতে চান যে দেবতারা পর্য্যন্ত বুদ্ধের সেবা করিতে প্রস্তুত। তারপর কুশীনগর যেখানে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন, চণ্ডালের বাড়ী খেয়ে অসুখ করে তাতে মারা যান। এই স্থান অতি পবিত্র। এখানে বুদ্ধের একটী প্রতিমূর্ত্তি আছে। বুদ্ধের পূর্ব্ব জন্মের অনেক চমৎকার চমৎকার গল্প আছে। পূর্ব্ব জন্মে একবার পাখী ছিলেন, এই কুশীনগরের বনে থাকিতেন, সেখানে একদিন আগুন লাগে, সমস্ত জন্তু ভয়ানক ব্যস্ত হয় তখন সেই পাখী জলাশয় হইতে পাখা করিয়া জল আনিয়া ছড়াইয়া দিতেছিল। ইন্দ্র তাহা দেখিয়া বলিলেন, পাখী তুমি একি করছ তুমি অতি নির্ব্বোধ তখন সেই পাখী বলিল, আমি যাহা করিতে পারি তাই করিব। তুমিত ইন্দ্র তুমিও ইচ্ছা করিলে আগুন নিবাইতে পার। পাখী এই বলিয়া আবার জল আনিয়া দিল, ইহা দেখিয়া ইন্দ্রের মনে লজ্জা হইল, যে ছোট পাখীটা এত করছে, আমি করতে পারি না, এবং আগুন নিবাইয়া দিলেন। আর একবার বুদ্ধ হরিণ ছিলেন সেই বনে আগুন লাগে, সমস্ত জন্তুরা পালাতে চেষ্টা করে, সেই হরিণ তখন নিকটে একটী ক্ষুদ্র নদী ছিল তার উপর দাঁড়াইল, ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তুরা তার উপর দিয়া পার হইয়া গেল। শেষকালে একটা খরগোস পার হল, তারপর হরিণটা মারা গেল। বুদ্ধ যখন নির্ব্বাণের অবস্থায় এমন সময় সুভদ্র ব্রাহ্মণ তাঁর সঙ্গে কথা বলিতে আসেন, মনে সন্দেহ হয় তবে মীমাংসা করিতে যান, আনন্দ বলিলেন এখন বুদ্ধের সঙ্গে তোমার দেখা হইবে না, তিনি এখন শেষ অবস্থায়, বুদ্ধ শুনিয়া বলিলেন না তাহাকে আমার নিকট আসিতে দাও। এবং সুভদ্রকে শেষ উপদেশ দান করেন তারপর মৃত্যু হয়। সেই খরগোস সুভদ্র হইয়াছেন। মৃত্যুর পর ৭দিন দেরী করা হয়, দেবতারা বলিলেন, তোমরাত শোক করিয়াছ এইবার আমাদের শোক করিতে দাও। তারপর দাহ করিবার সময় আগুণ জ্বলে না তখন সকলে বলিল বোধ হয় কাশ্যপ আসে নাই বলে জ্বলছে না। কাশ্যপ আসিলে পরে দেখেন, তাঁকে অনেক কাপড় দিয়া জড়ান হইয়াছে কিন্তু পা বাহির হইয়া পড়িয়াছে এবং একটা দাগ পড়িয়াছে। বুঝিলেন যে সকলের চোখের জল পড়িয়া ঐরূপ দাগ হইয়াছে। আরও লেখা আছে যে স্বর্গ হইতে মায়াদেবী নামিয়া আসেন তখন বুদ্ধ উঠিয়া তাঁকে সম্বোধন করে কয়েকটী কথা বলেন। এইরূপ অসংখ্য স্তূপ দ্বারা এই উচ্চ জীবনের ইতিহাস লেখা হইয়াছে। বই অনেক জনে পড়ে, কিন্তু এই যে স্তূপ নির্ম্মাণ করা হয়েছে, তাহাতে সহজে সকলে সব জানিতে পারিতেছে। ইতিহাস এই রকম করেও লেখা যায়। চীনদেশের লোকেরা এই সব স্মরণ চিহ্ন দেখে, সব ঘটনা জানিতে পারেন, এবং তাহা লিপিবদ্ধ করেন। ফাহিয়েন যখন আসেন তখন বৌদ্ধ ধর্ম্ম জীবন্ত, হুয়েনসান ২০০ বছর পরে আসিয়া ইহার অবসন্ন অবস্থা দেখেন, স্তূপ সকল ভগ্নাবস্থায় দেখেন। শ্রাবস্তি তখন জঙ্গলের মত। কিন্তু নালন্দার বিহার দেখে আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। ১০০ বছর পরে আর এসব জিনিষ দেখা যায় না। শশাঙ্ক ও মিহিরকুল এই দুজন রাজা সব নষ্ট করেন। কিন্তু পরিষ্কার রূপে কিছুই লেখা নাই যে কেমন করে এত সব স্তূপ ভেঙ্গে চুরে কোথায় গেল, এত সব সঙ্ঘারাম, কেমন করে বিলুপ্ত হল তাহা বোঝা যায় না। এখন কেবল অশোকের স্তম্ভ আছে। ফাহিয়েন ও হুয়েনসান এই অন্ধকারের মধ্যে আলোকের মত দেখা দিয়াছেন। ইহার পরে আর কোন ইতিহাস জানা যায় না।

মূল্যপ্রাপ্তি।

৯ম বৎসর।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী,	গুজাদিয়া	

১০ম বৎসর।

শ্রীমতী কুমুদিনী সেন,	কলিকাতা	২৲
শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী,	গুজাদিয়া	২৲
„ বরদাকান্ত হালদার,	বিজনী	২৲

১১শ বৎসর।

শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী,	টাঙ্গাইল	২৲
„ মনোরমা দেবী,	ঢাকা	১৲
„ সরোজিনী রায়,	কলিকাতা	২৲
„ ক্ষীরোদাসুন্দরী সেন,	ঢাকা	২৲
„ বিধুমুখী সেন,	ঢাকা	২৲
„ ইন্দিরাকুমারী রায়,	চট্টগ্রাম	২৲
„ হেমন্তকুমারী দেবী,	ঘুসুড়ী	২৲
„ সরলাসুন্দরী কাস্তগিরি,	বালীগঞ্জ	
„ কুসুমকুমারী পাল,	ঢাকা	
„ রাণী সাহেব,	তালচের	১৲
„ কমলিনী রায়,	কলিকাতা	২৲
„ নলিনীবালা দেবী,	কুন্দাকুম	১৲
„ অন্নদামণি সরকার,	কলিকাতা	২৲
„ হৈমবতী দেবী,	ভাগলপুর	১৲
„ কুসুমকুমারী রায়,	পিঙ্গনা	২৲
„ সুনীতি ঘোষ,	কলিকাতা	২৲
„ যাদুমণি রায়,	কলিকাতা	২৲
„ বাসন্তী মজুমদার,	সম্বলপুর	২৲
„ উমাশশী রায়,	গাজিপুর	২৲
„ সৌদামিনী দেবী,	নোয়াখালি	২৲
„ সরলাসুন্দরী দত্ত,	কুমিল্লা	
„ সুবোধবালা দেবী,	টাঙ্গু	
„ বি, এন্ দাস	ঢাকা	২৲
শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী,	গুজাদিয়া	২৲
„ বিহারীলাল ঘোষ,	শিবপুর	২৲
„ মধুসূদন রাও,	কটক	২৲
„ কিরণচন্দ্র ঘোষ,	কলিকাতা	
„ দুর্গাদাস বসু,	রাবিল	২৲
„ নলিনবিহারী সরকার,	কলিকাতা	২৲
„ বরদাকান্ত হালদার,	বিজনী	২৲

১২শ বৎসর।

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী,	ঘুসুরী	২৲
„ রাণী সাহেব,	তালচের	১৲
„ নলিনী দেবী,	কোয়ম্বাটুর	২৲
„ সুবোধবালা দেবী,	টাঙ্গু	২৲

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১২শ ভাগ] আশ্বিন, ১৩১৩ ; অক্টোবর ১৯০৬। [৩য় সংখ্যা।

স্ত্রীনীতিসার।

মাতা নিজে সুনীতিপরায়ণা হইয়া শিশু বালক বালিকাদিগকে শিক্ষা দান করিলে তাহাদের প্রকৃত শিক্ষা হয়, শৈশবের নীতিশিক্ষা সুকোমলমতি বালক বালিকাদিগের চরিত্রে প্রস্তররেখাবৎ স্থায়িত্ব লাভ করে। মা তাহাদের পান ভোজনের সময়, ক্রীড়ামোদের সময় অনেক শিক্ষা দান করিতে পারেন। তিনি শিশুকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া স্তন্য দান করিতেছেন, বা দুগ্ধপান করাইতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার প্রসন্নবদন সহাস্যভাব দেখিলে শিশুর মন প্রসন্ন থাকে, তখন সে মার মুখের দিকে তাকাইয়া হাস্য করে। আর মা ক্রুদ্ধ নয়নে তাহার দিকে তাকাইলে, শক্ত কথা কহিলে সে বিষণ্ণভাব ধারণ করিয়া থাকে, খিটমিটে রাগী হইয়া উঠে। মাতার দৃষ্টান্ত শিশুর জীবনে অতিশয় বদ্ধমূল হয়। অতএব শিশুর ভাবী জীবনগঠনে জননীর বড় দায়িত্ব।

শিশুর দন্তোদ্ভেদ হইলে সে দুগ্ধপানের পরিবর্ত্তে কঠিন দ্রব্য অন্নভোজন করিতে চাহে, তখন মা অন্নভোজন করাইবার সঙ্গে স্থির প্রশান্তভাবে ভোজনের নীতি তাহাকে শিক্ষা দিবেন। প্রথমতঃ নিজে তাহাকে খাওয়াইয়া দিবেন, সে নিজহস্তে পাত্র হইতে অন্ন তুলিয়া খাইতে সক্ষম হইলে তিনি তাহাকে ডান হাত ব্যবহার করিতে উপদেশ দিবেন, সে যেন বাম হস্তে বা উভয় হস্তে অন্ন তুলিয়া মুখে অর্পণ না করে। অন্নপাত্রে হস্ত প্রসারণ করিবার পূর্ব্বে যেন হস্ত ধৌত ও পরিষ্কৃত করিয়া লয়, চারিদিকে অন্ন ছড়াইয়া তাহার অপচয় এবং শরীরে ও বস্ত্রে ম্রক্ষণ না করে। তাহার ভোজন হইয়া গেলে তাহার হস্তমুখ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

মা শান্তভাবে সহাস্যবদনে শিশুকে ভোজন করাইবেন, এবং সেই সময় তাহাকে প্রসন্ন রাখিবার জন্য নানা প্রকার আমোদজনক গল্প বলিবেন। তাহার নিতান্ত অল্পাহার বা অতিরিক্ত ভোজন যেন না হয় তৎপ্রতি তিনি দৃষ্টি রাখিবেন।

পারিবারিক ব্যবস্থা

অনেক পরিবারে গৃহিণীর সুব্যবস্থার অভাবে নানা বিশৃঙ্খলা, গোলযোগ ও অশান্তি ঘটিয়া থাকে। প্রচুর অর্থাগমেও অস্বচ্ছলতা দূর হয় না, ঋণ হইতে থাকে; অর্থের সমুচিত ব্যবহার হয় না, অপব্যয় হয়। ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। কর্ত্তা মাসান্তে মাহিয়ানার টাকা আনিয়া গৃহিণীর হস্তে অর্পণ করিলেন, গৃহিণী তাহার অধিকাংশ নিজের বোম্বাই শাড়ী ও সিল্কের জ্যাকেট এবং হার ও বালা, বুট মুজা পোমেটম সাবান ইত্যাদিতে ব্যয় করিলেন, শিশু ও রোগীদিগের দুগ্ধ ও বাজার খরচ ইত্যাদিতে অর্থের টানাটানি হইতে লাগিল; ধর্ম্মকর্ম্মোদ্দেশ্যে অর্থব্যয়ের ঘরে একেবারে শূন্য পড়িল। গৃহিণী অগোছাল হওয়াতে, তাঁহার পারিবারিক ব্যবস্থার বিবেচনার ত্রুটিতে সংসারে অনেক কার্য্যের বিশৃঙ্খলা ঘটিল। লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, এরূপ নব্য গৃহিণীদের মধ্যে অবিবেচিকা ও অনিপুণা গৃহিণীর অভাব নাই। সাধারণতঃ প্রাচীন শ্রেণীর গৃহিণীরা অশিক্ষিতা হইলেও তাঁহাদের গৃহিণীপণা আছে, তাঁহারা সকল দিক্ দৃষ্টি করিয়া চলেন, তাঁহাদের আত্মত্যাগ ও বৈরাগ্য আছে, তাঁহারা কিছু অর্থ বাঁচাইয়া ধর্ম্মকর্ম্মে, পরসেবাতে ব্যয় করেন; নিজে না খাইয়া দুঃখী কাঙ্গালকে ও আত্মীয় কুটুম্বদিগকে খাওয়াইয়া সুখী হন। যে স্থানে বালক বালিকাদের দুই একটি জামার প্রয়োজন, তাঁহারা সে স্থলে খলিফা ডাকিয়া আনিয়া মূল্যবান্ বস্ত্রে নানা ফ্যাশনের সাতটা জামা প্রস্তুত করান না। সুগৃহিণীগণ অনর্থ ভোগবিলাসাদিতে অর্থের অপচয় করিতে কুণ্ঠিত হন, যথাসাধ্য দাতব্যে অর্থ দান করিয়া দয়ার পরিচয় দিয়া থাকেন। প্রকৃত গৃহিণী সংসারের সকল কাজ যথা সময়ে সম্পাদন করেন, কোন বিষয়ে উপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকেন না।

যে সকল গৃহিণী মনে করেন, আমার পতি বা পুত্রের যোগ্যতায় অর্থাগম হইয়া থাকে, তাঁহারা যথেচ্ছরূপে অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন না, তাঁহাদের দ্বারা অর্থের সদ্ব্যয় অল্পই হইয়া থাকে। অর্থের সঙ্গে তাঁহাদের পবিত্র সম্বন্ধ রক্ষা হয় না। তাঁহাদের সদ্ব্যয়ে কুণ্ঠিত এবং অপব্যয়ে মুক্ত হস্ত হওয়া আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু যে সকল গৃহিণী বিশ্বাস করেন, ধনসম্পত্তি লক্ষ্মীর দান, গৃহস্থ মঙ্গলময় বিধাতার হস্ত হইতে অর্থ লাভ করিয়া থাকেন, নিজগুণে, নিজযোগ্যতায় নয়; ভগবানের সঙ্গে অর্থের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রহিয়াছে। বিধাতার মঙ্গলাভিপ্রায় বুঝিয়া গৃহিণীকে তাহা ব্যয় করিতে হইবে, এবিষয়ে যথেচ্ছাচরণে পাপ হয়, এবং শাস্তি পাইতে হয়, একটী পয়সা অপব্যয় করিলে লক্ষ্মী অপ্রসন্ন হন, তিনি অর্থের অপব্যয় করিতে অক্ষম। সাধ্বী ভক্তিমতী নারী ঈশ্বরাভিপ্রেত কার্য্যে অর্থ ব্যয় করিয়া পুণ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তাঁহা দ্বারা নিজের কল্যাণ, পরিবারস্থ সকলের কল্যাণ হয়, দুঃখীর দুঃখ দূর হয়, সৎকার্য্যে অর্থ ব্যবহার করিয়া তাঁহার হস্ত পবিত্র, হৃদয় মন পবিত্র ও উন্নত হইয়া থাকে।

স্বেচ্ছাচারিণী গৃহিণী ধনের অপব্যয় করিয়া ধনদাতার অবমাননা করেন, নিজের ও পরিবারস্থ সকলের অকল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন। তাঁহার হস্ত কলঙ্কিত ও হৃদয় কলুষিত হয়।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে এই উপদেশ ;—"ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ, যদ্‌যদ্ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ "

অর্থাৎ গৃহস্থ ব্রহ্মনিষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ হইবেন, তিনি যে যে কর্ম্ম করিবেন তাহা পরব্রহ্মে উৎসর্গ করিবেন।

গৃহী ও গৃহিণী ভগবানে জীবনের সমুদায় কর্ম্ম উৎসর্গ করিয়া নিষ্কাম হইলে, আপনার বলিয়া কিছু না রাখিলে অর্থের অপব্যয় হইতে পারে না। যে স্থলে আমি কর্ত্তা, আমি কর্ত্রী সে স্থলেই ভোগবিলাস, স্বার্থাভিমান যথেচ্ছাচার ও অর্থের অপব্যবহার। আমরা অনেকবার মহিলার পাঠিকাদিগকে অনুরোধ করিয়াছি যে, ধর্ম্ম কর্ম্মে ব্যয় করিবার জন্য তোমাদের টাকা পয়সার অনাটন হইলে প্রতিদিন রাঁধিবার সময় অন্ততঃ এক মুট চাউল একটি পাত্রে তুলিয়া রাখিবে, টাকা ভাঙ্গাইবার সময় একটী ব দুইটী পয়সা রাখিয়া দিবে, পক্ষান্তে বা মাসান্তে তাহা কোন দয়ার কার্য্যে ব্যয় করিবে। যে গৃহে দয়ার কার্য্য দানধর্ম্ম নাই, কেবল লক্ষ্মীর ভাণ্ডার হইতে গ্রহণ ও আত্মসুখের জন্য ব্যয়, সেই গৃহ হইতে লক্ষ্মী অচিরে অন্তর্হিত হন। প্রত্যেক গৃহস্থ ও গৃহিণী নির্লিপ্ত অনাসক্ত হইবেন। বিধাতার এই বিধি।

নববিধানাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন স্বীয় অনুগামীদিগের অবস্থা ও প্রকৃতি বুঝিয়া তাঁহাদিগকে এক এক প্রকার ব্রতসাধনে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। কয়েক জন লোক গৃহস্থ বৈরাগীর ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিষয় কর্ম্ম ছিল, তাঁহারা আফিসে কাজ করিয়া মাসান্তে মাহিয়ানা প্রাপ্ত হইতেন, মাহিয়ানার সমস্ত টাকা উপাসনালয়ে—দেবালয়ে অর্পণ করিতেন। এরূপ অর্থার্পণকে বিধানব্যাঙ্কে অর্থ গচ্ছিত রাখা বলা হইত। তাঁহাদের পারিবারিক মাসিক ব্যয় কোন্ কোন্ বিষয়ে কিরূপ হইবে দরবারের সভ্যগণযোগে আচার্য্য বিধানব্যাঙ্ক হইতে নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন, তন্মধ্যে কিছু ধর্ম্মার্থ ব্যয়ও নির্দ্দিষ্ট থাকিত। বিষয়ী গৃহস্থ উপার্জ্জিত অর্থ স্বেচ্ছাক্রমে ব্যয় করিতে পারিতেন না, এবিষয়ে তাঁহার কোন স্বাধীনতা ছিল না। তিনি অর্থোপার্জ্জন করিয়াও সপরিবারে বৈরাগীর ন্যায় জীবন যাপন করিতেন। ঠিক সেই নিয়মে না হউক সেই ভাবে গৃহিণী গৃহকার্য্যাদিতে অর্থব্যবহারের ব্যবস্থা করিলে, পরিবারের কুশল কল্যাণ হয়, বিলাসিতা ও অপব্যয় খর্ব্ব হইতে পারে। ভরসা করি গৃহিণীগণ পারিবারিক ব্যবস্থাবিষয়ে মনোযোগ বিধান করিবেন।

পারিবারিক ব্যবস্থার অন্তর্গত অর্থব্যয়ের ব্যবস্থা প্রধান, আনুষঙ্গিক পারিবারিক অনেক ব্যবস্থা একা গৃহিণীর হস্তে ন্যস্ত। বালক বালিকাদিগকে শান্ত সুশাসিত রাখা, পরিবারস্থ সকল লোকের মধ্যে শান্তি কুশল স্থাপন করা, আহারাদির সুব্যবস্থা ও রোগীর সেবা শুশ্রূষা, চিকিৎসকের মতানু-

সারে যথা সময় তাহাদিগকে ঔষধ পথ্যাদি দান, আতিথ্যসৎকার, গৃহদ্রব্যাদির সুশৃঙ্খলা, ঘরবাড়ী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ইত্যাদি, সর্ব্বোপরি পারিবারিক পূজার্চ্চনা, শাস্ত্রপাঠাদি পারিবারিক ব্যবস্থার অন্তর্গত। এসকল বিষয়ে গৃহিণীর বিশেষ ভাবে হস্ত রহিয়াছে। সুগৃহিণী যত্নপূর্ব্বক এসকলের সুব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

প্রতিভাশালিনী শার্লোটি ব্রোণ্টি।

২য়।

বর্ষ বয়ঃক্রমকালে মিস্ শার্লোটি ব্রোণ্টি তাঁহার এক জন বন্ধুকে পুস্তকনির্ব্বাচনবিষয়ে পত্রদ্বারা যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার বহু বিস্তৃত পাঠ ও সূক্ষ্মবিবেচনার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছিলেন,"পাঠের জন্য কয়েক খানা পুস্তক মনোনয়ন নিমিত্ত তুমি আমাকে লিখিয়াছ,আমি যথাসম্ভব অল্প কথায় তাহা বলিতেছি। যদি কাব্য পাঠ করিতে চাও, তাহ'লে প্রথম শ্রেণীর কাব্য পড়িবে ; যেমন মিল্টন, সেক্ষপীয়র,টমসন, গোল্ডস্মিথ, পোপ, (যদিও ইঁহাকে আমি তেমন পছন্দ করি না,) স্কট, বায়রণ, কেম্বেল, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ এবং সাদে। সেক্ষপীয়র ও বায়রণের নামে চমকিয়া উঠিও না। ইঁহারা উভয়েই মহৎ লোক, ইঁহাদের লিখিত গ্রন্থও ইঁহাদেরই মত। তার পর, কোন্‌টি ভাল, কোন্‌টি মন্দ,তাহা তুমি নিজেই বুঝিতে পারিবে ; গ্রন্থের প্রধান প্রধান উক্তিগুলি বাস্তবিকই মূল্যবান্ ও পবিত্র—মন্দ কথাগুলি চিরকালই মন্দ—তুমি উহা দ্বিতীয় বার পড়িতে চাহিবে না। * * * উপন্যাস পড়িতে ইচ্ছা করিলে, একমাত্র স্কটের লিখিত বই পড়িবে—এতদ্ব্যতীত অপরাপর উপন্যাস একান্তই অসার ও মূল্যহীন। ইতিহাসের মধ্যে হিউম ও রোলীনের বই পড়িবে। জীবনচরিত পুস্তকমধ্যে জন্‌সন্‌লিখিত"কবিগণের জীবনী," বস্‌ওয়েল্ লিখিত "জন্‌সনের জীবনী" ইত্যাদি, প্রাকৃতিক ইতিহাসমধ্যে বিউইক, অডুবন, গোল্ডস্মিথ ও হোয়াইটের গ্রন্থাবলী প্রধান। ধর্ম্মগ্রন্থসম্বন্ধে তোমার ভ্রাতার উপদেশ লইবে। মোটের উপর, শুধু খ্যাতনামা লেখকগণের গ্রন্থই পড়িবে, এবং নূতনত্ব পরিহার করিবে।"

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে মিস্ ব্রোণ্টি রোহেডের কোন একটি স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার বয়স বিংশতি বৎসরমাত্র। অধ্যাপনার কার্য্যে বৃত হইয়া তিনি এখানে পরম সুখে ছিলেন। এই সময়ও তিনি নিয়ত অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকিতেন, এবং নিজকর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য তাঁহার সমস্ত শক্তি ও মন নিয়োগ করিয়াছিলেন। এরূপ অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার স্বাস্থ্য এত খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল যে, তিনি স্কুলের কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গৃহে ফিরিয়া তিনি পূর্ব্ববৎ নির্দ্দিষ্ট নিয়মে দৈনিক জীবনের কার্য্য আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এবার পূর্ব্বের

ন্যায় শান্তিসুখ ভোগ করিতে পারিলেন না। তাঁহার আপন শরীর রুগ্ন, ভ্রাতা ব্রেণওয়েল পীড়িত হইয়া গৃহে প্রত্যাগত ও সর্ব্বকনিষ্ঠা ভগিনী এন সাংঘাতিক ক্ষয়কাস রোগে শয্যাগত ছিল। এই সময় শার্লোটি অসুস্থ শরীর লইয়া সকলের পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। পরম স্নেহাধার ভগিনীর রোগশয্যার পার্শ্বে থাকিয়া তিনি যেরূপ উৎকণ্ঠা ও সতর্কতার সহিত তাহার যত্ন ও পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন, কোন জননী বোধ করি আপন গর্ভজাত সন্তানজন্য ততোধিক যত্ন করিতে পারিতেন না। তাঁহার জ্যেষ্ঠা দুই ভগিনী মেরিয়া ও এলিজাবেথ ইতিপূর্ব্বে পরিবারবর্গকে কিরূপ শোকাকুল করিয়া ভগবানের ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, শার্লোটি তাহা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। সেই চিন্তা তাঁহার স্নেহপ্রবণ হৃদয়ে সময় সময় গভীর শোক ও ভীতিসঞ্চার করিয়া দিত। ঠিক এই সময়েই শার্লোটির একটী সর্ব্বপ্রকারে যোগ্য ও বাঞ্ছনীয় বিবাহপ্রস্তাব সমুপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মতি প্রদান করেন নাই, তিনি জানিতেন, পরিণীতা হইলেই তাঁহাকে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিতে হইবে, তখন মাতৃহীনা অসহায়া পীড়িতা ভগিনী এনের সেবা শুশ্রূষা করিবার কেহ থাকিবে না, আরও জানিতেন যে, তিনিই এই ক্ষুদ্র পরিবারের জীবন ও আনন্দস্বরূপ। বিশেষতঃ এই সময় তাঁহার পিতার মস্তিষ্কবিকৃতি অত্যন্ত বাড়িয়া পড়িয়াছিল—তাঁহার পরিচর্য্যার জন্যও শার্লোটির গৃহে থাকা আবশ্যক। এই সমস্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া তিনি উল্লিখিত বিশেষ সুবিধাজনক ও নিতান্ত লোভনীয় বিবাহ প্রস্তাবও উপেক্ষা করিলেন, এবং তদ্দ্বারা কর্ত্তব্যপরায়ণতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন। তাঁহার অত্যন্ত যত্ন, পরিশ্রম ও শুশ্রূষায় এনের স্বাস্থ্যের অনেকটা উন্নতি হইল।

ব্রোণ্টি পরিবারে আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল না, এই জন্য শার্লোটি ও এন্ উভয়েরই পক্ষে এই সময় অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করা আবশ্যক হইয়াছিল। তাঁহারা শীঘ্রই দুইটী ভদ্র পরিবারে গৃহশিক্ষয়িত্রীর কার্য্য লাভ করিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে দুইটী স্থানই তাঁহাদের নিকট নিতান্ত অপ্রীতিকর হইয়াছিল। শার্লোটি যে পরিবারের বালক বালিকাদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন, সে পরিবারের কর্ত্রী ঠাকুরাণীর দোষে সন্তানগণের শিক্ষা ও সংশোধনের যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটিয়াছিল। তাহাদের আচরণসম্বন্ধে শার্লোটি কখনও অভিযোগ করিলে তিনি বিরক্ত হইতেন, এবং কখনও কখনও ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক অন্যায়, মিথ্যা ও প্রতারণাপূর্ণ বাক্য দ্বারা স্বীয় সন্তানগণের দোষগোপনে প্রয়াস পাইতেন। শার্লোটি এরূপ অস্বাভাবিক আচরণে বিরক্ত ও ব্যথিত হইয়া উক্ত কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ইহার পর ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুনরায় এক স্থানে গৃহশিক্ষয়িত্রীর কার্য্য গ্রহণ করেন। এই স্থানে তিনি যথেষ্ট আদর, যত্ন, প্রীতি ও সদ্ব্যবহার পাইয়াছিলেন, এবং তিনিও যথাসাধ্য পরিশ্রমসহকারে স্বীয় কর্ত্তব্য

সুসম্পাদনে যত্নবতী হইয়া সকলের সন্তোষ-বিধান করিয়াছিলেন। কিন্তু এই স্থানেও তিনি দীর্ঘকাল অবস্থান করিতে পারিলেন না; ভগিনী এনের স্বাস্থ্যভঙ্গ পুনরায় উদ্বেগ আনয়ন করিতে লাগিল। শার্লোটি বুঝিতে পারিলেন, প্রিয়তমা এনের জীবন রক্ষা করিতে হইলে তাঁহার উপর সতত সতর্ক-দৃষ্টি ও অবিরাম যত্ন, শুশ্রূষা একান্ত আবশ্যক। পরিবারের তেমন আয় ছিল না যাহাতে তিনি দীর্ঘকাল গৃহে থাকিয়া এনের পরিচর্য্যা করিতে পারেন। প্রাণ-সমা ভগিনীর জন্য শার্লোটির অন্তঃকরণ কাতর হইল। একটা অর্থাগমের পথ উদ্ভাবন করিবার জন্য তিনি ভাবিয়া অস্থির হইলেন। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, তিনিও তাঁহার ভগিনীগণ মিলিয়া অনায়াসে একটী স্কুল পরিচালনা করিতে পারেন। শার্লোটি এই মত আবিষ্কার করিয়া অমনি তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে এই সময় নিকটবর্ত্তী একটী স্কুলের পরিচালক ও অধ্যক্ষ সেই স্কুলটি শার্লোটিকে খুব অল্প টাকায় ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু উহা গ্রহণকরিবার একটু পূর্ব্বেই শার্লোটি তাঁহার স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে বুঝিতে পারিলেন, স্কুলপরিচালনা করিতে যে পরিমাণ বিদ্যা ও জ্ঞানের আবশ্যক, কোন কোন বিষয়ে তাঁহাদের তাহাতে অভাব আছে। সুতরাং শার্লোটি আপাততঃ এ কার্য্যে বিরত থাকিয়া সঙ্কল্প করিলেন যে, এমিলি ও তিনি ফরাসী ভাষা ও সঙ্গীতে নিজেদিগকে উপযুক্তরূপ শিক্ষিত করিবার জন্য ব্রুসেলস্ নগরে যাইবেন। এই উদ্যমে শার্লোটি তাঁহার মাতৃস্বসা হইতে কিছু অর্থ সাহায্য পাইয়াছিলেন। সেই অর্থ গ্রহণ করিয়া তাঁহারা উক্ত নগরে গমন করিলেন। বিশেষ সৌভাগ্যক্রমে এম্‌হিজার নামক এক জন কৃতী ও বিশেষ দক্ষ লোকের শিক্ষাধীনে থাকিবার তাঁহাদের সুবিধা হইয়াছিল এই স্থানে তাঁহারা অতুলনীয় অধ্যবসায়ের সহিত অগ্যোন্নতি-সাধনে তৎপর হইলেন। এম্ হিজার তাঁহার এই ছাত্রীগণের আশ্চর্য্য প্রতিভা উপলব্ধি করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি প্রতিভার হিসাবে এমিলিকে শার্লোটির উপরে স্থান দিতেন।

মাতৃস্বসার পরলোকগমনে সার্লোটি ও এমিলিকে শীঘ্রই ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল। ক্ষুদ্র পরিবার পুনরায় সম্মিলিত হইল। এই আনন্দের সময় ভ্রাতা ব্রেনুয়েলের স্বেচ্ছাচার চরিত্রহীনতা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক দোষে পরিবারে অনেক অসুখ ও অশান্তির কারণ উপস্থিত হইয়াছিল। শার্লোটি পরবৎসর পুনরায় ব্রুসেলস্ নগরে গিয়াছিলেন, কিন্তু এবার শিক্ষয়িত্রীরূপে গিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার যৎসামান্য আয় ছিল, তাহা হইতেই তিনি কষ্টে স্বষ্টে কিছু বাঁচাইয়া জর্ম্মাণ ভাষা শিক্ষার ব্যয় চালাইতেন। ইহা হইতে বুঝা যায়, বিদ্যা শিক্ষার জন্য তাঁহার কিরূপ ব্যাকুলতা ছিল।

কতকগুলি পারিবারিক কারণে ও পিতার দৃষ্টিহীনতাবশতঃ শার্লোটিকে সত্বর পুনরায় দেশে ফিরিতে হইল। গৃহে

প্রত্যাবর্ত্তন করিবার অত্যল্পকাল পরই অল্প ও নির্দ্দিষ্টসংখ্যক ছাত্রী লইয়া একটী বোর্ডিং স্কুল চালাইতে তিনি ইচ্ছুক হইলেন। তদনুসারে কার্ড ছাপাইয়া বিজ্ঞাপন বিতরণ করা হইল, এবং পরিচিত ব্যক্তি ও বন্ধুবর্গের নিকট পত্র লিখিয়া উৎসাহ ও আনুকূল্য প্রার্থনা করা হইল। দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ বিজ্ঞাপনে কোন ফল দর্শিল না। ব্রোণ্টি পরিবারে তেমন ক্ষমতাপন্ন কোনও আত্মীয় ছিল না, এবং তাঁহাদের এমন অর্থও ছিল না যে, বিজ্ঞাপনে অধিক ব্যয় করিতে পারেন। কাজেই বিজ্ঞাপনে কোন ফল হইল না। কিন্তু এরূপ বিফল প্রযত্ন হইয়াও শার্লোটির উৎসাহ ভঙ্গ হইল না— তিনি অদম্য উৎসাহ, সাহস ও অধ্যবসায় সহকারে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অর্থাভাব, পিতার অসহায় অবস্থা, ভ্রাতার উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র এবং নিজের ভগ্নস্বাস্থ্য, এই সমস্ত একত্র হইয়া সময় সময় শার্লোটির হৃদয়কে বিচলিত করিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু অবিচলিত ভগবদ্বিশ্বাস, অমিত সহিষ্ণুতা ও আত্মসংযমবলে এই বীর মহিলা নিজের স্বাভাবিক শক্তি ও সাহস অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন। শার্লোটি যখন এরূপ কঠোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত, সেই সময় একদা তাঁহার ভগিনী এমিলির লিখিত কতকগুলি কবিতার পাণ্ডুলিপি তাঁহার হস্তগত হয়। তিনি তাহাতে প্রকৃত কবিত্ব ও প্রতিভার বিকাশ দেখিয়া সেগুলি প্রকাশ করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হন। তাঁহার আগ্রহে এমিলি সম্মতা হইলেন, সুশীলা এনও তাঁহার রচিত কতকগুলি কবিতা বাহির করিলেন, সেগুলিতেও শার্লোটি আশ্চর্য্য কবিত্ব দেখিতে পাইলেন। অনন্তর তিন ভগিনীর লিখিত কতগুলি মনোনীত কবিতা, লেখিকাদের নাম গোপন রাখিয়া কল্পিত নামে প্রকাশ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। সমালোচকের তীব্র সমালোচনার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার মানসেই এই কল্পিত নামত্রয় অবলম্বন করা হইয়াছিল। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহা অপেক্ষা অনেক হীনদরের কবিতাও সাধারণের নিকট আদৃত হইয়াছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইহার আদর হইল না। ইহাতেও শার্লোটি নিরুৎসাহ হইলেন না। যে সাহিত্যসেবাকে জীবনের ব্রত করিয়াছেন, বিফলতার নিষ্পেষণেও তিনি তাহা হইতে বিচলিত হইলেন না। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, বলিবার মত কথা থাকিলে ও বলিবার সুযোগ পাইলে, তাঁহার কথা সাধারণকে অবশ্যই শুনিতে হইবে। এবার তিন ভগিনী গদ্যে তিনটি গল্প লিখিলেন, এবং তিনটি গল্প একই পুস্তকে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশে উদ্যোগী হইলেন। পুস্তকের পাণ্ডুলিপি লণ্ডনের গ্রন্থ প্রকাশকগণের দ্বারে দ্বারে ভিখারিণীর ন্যায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া পুনরায় রচয়িত্রীদের হাতে ফিরিয়া আসিল; কেহই তাহা প্রকাশ করিতে সম্মত হইলেন না।

ক্রমশঃ

আমাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত।

(করাচি বন্দরে যাত্রা।)

১২ই আষাঢ় রাত্রি ১০ টার ট্রেণে আমরা লাহোর হইতে আরব সাগরের তীরবর্ত্তী করাচি বন্দরাভিমুখে যাত্রা করি। শ্রীমান্ রোহিণীকুমার সেন এবং বিনয়ভূষণ ঘোষ ষ্টেশনে যাইয়া আমাদিগকে বিদায় দান করেন। লাহোর হইতে করাচি বহু দূরে, টেণে ৫৬ ঘণ্টা অবিশ্রান্ত চলিয়া ১৪ই প্রাতঃকালে তথায় পঁহুছান যায়। লাহোর নগরস্থ কোন পঞ্জাবী বন্ধু পথে মোল্তানে একদিন বিশ্রাম করিয়া যাইবার জন্য পরামর্শ দান করিয়াছিলেন। মোল্তানে আমরা ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে একবার গিয়াছিলাম, সে স্থানের অবস্থা জ্ঞাত আছি; গ্রীষ্মকালে মোল্তানে ভীষণ উত্তাপ হয়, মোলতানে এক দিন বাস করিয়া তথাকার উত্তাপ ভোগ করিবার কিছুতেই প্রবৃত্তি হইল না। মোল্তানে আমাদের কোন পরিচিত লোকও ছিল না। মোল্তানে যেমন উত্তাপ তেমন ধূলী এবং ভিক্ষুক দিগের দৌরাত্ম্য। একটী পারস্য কবিতায় মোল্তানের এরূপ বর্ণনা হইয়াছে।

"চহার চীজ তোর্ফাস্ত্দর মোল্তান,
গর্দ ও গরম গদা ও গোরস্তান।"

অর্থাৎ মোল্তানে চারিটি আশ্চর্য্য বস্তু আছে; উড্ডীয়মান ধূলী, উত্তাপ এবং ভিক্ষুক দল ও গোরস্থান (অসংখ্য কবর)।

লাহোর হইতে মোল্তান ২০৮ মাইল দূরে, প্রথম বারে যাইতে ২০।২৫ মাইল বা ৩০মাইল দূর এক একটি ক্ষুদ্র ষ্টেশন পাওয়া গিয়াছিল; এবার ঘন ঘন জনাকীর্ণ বড় বড় ষ্টেশন দৃষ্ট হইল। ২০৮ মাইল, প্রায় সমগ্র পথ শুভ্রবালুকাকীর্ণ প্রকৃত মরুভূমি না হইলেও মরুভূমিসদৃশ। তখন প্রায় কোথাও শস্যক্ষেত্র লক্ষিত হয় নাই, কেবল কণ্টকময় গুল্ম, ও স্থানে স্থানে খর্জ্জুর তরুমাত্র ছিল। মোল্তান নগর অতিক্রম করিয়া চন্দ্রভাগা নদী পর্য্যন্ত যাইয়া সেবার ভূমির এইরূপ অবস্থা আমরা নয়নগোচর করিয়াছিলাম, এবার অনেক উন্নতাবস্থা দৃষ্ট হইয়াছিল। নদী হইতে খাল খাত হইয়া দিগ্দিগন্তর প্রসারিত হইয়াছে। কেনালের জলে ইতস্ততঃ ভূমি উর্ব্বরতা প্রাপ্ত, হরিৎ শস্যক্ষেত্রে শোভিত। ইংরাজজাতির বুদ্ধি জ্ঞান ও যত্নবলে ভারতের সুবিস্তীর্ণ ভীষণ ঊষর ভূমি সকল শস্যক্ষেত্র ও উদ্যানে পরিণত হইতেছে, ভারতের কত অরণ্যাকীর্ণ দুর্গম স্থান জনাকীর্ণ নগর হইয়াছে, এক সময়ে এই সকল স্থানে গমনাগমন কত কষ্ট সাধ্য ছিল, বহু ক্লেশে বহু দিনে উষ্ট্রারোহণে যাতায়াত করিতে হইত। সেরূপ গমনাগমনে কয় জন লোক সুক্ষম ছিল? এক্ষণ একজন বালক বা বালিকা অনায়াসে নির্ব্বিঘ্নে সিন্ধুদেশে চলিয়া যাইতে সমর্থ। ইতিপূর্ব্বে ভদ্রবংশের দুইটী কুমারী বাঙ্গালী যুবতী স্বীয় গর্ভধারিণী সহ পুরুষ সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া সেই মহাপ্রান্তরের অপর পারে সুদূর সিন্ধুদেশে নিরাপদে চলিয়া গিয়াছেন। এদেশে কোন্ যুগে কোন্ রাজার রাজত্বে রাজ্যের এরূপ উন্নতি ও কল্যাণ এবং সামান্য প্রজাদের পক্ষে এত সুখ সুবিধা ও নিরাপদবস্থা ঘটিয়াছে?

কেবল অবিনীত ও অকৃতজ্ঞ হইয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ও ইংরাজ জাতিকে গালি দিলে পুরুষকার হয় না।

আমরা প্রাতঃকালে মোল্‌তানে পঁহুছিয়াছিলাম। পূর্ব্বে যেরূপ মোল্‌তানের ষ্টেশন দৃষ্ট হইয়াছিল, তদপেক্ষা তাহা অনেক বৃহৎ ও জনাকীর্ণ বোধ হইল। ষ্টেশনে যাত্রিকবৃন্দের অত্যন্ত ভিড় ছিল। মোল্‌তান ভক্ত প্রহ্লাদের জন্মভূমি, এরূপ কিম্বদন্তী যে এই নগর প্রহ্লাদজনক দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর রাজধানী ছিল। সেবার মোল্‌তানের দুর্গ এবং নগরের ভিতরে হিরণ্যকশিপুর উদর বিদীর্ণ করিতে প্রবৃত্ত নৃসিংহমূর্ত্তি দর্শন করা গিয়াছিল। তখন মোল্‌তানের সেনানিবেশে স্থিত এক জন বাঙ্গালী বন্ধুর আতিথ্য গ্রহণ করিয়া আমরা ২।৩ দিন অবস্থিতি করিয়াছিলাম।

মধ্যাহ্নে ভাওলপুর ষ্টেশনে পঁহুছান যায়, ভাওলপুর এক জন নবাবের রাজধানী। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে আমরা সিন্ধুনদের উপরে একটি জংসনে উপনীত হই। সেই জংসনের নাম বোধ হয় কট্রি। সেই স্থান হইতে বেলুচিস্থানের অন্তর্গত কোওয়েটা নগর পর্য্যন্ত লৌহবর্ত্ম প্রসারিত হইয়াছে। উক্ত জংসনে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ যোগে সিন্ধুনদ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, তদুপরি দুইটি সুদৃঢ় রেলওয়ে সেতু স্থাপিত। সিন্ধুর বক্ষে অদূরে একটি দ্বীপ দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। শ্রুত হইল সেই দ্বীপে অনেক সাধু মহান্ত বাস করেন; উহা তীর্থস্বরূপ,বহুলোক তথায় তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে যায়। আমাদের সঙ্গী সক্কর ও কোওয়েটা প্রভৃতি নগরের যাত্রিকগণ অবতরণ করিয়া সেই স্থানে অন্য গাড়ীতে আরোহণ করিল। লাহোর ও মোল্‌তান প্রদেশ ছাড়িয়া আসাতে উত্তাপের কথঞ্চিৎ শান্তি বোধ করা গেল বটে, কিন্তু উড্ডীয়মান ধূলীপটলে সর্ব্বাঙ্গ ও সঙ্গের দ্রব্যাদি আচ্ছন্ন হইয়া ধূসর বর্ণ ধারণ করিয়াছিল, সমুদায় ধূলীময় হইয়াছিল। গাড়ী চলিবার সময় ধূলীপুঞ্জের জন্য চক্ষু উন্মীলন করিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করা দুষ্কর হইয়াছিল। মুখ ও নাসিকার ছিদ্রপথে কত ধূলী যে উদরে প্রবেশ করিয়াছিল তাহা বলা যায় না।

১৪ই তারিখ প্রত্যূষে করাচি ক্যাণ্টোনমেণ্ট ষ্টেশনে পঁহুছান যায়। এক মাইল অন্তে কিয়ৎক্ষণ পরেই আমরা করাচি বন্দর ষ্টেশনে উপনীত হই। সেখানে পঁহুছিয়াই দেখি প্রেমাস্পদ শ্রীমান্ নন্দলাল সেন কতিপয় সিন্ধুদেশীয় ব্রাহ্মবন্ধুসহ আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন। দেখিবামাত্র সাদরে কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে, প্রিয় নন্দলাল হিন্দী ভাষায় উত্তর দান করিলেন। আমরা বলিলাম, তুমি বাঙ্গলা ভাষা কি ভুলিয়া গিয়াছ? আমার সঙ্গে হিন্দী কথা কহিতেছ? এই কথার উত্তরে তিনি হিন্দী ভাষায় এরূপ বলিলেন, "ভাই সব সাপ হ্যায় ওন্‌লোগোঁকো সমঝ্‌না চাহিয়ে।" নন্দলাল সতের বৎসর সিন্ধুদেশে যাপন করিয়াছেন, বাঙ্গলা ভাষায় কথোপকথন না করাতে এক্ষণ যেন উক্ত ভাষায় কথা কহিতে একটু বাধ বাধ বোধ করেন, হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় সিন্ধী ভ্রাতাদের সঙ্গে সর্ব্বদা

কথা কহেন বলিয়া তাহা মাতৃভাষাস্বরূপ অভ্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু সিন্ধুদেশে দীর্ঘ কাল স্থিতি করিয়া সিন্ধীভাষা যে তিনি উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছেন, সে ভাষায় অনর্গল কথা কহিতে পারেন, এরূপ বোধ হইল না। যাহা হউক আমরা সমাগত বন্ধুদিগের সঙ্গে অনতিদূরস্থ ব্রহ্মমন্দিরের সংলগ্ন নন্দলালের আশ্রমে চলিয়া গেলাম।

স্বর্দ্ধগতা।

দেবী বরদেশ্বরী গুপ্ত *।

উচ্চপ্রকৃতি নারী দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; ব্রহ্মবাদিনী ও স্ত্রীপ্রজ্ঞা। যে নারীর অন্তরে ব্রহ্মানুরাগ প্রবল, পূজার্চ্চনা, ভগবৎপ্রসঙ্গ ও ভগবদ্‌গুণানুকীর্ত্তনে যাঁহার বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহ, যিনি দিবা নিশি তাহাতে মত্ত ও অনুরক্ত, বৈদিক ঋষিগণ তাঁহাকে "ব্রহ্মবাদিনী" আখ্যায় আখ্যাত করিয়াছেন, এবং যিনি গৃহকর্ম্মে ও সেবাব্রতপালনে অতিশয় অনুরাগিণী ও সুনিপুণা, সর্ব্বদা যাঁহার এরূপ কার্য্যে উৎসাহ ও মত্ততা, ঈদৃশী লক্ষণাক্রান্তা নারী "স্ত্রীপ্রজ্ঞা" সংজ্ঞা প্রাপ্তা।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের দুই পত্নী ছিলেন। দেবী মৈত্রেয়ী ও দেবী কাত্যায়নী। মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী এবং কাত্যায়নী স্ত্রীপ্রজ্ঞাশ্রেণীর অন্তর্গতা ছিলেন। মহর্ষি যখন গার্হস্থ্যাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরন্তর ব্রহ্মধ্যানমনন ও যোগতপস্যায় জীবন যাপন করিবেন এরূপ সঙ্কল্প করিয়া বনপ্রস্থানে সমুদ্যত হইয়াছিলেন, তখন তিনি মৈত্রেয়ী দেবীকে গৃহবাসিনী হইয়া গৃহধর্ম্ম পালন ও ধনসম্পদ্ ভোগ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাহাতে ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্যকে এরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন ;—

"সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যন্নু ম ইয়ং ভগোঃ সর্ব্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ কথং তেনামৃতা স্যামিতি। নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো যথৈবোপকরণবতাং জীবিতং তথৈব তে জীবিতং স্যাদমৃতত্বস্য নাশাস্তি বিত্তেনেতি। সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্।"

বৃহদারণ্যক উপনিষদ।

মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ভগবন্, যদি ধনেতে পরিপূর্ণ সমুদায় পৃথিবী আমার হয়, তদ্দ্বারা কি আমি অমর হইতে পারিব ?" যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন, "না, ভাগ্যবান্ ব্যক্তিদিগের জীবন যেরূপ তোমার জীবনও সেইরূপ হইবে। ধনদ্বারা অমৃতত্বলাভের আশা নাই।" মৈত্রেয়ী বলিলেন, "যদ্দ্বারা আমি অমর হইতে না পারি, তাহা লইয়া আমি কি করিব ?"

দেবী মৈত্রেয়ী তৎপর আর গৃহে স্থিতি করিলেন না। স্বামী সহ বানপ্রস্থাবলম্বনপূর্ব্বক তপশ্চরণে প্রাণ মন উৎসর্গ করি-

---

* ইনি ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠা ভগিনী ছিলেন, গত ৭ই ভাদ্র পাঁচদোনা গ্রামে পিত্রালয়ে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভাই গিরিশচন্দ্র বিগত ১৭ ভাদ্র ইহার শ্রাদ্ধোপলক্ষে কলিকাতা নববিধান প্রচারাশ্রমে এই জীবনী পাঠ করিয়াছিলেন।

লেন। কিন্তু স্ত্রীপ্রজ্ঞাপ্রকৃতিসম্পন্না আর্য্যা কাত্যায়নী গৃহে থাকিয়া উৎসাহ ও অনুরাগসহকারে গৃহধর্ম্ম পালন ও পর-সেবাতে নিযুক্ত রহিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইবার পূর্ব্বে যুডিয়া দেশে মেরী ও মার্থানাম্নী দুই ভগিনী ছিলেন। দুই জনেই এক গৃহে বাস করিতেন। মেরী ব্রহ্মবাদিনী, মার্থা স্ত্রীপ্রজ্ঞাগুণসম্পন্না ছিলেন। একদা দেবাত্মা যিশু তাঁহাদের গৃহে পদার্পণ করেন। ব্রহ্মবাদিনী দেবী মেরী যিশুদেবকে গৃহে সমাগত প্রাপ্ত হইয়া মহানন্দে তাঁহার শ্রীমুখাৎ ঈশ্বরপ্রসঙ্গ পরমার্থতত্ত্ব নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করিতে লাগিলেন, অন্য কার্য্যে মনোযোগ বিধান করিলেন না। কিন্তু স্ত্রীপ্রজ্ঞাপ্রকৃতি দেবী মার্থা ভক্তিপূর্ব্বক যিশুদেবের অভ্যর্থনা করিলেন, এবং সেবা শুশ্রূষা করিয়া কিরূপে তাঁহাকে সুখী করিবেন ও তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করাইবেন তজ্জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন; রন্ধনাদি কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া মেরীদেবীকে অনুযোগ করিয়া বলিলেন, "ভগিনি, আমাদের সৌভাগ্যক্রমে প্রভুর শুভাগমন হইয়াছে, তুমি যথোচিত তাঁহার সেবার আয়োজন ও রন্ধনাদি করিতেছ না, বসিয়া কেবল কথা শুনিতেছ, এ কেমন?"

মোসলমান সম্প্রদায়ে বসোরানিবা-সিনী তপস্বিনী রাবেয়া ব্রহ্মবাদিনী এবং মহাপুরুষ মোহম্মদের প্রিয়তমা কনিষ্ঠা কন্যা দেবী ফতেমা স্ত্রীপ্রজ্ঞাপ্রকৃতিসম্পন্না ছিলেন। ব্রহ্মবাদিনী দেবী রাবেয়া এরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন;—

"পরমেশ্বর, তুমি ইহলোকে আমার জন্য যাহা কিছু নির্দ্দিষ্ট করিয়াছ, তাহা তোমার শত্রুকে দাও, স্বর্গলোকের যাহা কিছু তাহা তোমার বন্ধুকে দাও। তুমিই আমার পক্ষে যথেষ্ট, আমি ইহলোক ও স্বর্গলোক কিছুই চাহি না। হে ঈশ্বর, যদি আমি নরকের ভয়ে তোমার পূজা করি আমাকে নরকানলে দগ্ধ কর, যদি স্বর্গলোভে তোমার সেবা করি, আমার পক্ষে স্বর্গ অবৈধ কর; যদি শুদ্ধ তোমার জন্য তোমার পূজা করিয়া থাকি, তবে তোমার সৌন্দর্য্য উজ্জ্বলরূপে দর্শন করিতে আমাকে বঞ্চিত করিও না।"

একদা বসন্তকালে একটী নারী যাইয়া রাবেয়াকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, "আর্য্যে, কুটীর হইতে বাহিরে আসিয়া দেখুন সৃষ্টির কি বিচিত্র শোভা!" দেবী রাবেয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি ভিতরে আসিয়া স্রষ্টার বিচিত্র শোভা দর্শন কর।"

দেবী ফাতেমা স্বয়ং সমুদায় গৃহকর্ম্ম ও রন্ধনাদি করিয়া পতি পুত্রাদির সেবা করি-তেন। একদা তিনি গৃহকর্ম্মাদিতে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া স্বীয় পিতৃদেবকে বলিয়া-ছিলেন, "তাত, গৃহের সমুদয় কার্য্য স্বহস্তে আমাকে সম্পাদন করিতে হয়, আমি যাঁতাযন্ত্রের দ্বারা গোধূম চূর্ণ করি, এবং স্বয়ং রুটি প্রস্তুত করিয়া থাকি। মদিনাতে দাসীর অভাব নাই, একটী দাসী যদি পাই, সে আমার সহকারিণী হইয়া আমার পরিশ্রমের লাঘব করিতে পারে।" তচ্ছ্র-বণে উক্ত মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন, "দাসীর প্রয়োজন নাই; বৎসে, তুমি প্রত্যহ

প্রত্যূষে ও সায়াহ্নে ত্রিশ বারের অধিক 'সবহানাল্লাহ্' ও 'অল্‌হম্‌দো লেল্লাহে' এবং 'আল্লাহো আক্‌বর,' পরমেশ্বরের গুণানুবাদসূচক এই বাক্যত্রয় জপ করিও, ইহাতে তোমার জীবনে বিশেষ পুণ্য ও শান্তিলাভ হইবে। দাসীর প্রয়োজন কি?"

স্ত্রী প্রজ্ঞাশ্রেণীর নারীগণের যে ভগবানে অনুরাগ নাই, তাঁহার প্রতি ভক্তি বিশ্বাসের অভাব, তাহা নহে। তবে তাঁহাদের জীবনে ব্রহ্মবাদিনীর ন্যায় ব্রহ্মানুরাগ ও ব্রহ্মভক্তি প্রবল নহে। তাঁহাদিগের জীবন কর্ম্মপ্রধান ও সেবাপ্রধান।

আজ আমরা যাঁহার স্বর্গারোহণোপলক্ষে শ্রদ্ধা প্রকাশ করার জন্য এ স্থানে উপস্থিত হইয়াছি, আমার সেই পরম বন্দনীয়া জ্যেষ্ঠা সহোদরা ভগিনী বরদেশ্বরী দেবী স্ত্রীপ্রজ্ঞাশ্রেণীর মহিলা ছিলেন। তন্ত্রশাস্ত্র মহানির্ব্বাণে উক্ত হইয়াছে ;—

"দক্ষঃ শুচিঃ সত্যভাষী জিতচিত্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ অপ্রমাত্তোনিরালস্যঃ সেবাবৃত্তো ভবেন্নরঃ।"

অর্থাৎ মনুষ্য সেবাবৃত্তিতে দক্ষ, শুচি, সত্যভাষী, সংযতমনা, জিতেন্দ্রিয়, অপ্রমত্ত ও নিরালস্য হইবে।

ভগিনী ঠাকুরাণীর জীবন প্রায় এই সকল বিশেষ লক্ষণযুক্ত ছিল।

শ্রীমদ্ভাগবতের এই উপদেশ :—

"শশ্বৎ পরার্থসর্ব্বেহঃ পরার্থৈকান্তসম্ভবঃ।
সাধু শিক্ষেত ভূভৃত্তো নগশিষ্যঃ পরাত্মতাম্॥"

নিরন্তর পরের জন্য সর্ব্ববিধ যত্ন একমাত্র পরের জন্য জীবনধারণ ঈদৃশ পরাত্মতা সাধু ব্যক্তি বৃক্ষ ও পর্ব্বতের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া শিক্ষা করিবেন।

ভগিনী ঠাকুরাণীর নিজের জন্য নয়, বৃক্ষ ও পর্ব্বতের ন্যায় পরসেবার জন্য জীবন ধারণ হইয়াছিল।

তাঁহার বয়ঃক্রম নবতি বৎসরের নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল। তিনি ছয় মাস কাল অর ও অজীর্ণাদি রোগে ক্লেশ পাইয়া বিগত ৭ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে পাঁচদোনা গ্রামে আমাদের নিজভবনে দেহত্যাগপূর্ব্বক অমরধামবাসিনী হইয়াছেন।

আমরা জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে "বোন্‌দিদী" বা "ভগিনী ঠাকুরাণী" বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকি। দিদী বলিতেও আমাদের আপত্তি নাই। আমরা সহোদরা ভাই ভগিনী ছয় জন ছিলাম। তন্মধ্যে তিন ভগিনী ও দুই ভ্রাতা ক্রমে পরলোকগত হইয়াছেন ; আমি সর্ব্বকনিষ্ঠ তাঁহাদের অনুগমনের প্রতীক্ষায় আছি। বরদেশ্বরী গুপ্ত ভ্রাতা ভগিনীদের মধ্যে দ্বিতীয়া ছিলেন। সর্ব্বজ্যেষ্ঠা ভগিনী দেবী কাশীশ্বরী আমার শৈশবকালে পতিপুত্র পৃথিবীতে বিদ্যমান রাখিয়া ২৫ বৎসর বয়সে পরলোকে প্রস্থান করিয়াছিলেন।

দেবী বরদেশ্বরী ঢাকা জিলার অন্তর্গত সুবর্ণ গ্রামের হাড়িয়া বৈদ্যপাড়া পল্লীতে গুপ্তপরিবারে পরিণীতা হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বামীর নাম কমললোচন গুপ্ত ছিল। বিবাহের অল্পকাল পরেই তিনি বিধবা হন। তখন তাঁহার একাদশ বা দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম ছিল। তাঁহার শ্বশুর ভৈরবচন্দ্র গুপ্ত বক্সী মহাশয় তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ ও আদর করিতেন

তিনি বিপত্নীক হইয়াছিলেন। দিদী তাঁহার একমাত্র শিশু কন্যা শিব সুন্দরীকে প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু দিনান্তে বক্‌শী মহাশয় পরলোক প্রাপ্ত হন। দিদী স্বামি-গৃহে বাস করিয়া শিবসুন্দরীকে সযত্নে লালন পালনপূর্ব্বক বিবাহ দেন। পরে সেই কন্যার বড়ই দুঃখ ও দৈন্যাবস্থা হয়। তাহার স্বামী অন্ধ হইয়াছিলেন। দুঃখ দারিদ্র্যনিপীড়িত শিবসুন্দরী বিক্রমপুরে স্বামিগৃহে বাস করিতেছিল। অন্নবস্ত্রাভাবে তাহার অতিশয় কষ্ট হইয়াছিল। ভগিনী ঠাকুরাণী যথাসাধ্য অর্থ দান করিয়া তাহার অন্নবস্ত্রাভাবজনিত ক্লেশ কথঞ্চিৎ মোচন করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশাতেই শিবসুন্দরী বিধবা হইয়া পরলোক প্রাপ্ত হয়। স্বামীর গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক বরদেশ্বরী দেবী দেবরের সন্তানবর্গের প্রতিপালনের ভারও গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহারাও বাল্যকালে মাতৃহীন হইয়াছিল। অবশেষে তিনি মাতৃদেবীর আগ্রহ ও অনুরোধক্রমে জন্মভূমি পাঁচদোনা গ্রামে আসিয়া আমাদের সঙ্গে একত্র বাস করেন, মাতৃনির্ব্বিশেষে চিরকাল আমাদের প্রতি স্নেহ প্রকাশ ও আমাদের সেবা করিয়াছেন। তখন পিতৃদেব মাধবরাম রায় স্বর্গস্থ হইয়াছিলেন। মাতৃদেবীর সেবা করা দিদীর জীবনের একটি প্রধান কার্য্য হইয়াছিল। ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ ইন্দুভূষণ নিতান্ত শৈশব কালে মাতৃহীন হয়। শ্রীমান্ দিদীর ক্রোড়েই লালিত পালিত হইয়াছিল। তিনি মাতৃস্থানীয়া হইয়া সযত্নে লালন পালনপূর্ব্বক তাহাকে মানুষ করেন। তিনিই তাহার প্রকৃত মাতা হইয়াছিলেন। পরে ইন্দুভূষণের প্রথম পক্ষের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুখময়ী শৈশবকালে মাতৃহীনা হয়। দিদী তাহারও মাতৃস্থান গ্রহণ করেন। সুখময়ীর প্রতি তাঁহার ঘনীভূত স্নেহ সঞ্চারিত হয়। কোন মাতাকে কখনও এরূপ দেখা যায় না যে, নিজগর্ভজাত সন্তানের প্রতি এত দূর যত্ন স্নেহ করিয়া থাকেন। দিদীর সন্তান হয় নাই, অথচ তিনি বহু বালক বালিকার স্নেহময়ী মাতা হইয়াছিলেন। পরে সুখময়ী তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব হইয়াছিল। দিদী তাহাকে সস্নেহে লালন পালন করিয়া সৎপাত্রে ন্যস্ত করিয়াছিলেন। আজ তাঁহার পারলৌকিক ক্রিয়োপলক্ষে তাঁহার স্নেহের নাতজামাই রেবতীমোহন এখানে উপস্থিত আছেন। সুখময়ীর প্রকৃত মা এবং জামাতারও মা তিনি ছিলেন। আমার প্রতি ও ইন্দুভূষণের পিতা আমার অগ্রজ হরচন্দ্র রায় এবং সর্ব্বাগ্রজ ঈশ্বরচন্দ্র রায়ের প্রতি তাঁহার অতুল স্নেহ ছিল। আমাদের প্রতি তিনি কিরূপ আদর স্নেহ প্রকাশ করিতেন তাহা বলিয়া উঠা যায় না। গর্ভধারিণী জননীও এরূপ স্নেহ করেন, সচরাচর দৃষ্ট হয় না। সমুদায় কনিষ্ঠ আত্মীয় জনের প্রতি তাঁহার গভীর স্নেহ ছিল। তিনি আমাদের পরিবারের কর্ত্রী ও গৃহলক্ষ্মী ছিলেন; চিরকাল চরিত্রের শুদ্ধতা রক্ষা করিয়া পরসেবাতে জীবন যাপন করিয়াছেন। ইন্দুভূষণ বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে কয়েক বৎসর হাবড়ায় ও ফরিদপুরে ছিল।

মাতৃদেবী তাহার সঙ্গে সেই দুই স্থানে বাস করিয়াছিলেন। দিদীও মাতৃসেবার অনুরোধে তাহার সঙ্গে ছিলেন।

ভগিনী ঠাকুরাণী সুপাচিকা ও গৃহ-কর্ম্মে সুদক্ষা ছিলেন। ৬০।৭০ বৎসর বয়সেও স্বহস্তে রন্ধন করিয়া আত্মীয় স্বজন দিগকে ভোজন করাইয়াছেন। এই কার্য্যেই তাঁহার বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহ ছিল। গ্রামস্থ আত্মীয় কুটুম্বদিগের পরি-বারে বড় বড় ভোজোৎসবে তিনি প্রায়ই রন্ধনের ভার প্রাপ্ত হইতেন। যখন তাঁহার শরীর সবল ছিল, উত্তম রন্ধন করেন বলিয়া অনেকে বিবাহোৎসবাদিতে আগ্রহ সহকারে সেই কার্য্যের ভার তাঁহার প্রতি অর্পণ করিতেন। তিনি উৎসাহপূর্ব্বক তাহা সম্পাদন করিয়া আনন্দিত হইতেন। ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে তিনি যখন শ্রীমান্ ইন্দুভূষণের সঙ্গে হাবড়াতে স্থিতি করিতে-ছিলেন, তখন প্রচারক বন্ধুদিগকে ভোজন করাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়া-ছিলেন। একদিন নিমন্ত্রণ পাইয়া তাঁহারা সেখানে যাইয়া মাধ্যাহ্নিক ভোজন করেন। দিদী ২৫।৩০টি নিরামিষ ব্যঞ্জন স্বহস্তে রন্ধনপূর্ব্বক পরিবেশন করিয়া তাঁহাদিগকে খাওয়াইয়াছিলেন। ব্যঞ্জন সকল তাঁহাদের মুখে অতিশয় সুরস ও অনেক ব্যঞ্জন নূতন বোধ হইয়াছিল। তিনি নিজে স্বল্প ভোজন করিতেন, অন্নোপকরণ অতি সামান্য হইত, শাক বা একটি ডাইল; তাহা দ্বারা তিনি তৃপ্তি-পূর্ব্বক ভোজন করিতেন, অন্য জনকে নানা ব্যঞ্জনোপকরণে আড়ম্বর করিয়া খাওয়াইতেন। নিজের বৈরাগ্যপ্রধান জীবন ছিল। দুগ্ধপানেও তাঁহার স্পৃহা ছিল না। তিনি আম্র ও কদলী ফল ব্যতীত এদেশজাত অন্য সমুদায় ফল চির জীবনের জন্য ত্যাগ করিয়াছিলেন। জরাক্রান্ত হইয়াও যে পর্য্যন্ত সামর্থ্য ছিল, নিজের অন্ন ব্যঞ্জন তিনি নিজেই প্রস্তুত করিয়া লইতেন। পরে পীড়া ও বার্দ্ধক্যে নিতান্ত শক্তিহীন হইয়া পড়িলে ব্রাহ্মণ বংশীয়া একটী প্রতিবেশিনী দুঃখিনী বৃদ্ধা বিধবা তাঁহাকে রাঁধিয়া দিতেন। তিনি সেই বিধবাটীকে বড় ভাল বাসিতেন। বিদেশে থাকিলেও নিয়মিতরূপে তাঁহাকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিতেন। শুনি-য়াছি দিদীর মৃত্যুর পর সেই বিধবা ব্রাহ্মণকন্যা কিছু অর্থ পাইবেন, তিনি এরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার নিজের হস্তে সামান্য অর্থ ছিল। জ্যেষ্ঠ ভাগিনেয় শ্রীমান্ কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত তাঁহার সেবার জন্য মাসিক কিছু কিছু দান করি-তেন। তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ ইন্দুভূষণ হইতেও সাহায্য পাইতেন। তাঁহার নিজের জন্য আর অর্থব্যয় কি হইত? দরিদ্র আত্মীয় স্বজনের অভাবমোচনে, দুঃখী জনের দুঃখনিরাকরণে তিনি অনেক সময় যথাশক্তি অর্থ ব্যয় করিতেন। এক বার তিনি মধ্যভারতবর্ষের দুর্ভিক্ষ প্রপী-ড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দান করিয়াছিলেন, আমার মনে হয় বৈদ্যনাথের কুষ্ঠাশ্রমেও কিছু দিয়া ছিলেন।

ক্রমশঃ।

ভারতবর্ষের নারীগণ *।

উদ্ধৃত।

"এটি সকলের নিকটে একটু আশ্চর্য্য মনে হইবে যে, এক জন হিন্দু আপনাদের সভাপতি হইয়াছেন। লোকে বলিয়া থাকে যে, তাঁহার দেশীয় লোকেরা স্ত্রীজাতির সত্ত্ব ও অধিকার সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। তিনি এ কথা সত্য মনে করেন না, তবে বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের অবস্থার মধ্যে এমন সকল বিষয় আছে, যাহাতে এরূপ নিন্দা অনেকটা ঠিক। প্রাচীনকালের হিন্দুসমাজ যেরূপ ছিল, আজ আর সেরূপ নাই। এমন এক সময় ছিল, যে সময়ে স্ত্রী ও পুরুষ একত্র মেশামেশি করিতেন, নারীগণ গণিতে পারদর্শিনী ছিলেন, স্বামি-সহকারে ধর্ম্মালোচনা করিতেন, উচ্চ-শিক্ষায় শিক্ষিতা হইতেন, এবং নিজের স্বামী নিজে মনোনীত করিতেন। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। সময়ে সময়ে ভারতের নারীগণ এত দূর স্বাধীনতা সম্ভোগ করিতেন যে, এ দেশের সভ্যতাও তত দূর অগ্রসর হইতে পারে না। এখন জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতা ভারতসমাজের নিতান্ত দুরবস্থা উপস্থিত করিয়াছে। ভারতনরনারীর এত দূর পতিতাবস্থা উপস্থিত যে, তাঁহাদিগকে দেখিয়া বর্ত্তমান ভারতের মধ্যে প্রাচীন ভারতের ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন এরূপ দুরবস্থা যে একজন ব্রাহ্মণ সত্তরটী নারীর পাণিগ্রহণ করেন; কুলীন পিতা খাতা না দেখিয়া আপনার পুত্রকে পুত্র বলিয়া চিনিতে পারেন না। আর একটী অনিষ্ট-করী কুরীতি এই যে, এক জন অশীতি বর্ষের বৃদ্ধ একটী পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করে। হিন্দু বিধবাগণ পুনরায় বিবাহ করিতে পারেন না; একবার বিধবা হইলে চিরদিন বিধবা থাকিতে হয়। কেবল বিবাহ হয় না তাহা নহে, বিবিধ প্রকারের কৃচ্ছ্রসাধনে জীবন অতি-বাহিত করিতে হয়। বিধবাগণকে তাঁহাদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঈদৃশ ভাবে জীবনাতিপাত করিতে বাধ্য করা অত্যন্ত ক্লেশকর ব্যাপার। বাল্যবিবাহপ্রথা বিদূরিত হইয়া উপযুক্ত বয়সে বিবাহ হয়, এরূপ ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। যদি সম্ভবপর হয়, একাধিক বিবাহ, বহু বিবাহ রাজবিধি দ্বারা নিবারণ করা সমুচিত। অন্যান্য যে সকল ব্যবহারগত দোষ আছে তাহা চরিত্র প্রভাবে, গ্রন্থপ্রচারাদি উপায়ে অপ-নীত করা যাইতে পারে। এ সমুদায় দোষের মূল বিদ্যালোকের অভাব। যদি ভারতের নারীগণ উপযুক্ত বিদ্যালোক লাভ করেন, তাঁহারা নিজেই এই সকল সদোষ ব্যবহার অপনয়ন করিতে সমর্থ হইবেন। বিধবা হইয়া কৃচ্ছ্রসাধনে জীবনাতিপাত করা, বিদ্যালোকলাভে বঞ্চিত থাকা, এ সমুদায়ই তাঁহারা ভগব-

* লণ্ডন নগরে ভিক্টোরিয়া ডিস্কশন সোসাটির মাসিক অধিবেশনে শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন সভাপতির পদে বৃত হইয়া ভারতরমণীদের অবস্থাসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার মর্ম্ম আচার্য্য জীবন-চরিত মধ্যবিবরণের তৃতীয়াংশে যাহা লিখিত হইয়াছে, ইহা তাহা।

দিচ্ছা মনে করেন, সুতরাং বিদ্যালোকে তাঁহাদিগকে উন্নত করা একান্ত প্রয়োজন। নারীগণের চিত্ত হইতে অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিতে পারিলে কুসংস্কারাদি সহজে উৎপাটিত হইবে, সত্য পবিত্রতা শান্তির প্রবাহ প্রবিষ্ট হইবার জন্য সহস্র দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে। যদি কেহ এ কথা কহেন যে, হিন্দুশাস্ত্রই নারীগণকে এরূপ অবস্থাপন্ন করিয়াছে, তাঁহাদিগের ইহা জানা উচিত যে, হিন্দুশাস্ত্র পত্নীগণকে "ধন, বস্ত্র প্রেম, শ্রদ্ধা ও অমৃতময় বাক্য দ্বারা" সন্তুষ্ট রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। পতি কেবল পত্নীকে ভাল বাসিবেন না, তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিবেন, এরূপ ব্যবস্থাই তো সর্ব্বত্র পুরুষের নারীর প্রতি ব্যবহারের উপযুক্ত। কেহ বলেন যে, বালিকাগণকে শিক্ষা দেওয়ার পক্ষে প্রাচীন ব্যবস্থাপকগণের কোন যত্ন ছিল না। এ কথা সত্য নহে, হিন্দুশাস্ত্রে ব্যবস্থাপিত আছে, "পিতা কন্যাকে সে পর্য্যন্ত বিবাহ দিবেন না যে পর্য্যন্ত না সে পতির মর্য্যাদা, পতিসেবা ও ধর্ম্মশাসন বোঝে"। এ সকল শাস্ত্রবাক্য দেখাইয়া দেয় যে, হিন্দুসমাজের এখন পতিতাবস্থা। এ কথাও সত্য নহে যে, ভারতের সর্ব্বত্র নারীগণ অন্তঃপুরবদ্ধ। বঙ্গদেশ ছাড়া পঞ্জাব, বম্বে ও মান্দ্রাজে নারীগণ অনেক পরিমাণে স্বাধীনতা সম্ভোগ করিয়া থাকেন। যদিচ ভারতের নারীসমাজসম্বন্ধে অনেক গুলি বিষয়ে দুঃখ করিবার আছে, কিন্তু তাহার সঙ্গে পূর্ব্বকালের কতকগুলি ভাল বিষয়ও, সংযুক্ত আছে। পতির প্রতি অনুরক্তি, লজ্জাশীলতা, সুকোমল ব্যবহার, স্বাভাবিক প্রশান্ত ভাব, স্বামীর হিতসাধনে ঐকান্তিকতা, এ সকল গুণ এখনও হিন্দুনারীগণের মধ্যে বিদ্যমান। সে দেশের নারীগণের চরিত্র সংস্কৃত করিতে গেলে, তাঁহাদের মধ্যে যে সকল উৎকৃষ্ট উপাদান আছে, তৎপ্রতি উপেক্ষা করিলে চলিবে না ইংলণ্ডের সভ্যতার প্রতি তাঁহার আদর ও সম্ভ্রম আছে, কিন্তু এ দেশের আচার ব্যবহার ভারতে প্রচলন করিয়া দেশীয়গণকে নীচ করিয়া ফেলা কখনও সমুচিত নয়। কোন এক সমাজের উন্নতি বাহির হইতে আসে না, স্বাভাবিক ও দেশীয় ভাবের ভিতর হইতে হয়। সে দেশের নারীগণের যে সকল সদ্গুণ আছে, তাঁহাদের সংস্কার তদুপরি স্থাপিত করিতে হইবে। অনেকে বলেন, ইংলণ্ডের নারীগণের অধিকার লইয়া বিরোধ করা উচিত নয়। উহা লইয়া বিরোধ করিবার প্রয়োজন কি? যদি নারীগণ মনে করেন তাঁহাদের কোন কোন কাজ করা উচিত, পুরুষেরা কেন, তাহাতে বাধা দিবেন? যখন পুরুষেরা তাঁহাদের স্বাধীন কার্য্যে নারীগণ হস্তক্ষেপ করেন ইহা চান না, তখন পুরুষেরও নারীগণের সম্বন্ধে সেরূপ করা উচিত নয়। পুরুষ শ্রেষ্ঠ কি নারী শ্রেষ্ঠ? যাহা কিছু পুরুষোচিত, ওজস্বী, পুরুষেরা তাহাতে চিরদিনই শ্রেষ্ঠ থাকিবেন, যাহা কিছু সুকোমল সস্নেহ তাহাতে পুরুষগণ নারীগণকে কোন দিন পরাজয় করিতে পারিবেন না। পুরুষ ও নারী এ দুইয়ের গুণগুলি একত্র মিলিত হইলে

তবে উৎকর্ষ উপস্থিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, পুরুষগণ বিশেষ্য এবং নারীগণ বিশেষণমাত্র, কিন্তু তিনি অন্য প্রকার মনে করেন। পুরুষগণ বিশেষ্য পুংলিঙ্গ সত্তা, কিন্তু কর্ম্ম কারক, নারীরূপ সকর্ম্মক ক্রিয়া দ্বারা অনুশাসিত (ব্যাপ্ত)। কার্য্যতঃ সমুদায় পৃথিবীতে নারীগণ পুরুষগণকে শাসন করেন। অনেকে মুখে অস্বীকার করিতে পারেন, প্রতিবাদ করিতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক বিষয় কি? ভারতবর্ষে এক শত স্বামীর মধ্যে নবনবতি জন স্ত্রীকর্ত্তৃক শাসিত। ইংলণ্ডে এবং তাবৎ সভ্য ও সংস্কৃত দেশেও কি তাহাই নয়? শৈশব হইতে পরিণত বয়সপর্য্যন্ত মা, ভগ্নী, পত্নী, এবং সাধারণতঃ সমুদায় মহিলার প্রভাব সকলেই অনুভব করেন ও বহু মনে করেন। পুরুষগণের উপরে তাঁহাদের সুকোমল সস্নেহ মধুর প্রকৃতির প্রভাব অনিবার্য্য। যদি নারীগণ আমাদিগকে শাসন করিবেনই, তবে কি সকল বিষয়েই আমাদিগকে শাসন করিবেন? না। যে বিষয়ে পুরুষগণ শ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে তাঁহাদের কথা শোনা হউক, যে বিষয়ে নারীগণ শ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে তাঁহাদের কথা শোনা হউক। পুরুষ ও নারী এ উভয় জাতির সামঞ্জস্যে সমাজের কল্যাণ। এজন্য কি ইংলণ্ডে, কি ভারতে, এ দুই জাতির হিত, এ দুই জাতি একত্র মিলিত হইয়া পর্য্যালোচনা করিবেন, এবং দুইয়ে মিলিত হইয়া দেশহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন। ভারতের উপকারের জন্য তিনি অনেক স্থানে পুরুষগণের সভায় বলিয়াছেন, আজ নারীগণের সভায় তাঁহাকে যে বলিতে দেওয়া হইল, ইহাতে তিনি আপনাকে সম্মানিত মনে করিতেছেন। ইংরেজ মহিলাগণ—ইংরেজ ভগিনীগণ—হিন্দুনারীগণের যথাসাধ্য উন্নতিসাধনে যত্নবতী হউন। মিস্ কার্পেন্টার তৎকল্পে যাহা করিয়াছেন, অনেকেইতো তদ্বিষয়ে তাঁহার অনুসরণ করিতে পারেন। এখন সে দেশে গিয়া সুশিক্ষিত ইংরেজ মহিলাগণ শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা ভারতবর্ষের ভগিনীগণের কল্যাণ সাধন করিতে পারেন। তাঁহারা কিরূপ শিক্ষা দিবেন? অসাম্প্রদায়িক, উদার, খাঁটি এবং কার্য্যোপযোগী। সেইরূপ শিক্ষা যেরূপ শিক্ষাতে তাঁহারা উন্নত মাতা, ভগ্নী, কন্যা ও পত্নী হইতে পারেন। তিনি ভারতের দুটী একটী বা পঞ্চাশৎটী নারীর পক্ষ হইয়া বলিতেছেন না। কিন্তু কোটী২ নারীর পক্ষ হইয়া বলিতেছেন। তাঁহাদের অশ্রুপাত কি ইংরেজ ভগিনীগণের হৃদয় সংস্পর্শ করিবে না? উহা কি লৌহদ্বারা গঠিত? সমুদ্র, পর্ব্বত, বিবিধ বিঘ্নবাধা অতিক্রম করিয়া, স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া ভারতবর্ষের নারীগণকে বৈধব্যযন্ত্রণা, অসময়ে বিবাহ, এবং অজ্ঞানতা হইতে বিমুক্ত করিবার জন্য সে দেশে গমন অতি মহৎ উদ্দেশ্য সন্দেহ কি? গবর্ণমেণ্ট বিধিপ্রণয়ন দ্বারা, দেশহিতৈষী পুরুষগণ পুরুষগণকে শিক্ষিত করিবার যত্নের দ্বারা কল্যাণসাধনে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন, ইংরেজ নারীগণ যখন ইংলণ্ডে আপনাদের অধিকার সাব্যস্ত করিতে ব্যস্ত, এবং তজ্জন্য প্রকাশ্য বক্তৃতাদানে প্রবৃত্ত,

তখন তাঁহারা দেখান যে, তাঁহাদের দৃষ্টি ও সহানুভূতি এই ক্ষুদ্র দ্বীপমধ্যে বদ্ধ নহে। এ সভায় তিনি নারীগণের জন্য বিশেষভাবে আবেদন করিতে পারেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, তিনি প্রাচীরকে লক্ষ্য করিয়া নহে, কিন্তু সেই উদারচেতা নরনারীকে লক্ষ্য করিয়া এ সকল কথা কহিতেছেন, যাঁহারা ভারতবর্ষীয়া ভগিনীগণের সাহায্যজন্য সংমিলিত হইবেন। ভারতে বিশুদ্ধ ধর্ম্মদান করিবার নিমিত্ত যত্ন হইতেছে। অনেক মহিলা পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়াছেন। অনেক হিন্দুর গৃহেও দেবদেবী অনাদৃত হইয়া পড়িয়াছে। এইটি অতি আহ্লাদের বিষয়, আশা করিবার বিষয়। ভারত যদিও আজ পতিত, তবু উহা দিন দিন উন্নত হইয়া পরিশেষে সেই উন্নত সোপানে আরোহণ করিবে যাহা উহার নিয়তি। যে সাহায্য প্রার্থনা করা হইতেছে, উহা দিলে ইংলণ্ডের ভারতের প্রতি কর্ত্তব্য সাধন করা হইবে।

মহিলাদিগের রচনা।

সীতাবর্জ্জন।

(কটকমহিলাসমিতিতে পঠিত)।

সীতাদেবী অযোধ্যার রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীরামচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী এবং রাজর্ষি জনকের কন্যা, ইহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। সেই সীতাদেবী যিনি রাজকন্যা, রাজপুত্রবধূ এবং রাজমহিষী ছিলেন, যাঁহার পুণ্য পাতিব্রত্যকাহিনী যুগযুগান্তর ধরিয়া জগতে প্রচারিত হইতেছে; যিনি রূপে গুণে অতুলনীয়া ও স্বামীর প্রাণস্বরূপিণী ছিলেন, যাঁহার সহবাসে শ্রীরামচন্দ্র বনবাসের সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণা ভুলিয়া গৃহবাসীর ন্যায় সুখী হইয়াছিলেন, সেই পতিব্রতা সাধ্বী সতী সীতা দেবী স্বামী কর্ত্তৃক কি কারণে পরিত্যক্তা হইলেন? ইহাই আমার আলোচনার বিষয়।

রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত শ্রীরামচন্দ্র যখন পঞ্চবটী বনে সীতাসহ সুখে কালাতিপাত করিতেছিলেন তখন রাক্ষসরাজ রাবণ সীতার রূপের বিষয় শ্রবণ করিয়া শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের অনুপস্থিতিকালে সীতাদেবীকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া লঙ্কাপুরে অবরুদ্ধ করিয়া রাখে, এবং নানা প্রকার প্রলোভন, ভয় ও কৌশল দ্বারা বশীভূত করিবার চেষ্টা করে; কিন্তু পাপিষ্ঠ রাবণ পতিব্রতা সীতা দেবীর কেশাগ্র পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে নাই। দেবী সতীত্বের বলে দুরন্ত রাক্ষসের হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। এদিকে শ্রীরামচন্দ্র সীতা বিচ্ছেদে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। বনবাস তাঁহার পক্ষে অসহ্য বোধ হইল। তিনি আপনাকে রাজ্যত্যাগী, দীন হীন, নিরাশ্রয় ভাবিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। সীতা বিনা সমস্ত জগৎ তাঁহার নিকট বিষময় বলিয়া প্রতীয়মান হইল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন সীতাকে উদ্ধার না করিয়া কখনও রাজ্যে ফিরিবেন না। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র একাকী কিরূপে সীতার উদ্ধার সাধন করিবেন তাহাই ভাবিয়া নিতান্ত ব্যাকুল

হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে কিষ্কিন্ধ্যার রাজভ্রাতা সুগ্রীব ভ্রাতা কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া বনে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত শ্রীরামের মিত্রতা হইল। তিনি কিষ্কিন্ধ্যার রাজা বালীকে অজ্ঞাতসারে বধ করিয়া সুগ্রীবকে রাজ্য প্রদান করিলেন। সুগ্রীব সসৈন্যে সীতার উদ্ধারার্থ শ্রীরামচন্দ্রের সহায়তা করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণ, সুগ্রীব, ও লক্ষ্মণের সাহায্যে রাক্ষস-রাজ রাবণকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়া সীতাকে উদ্ধার করিলেন; কিন্তু যখন সীতাদেবী শ্রীরামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন তখন বিপুল সৈন্যসঙ্ঘের সাক্ষাতে তাঁহাকে কহিলেন,"তুমি রাক্ষসগৃহে কি ভাবে ছিলে আমরা তাহা জ্ঞাত নহি, তবে কি প্রকারে তোমায় গ্রহণ করিব? লক্ষ্মণ ভরত সুগ্রীব কিংবা বিভীষণ ইঁহাদের মধ্যে যাঁহাকে অভিরুচি তাঁহারই উপর মনোনিবেশ কর, কিংবা দশ দিক পড়িয়া রহিয়াছে তুমি যথা ইচ্ছা গমন কর, তোমাতে আমার প্রয়োজন নাই। রাবণ তোমাকে হরণ করিয়াছিল, তোমার উদ্ধার না করিলে আমার অপযশ ঘোষিত হইবে, এবং আমার বংশমর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য তোমাকে উদ্ধার করিলাম।" শ্রীরামচন্দ্রের এই বাক্যে সীতাদেবীর মন কিরূপ হইল তাহা অনুভবনীয়। চতুর্দ্দিকে মহা সৈন্যাজ্য সহস্র কর্ণ বিস্ময়ে শ্রীরামচন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্যথিত হইল। ঘোরতর লজ্জায় সীতাদেবী অবনত হইলেন, কিন্তু অশ্রুরাশি এক হস্তে মার্জ্জনা করিয়া গদগদ স্বরে স্বামীকে বলিলেন, "যদি তুমি আমার চরিত্রে সন্দিহান হইয়াছিলে তবে হনুমানকে যখন আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলে তখন আমাকে বর্জ্জন করিলে না কেন? তাহা হইলে আমি আত্মহত্যা করিয়া এ দুর্গতি হইতে রক্ষা পাইতাম। এখন সভামধ্যে আমাকে বারাঙ্গনাজ্ঞানে অপমান করিয়া অপরের নিকট যাইতে বলিতেছ।" এ স্থলে শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীর প্রতি যে প্রকার নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলেন তাহা তাঁহার নিজের বাক্যেই স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে যে, তাঁহার নিজের এবং বংশমর্য্যাদা রক্ষা করাই সীতা উদ্ধারের অভিপ্রায়। তৎপর যখন সীতাদেবী অগ্নিপরীক্ষা দ্বারা আপনাকে শুদ্ধচরিত্রা বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন, তখন শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন "সীতাদেবী যে শুদ্ধচরিত্রা এবং সতীত্বের প্রভাতে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন তাহা আমি মনে মনে জানিতাম, কেবল অপবাদের ভয়ে এইরূপ বলিয়াছি।" এই বলিয়া তিনি সীতাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। এস্থলে শ্রীরামচন্দ্রের সীতার প্রতি এরূপ ব্যবহারসম্বন্ধে দু'একটী কথা না বলিয়া থাকা যায় না। যাঁহাদের সন্দেহভঞ্জনের জন্য সতীর অগ্রগণ্যা সীতাদেবীর প্রতি এরূপ কঠোর ব্যবহার করিলেন তাঁহারাত কখনও সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই, বরং যখন তিনি সীতাদেবীকে পরিত্যাগ করিলেন তখন লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও হনুমান প্রভৃতি সমস্ত বানর সৈন্য নিতান্ত শোকার্ত্ত ও মর্ম্মাহত হইয়াছিল।

শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীকে প্রিয়তমা

সহধর্ম্মিণীরূপে গ্রহণ করিয়া অযোধ্যায় আসিয়া সুখে সচ্ছন্দতায় রাজত্ব করিতে লাগিলেন। সীতা তাঁহার নয়নপুত্তলি কণ্ঠের হার ও নয়নের অঞ্জন হইয়াছিলেন। পতিপ্রাণা সীতাদেবী স্বামি-সোহাগে বড়ই সুখী হন, কিন্তু হায়! সংসারের সকল বিষয়ই অনিত্য, অসার ও ক্ষণস্থায়ী। এখানকার সুখ আরাম সন্ধ্যার ছায়ার ন্যায় এই আছে এই নাই। সীতাদেবী তাঁহার স্বামিসহবাসে বঞ্চিত হইলেন ও স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা হইলেন। কোন্ অপরাধে সীতাদেবীর এরূপ দুর্দ্দশা হইল? তাঁহার তো কোনই দোষ ছিল না, তাঁহার প্রজাবর্গের মধ্যে কয়েক জন হীনমতি অজ্ঞ লোক সীতাদেবীর অপবাদ ঘোষণা করায়—লোকরঞ্জনপ্রিয় শ্রীরামচন্দ্র বিনা বিচারে তাঁহাকে তাঁহার অজ্ঞাতসারে বনবাসে পাঠাইলেন। কোথায় পরীক্ষিতা সীতার পবিত্র চরিত্রকে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীরামচন্দ্র দণ্ডায়মান হইবেন, তাহা না করিয়া বিনা বিচারে আপনার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সসত্ত্বা নিরপরাধিনী পতিপ্রাণা সীতাদেবীকে বনবাসে প্রেরণ করিলেন। অত্যন্ত নীচ হীন প্রজার নামে অভিযোগ উপস্থিত হইলে রাজসভায় বা বিচারালয়ে তাহার বিচার হইয়া থাকে, কিন্তু নিতান্ত নীচ হীন প্রজার বিচারিত হইবার যে অধিকার রাজমহিষী হইয়াও সীতাদেবী সে অধিকার হইতে বিচ্যুত হইলেন। শ্রীরামচন্দ্র নানা গুণে ভূষিত ছিলেন, তিনি প্রজাবৎসল রাজা ছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে আদর্শ স্বামী বলিয়া আমার ক্ষুদ্র মন কিছুতেই স্বীকার করিতে পারে না। সতীর পতিই একমাত্র অবলম্বন। তিনি আপনার পিতা, মাতা, আত্মীয় স্বজন এবং আপনার নাম, গোত্র পরিত্যাগ করিয়া পতিকে আত্মসমর্পণ করেন। শরীর, মন, প্রাণ, ধর্ম্ম, চরিত্র, মান, সম্ভ্রম, রক্ষা করিবার ভার পতিরই হস্তে ন্যস্ত হয়, সেই পতি যদি ধর্ম্মবুদ্ধিতে চালিত হইয়া সতীকে রক্ষা না করেন তাহা হইলে এ সংসারে স্ত্রীজাতির গতি কোথায়?

সীতাবর্জ্জনের পর শ্রীরামচন্দ্র শোকে অধীর হইয়া সীতার স্বর্ণমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই শোকাশ্রু নিরর্থক, এই প্রতিমূর্ত্তি নিষ্প্রয়োজন। নিরপরাধিনী পতিপ্রাণা জীবন্ত সীতার প্রতি অত্যাচার করিয়া তাঁহার স্বর্ণময়ী প্রতিমূর্ত্তিকে আদর করিলে কি হইবে? বঙ্গদেশে একটি চলিত কথা আছে "গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়া।" ইহা কি সেই প্রকার নয়?

চরিত্র।

চরিত্রেই মানুষের মনুষ্যত্ব। দুর্নীতিপরায়ণ চরিত্রহীন ব্যক্তি মনুষ্যনামের অযোগ্য। কি স্ত্রী কি পুরুষ উভয়েরই অলঙ্কারস্বরূপ চরিত্রটীকে জীবনে ধারণ করা উচিত। উন্নত চরিত্র ব্যক্তি দেবতা নামে বাচ্য হইতে পারেন, কিন্তু চরিত্রহীন ব্যক্তি পশুর স্থানে গণনীয়। ঈশ্বর সর্ব্বজীবের মধ্যে মনুষ্যকে শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন

মনুষ্যমাত্রেই চেষ্টা করিলে চরিত্রের পবিত্রতা ও গৌরব রক্ষা করিতে পারে, দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিও চেষ্টা এবং যত্ন করিলে মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে। চরিত্রভ্রষ্ট ব্যক্তিকে ঈশ্বর অন্তরের সহিত ঘৃণা করেন। তাঁহার নিকট অবজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে ঘোরতর নরক ভোগ করিতে হয়। আমাদের অবিকৃত চরিত্র শুধু সংসারের পাপস্পর্শে কলুষিত হইয়া যায়। সংসার ঘোর পরীক্ষার স্থল, ঈশ্বর স্বেচ্ছায় আমাদের এইরূপ মোহময় জগতে পাঠাইয়া দূরে দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছেন, কখনও নয় বিবেকবাণীই যে তাঁহার আদেশ। ঈশ্বর আমাদের নানা প্রকার বুঝিবার ও জানিবার উপায় করিয়া দিয়াছেন, তথাপি আমরা তাহা উপলব্ধি করি কই? বিদ্যার সঙ্গে চরিত্রের তুলনা দেওয়া যায় না, হাজার বিদ্বান্ ব্যক্তিকেও দেখা যায় চরিত্রের পবিত্রতা-বিষয়ে অনেক উদাসীন। চরিত্রটি যে কি অমূল্য ধন তাহা তাঁহারা জ্ঞানী হয়েও অনুভব করিতে ভুলিয়া যান। চরিত্রহীন ব্যক্তি যদিও নানা বিদ্যায় ভূষিত হন তথাপি তাঁহাকে সকলে ঘৃণা করে, এবং ঈশ্বর নিকটেও তাঁহাকে ঘৃণার পাত্র এবং হেয় হইতে হয়। যিনি এই প্রলোভনময় সংসারটাকে স্বপ্নরাজ্য বলিয়া মনকে স্থির করিয়া অচল পাহাড় পর্ব্বতের ন্যায় দৃঢ় রাখিয়া জীবনতরী নির্ম্মল পবিত্র ভাবে চালাইতে পারেন তিনিই ধন্য এবং ঈশ্বর সমীপে আদরণীয়, এমন কি তাঁহার জন্যই ঈশ্বরের ক্রোড় প্রসারিত থাকে।

চরিত্রের সঙ্গে ধর্ম্মের সম্বন্ধ। চরিত্র নির্ম্মল না হইলে কি প্রকারে ধর্ম্ম উপার্জ্জন করা যাইতে পারে?

আমাদের আহার্য্য দ্রব্য ছাড়া যেমন জীবন ধারণ হয় না, তেমনি চরিত্র নির্ম্মল না হইলে ধর্ম্ম জ্ঞান হয় না।

মনের সঙ্গে যেরূপ শরীরের সম্পর্ক তেমনি ধর্ম্মের সঙ্গে চরিত্রের সম্পর্ক। মন অসুস্থ হইলে যেমন শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে, শরীর অসুস্থ হলেও মন অসুস্থ হইয়া পড়ে। তেমনি চরিত্র কলঙ্কিত হইলে ধর্ম্মপথে কাঁটা পড়িয়া যায়। একবার বিপথগামী হইলে ভাল হওয়া কঠিন হইয়া পড়ে, একমাত্র ঈশ্বর-চিন্তায় আন্তরিক পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার উপায় আছে। ঈশ্বর সর্ব্বজীবে দয়াময়। তাঁহার নিকট সকলে সমভাবে দয়া এবং ক্ষমা পাইয়া আসিতেছে। সন্তানের কাতর প্রার্থনা ও অশ্রুজল তাঁহার কোমল প্রাণকে অবশ্যই স্পর্শ করিবে। তাঁহার শরণাপন্ন হইলে এ সংসারে কি ভয়? ইহকাল পরকাল তাঁহার স্নেহের পাত্র হইয়া কাটান যায়।

মাণিকার চর।— শ্রীমতী সু—

পূর্ব্ব-স্মৃতি।

১

কেন আজি পূর্ব্ব-স্মৃতি উদয় হতেছে মনে?
বসন্ত মলয় বায়
ধীরে ধীরে বয়ে যায়
গাহিছে কলকণ্ঠ পিক সুমধুর তানে,
আকাশে চাঁদিমা তারা
ছড়ায় কনকধারা
তা দেখে পূর্ব্বের স্মৃতি হইতেছে মনে।

মনে পড়িতেছে আজ সুখের আলয়
যেখানে ছিলেন মোর পিতা স্নেহময়
পিতার নিকটে ব'সে
মনের আনন্দে ভেসে
ভাই বোন চারি জনে মিলে সমুদয়
রহিয়াছি কত সুখে ভুলিবার নয়।

৩

শারদ জোছনা রেতে মৃদুল বাতাসে
পিতার নিকট বসে মনের হরষে
সুখেতে মাতায়ে প্রাণ
গাহিয়াছি কত গান
শুনিয়ে জন্মিত প্রীতি পিতার হৃদয়ে
তুষিতেন সদা মধুমাখা কথা কয়ে।

৪

সহচরীগণ সনে মিলে এক মনে,
কত সুখে ভ্রমিয়াছি ফুলের বাগানে,
স্বকরে তুলিয়া ফুল
পরিয়াছি কর্ণে দুল
ফুলমালা গেঁথে গলে পরিয়াছি হার
তা দেখে কতই সুখ হইত পিতার।

৫

কত সুখে ছিনু পিতা মাতার যতনে
সেই সব সুখ যত
চির জীবনের মত
রাখিয়াছি স্মৃতিপটে আঁকিয়া যতনে
ভুলিব না সেই সব কভু এ জীবনে।

৬

বাজিতেছে শেল সম হৃদে কত কথা
উথলয়ে অবিরল
শুধু নয়নের জল
কোথা সে সুখের দিন পিতা মোর কোথা।
ফেলে সে সাধের গেহ
ত্যজিয়া মমতা স্নেহ
কোথায় গিয়াছ এবে পিতা গো আমার
তোমা বিনে সমুদয়
হেরিতেছি শূন্যময়
নাহি হয় প্রাণে মোর প্রীতির সঞ্চার।

আমাকে কতই ভাল বাসিতে সতত
ভাই বোন চারি জন
আন্তরিক স্নেহ টান
ছিলগো আমার প্রতি তোমার নিরত।
আমার মলিন মুখ
হেরিলে পাইতে দুখ
কিসেতে থাকিবে সুখী আমার অন্তর
ভাবিয়াছ দিবানিশি তাহা নিরন্তর।

৮

এত স্নেহ প্রীতি এবে ভুলিলে কেমনে
ছেড়ে এ মরত ভূমি
কোথায় গিয়াছ তুমি
এখন মোদের কিগো নাহি পড়ে মনে?
সে দেশে কি গেলে কেহ
ফিরিয়া না আসে গেহ
ভুলি থাকে চিরতরে যত বন্ধু জনে।
তুমিও সেথায় যেয়ে
সে দেশের নীতি পেয়ে
ভুলেছ জনম তরে যত পরিজনে।

৯

কেন লোক ভুলে থাকে সে দেশ কেমন
সেথা কি দুঃখীর প্রতি
করে সবে স্নেহ প্রীতি
পরদুঃখে হৃদে ধরে অসহ্য বেদন
সেথা কি সুনীলাকাশে
চাঁদ হাসে তারা হাসে
ঢালিয়া সুরভি রাশি বহিছে পবন।
সে দেশে কি উষারাণী
পরে রাঙ্গা সাড়ী খানি
তরুণ অরুণ সহ দেয় দরশন।

১০

কেমনে জানিব মোরা সে দেশ কেমন
তথায় যাহারা যায়
নাহি ফিরে এ ধরায়
কিসের উৎসবে মাতি জনম মতন
ভুলে থাকে চির তরে যত পরিজন।

১১

কোথায় অনন্ত ধাম নীলিমার পার

কিছুই বুঝি না হায়
সকলে কোথায় যায়
দিবানিশি ডাকিলেও নাহি ফিরে আর।
পিতা মোর ফিরে আর
আসিবে না পুনর্ব্বার
পূর্ব্ব স্মৃতি মনে উঠে হৃদয়ে আমার
উথলিছে শোক-সিন্ধু বহে অশ্রুধার।

১২

দয়াময়! প্রেমময়! কোথা আজি এ সময়।
অবোধ তনয়া তব
সংসারের নীতি সব
বুঝিতে না পারে বড় ব্যাকুল হৃদয়,
ডাকিছে তোমায় নাথ
প্রসারি স্নেহের হাত
করগো শীতল এবে তব তনয়ায়
পূর্ব্ব স্মৃতি সব গুলি
হৃদয় হইতে তুলি
প্রাণে মোর শান্তি এবে দেও দয়াময়
শান্তিদাতা তুমি প্রভু মঙ্গল আলয়।

হাফলঙ্গ,—একটী বধূ।

চেতনা।

ওহে রাজরাজ!
কি জানি কেমনে এত দিন পরে
আপনার মাঝে নিরখি আমারে
চকিতে পেয়েছি বড় লাজ।
তাইত সংশয়ে চলে না চরণ
লয়ে এ অসার মলিন জীবন
কেমনে দাঁড়াব বল আজ।
তোমার অমল মন্দির দুয়ারে
প্রতিদিন যেথা গেছি শত বারে
আজ সেথা চলে না চরণ॥
প্রতিদিন কত দিয়াছি অর্ঘ্য
বলিয়াছি দেব লহ লহ লহ
আমার জীবন প্রাণ মন।
প্রতিদিন তোমা বলিয়াছি প্রাণ
প্রতিদিন কত মাগিয়াছি ত্রাণ
আজ কেন সরে না বচন।
বলিয়াছি তব ও অভয় পদ
বিনা কিছু নাহি চাহি হে সম্পদ
তুমিই আমার প্রিয়তম।
ইহকাল তুমি, পরকাল তুমি,
প্রত্যেক নিমেষ তোমারই আমি
তোমা বিনা কিছু নাহি চাই,
অনিত্য ধরার বিভব বিলাস
দুদিনের খেলা দুদিনে বিনাশ
অমর সম্পদ তুমি তাই।
এইরূপে কত গাঁথিয়া গো মালা
তোমার পূজার সাজায়েছি ডালা
তাহাতেই তৃপ্ত ছিল মন।
পুতুলের মত লইয়া তোমারে
মন গড়া খেলা খেলেছি সাদরে
কতই অসার আয়োজন!
আজি যে বুঝেছি এতদিন ধরে
যতন করিয়া ছলেছি তোমারে
ছলেছি নিয়ত আপনারে
(ছলনায় ডুবেছি চিরতরে)
তোমা বলে নাথ যা কিছু দিয়াছি
তোমা দেই নাই ও পিতা বুঝেছি
দিয়াছি সে সব অপরেরে।
ওহে পুণ্যময়! তব নাম করে
যতন করিয়া ছদ্মবেশ ধরে
নিয়ত পূজেছি কামনারে,
মিটাতে বাসনা যত আয়োজন
করিয়া ভেবেছি তোমার পূজন
করিনু প্রাণের প্রীতিহারে।
আপনার তরে যা কিছু করেছি
ভাবিয়াছি তাহা তোমারে দিয়াছি
ভেঙ্গেছে আজ সে মোর মোহ।
বুঝেছি নিয়ত নিজেরে তুষিতে
প্রীতি ফুল দিছি তোমারে ভুলাতে
নহ প্রভু তুমি মোর নহ।
একান্তে চাহিনি তব প্রেম প্রীতি
নিজেতেই মোর ছিল এবে রতি
নিজেকেই আমি বাসি হে ভাল।
বৃথা বলিয়াছি চাহি অনুক্ষণ।
ওহে দয়াময় তোমার আলো।

জানি না কেমনে সে কুহক সাজ
ঘুচে গেছে তাই পেয়েছি এ লাজ
তাই আর চলে না চরণ
আজি হৃদিতল হতেছে কম্পন
গভীর নিরাশে টুটিছে পরাণ
হায়! হায়! কি হবে এখন।
কেমনে ঘুচিবে এ ভবের বাস
কেমনে করিব ও চরণে আশ
আশা যাতে কভু রাখিনি নাথ,
তুমি চিদানন্দ চিন্ময় শোভন
চিদাকাশে যদি না করি পূজা
লোকাচারে আর ভুলাব কত?
আমার ত দেব! নাহি সেই ধন
যা দিয়ে পূজিতে হয় ও চরণ
সঞ্চিত নাই তাহা ভ্রমের বশে।
হায়! এত দিন ভরিয়া আঁচল
প্রবঞ্চনা ধুলা রেখেছি কেবল
আজ যায় তাহা বাতাসে ভেসে।
ভাঙ্গিয়াছে ঘুম গিয়াছে কুয়াসা
আপনি বুঝেছি আপনার দশা,
কি হইবে প্রভু আমার গতি!
বিষসুধা আর ভাবিতে পারি না
তবু বিষ পান কেনগো ছাড়ি না
দুরবলে দেব! দাও সে শকতি।

খেরুওয়া। শ্রীপ্র—

সংবাদ।

বিলাতে একটি ২৪ বৎসরবয়স্ক যুবা ৬০ বৎসরবয়স্কা বিধবাকে বিবাহ করিয়াছে। সভ্যদেশের সভ্যতার রীতি বটে। ইংরাজদিগের মধ্যে ভগিনীপতির পক্ষে শ্যালীকে বিবাহ করার নিয়ম ছিল না। বিবাহ করিলে আইনানুসারে দণ্ডিত হইতে হইত। দীর্ঘকাল ব্যাপী বহু তর্ক বিতর্ক ও পর্য্যালোচনার পর শ্যালীর পাণিগ্রহণের সপক্ষ লোক জয়ী হইয়াছে। শ্যালীকে বিবাহ করা যাইতে পারিবে এরূপ আইন বিধি বদ্ধ হইয়া গিয়াছে। মোসলমানসমাজে বহু পরিণয় হইয়া থাকে কিন্তু স্ত্রী বিদ্যমান থাকিতে তাহার ভগিনীকে বিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ। হিন্দু সমাজে সচরাচর স্ত্রীবিয়োগের পর অনেক ভগিনীপতি শ্যালীকে বিবাহ করিয়া থাকে। বহু বিবাহকারী কুলীন পুরুষগণের স্ত্রীর ২।৩টী ভগিনীকে একযোগে বিবাহ করিতে কোন বাধা নাই। উড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্গত গড়জাতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পর কনিষ্ঠ সহোদর ভ্রাতা তাহার স্ত্রীকে অর্থাৎ বৌদিদীকে বিবাহ করিয়া থাকে। "উৎকলে দেবরঃ পতিঃ" ইহা প্রসিদ্ধ বাক্য। এমনও হয় যে, ৮।১০ বৎসর বয়স্ক দেবর ২০।২৫ বৎসর বয়স্কা বৌদিদির স্বামী হয়।

এবার যে কেবল পূর্ব্ববঙ্গে ভীষণ জলপ্লাবন ও দুর্ভিক্ষ হইয়াছে তাহা নয়। মুঙ্গেরের জিলার দ্বারভাঙ্গার ও মজফরপুরের সেইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। মুঙ্গেরের জিলার তিনটী থানা একেবারে জলমগ্ন হওয়াতে লোকের ঘর দুওয়ার বিষয় সম্পত্তি ভাসিয়া গিয়াছে, অন্নাভাবে স্ত্রী ও বালক বালিকাগণ কঙ্কালাবশেষ হইয়াছে, অনেকে গাছের পাতা ভক্ষণ করিয়া কোনরূপে জীবন ধারণ করিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে অন্ন যোগাইবার জন্য ষাট হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। তিন জন ডিপুটী তিন থানায় সাহায্যদানের জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন। দ্বারভাঙ্গার সদরদ্বদর মাজিষ্ট্রেটের যত্নে প্রজাদের বিশেষ কষ্ট হয় নাই।

ভিক্টোরিয়ামহিলাবিদ্যালয়।

খাদ্য *।

আজ খাদ্যসম্বন্ধে আপনাদের কিছু বলিব, কি কি উপাদানে আমাদের শরীর রক্ষিত হইতেছে সেই বিষয়ে বলিব। খাদ্য যে কেবল আমাদের মুখের রুচির জন্য দরকার তা নয়, ইহা আমাদের শরীরের জন্য বিশেষ দরকার। আমাদের শরীরের যন্ত্র সকল প্রতিমূহূর্ত্তে কাজ করিতেছে, এবং তাহাতে অণু অণু করিয়া শরীর ক্ষয় পাইতেছে। এই যে আমরা পরিশ্রম করি, সংসারের কাজকর্ম্ম করি ইহাতে বলের দরকার হয়, এবং ইহাতেও শরীর ক্ষয় পায়। সেই ক্ষয়ের অংশ পুরণের জন্য খাদ্য প্রয়োজন হয়। জোরে দৌড়াদৌড়ি করিলে কিম্বা উপর নীচ করিলে যে জোরে জোরে শ্বাস ফেলি ও হাঁপাই ইহা আর কিছুই নয়, হৃৎপিণ্ডের গোলযোগে এইরূপ হইয়া থাকে। হাঁপান মানে জোরে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস লওয়া। আমরা সাধারণতঃ নিঃশ্বাস লইতে টের পাই না, কিন্তু খুব বেশী কাজ করিলে ইহা বেশ টের পাই। যদি আমরা চিন্তা করি, কি শক্ত শক্ত পরিশ্রম করি তাহাতেও শরীরের অংশ ক্ষয় পাইতে থাকে। বাতাসে এক রকম গ্যাস আছে তাহার নাম Oxygen, ইহাতে আমাদের শরীরের রক্ত পরিষ্কার হয়। মুক্তবায়ুতে আমাদের শরীরের রক্তকে পরিষ্কার করে॥ ইহা স্বভাবতই আমাদের দরকার হয়। Oxygen যে কেবল বেশী যোগান দরকার তা নয়। আমাদের শরীরের যে যে অংশ ক্ষয় হয়, তাহারই জন্য Oxygen খুব দরকার। মোমবাতি জ্বালাইলে যেমন একটু একটু ক্ষয় পাইতে থাকে, আমাদের শরীরও সেই রকম ক্ষয় পাইতেছে। মোমবাতি জ্বালাইলে তার চারি দিকে শক্ত থাকে, মধ্য স্থানটা একটু একটু গলিতে থাকে। বাহিরের ঠাণ্ডা বাতাসে বাতির চারি দিক শক্ত থাকে এবং মধ্যস্থানের তরল অংশ শিখার উত্তাপে অল্প অল্প করিয়া গলিয়া বাষ্পাকারে উঠে। বাতাসের মধ্যে Oxygen এর সহিত ইহা মিশিয়া যায়। যখন ইহা ফুরাইয়া আসে তখন ইহা নিবিয়া যায়। বাতাসের অভাবে বাতি আর জ্বলিতে পারে না, তখনই ইহা জানা গেল যে, বাতাস অল্প আছে, বাতী ফুরাইয়া গিয়াছে। এই যে এত বড় বাতিটা কি করিয়া ক্ষয় পাইল, এবং গেলই বা কোথা তাহা জানা উচিত। এই গলা মোম উত্তাপ পাইয়া বাষ্পাকারে উঠে। তরল পদার্থ উত্তাপ লাগিলেই বাষ্প হয়; যেমন জল ঠাণ্ডা হইলে বরফ হয় ও উত্তাপ লাগিলেই বাষ্প হয় ইহাও ঠিক সেইরূপ। গ্যাসটা তেল হইতেছে এবং তেলটা বাষ্প হইতেছে। সেই বাষ্পটা দুইটি জিনিষে পরিণত হয়, প্রথম জল, দ্বিতীয় একটী গ্যাস, তাহার নাম Carbonic

* ১৯০২ সালের ৫ই অক্টোবর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মোহলানবিস মহাশয় যে বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন তন্মূলক।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১২শ ভাগ] কার্ত্তিক ১৩১৩; নবেম্বর ১৯০৬। [৪র্থ সংখ্যা।

স্ত্রীনীতিসার।

গত বারে মা শিশুবালক বালিকাদিগকে যেরূপে ভোজন নীতি শিক্ষা দিবেন তাহার কিছু বলা গিয়াছে, তদ্বিষয়ে আরও বলিবার আছে ;—

মা বালিকাদিগকে শৈশব কাল হইতে আহারে বৈরাগ্য শিক্ষা দিবেন, তাহারা যেন সুখাদ্য সামগ্রীর প্রতি লোভী হইয়া না উঠে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, মধ্যে মধ্যে উপকরণশূন্য অন্ন তাহাদিগকে ভোজন করিতে দিবেন। অধিক ভোজনে শরীর মন অবসন্ন হয়, শরীর রোগের আলয় হইয়া উঠে, যাহারা অধিক ভোজন করে লোকে তাহাদিগকে ঔদরিক বলিয়া ঘৃণা করে, তাহারা উত্তমরূপে লেখাপড়া শিখিতে পারে না, তাহাদের দ্বারা প্রায় কোন ভাল কাজ হইয়া উঠে না, উঠিতে বসিতে তাহাদের কষ্ট হয়। আহারের সময় লোভী বালক বালিকাদিগকে মা কথাপ্রসঙ্গে ইহা বুঝাইয়া দিবেন। খাদ্য বস্তু যেন তাহারা উত্তমরূপে চিবাইয়া খায়, এক গ্রাস গলাধঃকরণ না হইতে অপর গ্রাস তুলিয়া যেন মুখে অর্পণ না করে, ভোজনে প্রবৃত্ত অন্য বালক বালিকার গ্রাসের প্রতি যেন দৃষ্টি প্রসারণ করিয়া না থাকে, এ বিষয়ে মা দৃষ্টি রাখিবেন এবং তাহাদিগকে সমুচিত উপদেশ দিবেন। বালক বালিকার কিছু বয়স হইলে মা তাহাদিগকে ঈশ্বরকে প্রণাম এবং তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা দান করিতে শিক্ষা দিবেন, এবং তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিবেন যে, পরমেশ্বরই অন্নদায়িনী জননীরূপে অন্নদান করিয়া সকল জীবকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন।

পরিচ্ছদাদিতে বালকবালিকারা যাহাতে বিলাসী না হইয়া উঠে মা তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন, তাহাদিগকে সাধারণ মোটা কাপড় পরিতে দিবেন। মূল্যবান্ সূক্ষ্ম বস্ত্র ও চিত্র বিচিত্র পরিচ্ছদাদির প্রতি যেন তাহারা আসক্ত হইয়া না উঠে। তাহা হইলে তাহারা বিলাসী অহঙ্কারী হইয়া উঠিবে। বালকদিগকে সুকোমল শয্যায় শয়ন করিতে দিবেন না, তাহা হইলে তাহাদের শরীর দৃঢ় ও বলিষ্ঠ হওয়ার পক্ষে বিঘ্ন হইবে।

বঙ্গনারীদিগের অবস্থা।

প্রাচীন শ্রেণী ও নব্য শ্রেণী এই দুই শ্রেণীতে প্রধানতঃ বঙ্গনারীগণ বিভক্ত। সমুদায় হিন্দুনারী প্রাচীন শ্রেণীর অন্তর্গত; নব্য শ্রেণীতে হিন্দুনারী ও ব্রাহ্মনারী দুই প্রকার নারী আছেন।

প্রাচীন শ্রেণীর হিন্দুনারীগণ একবিধ অবস্থায় জীবন যাপন করেন, তাঁহাদের অবস্থাগত বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না। ভদ্র হিন্দু মহিলাগণ সচরাচর অন্তরালে, অন্তঃপুরে বাস করেন, শ্বশুরকুলের পুরুষদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইলে অবগুণ্ঠনাবরণে মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া উপস্থিত হন, কথা কহিতে হইলে এক প্রকার ইঙ্গিতে বা অপরিস্ফুট শব্দে কথা কহেন। বৃদ্ধাদিগের নিত্যকর্ম্ম আহ্নিক পূজা, এবং কিছু কিছু গৃহকার্য্য সম্পাদন, অপিচ বধূদিগের প্রতি আদেশ উপদেশ দান। যুবতীদিগের নিত্যকর্ম্ম, রন্ধন পরিবেশন সর্ব্ববিধ গৃহকর্ম্ম সম্পাদন, সন্তান পালন, পরিবারস্থ সকলের সেবা কার্য্য।

বালক বা যুবকের সঙ্গে হিন্দুপরিবারস্থ বালিকাদিগের বাল্যকালেই বিবাহ হয়। কন্যার মতামত নিরপেক্ষ হইয়া নিজ ইচ্ছানুসারে পিতামাতা সৎপাত্রে বা অপাত্রে তাহাকে ন্যস্ত করেন। তাঁহারা পাত্রের অর্থ স্বচ্ছলতার অবস্থা ও কুলমর্য্যাদার প্রতি অধিকতর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে হিন্দু কন্যাগণ লেখাপড়া কিছুই শিক্ষা না পাইয়া পরিণীতা হইত, [illegible] প্রায় বালিকারই বর্ণজ্ঞান হইয়া পিতামাতা গৃহে বা পাঠশালাতে বর্ণপরিচয় বোধোদয় প্রভৃতি সামান্য পুস্তক সকল পড়াইয়া থাকেন, অনেকের বিদ্যা সেই পর্য্যন্তই হয়, কেহ কেহ বিবাহের পর স্বামীর সাহায্যে বা নিজ যত্নে লেখাপড়ায় কিছু উন্নতি লাভ করে। হিন্দুসমাজে আট দশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময়েই কন্যা সম্প্রদান করার নিয়ম, কিন্তু এক্ষণ নানা কারণে প্রায় সেই নিয়ম রক্ষা পায় না। অনেক বালিকা ১২।১৪ বৎসর বয়ঃক্রমের পর পাত্রস্থ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে অনেক কন্যাকর্ত্তা ২।৪ শত বা ২।৪ হাজার টাকা বরপক্ষ হইতে কন্যা পণস্বরূপ গ্রহণ করিয়া কন্যাসম্প্রদান করিতেন, এক্ষণ তাহার পরিবর্ত্তে কন্যাকর্ত্তাকে কন্যার বিবাহে বর-পণ দান করিতে হয়। বরের বাজার বড়ই চড়া, অগ্নিমূল্যে বর গ্রহণ করা হইয়া থাকে। এক একটি পাশ করা ছেলের মূল্য নগদ ২।৩ হাজার টাকা। ক্রমশঃ মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে, তদ্ভিন্ন বহুমূল্য বস্ত্রা ভরণ ও তৈজস পত্রাদি দান করিতে হয়। গরিব কন্যাকর্ত্তা এক একটি কন্যার বিবাহে সর্ব্বস্বান্ত হন। যিনি একাধিক কন্যাদায় গ্রস্ত তাঁহার উপায়ান্তর নাই, তিনি ভাবনা চিন্তায় চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখেন। কন্যার বয়স হইলে তাহাকে বিবাহ না দিয়া থাকিতে পারেন না। হিন্দুসমাজ বয়ঃস্থা কন্যাকে বিবাহিত না করিয়া ঘরে রাখিলে কন্যাকর্ত্তার উপর সমাজের বিশেষ শাসন হইয়া থাকে, সুতরাং অর্থসম্বলবিহীন কন্যাকর্ত্তা সামান্য অর্থব্যয়ে অপাত্রে কন্যা-দান করিতে বাধ্য হন। বিবাহের দোষে অনেক কন্যা চিরদুঃখিনী হন।

প্রাচীন হিন্দুসমাজ চিরকাল রক্ষণশীল। নারীদিগের পক্ষে কোন বিষয়ে উন্নতির পথ মুক্ত নহে। বরং দিন দিন ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ে তাঁহাদের অবনতি ঘটিতেছে, পূজার্চ্চনা পরসেবাদি বিষয়ে নিষ্ঠার হ্রাস হইতেছে; তরুণবয়স্কা মহিলাদের স্বাভাবিক শক্তি ও সদ্‌গুণ সকল প্রস্ফুটিত হইতে পারিতেছে না, সামাজিক নির্য্যাতনে ও কুসংস্কারপূর্ণ অভিভাবকদিগের নিপীড়নে তাঁহাদের আন্তরিক উচ্চভাব সকল নিষ্পেষিত হইতেছে ও শুকাইয়া যাইতেছে। তাঁহারা জানিয়া শুনিয়া নানা কুসংস্কার ও অসত্যের শরণাপন্ন থাকিতে বাধ্য হইতেছেন। প্রাচীন কুরীতি ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে একটী কথা কহিবার তাঁহাদের কাহারও সাধ্য নাই। চিরকাল এক ভাবে স্থিতি ভিন্ন তাঁহাদের অগ্রসর হইবার সুযোগ কোথায়। ইঁহারা প্রায়ই সেকেলে রকম বস্ত্রালঙ্কার ব্যবহার করেন। এক্ষণ অলঙ্কারের পরিমাণ কিছু কমিয়াছে।

প্রাচীন শ্রেণীর হিন্দু মহিলাদিগের অবস্থা হইতে নব্য শ্রেণীর হিন্দু মহিলাদিগের অবস্থা অনেক ভিন্ন। তাঁহারা নামে মাত্র হিন্দু, কিন্তু তাঁহাদের রীতি নীতি আচার ব্যবহার হিন্দুর মত নহে, তাঁহারা হিন্দুয়ানীর প্রায় কোন ধার ধারেন না, পূজার্চ্চনা ধর্ম্ম কর্ম্ম বড় মানেন না। কেবল পুত্র কন্যার বিবাহের সময় হিন্দু পুরোহিতকে মন্ত্র পড়াইবার জন্য আহ্বান করা হয়, বিবাহসভায় শালগ্রাম ঠাকুর স্থাপিত হইয়া থাকে, কন্যা হিন্দু দেব দেবীর নামে মন্ত্রাদি উচ্চারণ করেন, এই পর্য্যন্ত হিন্দুয়ানীর সঙ্গে তাঁহাদের সম্পর্ক। তাঁহারা কন্যাকে বয়ঃস্থা করিয়াই বিবাহ দেন, তাঁহাদের আহারাদি কতক বিবিয়ানা রকম, তাহাতে কোনরূপ জাতি বিচার নাই, খানসামা পরিবেশন করে, ছাগল কুক্কুটাদির মাংস বাবুর্চ্চি রাঁধিয়া দেয়। নব্য হিন্দু মহিলারা চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর কাটা চামচ যোগে সে সকল ভোজন করেন। তাঁহারা অপর পুরুষ দেখিলে ঘোমটা টানিয়া এক পার্শ্বে সরিয়া গিয়া লজ্জার পরিচয় দান করেন না; এবং অন্য পুরুষের সঙ্গে বসিয়া এক টেবিলে ভোজন করিতে তাঁহাদের আপত্তি নাই। সচরাচর তাঁহারা বিলাত ফেরত বড়লোকদিগের পত্নী বা কন্যা। এই সকল নব্য হিন্দু মহিলাদিগের অনেকেই কুসংস্কারবিবর্জ্জিতা সুশিক্ষিতা। বালিকাগণ বিবীদের স্কুলে রীতিমত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অনেকে বিলাতী শিল্পকর্ম্ম, চিত্রবিদ্যা এবং গীত বাদ্যাদিতেও নৈপুণ্য লাভ করে। রন্ধন ও গৃহকর্ম্মাদিতে প্রায় সকলেরই অবহেলা, পূজার্চ্চনা ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠে তাঁহাদের উপেক্ষা দেখা যায়। তাঁহারা প্রত্যহ ২।৩ বার চা পান করেন, কখন কখন চা সমিতিতে নিমন্ত্রিত হইয়া যাইয়া আমোদ গল্প করিয়া থাকেন, তাঁহারা পরিমিতরূপে অলঙ্কার পরিধান করেন, কিন্তু তাঁহাদের পোষাকের জাঁকজমক অত্যন্ত অধিক। তাঁহাদের পরিচ্ছদাদিতে নূতন নূতন প্রণালীর আড়ম্বর দেখায়।

নব্যশ্রেণীর বঙ্গনারীর অন্তর্গত ব্রাহ্মিকা

মহিলাগণ আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর ব্রাহ্মিকা মহিলাতে আর নব্য শ্রেণীর হিন্দু মহিলাতে বড় প্রভেদ নাই। কেবল নব্য শ্রেণীর হিন্দু মহিলারা পুতুল পূজা করিয়া পুত্র কন্যাদের বিবাহ দেন, ইঁহারা ব্রহ্মোপাসনা করিয়া তাহাদের বিবাহ দিয়া থাকেন এবং স্বয়ং বিবাহিত হন। ইঁহাদের গৃহেও নিয়মিতরূপে নিত্য ব্রহ্মোপাসনা হয় না। তবে বৎসরান্তে উৎসবাদিতে প্রায় ইঁহারা ব্রহ্মমন্দিরে গিয়া উপাসনাতে যোগদান করিয়া থাকেন। আচার ব্যবহার ভোজন পরিচ্ছদাদি সকল বিষয়ে ইঁহারা নব্যশ্রেণীর হিন্দু মহিলাদের অনুরূপ। ইঁহারা ব্যাকরণানুসারে ব্রাহ্মের স্ত্রী ব্রাহ্মিকা।

অপর শ্রেণীর ব্রাহ্মিকারা পারিবারিক উপাসনাদিতে যোগদান করেন, গৃহে উপাসনার জন্য বিশেষ স্থান আছে, তথায় নিত্য উপাসনা হয়, মহিলারা সময়ে সময়ে ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ ও ধর্ম্মচর্চ্চা করেন। ইঁহারা বিজাতীয় আচার ব্যবহারের একান্ত পক্ষপাতী হইয়া জাতীয় উৎকৃষ্ট রীতি নীতি পরিত্যাগ করেন না। ইঁহারা কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতা ত্যাগ করেন, কিন্তু প্রাচীন বিশুদ্ধ রীতি নীতি ও আচার ব্যবহারানুসারে চলিয়া দেশীয় ও জাতীয় ভাবকে সমর্থন করেন। ইঁহারা বিবিয়ানার পক্ষপাতিনী নহেন, সাধ্বী আর্য্যনারীদিগের চরিত্রের পক্ষপাতিনী। ইঁহারা বস্ত্রালঙ্কারাদিতে যতদূর সম্ভব মিতাচারিণী হইয়া চলেন। পরসেবা ও গৃহকর্ম্মাদিতে অবহেলা করেন না। কিন্তু ঈদৃশ অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মিকার সংখ্যা অল্প।

ব্রাহ্মসমাজ প্রধানতঃ দুই ভাগে। বিভক্ত, আদি সমাজ ও উন্নতিশীল সমাজ। আদি সমাজ স্বর্গগত মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের নেতৃত্বাধীন। উহা উন্নতিবিমুখ রক্ষণশীল। মহর্ষি স্ত্রীজাতির জ্ঞানোন্নতি বিধান ও স্বাধীনতা দানাদি বিষয়ে বিশেষ অনুকূল ছিলেন না। তিনি বয়ঃস্থা হওয়ার পূর্ব্বে বালিকাদিগকে স্বজাতীয় পাত্রে বিবাহ দানের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মগত পৌত্তলিকতা বিবর্জ্জিত সংস্কৃত হিন্দুধর্ম্ম। তিনি প্রায় সকল বিষয়ে হিন্দুভাবাপন্ন ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পরিবারস্থ অনেক মহিলাই, ঠিক তাঁহার মত ও ভাবে পরিচালিত হন নাই, অনেক বিষয়ে মুক্তভাবে চলিয়া থাকেন কেহ কেহ সাহিত্য জগতে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

উন্নতিশীল সমাজের নেতা স্বর্গগত আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন। তিনি নারীজাতির সর্ব্বতোমুখী উন্নতির জন্য যত্ন চেষ্টা করিয়াছেন। উক্ত উন্নতিশীল সমাজ নববিধান সমাজ নামে আখ্যাত। আচার্য্যের প্রতি বিরুদ্ধভাব ও অবিশ্বাস বশতঃ তাঁহার কতকগুলি অনুগামী কর্ত্তৃক এক নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাকে সাধারণসমাজ বলে। সাধারণ সমাজ ধর্ম্মের সাধারণ ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত। নববিধান সমাজের অনেক বিষয়ে বিশেষত্ব আছে। উভয় সমাজে অনেক সময় পরস্পর বিবাহাদি সম্বন্ধ হয় বটে, কিন্তু পরস্পর মতের অনৈক্যবশতঃ গোলযোগ ও সংঘর্ষণ হইয়া থাকে। সাধারণ সমাজে

স্ত্রী স্বাধীনতাদি বিষয়ে বাহ্যিক ভাব প্রবল, নববিধান সমাজ সে বিষয়ে কিছু সংযত। উভয় সমাজে বহু কন্যা বয়ঃস্থা হইয়া উপযুক্ত পাত্রাভাবে তাঁহাদের অনেকেরই বিবাহ হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দুসমাজের পিতামাতা বালক বালিকাদিগকে তাহাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিবাহ দিয়া থাকেন, এই ব্রাহ্মসমাজে তাহা হইতে পারে না। বিবাহে পাত্র পাত্রীর স্বাধীনতা আছে, তাহাদের অমত ও অনিচ্ছাতে অভিভাবকগণ তাহাদিগকে পরিণয়সূত্রে বদ্ধ করিতে পারেন না।

পূর্ণবয়স্ক অনেক পাত্রপাত্রী পিতা মাতার মতনিরপেক্ষ হইয়া স্বাধীন ভাবে বিবাহ করেন। যে মণ্ডলীর অন্তর্গত সেই মণ্ডলীকে অতিক্রম করিয়া অনেক পাত্র স্বেচ্ছানুসারে অপর মণ্ডলীতে বা কোন ধর্ম্মসমাজভুক্ত নয় এমন পরিবারে কন্যা মনোনীত করিয়া থাকেন। ইহা অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। বিবাহে অনেক পাত্র ও পাত্রী উচ্চ ধর্ম্মভাবে পরিচালিত হইয়া থাকেন। আমরা জানি নববিধান মণ্ডলীতে ৩০। ৪০টী কন্যা বয়ঃস্থা, এবং অনেক কন্যার বিবাহের বয়স পার হইয়া গিয়াছে। তাহাদের বিবাহ হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। অনুসন্ধানে পাত্র পাওয়া গেলেও তাহাদের সম্মতি পাওয়া দুষ্কর। হইয়াছে! পিতা মাতা কন্যাদায়গ্রস্থ হইয়া পড়িয়াছেন, সর্ব্বদা চিন্তিত ও ব্যস্ত, বন্ধু বান্ধব যোগে নানা স্থানে প্রস্তাব পাঠাইতেছেন, চেষ্টা যত্নের সফলতা না দেখিয়া নিরাস ও নিরুপায় হইয়া পড়িতেছেন।

কন্যার বিবাহে বিশ্বাসী ব্রাহ্ম ভগবানের ইঙ্গিত বুঝিয়া চলিলে তাঁহার অন্তরের ভার অনেক লাঘব হইতে পারে। আমরা একপ বুঝিতেছি যে বিধাতার এরূপ ইচ্ছা যে বিশ্বাসী মণ্ডলীর অনেক কন্যা জ্ঞানধর্ম্মে সমুন্নত হইয়া চিরকৌমার্য্যব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক স্বদেশের নারীজাতির সেবাতে জীবন উৎসর্গ করিবেন। নারী সমাজের নানা বিষয়ে অতিশয় হীনাবস্থা। পুরুষের দ্বারা তাহার অবস্থার উন্নতি ও সংশোধন হইয়া উঠে না। জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নত হইয়া নারীগণ একার্য্যে জীবন উৎসর্গ না করিলে নারীজাতির প্রকৃত কল্যাণ অসম্ভব। স্ত্রী ও পুরুষ এই দুইয়ের যোগে মানবজাতি। স্ত্রী অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপ, নারীসমাজ বিকল ও অনুন্নত থাকিলে কেবল পুরুষ দ্বারা জাতীয় উন্নতি হইতে পারে না। দেহের বামপার্শ্ব অনুন্নত ও বিকল, কেবল দক্ষিণ পার্শ্ব সুস্থ ও উন্নত হইলে কি দেহের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি হয়? উভয় পার্শ্ব সবল ও সুস্থ হইলেই সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি। এদেশের নারীজাতির জ্ঞানোন্নতি সাধনার্থ নারীহিতৈষী পুরুষগণ বিলাত হইতে জ্ঞানোন্নত মহিলাদিগকে আনিয়া নিযুক্ত করেন। ইহ স্বাভাবিক নয়। এ দেশের সুশিক্ষিতা ধর্ম্মোন্নতা নারীগণ এদেশের নারীসমাজের সংস্কারে প্রাণ মন উৎসর্গ করিলে যথার্থ কল্যাণ হয়, বিলাতের উন্নত মহিলাদিগের দ্বারা এদেশের নারী সমাসমাজের অনেক উন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে সত্য, কিন্তু তাঁহাদের প্রকৃতি, ভাব ও রুচি স্বতন্ত্র, এদেশের নারীদিগের উপযোগী

নহে। তাঁহাদের দ্বারা অনেক স্থলে বিকৃত শিক্ষা হয়। এ বিষয়ে স্বদেশী বিদেশী প্রভেদ করিলে ভাল হয়। চির কৌমার্য্যব্রতধারিণী শত শত জ্ঞানোন্নত ইয়ুরোপীয় মহিলা সাগর পর্ব্বতাদির বাধা অতিক্রম করিয়া সহস্র সহস্র ক্রোশ দূরে অজ্ঞাত ও অপরিচিত দেশে যাইয়া নারীজাতির সেবাতে নিযুক্ত আছেন, তজ্জন্য দুঃখ ক্লেশ বিপদকে জীবনের অলঙ্কার করিয়া লইয়াছেন। জ্ঞানোন্নত বঙ্গনারীগণ স্বদেশীয় ভগিনীদিগের সেবাতে কেন ত্যাগস্বীকার করিবেন না? আমরা জানি দুই চারি জন জ্ঞানোন্নতা বাঙ্গালী যুবতী হায়দরাবাদ,ত্রিবাঙ্কুর মহিশুর প্রভৃতি ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাইয়া স্ত্রীশিক্ষাকার্য্যের ভার গ্রহণপূর্ব্বক বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, এবং তাঁহাদের অনেক সম্মান ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। বঙ্গদেশে উপযুক্ত বাঙ্গালী শিক্ষয়িত্রীর অত্যন্ত অভাব, তজ্জন্য ইংলণ্ডের শরণাপন্ন হইতে হয়, বহু অর্থব্যয়ে সেদেশ হইতে শিক্ষয়িত্রী আনয়ন করা হইয়া থাকে। দেশীয় ভাবে যাহাতে এ দেশের নারীদিগের শিক্ষা হয়, যাহাতে তাঁহারা ধর্ম্ম ও নীতি জ্ঞানে উন্নত হইয়া সুমাতা, সুগৃহিণী এবং সুপত্নী হইতে পারেন, প্রাচীন আর্য্যনারীদিগের বিশুদ্ধ রীতি নীতি ও ধর্ম্মভাবকে চরিত্রের ভূষণ করিয়া আদর্শ সতীনারী হইতে পারেন, এরূপ শিক্ষার প্রয়োজন। বিদেশীয় মহিলাদিগের দ্বারা সেরূপ শিক্ষাদান হইয়া উঠা সুকঠিন। কতিপয় বাঙ্গালী মহিলা শিক্ষালাভ করিয়া স্বদেশীয় ভগিনীদিগকে শিক্ষাদানের জন্য জীবন উৎসর্গ করিলে তাঁহাদের ও এদেশের নারীজাতির প্রভূত কল্যাণ হয়। বিবাহিত জীবনে তাহা হইয়া উঠে না। অনেক যুবতী কুমারী বিদ্যাশিক্ষা করিয়া কত সুন্দর সুন্দর গদ্য পদ্য প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, সভা সমিতি চালাইয়াছেন, স্বদেশীয় ভগিনীদিগের উন্নতিসাধনে নানাপ্রকার উৎসাহ ও উদ্যম প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা কত আশা করিয়াছি যে ইহার দ্বারা নারীজাতির মুখোজ্জ্বল হইবে কিন্তু যাই বিবাহ হইয়াছে তাঁহার সেই সমুদায় স্বর্গীয় ভাব নির্ব্বাণ পাইয়াছে, সংসাররূপ অগাধ জলধিগর্ভে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। বিবাহের পর অনেক বঙ্গবালা লেখাপড়া এক প্রকার ভুলিয়া যান, অন্যরূপ জীবনধারণ করেন। নারীসমাজে কার্য্যক্ষেত্র প্রশস্ত, বহু সেবিকা ও বহু কর্ম্মপ্রচারিকার প্রয়োজন। নারীহিতৈষী পুরুষগণ হইতে তাঁহারা সাহায্য ও উৎসাহ পাইবেন, কিন্তু প্রকৃত কার্য্য পুরুষদিগের দ্বারা হইবে না। ধর্ম্মানুরাগিণী সুনীতিপরায়ণা সুশিক্ষিতা নারীদিগকে জীবনদান করিতে হইবে, তবে সুফল ফলিবে। পিতা মাতা কন্যার বিবাহের জন্য চিন্তা না করিয়া উপযুক্ত জ্ঞানধর্ম্ম শিক্ষা দানে তাঁহাকে পবিত্র সেবাব্রত পালনের জন্য প্রস্তুত করুন। তাহাতে তাহার মঙ্গল, পরিবারের মঙ্গল ও দেশের মঙ্গল হইবে, এক একজন ইয়ুরোপীয় ব্রতধারিণী কুমারী মহিলা নারীজগতের কত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনপ্রভায় কত দেশ গৌরবান্বিত

হইয়াছে, তাঁহাদের পবিত্র জীবন জাজ্বল্যমান। বর্ত্তমান সময়ে একটী বঙ্গ মহিলাকেও সেই সকল দেবীপ্রকৃতি নারী জীবনের অনুকরণ করিতে দেখা যায় না।

প্রতিভাশালিনী শার্লোটি ব্রোণ্টি

৩য়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

একে একে শার্লোটির সকল উদ্যম ব্যর্থ হইল। বড় আশায় বুক বাঁধিয়া তিনি গল্পপুস্তক প্রকাশে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার কোন আশাই ফলবতী হইল না, গ্রন্থপ্রকাশকগণের নিকট হইতে শুধুই অসম্মতিজ্ঞাপক পত্র পাইতে লাগিলেন। এরূপ অপ্রত্যাশিত নিরাশার কঠোর কষাঘাতে অনেক দৃঢ়চেতা লোকের হৃদয়ও বিচলিত হইয়া থাকে, কিন্তু শার্লোটির বীর হৃদয় অচল অটুট রহিল, তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট না হইয়া দ্বিগুণিত উৎসাহ ও প্রতিজ্ঞার সহিত সংগ্রামে পুনঃ প্রবৃত্ত হইলেন। যে "জেন্ আয়ার" গ্রন্থ শার্লোটিকে ইংরাজী সাহিত্য মঞ্চের অতি উচ্চাসনে সংস্থাপনা করিয়াছে এবং যাহার জন্য ইংরাজী সাহিত্য গৌরবান্বিত—এই প্রকার মানসিক অবস্থা লইয়া শার্লোটি এক্ষণ সেই গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যে তাঁহার কথা তিনি সাধারণকে জানাইবেনই। উল্লিখিত সর্ব্ববিধ অননুকূল অবস্থার সহিত সম্পূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া শার্লোটি ব্রোণ্টি এই নূতন উদ্যমে যে অনন্য সাধারণ সাহস ও অধ্যবসায়ের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার বীরত্ব ও মহত্ত্ব। তাঁহার অনেক জীবনচরিত লেখক এতদুপলক্ষে বলিয়াছেন, তাঁহার (শার্লোটির) পারিবারিক অবস্থার বিষয় চিন্তা করুন, উন্মার্গগামী সহোদরের অনুতাপদগ্ধ কলঙ্কময় দুর্ব্বহ জীবন, জনকের দৃষ্টিশক্তির প্রায় সম্পূর্ণ তিরোধান, ভগিনীর ভগ্নস্বাস্থ্য ও শার্লোটির উপর একান্ত নির্ভর, পূর্ব্বরচিত-গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির সঙ্গে তৎকালেও লণ্ডনস্থ গ্রন্থপ্রকাশকগণের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ—এইসমস্ত বিষয় ভাবুন, আর প্রশংসা করুন, এরূপ অবস্থায়ও কিরূপ ধৈর্য্য ও অবিচলিত সাহস সহকারে "জেন্আয়ার"এর ন্যায় গ্রন্থ লিখিত হইতেছিল।" আত্মশক্তির উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন ব্যতিরেকে কাহারও পক্ষে ঈদৃশ দৃঢ়তাবলম্বন সম্ভবপর নহে।

সাংসারিক বহুবিধ অভাব, দুঃখ, চিন্তা, যুগপৎ সমুপস্থিত হইলে মানুষ সচরাচর একান্ত বিমূঢ় ও ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠে। শার্লোটি ও তাঁহার ভগিনীগণ সে গুলিকে মনের এক প্রান্তে সরাইয়া রাখিয়া পরস্পরের লিখিত ও কল্পিত গল্প উপাখ্যানের বিভিন্ন চরিত্রের ধীর সমালোচনা ও তাহাদের উৎকর্ষসাধনের চেষ্টায় সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন। কল্পিত নায়ক নায়িকার সুখ দুঃখময় কাল্পনিক জীবনের উত্থান পতন অনুসরণ করিয়া তাঁহারা স্বকীয় জীবনের প্রকৃত দুঃখ দারিদ্র্য ভুলিয়া থাকিতে পারিয়াছিলেন। সংসারের প্রকৃত দুঃখ যন্ত্রণা অগ্রাহ্য করিয়া কল্পনাজগতে

এরূপ ভাবে সম্পূর্ণ আত্মনিমগনের দৃষ্টান্ত নিতান্তই বিরল।

শার্লোটির "জেন্‌আয়ার" গ্রন্থ একখানি উপন্যাস মাত্র। উপন্যাসের নায়িকাগণকে সাধারণতঃ অসামান্য রূপলাবণ্য ও সকল প্রকার উৎকৃষ্ট গুণাবলীতে বিভূষিত করার রীতি এ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছিল। শার্লোটি এই চির প্রচলিত প্রথার সম্পূর্ণ প্রতিকূলবর্ত্তিনী হইয়া "জেন্‌আয়ারের" চিত্র অঙ্কিত করিতে সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহার ভগিনীগণ তাহাতে আপত্তি করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "নায়িকার চিত্রাঙ্কনে বাহ্যসৌন্দর্য্যের একান্ত আবশ্যকতা কিছুনাই, বস্তুতঃ ঐ প্রকার ধারণই। সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও গর্হিত। আমি প্রমাণ করিয়া দেখাইব যে তোমরা এ বিষয়ে প্রকৃতই ভ্রান্ত এবং তোমাদের সমক্ষে আমারই মত সাদাসিদে ও খর্ব্বাকার এমন এক নায়িকা উপস্থিত করিব যাহা তোমাদের যে কোন নায়িকার সমকক্ষ হইবেই।" শার্লোটি নিজে যেমন আড়ম্বরশূন্য, নিখুত পরিচ্ছন্ন ও সাদাসিদে রকমের ছিলেন, তাঁহার জেন্‌আয়ারকেও তিনি প্রায় তদ্রূপই অঙ্কিত করিয়াছিলেন। প্রতিভার উদ্দীপনায় উত্তেজিত হইয়া তিনি অপরিসীম উৎসাহ সহকারে গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ ছিল, এজন্য চক্ষের অত্যন্ত সন্নিকটে কাগজ রাখিয়া অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে তিনি লিখিতেন। ক্রমাগত তিন সপ্তাহ কালের অবিরাম পরিশ্রমে গ্রন্থের অনেকাংশ লিখিত হইল। কিন্তু এই কঠোর পরিশ্রমের ফলে শার্লোটিকে জ্বরাক্রান্ত হইয়া কিছুকাল বিরাম লইতে হইয়াছিল। ওদিকে তাঁহার অপর গ্রন্থ "প্রফেসর" তখনও লণ্ডনের গ্রন্থপ্রকাশকগণের কৃপাভিখারী হইয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেছিল। উহা এইরূপে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে স্মিথ ও এল্ডার নামধেয় গ্রন্থপ্রকাশকগণের হাতে পঁহুছিল। তাঁহারা ঐ গ্রন্থের সারবত্তা উপলব্ধি করিলেন বটে, কিন্তু অপর কতগুলি কারণে তাহা প্রকাশ করিতে সম্মত হইলেন না। তবে আশা দিলেন যে উক্ত রচয়িত্রীর লিখিত প্রচলিত তিন খণ্ডে সমাপ্ত অপর কোনও গ্রন্থ থাকিলে তাহা প্রকাশ করিবেন। এই আশা ও উৎসাহ পাইয়া শার্লোটি ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত স্মিথ ও এল্ডারের নিকট "জেন্‌আয়ারের" পাণ্ডুলিপি প্রেরণ করিলেন। মিঃ স্মিথ ঐ পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া এমন বিমুগ্ধ হইলেন যে, তখনই তাহা প্রকাশ করিতে সম্মত হইলেন। শার্লোটির বহুকালের আশা এতদিনে ফলবতী হইতে চলিল। গ্রন্থ প্রকাশিত হইল এবং এবারও রচয়িত্রীর প্রকৃত নাম গুপ্ত রহিল। গ্রন্থ প্রকাশের পর তিন মাস মধ্যেই লেখিকার যশ সমস্ত ইংলণ্ডে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। "জেন্‌আয়ার" প্রথম শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলিয়া বিদ্বৎসমাজে পরিগণিত ও পরিগৃহীত হইল—প্রতিভা ও অধ্যবসায় পুরস্কৃত হইল।

"জেন্‌আয়ার" চিত্র কল্পনার নূতন সৃষ্টি। শার্লোটি ব্রোণ্টি এই চিত্র অঙ্কিত করিতে যাইয়া যেরূপ সম্পূর্ণ মৌলিকতা,

ঘটনাবিন্যাসনৈপুণ্য ও বর্ণনা কুশলতা প্রকাশ করিয়াছেন সর্ব্বোপরি সমাজের সমক্ষে যে অভিনব উচ্চ আদর্শ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহারই জন্য তাঁহার যশ অতি অল্প সময় মধ্যে সমগ্র ইংলণ্ডে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। যতদিন ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য থাকিবে, শার্লোটির এই অক্ষয় কীর্ত্তি তত কাল থাকিবে।

শার্লোটির শোকদুঃখময় জীবনাখ্যায়িকায় ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ একটী অতি ক্লেশকর পরিচ্ছেদ। কয়েকখানা নূতন গ্রন্থ প্রকাশের মানসে শার্লোটি ও এন্ উক্ত বৎসর সর্ব্বপ্রথম লণ্ডন নগরে গিয়াছিলেন। সেই মহানগরীতে তাঁহারা পরম সমাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন। এই ক্ষণিক সুখশান্তির অন্তরালে ইঁহাদের জন্য যে ঘোরতর অশান্তি ও নিরানন্দের দারুণ শেল নির্ম্মিত হইতেছিল, তাহা তাঁহারা প্রথমতঃ বুঝিতে পারেন নাই। হঠাৎ এক দিন ভ্রাতা ব্রেণওয়েলের কঠিন পীড়ার সংবাদ অবগত হইয়া শার্লোটি ও এন্‌কে লণ্ডন পরিত্যাগ করিতে হইল। যথেচ্ছাচারিতা ও অতিরিক্ত পানদোষ প্রভৃতি দুষ্ক্রিয়া দ্বারা ব্রেন্‌ওয়েল তাঁহার উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ অপচয় সাধন করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে অকালে বৃদ্ধ পিতা ও স্নেহশীলা ভগিনীগণকে গভীর শোকসন্তপ্ত করিয়া তিনি পরলোকগামী হইলেন। নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের ন্যায় মুমূর্ষু কালে তাঁহার সদ্‌জ্ঞানের সঞ্চার হইয়াছিল। এই শোককর ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া শার্লোটি লিখিয়াছেন, "ভ্রাতা ব্রেণওয়েল এক্ষণ ভগবানের হস্তে—ভগবান সর্ব্বশক্তিমান্ ও পরম দয়াশীল। ভ্রাতা তাহার কষ্টকর ক্ষণিক ভ্রান্ত জীবনাবসানের পর, এই ক্ষণ পরম শান্তিতে অবস্থান করিতেছে এই গভীর বিশ্বাসে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ এবং তাহাতেই আমি মনে শান্তি অনুভব করিতেছি। তাহার শবদেহের করুণাত্মক মলিন দৃশ্য ও শেষ বিদায়, এ দুটী ঘটনায় আমি কল্পনাতীত কষ্টানুভব করিয়াছিলাম। শেষ মুহূর্ত্ত সমুপস্থিত না হইলে আমরা বুঝিতে ও জানিতে পারি না যে আমরা আমাদের আত্মীয় বিশেষের জন্য কি পরিমাণ শোক করিতে পারি ও তাহাকে কতটা ক্ষমা করিতে পারি। ভ্রাতার দুষ্ক্রিয়াগুলি এখন আর কিছুই নহে, আমরা শুধু তাহার দুঃখের কথাগুলি স্মরণ করি।"

শার্লোটির কুসুম কোমল দয়ার্দ্র হৃদয়ের জন্য এতদপেক্ষাও গভীরতর শোক অপেক্ষা করিতেছিল। এমিলি ও এন্ উভয়েরই স্বাস্থ্য দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছিল। ব্রেণওয়েলের পরলোক গমনের দুই মাস পরই এমিলি সংসারের লীলা সমাধা করিয়া অমরধামে যাত্রা করিলেন। কথিত আছে, এমিলির একটী বিশ্বস্ত প্রিয় কুকুর তাঁহার শবের সঙ্গে সমাধি স্থান পর্য্যন্ত গিয়াছিল এবং শান্ত ভাবে তাঁহার পারলৌকিক ক্রিয়ার আদ্যন্ত অবলোকন করিয়া অবশেষে গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক এমিলির শূন্য কক্ষ দ্বারে পতিত হইয়া ক্রমাগত অনেক দিন পর্য্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া শোকপ্রকাশ

করিয়াছিল। শার্লোটি তাঁহার "শার্লি" নামক গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন।

শার্লোটির ভীষণ পরীক্ষা এখনও শেষ হয় নাই। ভ্রাতা ভগিনীদের মধ্যে এখন একমাত্র এন্ তাঁহার সহচরী ছিলেন। কিন্তু এনের অবস্থাও অতি শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। বিচক্ষণ চিকিৎসকগণের উপদেশানুসারে সমুদ্র বায়ু সেবনে উপকারের প্রত্যাশায় তাঁহাকে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে স্কারবরোতে স্থানান্তরিত করা হইল। সুশীলা এন্ গভীর ধর্ম্মবিশ্বাসে অণুপ্রাণিত হইয়া সমস্ত রোগযন্ত্রণা শান্ত চিত্তে ও অতুলনীয় ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করিয়া আসিতেছিলেন। স্থান পরিবর্ত্তনেও তাঁহার স্বাস্থ্যের কোনও উন্নতি পরিলক্ষিত হইল না—এক সপ্তাহ কাল মধ্যেই তাঁহার সরল শুদ্ধাত্মা নশ্বর জগতের বন্ধন ছিন্ন করিয়া স্বর্গগামী হইল। মৃত্যুর শেষ যন্ত্রণা উপস্থিত হওয়ার প্রাক্কালে তাঁহাকে বহন করিয়া একটী শোফাতে শয়ান করান হইয়াছিল। তখন জনৈক বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তিনি একটু আরাম বোধ করিতেছেন কিনা, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমরা এমন কেহই নও যে আমাকে আরাম দিতে পার। ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশুর কৃপায় শীঘ্রই সমস্ত সুখকর হইবে।" তাঁহার মৃত্যুভয় ছিল না—তিনি সর্ব্বদা তজ্জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। সেই দুরদেশেই তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হইয়াছিল। বসন ভূষণের ন্যায় ভৌতিক দেহ মানবাত্মার বাহ্যাবরণ মাত্র মনে করিয়া শার্লোটি সমধির স্থানসম্বন্ধে কোনও তর্ক উপস্থিত করেন নাই।

উপর্য্যুপরি এরূপ ভীষণ শোকাগ্নিতে দগ্ধ হইয়াও শার্লোটি যেরূপ আত্মসংযম ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না।

শার্লোটির অপর গ্রন্থ "শার্লি" প্রায় এই সময়েই প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম হইতেই এই গ্রন্থ যথেষ্ট আদৃত হইয়াছিল—ইহার বিস্তৃত পাঠকমণ্ডলীর অনেকের মতে কোন কোন বিষয়ে এই গ্রন্থ "জেন্ আয়ার" অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এতকাল পরে গ্রন্থকর্ত্রীর প্রচ্ছন্ন নাম প্রকাশিত হইয়া পড়িল। অতঃপর তিনি যখন লণ্ডননগরে গিয়াছিলেন, তখন সর্ব্বত্র এত অধিক আদর যত্ন পাইয়াছিলেন যে,তাহাতে তিনি একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তৎকালের প্রসিদ্ধ লেখক ও লেখিকাদের সহিত তিনি বিশেষ পরিচিত ও সৌহার্দ্দসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। এরূপ খ্যাতিলাভসত্ত্বেও শার্লোটির জীবন সুখময় ছিল না। অতীতের শোকস্মৃতি তাঁহার হৃদয়কে গভীর বিষাদচ্ছায়ায় ঢাকিয়া রাখিত। সংসারে তিনি এখন একাকিনী, যে ভগিনীগণ তাঁহার জীবনের সঙ্গিনী ছিলেন, তাঁহারা একে একে মরজগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। এক মাত্র বৃদ্ধ পিতা—তিনিও অধিকাংশ সময়ই আপন নির্জ্জন কক্ষে অতিবাহিত করিয়া থাকেন। এরূপ জীবন নিতান্ত দুর্ব্বহ, হইয়া পড়ে। শার্লোটি তখনও তাঁহার

স্বাভাবিক সংযম ও সহিষ্ণুতার রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন।

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে শার্লোটির শেষ গ্রন্থ "ভিলেট" প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থেও তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। পাঠকমণ্ডলী পরম আগ্রহ সহকারে ইহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

মিঃ ব্রোণ্টির সহকারী ধর্ম্মযাজক মিঃ নিকলস্ এই সময়ে শার্লোটির পাণিপ্রার্থী হইয়া পরিণয় প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি বহুকাল যাবৎ শার্লোটির পবিত্র জীবনের উচ্চব্রত ও তাহার উদ্‌যাপন আয়োজন লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন, এবং অজ্ঞাতসারে তৎপ্রতি গভীর প্রণয়াসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইঁহার অকৃত্রিম গাঢ় অনুরাগ উপলব্ধি করিয়া শার্লোটি এই প্রস্তাব উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। কিন্তু বিবাহে সম্মতিদানের পূর্ব্বে একবার বৃদ্ধ পিতার নিকট তাহা বিবৃত করা সঙ্গত বোধ করিলেন। মিঃ ব্রোণ্টি বিবাহের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন, বিশেষতঃ শার্লোটিই এক্ষণ তাঁহার এই পরিণত বয়সে শোকজর্জ্জরিত জীবনে একমাত্র শান্তিস্থল, সম্ভবতঃ তাঁহার বিচ্ছেদ নিতান্ত অসহনীয় হইবে মনে করিয়া তিনি বিবাহে সম্মতি দিতে প্রস্তুত হইলেন না। পিতৃভক্ত কর্ত্তব্যপরায়ণা কন্যা পিতার মতের প্রতিকূলতাচরণ করিয়া তাঁহাকে আরও শোককাতর করা নিতান্ত গর্হিত কার্য্য মনে করিলেন। মিঃ নিকলস্‌কে তাঁহার অসম্মতি জানাইলেন, এবং তাহাতে উজ্জ্বল আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন, যদিও নিঃসন্দেহ এই ঘটনায় তিনি প্রকৃত ব্যথিত হইয়াছিলেন। মিঃ নিকলস্ গভীর নিরাশায় ও মনোদুঃখে তাঁহার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। মিঃ ব্রোণ্টি অবশেষে তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে মিঃ নিকলস্ তাঁহার কর্ম্মে পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন। পরবর্ত্তী জুন মাসে তাঁহাদের উদ্বাহ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইল। মিঃ নিকলস্ অতঃপর ভার্য্যা সহকারে তাঁহার আত্মীয় বন্ধুবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আয়র্লণ্ড ভ্রমণ করিয়া আসিলেন, এবং হওয়ার্থে আসিয়া পরম সুখে ও শান্তিতে, গার্হস্থ্য জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

শার্লোটির বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "গ্রামবাসিগণ আমার স্বামীকে খাঁটি ক্রিশ্চিয়ান ও সদাশয় ব্যক্তি বলিয়া সম্মান করেন, তাহাতে আমার অন্তঃকরণে অপার আনন্দ হয়। আমি ভাবি, এরূপ উচ্চচরিত্র লাভ করা ও তাহার উপযুক্ত হওয়া, সাংসারিক সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য, যশঃ ও ক্ষমতালাভ অপেক্ষা অনেকাংশে অধিক শ্রেয়ঃ।...আমি সর্ব্বদাই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকি—চিন্তা করিবার আমার অবকাশ নাই। আমার প্রিয়তম স্বামীর ন্যায় আমিও সর্ব্বদা কর্ম্মশীল। তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে নয়টার সময় 'ন্যাশনেল স্কুলে' যান এবং সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত ছাত্রগণকে ধর্ম্মবিষয়ে শিক্ষা ও উপদেশ দিয়া থাকেন, এবং প্রায় প্রতিদিনই অপরাহ্ণে দরিদ্র গ্রামবাসিগণের কুটিরে কুটিরে যাইয়া তাহাদের দুঃখমোচনে যত্ন করিয়া

থাকেন। অবশ্য তাঁহার স্ত্রীর জন্যও তিনি কখন কখন কিছু কাজ রাখিয়া দেন—বলা নিষ্প্রয়োজন, তাঁহার স্ত্রী উক্ত মহৎ কার্য্যে তাঁহার সাহায্যকারিণী হইতে একটুও দুঃখিতা নহেন। সাহিত্যালোচনা ও চিন্তাশীলতার দিকে মনোযোগী না হইয়া আমার স্বামী যে পরোপকার ও তদ্রূপ কার্য্যে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি বিশ্বাস করি, আমার কোনও অপরাধ নাই।"

এত ঝটিকা ঝঞ্ঝাবাতের পর আশা করা যাইতে পারিত যে শার্লোটির অবশিষ্ট জীবন হয়ত দীর্ঘ ও সুখময় হইবে। কিন্তু ভগবান্ অন্যবিধ ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। মেঘান্তরাল হইতে সুখসূর্য্য সমুদিত হইতে না হইতেই তীর্থযাত্রীর পথ অকস্মাৎ সঙ্কীর্ণ ও শেষ হইয়া আসিল। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসের শেষভাগে শার্লোটি একদিন হঠাৎ সর্দ্দিতে আক্রান্ত হইলেন, সমস্ত শীত ঋতু তাহাতে কষ্ট পাইলেন। পীড়া প্রথমতঃ সামান্য বলিয়া অনুমান করা গিয়াছিল, কিন্তু ক্রমেই উহা কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহার স্বামী প্রাণপণে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছিলেন, কিন্তু মানুষের শক্তির একটা সীমা আছে। মার্চ্চ মাসে শার্লোটির অবস্থা অত্যন্ত ভীতিপ্রদ হইয়া উঠিল—ক্রমে বিকার উপস্থিত হইল। সময় সময় চৈতন্যসঞ্চার হইলে তিনি স্বামীর কাতর মুখমণ্ডলের দিকে তাকাইতেন। একদিন তাঁহাকে ধীরে ধীরে বলিয়াছিলেন "আমি অবশ্য মরিতে যাইতেছি না—আমরা এত সুখে ছিলাম, ভগবান নিশ্চয়ই আমাদের বিচ্ছেদ ঘটাইবেন না।" কিন্তু এই বিচ্ছেদ অতি শীঘ্র উপস্থিত হইল। ৩:শে মার্চ্চ শনিবার প্রাতঃকালে হওয়ার্থের গীর্জ্জার গম্ভীর ঘণ্টাধ্বনিতে শার্লোটির পরলোকগমন বার্ত্তা জগতে ঘোষিত হইল।

শার্লোটি ব্রোণ্টি পরলোকে যাইয়াও কথা বলিতেছেন, তাঁহার লিখিত গ্রন্থাবলীর ভিতর দিয়া আমরা তাঁহার কথা শুনিতে পাইতেছি। এই উচ্চশ্রেণীর মহিলার মহৎ জীবনের আলোচনা করিয়া আমরা তাহাতে সদাশয়তা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, স্বার্থত্যাগ, সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায় ও অসাধারণ প্রতিভার আশ্চর্য্য নিদর্শন দেখিয়া বিমুগ্ধ হই। মিস্ মার্টিনো সত্যই বলিয়াছেন, শার্লোটি ব্রোণ্টিতে "ভগবানের বিশেষ কৃপাপাত্র মহিলার অন্তর্দৃষ্টি, পুরুষের শক্তি, বীরোচিত সহিষ্ণুতা এবং সাধু মহাত্মার বিবেক ছিল।" R. M. S.

আমাদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

করাচি বন্দর।

আমরা গত আশ্বিন মাসে লিখিয়াছি যে, ১৩১২ সনের ১৪ই আষাঢ় প্রাতে করাচি বন্দরে উপস্থিত হইয়াছিলাম, শ্রীমান্ নন্দলাল এবং কতিপয় সিন্ধী ব্রাহ্ম বন্ধু ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া তত্রত্য ব্রহ্ম মন্দিরের সংলগ্ন নন্দলালের আশ্রমে লইয়া গিয়াছিলেন।

শ্রীমান্ নন্দলাল স্বর্গগত নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র, নব বিধানাচার্য্য স্বর্গগত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র। সিন্ধু হায়দরাবাদ নিবাসী স্বদেশহিতৈষী সুশিক্ষিত ভক্ত যুবা স্বর্গগত হীরানন্দের বন্ধুতা সূত্রে বদ্ধ হইয়া তিনি হায়দরাবাদে হীরানন্দের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কার্য্য করিবার জন্য ১৭ বৎসর পূর্ব্বে গিয়াছিলেন। এই দীর্ঘকাল সিন্ধুদেশেই যাপন করিয়াছেন, একবার বা দুইবার মাত্র ২।৪ দিনের জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। এবৎসর জন্মভূমি কলিকাতায় আসিয়াই বাস করিতেছেন। হীরানন্দের স্বর্গগমনের পর স্কুল পরিচালনের ব্যবস্থা তাঁহার মনোমত না হওয়াতে তিনি স্কুল পরিত্যাগ করিয়া হায়দরাবাদ হইতে করাচিতে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। নন্দলাল কৌমার্য্যব্রতধারী নির্জ্জনতাপ্রিয় ঋষিপ্রকৃতি যুবা। তখন তিনি ব্রহ্মমন্দিরের পার্শ্বস্থ একটি কুটীরে বাস করিতেছিলেন। তথায় নির্জ্জনে বসিয়া অধ্যয়ন ও চিন্তা করা এবং বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ানুসারে সুন্দর সুন্দর ছবি ও ফটো প্রস্তুত করা তাঁহার জীবনের নিত্য কার্য্য ছিল। আমরা গুরু নানক, রাজা রামমোহন রায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি মহাপুরুষ মহাজনদিগের অতি সুন্দর ছবি ও ফটো তাঁহা হইতে উপহার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। শার্টের বুতাম, পেন্‌সিলের উপরে তিনি অতি সুন্দর সুন্দর ক্ষুদ্র ছবি অঙ্কিত করেন, তাহা আমরা উপহার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দিত হইয়াছি। দেশ দেশান্তরে তাঁহার ছবি ও ফটো বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইয়া থাকে। লোকে সে সকল আদরপূর্ব্বক ক্রয় করে। তাহাতে যে অর্থাগম হয় নন্দলাল তদ্দ্বারা নিজের জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, এবং গোপনে দুঃখী দরিদ্র বন্ধুদিগের সাহায্য করিয়া থাকেন। আমরা তাঁহারই প্রকোষ্ঠে কয়েক দিন স্থিতি করিয়াছিলাম। আমরা তাঁহাকে প্রত্যহ কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান এবং মধ্যাহ্নে স্বহস্তে প্রস্তুত উপকরণশূন্য খিচড়ীভোজন করিতে দেখিয়াছি, এইরূপ একবার মাত্রই তাঁহার ভোজনের ব্যবস্থা ছিল। তিনি বেঞ্চের আকার এক খানা তক্তপোষে দারু নির্ম্মিত উপাধানে মস্তক স্থাপন করিয়া শয়ন করিতেন। তাঁহার কুটীরের পার্শ্বে সাধু হীরানন্দের নামে স্থাপিত হীরাকুটীর, সায়ংকালে করাচির ব্রাহ্ম বন্ধুগণ আসিয়া উক্ত হীরাকুটীরে সম্মিলিত হইয়াছেন, সঙ্গীত ও সৎপ্রসঙ্গাদি করিয়াছেন। সৎপ্রসঙ্গে নন্দলাল যোগদান করিতেন। নন্দলালের মুখমণ্ডলে সর্ব্বদা প্রফুল্লতা দেখিয়া আমরা অত্যন্ত সুখী হইয়াছি, তিনি নিজের পবিত্র ভাব ও বালকবৎ সরল মধুর প্রকৃতিতে সে দেশের সকলের শ্রদ্ধা প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন। করাচি ব্রহ্মমন্দির প্রাঙ্গণের পূর্ব্ব পার্শ্বে হীরাকুটীর, পশ্চিম পার্শ্বে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে খ্যাত দেবেন্দ্রাশ্রম গৃহ, সেই গৃহে ব্রহ্মপরায়ণ ডাক্তর রুদিণ সপরিবারে বাস করেন। মহর্ষির একটি সুন্দর অয়েল পেন্টিং আলেখ্য নন্দলালের কুটীরে রক্ষিত

দৃষ্ট হইয়াছে। ডাক্তার রুবিণ প্রিয় নন্দলাল কর্ত্তৃক সপরিবারে বিশেষরূপে উপকৃত। তিনি প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্নে কতিপয় সিন্ধী বালক বালিকাকে আমোদচ্ছলে ব্যায়াম শিক্ষা দান করেন, অপরাহ্নে বালক বালিকাগণ তাঁহার নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইয়া সঙ্গীত শিক্ষা করে। প্রতি রবিবার সমাজ গৃহে হিন্দী বা সিন্ধী ভাষায় সামাজিক উপাসনা হয়। মহিলারা আসিয়া এক পার্শ্বে বসিয়া উপাসনাতে যোগদান করেন। এস্থানে মহিলাদিগের জন্য পর্দ্দা স্থাপনের প্রয়োজন হয় না। স্বর্গগত পরমোৎসাহী বিধানপ্রচারক বলদেব নারায়ণ কর্ত্তৃক হায়দারাবাদ ও করাচি ব্রহ্মসমাজ বিশেষ রূপে উপকৃত। সে দেশের ব্রাহ্মিকা মহিলাগণও তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ভক্তি অন্তরে পোষণ করেন এবং তাঁহাকে স্মরণ করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিয়া থাকেন। এস্থলে এক জন পরম ভক্ত মোসলমান ব্রাহ্মের উল্লেখ করা যাইতেছে। কচ্ছ দেশে এই ভক্তের নিবাস, ইনি একজন ধনী লোক ছিলেন, স্ত্রী পুত্রাদি বিদ্যমান, সকল পরিত্যাগ করিয়া করাচিতে আসিয়া পরম ভক্ত বৈরাগীর ন্যায় জীবন যাপন করিতেছেন, সহাস্য বদনে একতন্ত্রীযোগে ভক্তি সহকারে পথে পথে দ্বারে দ্বারে ব্রহ্মনাম, হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া বেড়ান। ইহার অন্নবস্ত্রের চিন্তা নাই, নির্দ্দিষ্ট বাস স্থান নাই, লোকে আদর শ্রদ্ধা করিয়া ডাকিয়া আনিয়া ইহাকে ভোজন করায়। ইনি এক খণ্ড রুটি মাত্র ভোজন করিতে পাইলেই আনন্দিত হন। ইনি অতিশয় সরল হৃদয় সদা প্রফুল্ল নিশ্চিন্ত বৈরাগী, ভগবানের অনন্ত লীলা ও প্রেম এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনানকের মাহাত্ম্য বিষয়ে মধুর সঙ্গীত করিয়া বেড়ান, ব্রাহ্মসমাজের সামাজিক উপাসনায় যোগ দান করেন। ১৮ই রবিবার সমাজে ভক্তি বিষয়ে হিন্দী ভাষায় উপদেশ হইয়াছিল, সেই মোসলমান জাতীয় ভক্ত উপসনায় অত্যন্ত তৃপ্ত হইয়া আমাদের নিকটে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং পরে একতন্ত্রী যোগে প্রফুল্ল বদনে সুমধুর ভজন গাহিয়া আমাদিগকে পুলকিত করিয়াছিলেন।

তখন করাচি ব্রাহ্মসমাজের সভ্য জগুমল, ডাক্তার রুবিণ, ডাক্তার পিতমদাস, টিকম দাস, জঙ্গীমল, বালক প্রকৃতি পরসেবানুরক্ত হীরাসিংহ প্রভৃতি এবং এক মাত্র বাঙ্গালী শ্রীমান্ নন্দলাল সেনছিলেন। জগুমল পিতম দাস এবং টিকম দাসের আবাস অদূরে ব্রাহ্মসমাজ প্রাঙ্গণের সঙ্গে এক প্রকার সংলগ্ন। আমরা প্রিয় নন্দলালের কুটীরে স্থিতি করিয়াছিলাম, জগুমল বা পিতম দাসের গৃহে আমাদের ভোজন হইত। সাধারণতঃ বন্ধুবর জগুমলেরই আতিথ্য গ্রহণ করিয়া থাকিতে হইয়াছিল। অনেক সময় ভোজ্য সামগ্রী আমাদের জন্য নন্দলালের কুটীরে প্রেরিত হইত। আমাদের অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুতির প্রণালী এবং সিন্ধুবাসীদিগের খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুতি প্রণালী এক প্রকার নহে। সিন্ধী পাচিকারা অন্ন প্রস্ফুটিত হইলেই তাহাতে

ঘৃত ঢালিয়া দেয়, এবং লবণ অর্পণ করে, ফেণ না গালিয়া ভোজনের জন্য ভোজ্য পাত্রে অন্ন রক্ষা করে, খিচড়ীর ফেণ গা লয়া থাকে। তাহারা বঙ্গালীর ন্যায় নানা প্রকার সুরস ব্যঞ্জনোপকরণ রন্ধন করিতে জানে না। সদ্য আলু বেগুন শাক সবজী ইত্যাদি রন্ধন করে না কয়েক দিন রাখিয়া রস মজাইয়া কুচি কুচি করিয়া সে সকল দ্বারা এক প্রকার ঘণ্ট প্রস্তুত করে, তাহাতে এবং ডাইল ইত্যা-দিতে প্রচুর লসুন পলাণ্ডু সংযুক্ত করিয়া থাকে। তাহারা কোন ব্যঞ্জনেই তৈল ব্যবহার করে না। উৎকৃষ্ট রূপে রুটী প্রস্তুত করিয়া থাকে। সিন্ধীদের নিকটে পাঁপড় অতি প্রিয় সামগ্রী, ভাতের সঙ্গে রুটীর সঙ্গে পাঁপড় ব্যবহৃত হয়। পিপাসায় সময় জলপান করিতে হইলে তাহারা সচ-রাচর একটুকরা পাঁপড় ভক্ষণ করিয়া জল পান করে। অনেকের এরূপ সংস্কার যে পাঁপড় না খাইয়া জল পান করিলে অসুখ হয়। তাঁহারা অনেকে একত্র বসিয়া শয্যার উপর অন্নপাত্র স্থাপন পূর্ব্বক ভোজন করেন, অন্নকে অশুচি মনে করেন না। একটী সিন্ধী মহিলা আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, "বাঙ্গালীদিগের কিরূপ প্রকৃতি আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না, যে ভাত তাঁহারা আদর পূর্ব্বক চিবাইয়া উদরস্থ করেন তাহা হাতে করিলে তাঁহা-দের হাত অশুদ্ধ হয়, বস্ত্রাদিতে সংস্পর্শ হইলে বস্ত্র অশুদ্ধ হয়, হস্ত ও বস্ত্রাদি ধৌত করিয়া শুদ্ধ করা হইয়া থাকে, যে বস্তুতে জীবন রক্ষা হইয়া থাকে যাহা মুখে অর্পণ করিয়া চর্ব্বণ করা হয় তাহা আবার অশুদ্ধ, ইহার কোন অর্থ নাই।"

করাচীর সকল ব্রাহ্মেরই সামান্যাবস্থা, কাহারও বিশেষ অর্থ স্বচ্ছলতা নাই। প্রায় কেহই ভৃত্য ও পাচক পাচিকা রাখিতে পারেন না, রাখিতে ইচ্ছাও করেন না। গৃহকর্ত্তা বাজারে যাইয়া দ্রব্যজাত ক্রয় করিয়া লইয়া আইসেন, গৃহিণী স্বয়ং গৃহকর্ম্ম রন্ধনাদি সমুদায় কার্য্য স্বহস্তে সম্পাদন করেন। বাঙ্গালীদিগের ন্যায় ইহারা আমিষপ্রিয় নহেন, তবে সকলে পূর্ণ নিরামিষভোজী এরূপ বলা যায় না। কিন্তু সকলেই লসুন পলাণ্ডুর অতি-শয় ভক্ত। আমরা এক দিন রাত্রিতে ব্রাহ্ম বন্ধু জগুমলের গৃহে ভোজন করিতে বসিয়াছি, ডাইল পরিবেশন হইয়াছে, আমরা ডাইলে লসুনের অত্যন্ত দুর্গন্ধ অনুভব করিলাম। লসুন পলাণ্ডুর প্রতি আমাদের বিষম বিরাগ, এই দুই বস্তুর তীব্র দুর্গন্ধ আমরা সহ্য করিতে পারি না। ডাইল স্পর্শ করিতেছি না দেখিয়া গৃহ-কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডাইল খাইতেছেন না কেন?" আমরা বলিলাম, ইহাতে লসুনের যোগ হইয়াছে, ইহা আমাদের অখাদ্য। তিনি বলিলেন, "না লসুন দেওয়া হয় নাই।" আমরা বলিলাম নিশ্চয় ডাইলে লসুনের যোগ হইয়াছে। কিন্তু তিনি পুনঃ পুনঃ অস্বীকার করিলেন। পরে গৃহিণীকে আমার সাক্ষাতে ডাকিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কি ডাইলে লসুন দিয়াছ?" তিনি বলি-লেন, "না, লসুন কখনও দেওয়া হয় নাই।"

আমরা বলিলাম, নিঃসন্দেহ লসুন ডাইলের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়াছে। তখন গৃহিণী একটু সরিয়া গিয়া একটি বৃহৎ লসুন সহ ফিরিয়া আসিয়া তাহা প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিলেন, "এই থোম দেওয়া হইয়াছে। লসুন আমাদের ঘরে নাই।" আমরা বলিলাম, এই থোমকেই আমরা লসুন বলি, ইহা সিন্ধী ভাষায় থোম, বাঙ্গলা ভাষায় লসুন, একই বস্তু, নামান্তর মাত্র। আমরা যাহাকে জল বলি, ইংরাজেরা তাহাকে ওয়াটার বলে, কিন্তু বস্তু এক। সিন্ধী ভাষায় পাঁাজকে বসল বলে। আমরা এক দিন ডাক্তার পিটম দাসের গৃহে মাধ্যাহ্নিক ভোজন করিতে গিয়াছিলাম, গৃহপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইবামাত্র তরুণ বয়স্কা গৃহিণী আমাদিগকে দেখিয়াই রন্ধনশালা হইতে বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষায় বলিলেন, "নমস্কার, আপনি কেমন আছেন? কয়দিন এখানে থাকিবেন?" আমরা সিন্ধী মহিলার মুখে বাঙ্গলা কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আপনি বাঙ্গলা ভাষা কোথায় শিক্ষা করিলেন? তখন তিনি সম্মুখে সহাস্যমুখে আসিয়া বলিলেন, "আমি যে আপনাদের নিকটে ৮। ৯ মাস কলিকাতায় ছিলাম।" আমরা দেখিয়াই তাঁহাকে চিনিলাম যে, আমাদের স্নেহের গঙ্গা; তিনি স্বামী সহ কলিকাতায় ছিলেন। গঙ্গা তাঁহার শিশুকন্যা সহ আমাদের স্কুল বাড়ীতেই বাস করিয়াছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া ও তাঁহার সঙ্গে বাঙ্গলা ভাষায় কথা কহিয়া আমাদের বড় আহ্লাদ হইয়াছিল। তিনি অতিশয় শান্ত সরল প্রকৃতি মেয়ে। আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তুমি এতদিন কলিকাতায় ছিলে বাঙ্গলা পুস্তক পড়িয়াছ কি? তিনি বলিলেন, "হাঁ আমি দুই খানা বই পড়িয়া সমাপ্ত করিয়াছি। উহা বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ।" তাঁহার বাড়ীতে আমরা যখন ভোজন করিয়াছি, পাঁাজ লসুনের গোলোযোগ হয় নাই। তিনি সে বিষয়ে সাবধান ছিলেন, অন্য গৃহিণীরা সাবধান হইতে পারেন নাই। তাঁহাদের পুনঃ পুনঃ ভুল হইয়াছে। তাঁহারা পাঁাজ বা লসুন প্রয়োগে কোন না কোন ব্যঞ্জন সুগন্ধীকৃত করিয়াছেন। দেখা গেল সিন্ধু দেশীয় মহিলাদিগের বস্ত্রালঙ্কারের কোন জাঁক জমক নাই। প্রায় সকলকেই সামান্য বস্ত্রপরিহিতা অনলঙ্কৃতা দৃষ্ট হইল। গঙ্গা বলিলেন, "আমার তিন চারি হাজার টাকার অলঙ্কার আছে। কিন্তু কোন অলঙ্কার পরিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না।" তাঁহার হস্তেও বালা বা চুড়ী দৃষ্ট হইল না। একেবারে অনলঙ্কৃত শূন্য হস্ত লক্ষিত হইল। এক দিন উপযাচক হইয়া প্রিয় নন্দলালের খিচড়ীর অংশী হইয়াছিলাম তিনি প্রত্যহ মসুর ডাইলের খিচড়ি ভোজন করেন, তাহাতে হলুদ লঙ্কাদি কোনরূপ মসলার প্রয়োগ হয় না। কেবল। লবণ ও ঘৃতের যোগ হইয়া থাকে। তিনি খিচুড়ীর সঙ্গে কোন উপকরণ ব্যবহার করেন না। তবে আমাদের জন্য কয়েক টুকরা পাঁউরুটি ও কিছু আলু ঘৃতে ভাজিয়া লইয়াছিলেন।

করাচি ভারতবর্ষমধ্যে প্রধান বন্দর, ইয়ুরোপের বড় বড় বাণিজ্যপোত এখানেই প্রথম সংলগ্ন হয়। সিন্ধুদেশের চীফকমিশনর সাহেব করাচিতে স্থিতি করেন। এখানকার সেনানিবেশ বহু বিস্তৃত। পারস্য আরব, বোম্বাই, কচ্ছ, পঞ্জাব, উত্তর, পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি নানা স্থানের স্ত্রী পুরুষ দলে দলে এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থানে অশ্বযোগে ট্রাম গাড়ী সর্ব্বদা চলিতেছে, টিকিটের মূল্য ২।৩ পয়সামাত্র। বন্দর রোড করাচি বন্দরের প্রশস্ত বড় রাস্তা, তাহা ক্যাণ্টোন্‌মেণ্ট হইতে কেয়ামারীঘাট পর্য্যন্ত প্রসারিত।

বন্ধুবর টিকম দাস করাচির বিশেষ বিশেষ দর্শনীয় বিষয় আমাদিগকে প্রদর্শন করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি ১৫ই আষাঢ় অপরাহ্লে তত্রত্য পশুশালা (Zoological Garden) প্রদর্শন করিতে আমাদিগকে লইয়া যান। প্রায় এক ক্রোশ পথ ট্রামে যাইতে হইয়াছিল। এই পশুশালা আলিপুরের পশুশালার ন্যায় বৃহৎ না হইলেও আফ্রিকা দেশের মেষ ও হরিণজাতীয় বিচিত্র শৃঙ্গ ও অবয়ববিশিষ্ট এমন নূতন২ পশু এখানে অনেক দেখা গেল যাহা আলিপুরের পশুশালাতে কখনও আনা হইয়াছে বোধ হয় না। সেখানে দুইটি পরিণতবয়স্ক সিংহ ও সিংহী এবং তাহাদের বংশধর তরুণবয়স্ক দুইটি সিংহ ও দুইটি সিংহী বিদ্যমান। নানা দেশের নানা জাতীয় বিহঙ্গ সেই স্থানে রক্ষিত। ইতস্ততঃ বিস্তীর্ণ উদ্যান, তথায় ভ্রমণ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করা যায়।

১৬ই আষাঢ় পূর্ব্বাহ্লে সাগরে স্নান করা যায়। যে ঘাটে স্নান করা গিয়াছিল, তাহার নাম ক্লিপ্‌টিং ঘাট, তথায় প্রবল বেগে সামুদ্রিক বায়ু প্রবাহিত হয় বলিয়া সেই স্থানকে "হাওয়াকা বন্দর" বলে। সাগরকূলে অনেক গুলি ইয়ুরোপীয় যুবতীকে ছুটিয়া বেড়াইতেছে দেখা গেল। ক্লিপ্‌টিং ঘাটের উপর সুন্দর ঘর ও বসিয়া বিশ্রাম করার আসনাদি নির্দ্দিষ্ট আছে। গৃহে ফিরিয়া আসিবার সময় মিয়ুজিয়ম দর্শন করা গেল। উক্ত জাদুঘরের বিশেষত্ব এই যে, তথায় নানা প্রকার সামুদ্রিক জন্তুর কঙ্কাল অধিকতর রক্ষিত।

১৭ই প্রাতে বাজার দর্শন করা যায়, অপরাহ্লে নেটিভজেটি ও কেয়ামারি পোর্ট দর্শন এবং ট্রামারোহণে ক্যাণ্টোনমেণ্টে ভ্রমণ হয়।

১৮ই অপরাহ্লে সাগরশাখা বিশেষ Break water নৌকাযোগে পার হইয়া মনওয়ারা দ্বীপে যাওয়া যায়। বন্ধুবর জগুমল, ডাক্তার রুবিন, টিকম দাস এবং পিতমদাস সহযাত্রী হইয়াছিলেন। সেই দ্বীপের দক্ষিণাংশে সাগরের মহা আস্ফালন ও ভীম গর্জ্জন, তিন জন বন্ধু উত্তাল তরঙ্গের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া স্নান করিয়াছিলেন। সেই ভীষণ তরঙ্গের অভিমুখে অগ্রসর হইবার সাহস আমাদের হয় নাই। মনওয়া দ্বীপের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি উপশৈল বিদ্যমান, নিয়ত সাগরতরঙ্গ মহাবেগে তাহার পাদদেশ ধৌত করিতেছে। তৎপর সেই শৈলমূলের নতোন্নত সঙ্কীর্ণ পথে তাহাকে এক প্রকার প্রদক্ষিণ করা হয়

তাহা প্রদক্ষিণ করা অসম সাহসিকতার কার্য্য। বীচিমালা ভীম গর্জ্জনে আমাদিগকে যেন গ্রাস করিতে আসিতেছিল। সে যে কিরূপ ভীষণ দৃশ্য তাহা বর্ণন করিয়া উঠা যায় না। ইতি পূর্ব্বে সেই পথে যাইতে এক ব্যক্তিকে সাগর গ্রাস করিয়াছিল। তদবধি কাহারও উক্ত বিপদসঙ্কুল পথে যাওয়া নিষেধ। পিটম দাস, সাহেবের নিকটে যাইয়া অনেক চেষ্টা যত্ন করিয়া অনুমতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সায়ংকালে আমরা পূর্ব্বোক্তরূপ নৌকাযোগে সাগর শাখা পার হইয়া কেমারি হইতে ট্রামযোগে গৃহে প্রত্যাগত হই। স্বর্গগত হারানন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেওয়ান তারাচাঁদ করাচিনগরে ভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, আমরা ২০শে আষাঢ় অপরাহ্নে তাঁহার সঙ্গে হাইদরাবাদে যাত্রা করি।

দেবী বরদেশ্বরী গুপ্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দিদী গৃহকর্ম্মাদিতে অতিশয় ক্ষিপ্রহস্তা ছিলেন। তিনি সকল কার্য্য সত্বর সম্পাদন করিতেন। জরাদুর্ব্বল কঙ্কালাবশেষ দেহে তিনি যেরূপ কার্য তৎপরতা ও শ্রমশীলতার পরিচয় দান করিয়াছেন, উদীয়মান যৌবনকালে অনেকের তাহা সাধ্যাতীত। দিদী বিনা কার্য্যে আলস্যে এক দণ্ড বসিয়া থাকিতে কষ্টবোধ করিতেন। রন্ধন করা, কুটন কুটা, গৃহের দ্রব্যজাত গুছাইয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ইত্যাদি কার্য্যে তিনি সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। বিকাল বেলা অন্য কাজ না থাকিলে বসিয়া ডাইল ও চাউলের খুদ কণা বাছিয়া ফেলিতেন, কিংবা বালিশের ও লেপ তোষকের ওয়াড় সেলাই করিতেন। নিজে জামা ব্যবহার করিতেন, স্বহস্তে কাপড় কাটিয়া আপন জামা নিজে সেলাই করিয়া লইতেন। শ্রীমান্ গঙ্গাগোবিন্দ সোণার ফ্রেমের একটি চশমা তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন, তিনি সেলাই কাজ করিবার সময় সেই চশমা ব্যবহার করিতেন। কিয়ৎকাল হইল নিজের একটী আত্মীয়া মহিলাকে বস্ত্র উপহার দিয়াছিলেন, তৎপ্রসঙ্গে একটী জামাও তাহার ব্যবহারের জন্য দিয়াছিলেন। কোন বধূকে অগোছাল দেখিলে, তাঁহাদের উপেক্ষায় ও অযত্নে দ্রব্যজাতের অপচয় ও অর্থের অপব্যয় হইতেছে দেখিলে অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন, এবং তাঁহাদিগকে শক্ত কথা কহিতেন। অনেক সময় তাঁহার অভিমান সীমা অতিক্রম করিত। দিদী বালবিধবা ছিলেন, পর সেবাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল, তিনি নিজে কাহারও সেবার প্রত্যাশী ছিলেন না। তিনি বুদ্ধিমতী প্রতিভাশালিনী এবং অতিশয় লজ্জাশীলা ছিলেন।

ইতিপূর্ব্বে শ্রীমতী সুখময়ী স্বামিসহ কিয়ৎকাল ঢাকা নগরে বাস করিয়াছিল। তখন দিদীও শেষ জীবনে প্রিয়তমা নাতিনীর সঙ্গে ছিলেন। সুখময়ীর দুই তিনটি শিশু সন্তানকে তিনি বুকে করিয়া প্রতিপালন করিয়াছেন। অনেক দিন রাত্রিতে শিশুদিগের ক্রন্দন, আবদার ও চীৎকারে তাহাদের মা ঘুমাইতে পারিত না, অত্যন্ত

বিরক্ত হইত, রাগ করিত। কিন্তু তিনি অবিরক্ত চিত্তে তাহাদিগকে বক্ষে ধারণপূর্ব্বক ঘুম পাড়াইতেন। অনেক দিন তাহাদের উৎপাতে তাঁহাকে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিতে হইত। একদিন একটি শিশু তক্তপোষের নীচে প্রবেশ করিয়াছিল। সে বাহির হইবার সুযোগ পাইতেছিল না, পুনঃ পুনঃ দাঁড়াইয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছিল, আর মাথায় তক্তপোষের আঘাত পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছিল; তাহার মা নিকটে ছিল না। দিদী তাহাকে বাহির করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি তক্তপোষের এক কোণ উচু করিয়া তাহাকে বাহির করিতে যাইয়া কোমরে চোট পাইয়া পড়িয়া যান, তাঁহার কোমর ভাঙ্গিয়া যায়, তজ্জন্য তিনি মাসাধিককাল শয্যাগত থাকেন। সেই বৃদ্ধ বয়সে নাতিনীর নিকটে থাকিয়া নানা কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন। অশীতি বৎসরবয়স্কা কৃশাঙ্গী বৃদ্ধার কার্য্যব্যস্ততা দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইয়াছেন। আলস্য কি তিনি জানিতেন না। ভাটপাড়া গ্রামে বা ঢাকা নগরে স্বামীর আলয়ে কনিষ্ঠা ভগিনী দেবী অন্নদাসুন্দরী রোগবিপদে আক্রান্তা, এরূপ সংবাদ পাইলেই তাঁহার নিকট যাইতেন ও তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হইতেন। দুঃখের বিষয় যে, যে সুখময়ী প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর ছিল সে তাঁহার লোকান্তরগমনের তিন চারি মাস পূর্ব্ব হইতে স্থানান্তরে দূরদেশে ছিল, তাঁহার সঙ্গে আর তাহার শেষ দেখা হয় নাই। নাতিনী শেষ সেবা করিয়া মনের সাধ মিটাইতে পারে নাই। সে যাইয়া তাঁহাকে দেখিতে অক্ষম হওয়াতে উন্মাদিনীপ্রায় হইয়াছে। সুখময়ীর পিতা ইন্দুভূষণ এত প্রিয় ছিল, কিন্তু তথাপি সুখময়ীর প্রতি তাহার কিঞ্চিৎ অমনোযোগ ও অযত্ন দেখিলে তাহার প্রতি তিনি অতিশয় বিরক্ত হইতেন ও তাহাকে ভর্ৎসনা করিতেন। সুখময়ী কোন চিত্রকার্য্য বা কাগজ কাটা, অথবা সেলাইয়ের কাজ, করিলে কিংবা কোন প্রবন্ধ লিখিলে তিনি আনন্দে বিহ্বল হইতেন, এবং সেই সকল জিনিষ হাতে করিয়া আমাদিগকে দেখাইতেন। তিনি গল্প বলিয়া বালক বালিকাদিগকে আমোদিত করিতেন, তাহাতে উপদেশ থাকিত।

বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসে বাড়ীতে দিদী রোগশয্যায় শয়ানা, উঠিতে বসিতে কষ্ট বোধ করেন, এমন সময় জামাতা রেবতীমোহন গিয়াছিলেন, তখনও তিনি কোনরূপ কষ্টে বসিয়া নিজহস্তে আম কাটিয়া তাঁহাকে খাইতে দিয়াছিলেন। তিনি কোন ব্যঞ্জন মুখপ্রিয় বোধ করিলেই "রেবতী খাইবে" বলিয়া রাখিয়া দিতেন। যখনই আমি তাঁহার নিকটে গিয়াছি, তখনই তিনি যে কত উৎসাহ ও আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন, কত প্রকার মিষ্টান্ন কতপ্রকার সুরস ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া আদরপূর্ব্বক খাওয়াইয়াছেন, তাহা ভুলিবার নহে। বিদেশে অবস্থান কালে প্রতি সপ্তাহে আমার পত্র না পাইলে অস্থির হইয়া পড়িতেন। তাঁহাকে সুস্থির রাখিবার জন্য সপ্তাহমধ্যে একখানা করিয়া পত্র

লিখিতে হইত। তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র ভাগিনেয়ীদিগের নিকট হইতে কুশল সংবাদ সম্বলিত পত্র পাইতে ইচ্ছা করিতেন, না পাইলে অতিশয় ভাবিত ও দুঃখিত হইতেন, এবং অমুকে অমুকে একখানা পত্র লিখিয়াও আমাকে সংবাদ দান করে না, আমি তাহাদের জন্য কত ব্যস্ত, ইহা বলিয়া আমার নিকটে দুঃখ প্রকাশ করিতেন। কেবল আমাদের প্রতি নয়, সকলের প্রতি তাঁহার স্নেহ দয়া অত্যন্ত অধিক ছিল। এরূপ স্নেহপ্রবণ কোমলহৃদয় সচরাচর লক্ষিত হয় না। তাঁহার জরাজীর্ণ নশ্বর দেহ শ্মশানে ভস্মীভূত হইয়াছে, কিন্তু প্রেমোজ্জ্বল অবিনশ্বর আত্মা স্বর্গে দীপ্তি পাইতেছে। "ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ, অতএব যে প্রেমেতে অধিবাস করে, সে ঈশ্বরেতে অধিবাস করে, এবং ঈশ্বর তাহাতে অধিবাস করেন।" বাইবেল পুস্তক।"

দিদী ছাপার পুস্তক পড়িতে পারিতেন; ধর্ম্ম পুস্তকাদি স্বয়ং পড়িতেন, বা অন্য লোক দ্বারা পড়াইয়া শুনিতেন। তিনি "শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্ম" পুস্তক পড়িবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুরোধে সেই পুস্তক একখানা ক্রয় করিয়া তাঁহাকে দেওয়া গিয়াছিল। ভগিনী ঠাকুরাণী প্রথম বয়সে মাতামহী দেবীর সঙ্গে কাশী গয়া প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থ স্থান ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন। তখন এদেশে রেলওয়ে হয় নাই। নৌকাযোগে বাঙ্গালী তীর্থযাত্রিগণ সেই সকল দূরতর তীর্থক্ষেত্রে যাইতেন। দেশে ফিরিয়া আসিতে ৬।৭ মাস সময় ব্যয় হইয়া যাইত। পথে যাত্রিকদল নানা প্রকার বিপদ্ দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হইত। ঢাকা হইতে কাশী যাইবার পথে পাটনাতে, এবং কাশী হইতে প্রয়াগ যাইতে মির্জাপুরের নিকটে মাতামহী দেবীর নৌকা দস্যু দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল, ভগবানের কৃপাকৌশলে মাতামহী ও তাঁহার সহযাত্রী ভগিনী ঠাকুরাণী প্রভৃতি রক্ষা পাইয়াছিলেন। পরে দিদী বিষম ক্লেশস্বীকারে শ্রীক্ষেত্রে গিয়াছিলেন ১২।১৩ বৎসর হইবে রেলপথে পুনর্ব্বার কাশীতে ও গয়াধামে গিয়াছিলেন। শেষ জীবন কাশীতে যাপন করিবেন তাঁহার এরূপ ইচ্ছা ছিল। নানা কারণে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই।

দিদী প্রায় ৭মাস কাল বাড়ীতে অজীর্ণ ও জ্বর রোগে আক্রান্ত ছিলেন। রোগের কখন বৃদ্ধি কখন হ্রাস হইতেছিল। গত ২৯শে মাঘ তাঁহার আগ্রহানুসারে আমি একবার তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য গিয়াছিলাম। প্রায় দুই মাস হইল, "আমার রোগ যন্ত্রণা বৃদ্ধি পাইয়াছে। তুমি একবার আসিয়া আমাকে দেখিয়া যাও, আমি তোমাকে দেখিলেই ভাল হইব।" ইত্যাদি অনেক কথায় ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন, এবং আমি গমনাগমনের পাথেয় তাঁহা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। নানা কাজের প্রতিবন্ধকতাবশতঃ আমার গমনে বিলম্ব হইয়া পড়িয়াছিল। আমি ভাদ্রোৎসবের পর দিবস ১১ই সোমবার যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলাম; উৎসবের দিনই অপরাহ্নে ভ্রাতুষ্পুত্র

শ্রীমান্ প্রতাপচন্দ্র হইতে তাঁহার পরলোক-যাত্রার সংবাদ পাইয়া শোকার্ত্ত হই,বিকালে আর উৎসব ভোগ করিতে পারি নাই। যাঁহাদিগকে দিদী অধিকতর স্নেহ ও আদর করিতেন তাঁহারা কেহই নিকটে ছিলেন না, অন্তিমকালে সেবা করিতে পারেন নাই। বধূ ঠাকুরাণী (স্বর্গগত বড় দাদার পত্নী) এবং ভ্রাতুষ্পুত্রবধূদ্বয় (শ্রীমান্ বিপিনের ও শ্রীমান্ রমেশের পত্নী) নিকটে থাকিয়া তাঁহার যথোচিত সেবা করিয়াছেন। দিদী মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে রেবতী মোহনকে লিখিয়াছিলেন, "তুমি পূজার ছুটীতে আসিয়া আমাকে দেখা দিবে।" তাঁহার শরীরে পক্ষাঘাতের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল।

বড় দুঃখের বিষয়, আমি চরমকালে তাঁহার চরণ দর্শন করিতে পারি নাই। আমি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলে পর প্রথমতঃ তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হইয়াছিলেন। কিছু দিন পরে আর তাঁহা হইতে বিরক্তির লক্ষণ কিছুই প্রকাশ পায় নাই; বরং তাঁহার স্নেহ ও আদর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কোন ব্রাহ্ম বা ব্রাহ্মিকার প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ও বিরক্তি ছিল না। তিনি সকলকে আদর যত্ন করিতেন। বিধাতার ইচ্ছাই পূর্ণ হয়। প্রেমময়ী মঙ্গলময়ী বিশ্বজননী তাঁহার সাধ্বী কন্যার আত্মাকে স্বর্গের অমৃত পান করাইয়া চির পরিতৃপ্ত রাখুন।

দিদীর হস্তে সামান্য অর্থ ছিল, তাঁহার দেহত্যাগের পর সেই অর্থের কিরূপ ব্যবহার হইবে তদ্বিষয়ে তিনি এক চরমপত্র লিখিয়া শ্রীমান্ প্রতাপচন্দ্রের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি নিজের শ্রাদ্ধসম্বন্ধে তাঁহার অন্তিম উপদেশ এই যে, শ্রাদ্ধে ভোজাদির ঘটা হইবে না, দুঃখী দরিদ্রদিগকে দান করা হইবে। হিন্দুমতে শ্রাদ্ধাধিকারী দেবরপুত্র আছেন। দিদী এবার রোগমুক্ত হইবেন না ভাবিয়া মধ্যে মধ্যে মালসী গান করিতেন।

পত্রাবলী।

জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পত্র শ্রীমান্ প্রতাপচন্দ্র সেন গত ২০শে আগষ্ট বাড়ী হইতে আমাকে এই পত্র লিখিয়াছেন,—

"বৃহস্পতিবার বেলা প্রায় ৩টার সময় (অপরাহ্নে) শ্রীযুক্ত পিসী ঠাকুরাণী পরলোকে গমন করিয়াছেন। তিনি প্রাতে ৮৷৷টা পর্য্যন্ত বেশ ভাল ছিলেন। নিজেই তরকারী কুটিতেছিলেন, ইতিমধ্যে 'আমার শরীর কেমন করে' বলিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়েন। আর কথা কহিতে সমর্থ হন নাই।"

৮ই ভাদ্র শ্রীযুক্তা বধূঠাকুরাণী (বড় দাদার পত্নী) লিখিয়াছেন;—

"গত কল্য শ্রীমানের পিসী বেলা তিনটার সময় পরলোকে গমন করিয়াছেন। কিন্তু মরণটি বড়ই সুন্দর হইয়াছে। প্রাতে উঠিয়া মুখ ধুইয়া এবং ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া কিছু জল খাইয়া তরকারি কুটিতে বসিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে শরীর কেমন করে বলিয়াই অস্থির হইয়া পড়েন, এবং ঐ সময়েও ঈশ্বরের নাম দুই বার লইয়াছিলেন। তাহার অর্দ্ধ ঘণ্টা পরেই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহার পর ক্রমেই মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করে।

কিন্তু উহার পরে কোন কষ্ট হয় নাই। হঠাৎ মৃত্যু হয়।"

কটক হইতে শ্রীমান্ ইন্দুভূষণ তাহার পিসীমাতার পরলোকগমনসংবাদ পাইয়া ২৭শে আগষ্ট লিখিয়াছেন ;—

* * * * * "আমি জীবনে তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না। মৃত্যুকালে তাঁহার নিকটে উপস্থিত থাকা আমার ঘটিল না। ইহাই দারুণ আক্ষেপ রহিয়া গেল। তাঁহার পরলোকগত আত্মার পরম গতি লাভ হউক, ইহাই ভগবানের নিকটে একান্ত প্রার্থনা।"

বালীগঞ্জ হইতে শ্রীমান্ কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত ২৮শে আগষ্ট লিখিয়াছেন ;—

"মাসীমার পরলোকযাত্রার সংবাদে বড় ব্যথিত হইলাম। ক্রমে ক্রমে পূজ্যপাদ যাঁহারা ছিলেন সকলেই চলিয়া যাইতেছেন।"

দার্জিলিং হইতে শ্রীমান্ গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্ত ২৮শে আগষ্ট লিখিয়াছেন ;—

"গত কল্য বড় মামীমাতার পত্রে মাসীমাতার পরলোকগমনের সংবাদ পাইয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। ইচ্ছা ছিল এবার পূজার ছুটীতে যাইয়া একবার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া আসিব। তাহা আর হইল না। একে একে গুরুজন সমস্তই চলিয়া গেলেন। আমাদেরও ক্রমে প্রস্তুত হইতে হইবে। গুরুজনের আশ্রয়ে ও আশীর্ব্বাদে এত দিন বর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছি, ক্রমে তাহা হইতে বঞ্চিত হইতেছি।

"মাসী মাতার অসীম স্নেহ বাকী জীবনে ভুলিতে পারিব না। দয়াময় তাঁহার নির্ম্মল পবিত্র আত্মাকে তাঁহার শান্তিক্রোড়ে রক্ষা করুন।"

বিগত ২৯শে আগষ্ট বালীগঞ্জ হইতে বধূমাতা শ্রীমতী প্রসন্নতারা গুপ্ত (শ্রীমান্ কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের পত্নী) লিখিয়াছেন ;—

"মাসীর মৃত্যুসংবাদ পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। আমাদিগকে যাঁহারা স্নেহ করিতেন তাঁহারা ক্রমেই চলিয়া যাইতেছেন। তিনি উপযুক্ত বয়সেই মরিয়াছেন, তাঁহার আত্মা ঈশ্বরসমীপে যাইয়া শান্তি লাভ করুক, এই প্রার্থনা।"

পরে ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ বিপিনচন্দ্র ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র পিসীমাতার পরলোক সংবাদ পাইয়া আমাকে পত্র লিখিয়াছেন, বাহুল্যপ্রযুক্ত তাহা উদ্ধৃত করা গেল না।

কেশবচন্দ্রের মহারাজ্ঞীর সহিত সাক্ষাৎকার।

১৩ই আগষ্ট শনিবার আচার্য্য কেশবচন্দ্র ধর্ম্মপরায়ণা মহারাজ্ঞী বিক্টোরিয়ার সাক্ষাৎকার লাভ করেন। ৯ আগষ্ট ডিউক অব আর্গাইল তাঁহাকে লিখেন ;

"প্রিয় মেস্তর সেন,—মহারাণীর প্রাইবেট সেক্রেটারী কর্ণেল পন্সনবয় আমাকে লিখিয়াছেন যে যদি আপনি আগামী ১৩ তারিখ শনিবার ওস্বোরণে যান, তাহা হইলে আপনি মহারাজ্ঞীকে দেখিতে পাইবেন। ওয়াটারলুব্রীজ হইতে সাউথমটনে প্রাতে ৮টা ১০ মিনিটের সময় যে ট্রেণ ছাড়ে সেই ট্রেণে যাইতে পরামর্শ দিতেছি। এই ট্রেণের সঙ্গে ষ্টিমারের যোগ আছে, সেই ষ্টিমার আপনাকে কাউয়েসে নামাইয়া দিবে, সেখান হইতে আপনি বরাবর ওসবোরণে যাইতে পারেন।"

নির্দ্দিষ্ট দিনে কেশবচন্দ্র এক জন ইংরেজ বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া ওস্বোরণে গমন করেন। রাজপ্রাসাদে উপনীত হইলে তিনি কর্ণেল পন্সনবয় কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হন। কর্ণেল পন্সনবয় সহকারে তাঁহার বিবিধ বিষয়ে আলাপ হয়। কর্ণেল পন্সনবয় "দেশীয় বিবাহবিধির পাণ্ডুলিপির" অনুকূল ছিলেন, সুতরাং তৎসম্বন্ধে তাঁহার সহিত বিশেষ কথা হইয়াছিল।

অনন্তর বিবিধ গৃহাবকাশের সঙ্গে সংলগ্ন পথ দিয়া তাঁহাকে প্রয়াণগৃহাবকাশ প্রভৃত দেখান হইল; এবং নিরামিষ আহার্য্য সামগ্রী তাঁহার ভোজনার্থ প্রদত্ত হইল। তিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাকে প্রয়াণগৃহাবকাশে লইয়া গেলেন। গৃহটি আড়ম্বরে সজ্জিত নহে, গ্রহীত্রী এবং গৃহীতের ভাবানুরূপে শোভিত। কেশবচন্দ্র গিয়া অল্পক্ষণ বসিয়া আছেন; ইতিমধ্যে যবনিকা অপসারিত হইল, মহারাজ্ঞী, রাজকুমারী লুইস, কুমার লিওপোল্ড তিন জন আসিয়া উপস্থিত। কেশবচন্দ্র আস্তে ব্যস্তে উঠিলেন, রাজদর্শনে স্তম্ভিত হইলেন, কি করিবেন, কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। মহারাজ্ঞী হস্ত অগ্রসর করিয়া দিলেন। কেশবচন্দ্র নিজের মস্তক ভূমির দিকে প্রনত করিয়া নমস্কার করিলেন, মহারাজ্ঞীও সেইরূপ করিলেন, এইরূপ ক্রমে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে মস্তক তুলিয়া নমস্কার হইল। কেশবচন্দ্রের রাজভক্তির প্রাবল্যবশতঃ অগ্রে কোন কথা স্ফূর্ত্তি পাইল না। মহারাজ্ঞী পার্শ্বর্ত্তী সেক্রিটারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেশবচন্দ্র কি ইংরাজী ভাষায় কথা কহিয়া থাকেন?" অনন্তর কেশবচন্দ্র মুখ খুলিলেন। ১০।১৫ মিনিটের মধ্যে ব্রিটিষ সুশাসনে ভারতের যে কি প্রকার সৌভাগ্যোদয় হইয়াছে, ইহা নিবেদন করিলেন। ভারতে নারীগণের বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি এবং ইংরাজী শিক্ষাপ্রভাবে সে দেশে যে নানাবিধ উন্নতির ব্যাপার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহা শুনিয়া রাজ্ঞী সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। সতীদাহনিবারণ হওয়াতে তিনি আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন, এবং হিন্দুনারীগণের দুঃখের অবস্থা শ্রবণে বিষণ্নচিত্ত হইলেন। ভারতবর্ষ দেশহিতৈষিগণের বিস্তৃত পরিশ্রমের ক্ষেত্র এবং কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডের মহিলা বন্ধুগণকে নারীগণের শিক্ষার জন্ত তথায় যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন, ইহা শুনিয়া মহারাজ্ঞী এবং রাজপুত্রী আহ্লাদিত হইলেন। কেশবচন্দ্র দেশীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত, তাঁহার পত্নীর দুইখানি প্রতিকৃতি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, মহারাজ্ঞী এবং রাজপুত্রী সে দুইখানি প্রতিকৃতি গ্রহণ করিলেন। প্রিন্স লিওপোল্ড কেশবচন্দ্রের হস্তাক্ষর চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। মহারাজ্ঞীর সহিত সাক্ষাৎকারের পর কেশবচন্দ্র কর্ণেল পন্সনবয়কে নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়াছিলেন।

"প্রিয় মহাশয়,—বিগত শনিবার মহারাজ্ঞী দয়া ও অবনতি স্বীকারপূর্ব্বক সাক্ষাৎকার দ্বারা আমায় যে সম্মানিত করিয়াছেন তজ্জন্য আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে ভিক্ষা করিতেছি। এই সাক্ষাৎকার আমায় এবং দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়কে মহারাজ্ঞীর আমাদিগের দেশের প্রতি যত্নের অতি আহ্লাদকর উৎসাহকর নিদর্শন প্রদর্শন করে, এবং আমি বিশ্বাস করি যে অনুরাগ ও রাজভক্তির বন্ধনে আমরা রাজসিংহাসনের সহিত বদ্ধ, এতদ্দ্বারা সেই বন্ধন আরও সুদৃঢ় হইবে। মহারাজ্ঞী অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার স্ত্রীর যে ফটোগ্রাফ গ্রহণ করিয়াছেন, এবিষয়টি চিরদিন আমি আহ্লাদ ও অভিমানের সহিত স্মরণে রাখিব। আমার পত্নী এবং সাধারণতঃ ভারতবর্ষের সমুদায় মহিলা ইহা জানিতে পারিয়া আহ্লাদিত হইবেন যে, তাঁহাদিগের কল্যাণের জন্য তিনি ঈদৃশ স্নেহযুক্ত।

"আমি নিতান্ত অনুগ্রহ মনে করিব, যদি আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক রাজোচিত উচ্চ সম্মানভাজন প্রিন্সেস লুইসকে তৎপ্রতি যে অতি সরল গভীর সম্মাননা পোষণ করি তাহার বিনীত চিহ্নস্বরূপ এই পত্রের সহিত প্রেরিত পুস্তিকাগুলি গ্রহণ করিতে বলেন।

"পত্রমধ্যে প্রেরিত করলিপি রাজো-

চিত উচ্চ সম্মানভাজন রাজকুমারের সানুগ্রহ গ্রহণার্থ।

"করুণাময় ঈশ্বর মহারাজ্ঞীকে এবং রাজপরিবারকে আশীর্ব্বাদ করুন, এই আমার ব্যাকুল প্রার্থনা।"

আচার্য্যজীবন—মধ্যবিবরণ।

মহিলার রচনা।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার উপহার।

নবছন্দে, নব উষা,
পরিয়া নূতন ভূষা,
আনিয়াছে নবছবি নব বরষের;
স্নেহালোকে, প্রেমালোকে,
ইহলোকে, পরলোকে—
সে ছবি-মাধুর্য্যে আজি পূর্ণ চরাচর।
ভগিনীর ভ্রাতা আজি
এসগো "দেবতা" সাজি,
নিরখি ললাটে তব, বিশ্ব-জননীর—
(কোটী সূর্য্য প্রভা জিনি
গৌরব-মুকুট-মণি)
সার্থক হউক প্রাণ দীন-ভগিনীর।
ভগিনীর ভ্রাতা আজি
এসগো দেবতা সাজি
ধর আজি ভগিনীর হস্ত দুরবল
পবিত্র পরশে তব
জাগিয়া উঠুক নব,
আনন্দ, উৎসাহ, আশা, প্রেম, পুণ্য বল।
ভগিনীর ভ্রাতা আজি
এসগো দেবতা সাজি
শিখাও এ অকিঞ্চনে সে বিশ্বজনীন
উদারতা, একাগ্রতা,
মিলনের সে একতা,
সেই প্রেমানন্দ নীরে করগো বিলীন।
ভগিনীর ভ্রাতা আজি
এসগো দেবতা সাজি
লয়ে শুভনিমন্ত্রণ ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার
দেখ আজি ভগিনীর
উন্মোচি হৃদয় দ্বার
আনিয়াছে "অশ্রুরাশি" স্নেহ-উপহার।
ভগিনীর ভ্রাতা আজি
দিতে ও শ্রীকরে আজি
ব্যাপি এ বিশাল বিশ্ব কিছু নাহি তার
নেবে কি আদর করি,
তব শ্রী অঞ্জলি ভরি,
আজি এই শুভ দিনে অশ্রু উপহার।

কটক। শ্রীমতী রে—

সংবাদ।

বিগত ১১ই কার্ত্তিক কুচবিহারে জজ আদালতের বৃদ্ধ নিরীহ নাজির ব্রজনাথ তার কন্যা-বিবাহে বরপণদানে প্রচুর ঋণগ্রস্ত হওয়াতে সেই ঋণ পরিশোধ করিতে অক্ষম হইয়া আফিসের কয়েক শত টাকা আত্মসাৎ করিয়াছিলেন, ধরা পড়াতে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছেন। বর ও বরকর্ত্তাদের নিষ্ঠুর কসাইয়ের ন্যায় আচরণে ঋণগ্রস্ত হইয়া অনেক কন্যাকর্ত্তা নিরুপায় অবস্থায় যে এরূপ আত্মহত্যা করিবেন আশ্চর্য্য নহে।

কুচবিহারে আমাদের একজন আত্মীয় একজন দরিদ্র লোকের কন্যার সঙ্গে নিজের পুত্রের সম্বন্ধ স্থির করেন। কন্যার পিতা তাঁহাকে বলেন, আমি অর্থ সম্বল বিহীন, আমার কন্যাকে তিন খানা স্বর্ণাভরণের অধিক প্রদান করিতে পারিব না। বরের পিতা বলেন, আপনার যেরূপ অবস্থা, আমি ইচ্ছা করিনা যে, আপনি একখানা অলঙ্কারও প্রদান করেন। আপনি কিছুই দিবেন না, কেবল শাঁখা সিন্দূরদানে কন্যাকে আমার গৃহে পাঠাইবেন। ইহাতে বরকর্ত্তার কেমন সহৃদতা প্রকাশ পাইয়াছে।

ভিক্টোরিয়ামহিলাবিদ্যালয়।

ছোট ছোট দৈব ঘটনা *।

দৈব ঘটনাসম্বন্ধে বেশী কিছু বলবার নেই; তবে মোটামুটী কতকগুলি বিষয় জানিলে সে সকল বিষয়ে সাবধান হইতে পারা যায়। কারণ আকস্মিক ঘটনা থেকেই আবার কত বিপদ ঘটে। যেমন ছোট ছেলেরা খেলতে খেলতে কত জিনিষ গিলে ফেলে, তাহলে গলায় আটকে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কখনও কখনও বড়দের সম্বন্ধেও এরূপ দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। অল্পদিন হল একটা লোক তার হাতের আঙ্গুল ছিল না, সে নিমের দাঁতন করত, দাঁতন দিয়ে গলার ভেতরটা ঘসে ঘসে পরিষ্কার করত। এক দিন ঘসতে ঘসতে গলার একটু ভিতর তাহা চলে গেছে। তখন সে খুব জোরে নিঃশ্বাস টেনেছে, আর সেটা একেবারে পেটের ভিতর চলে গিয়েছে। তার হাত নেই সুতরাং সে সেটা বাহির করিতে পারিল না। আমার ঠিক মনে নেই, কিন্তু সেটা ছয় ইঞ্চির কম নয়। হাঁসপাতালে গিয়ে বলে যে, পেটে ব্যাথা। সাঁড়াসী দিয়ে বের করবার চেষ্টা করা হল, কিন্তু উহা পেট পর্য্যন্ত পৌছিল না। তখন পেট কেটে পাকস্থলীটা একটু ফুটো করে বের করা হল। তার পর সেলাই করে দেওয়া হয়, লোকটা বেশ ভাল হয়ে গেল। গলায় ছোট ছোট ফল ইত্যাদি বেধে যাওয়া ইত্যাদি সম্বন্ধে আজ গুটিকত কথা বলব।

এক জন মুসলমান তার ৫।৬ বৎসরের একটি অতি সুন্দর ছেলেকে একটা আঁসফল খেতে দিয়েছে। খেতে গিয়ে সেটা নিঃশ্বাসের মুখে আটকে গেল। মা বাপ জানতে পারে নি। বাপ তাকে কোলে নিয়ে হাঁসপাতালে দৌড়ে এসেছে। ইটালী থেকে এতদুর চাঁদনীর হাঁসপাতালে দৌড়ে এসেছে, নিঃশ্বাস ফেলতে পাচ্ছে না, ছেলে যতই ছটফট করে বাপ ততই দৌড়োয়। খানিক দূর যেতেই ছেলে চুপ করে কাঁধের উপর শুয়ে পড়ল। বাপ ভাবিল যে, এখন বুঝি একটু ভাল। হাঁসপাতালে গিয়ে জানতে পারলে যে মরে গিয়েছে। যদি সে জানত গলায় কিছু ঢুকে গেলে কি করতে হয়, তাহলে ছেলেও মারা যেতনা, এবং বাপকেও মরা ছেলে কাঁদে লইয়া দৌড়াইতে হইত না। গলায় কিছু ঢুকে গেলে প্রথমে অক্ শব্দ করে, তার পর ঢোক গেলে, এবং মাথা নীচু করে দৌড়ায়, সে দুই হাত ফাঁক করে, বেশী জায়গা বাতাসের জন্য চায়, বাতাস বন্ধ হলে তারা আপনারা বাতাস নেবার চেষ্টা করে। সেই জন্য ছেলে বুড়ো সকলেই হাত

---

* ১৯০৩ সালে ৪ঠা সেপ্টেম্বর শ্রীযুক্ত ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় যে বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন, তন্মূলক।

ফুটো ছড়ায়, তাহলে বুক চওড়া হয়। ইহা কেউ শেখায় না, আপনিই হয়। দুধ খাবার সময় ছোট ছেলেদের গলায় দুধ আটকে গেলে মাথা নাড়ে, নাকে কিছু গেলে হাঁচি হয়। হাঁচি দেওয়াতে হলে নাকে সরু সুতো দিয়ে একটু ঘোরালে নাকে সুড়সুড়ি লাগে, এবং নাক বড় হয়, মাথা নীচু করে বুক চওড়া হয়। তার পর বাহির করবার উপায় কি, উপুড় করে শুইয়ে পিঠে চাপড় মরিলে গলার জিনিষ বেরিয়ে যায়। তা বলে ন্যাকড়া ট্যাকড়া গলায় ঢুকে গেলে ও রকম করলে বেরোয় না, তখন গলার আঙুল দিয়ে বের করতে চেষ্টা করিতে হইবে। পিঠে চড় দেবার সময় যেন মনে না করা হয় যে ছেলের লাগবে। আমরা সদ্যঃপ্রসূত ছেলে নিঃশ্বাস ফেলতে না দেখে গরম জলে ডুবিয়ে দি। উল্টে ফেলে পিঠে অর্থাৎ যে কোন রকমে ঘাড় নীচু করে মারলেই নিঃশ্বাস বেরোয়।

আঁতুড় ঘরের কথাও আজ কিছু বলিব। বাঙ্গলা দেশেই যে শুধু এরকম বিশ্বাস আছে, তা নয়। ইউরোপের ন্যায় সভ্য দেশেও এইরূপ বিশ্বাস আছে। আঁতুড় ঘরে যে ফিট হয়, বলে যে ভূতে ধরেছে—বার্ম্মারা গ্রহণের সময় আমাদের দেশের শাঁখের বদলে বাঁস হাঁড়ী ইত্যাদি যা থাকে তাই দিয়ে খুব শব্দ করে। কেন করে? জিজ্ঞেস করলে বলে ভূতকে তাড়িয়ে দিচ্ছি।

আঁতুড় ঘরে তক্তপোষে শুতে দেয় না। তার ভেতরে আগুন জলে এবং ফুটো ফাটা থাকলে তাহাও ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়া দিয়ে বন্ধ করে দেয়।

শীতকালে কিংবা বর্ষাকালেও বেশী কাপড় দেওয়া হয় না, কারণ আঁতুড়ের জিনিষ সব ফেলা যায়। বাতাস থেকে অম্লজান হয় আমরা জানি, এবং তাহা আগুনেও পোড়ে। জলেতেও অম্লজান দরকার। এই জন্য আগুন জ্বালালে শীঘ্রই সেই বন্ধ ঘরের বাতাসে অম্লজানের অভাব হয়ে পড়ে। আগুনটাও ভাল করে জ্বলতে পারে না, এবং ধোঁয়া হয়। ঐ ধোঁয়া নিঃশ্বাসের সহিত রোগীর শরীরে গিয়া রক্ত খারাপ করে, এবং মাথা বিকৃত করে দেয়। এই অবস্থাতেই ফিট্ হয়, তখন তাড়াতাড়ি যদি কেউ গিয়ে দরজাটা খুলে দিয়ে আগুনটা বের করে, ফেলে, এবং মুখে একটু জলের ছিটে দিয়ে বাতাস করে, তাহলেই তিনি বাঁচিয়া যান। কারণ বাতাসই দরকার।

মূল্যপ্রাপ্ত।

১০ম বৎসর।

শ্রীযুক্ত হাজারিলাল,		।৹
„ মতিলাল মুখোপাধ্যায়,	বরাহনগর	২৲
„ মিয়াঁ এনায়ত উল্লা,	হলদিবাড়ী	২৲
„ দুর্গাপ্রসন্ন সেন,	কটক	২৲
„ মহারাজা,	দিনাজপুর	২৲

১১শ বৎসর।

শ্রীমতী তরঙ্গিণী দত্ত,	জপালা	২৲
„ লীলাসুন্দরী দেবী,	কলিকাতা	২৲
শ্রীযুক্ত মিয়াঁ আমানত উল্লা	বড় মরিচা	২৲
„ মিয়াঁ এনায়ত উল্লা,	হলদিবাড়ী	২৲
„ মতিলাল মুখোপাধ্যায়,	বরাহনগন	২৲
„ দুর্গাপ্রসন্ন সেন,	কটক	২৲
„ মহারাজা,	দিনাজপুর	২৲
„ হেমেন্দ্রলাল কাস্তগিরি	আজপুর	২৲
„ জয়চন্দ্র দাস,	বরিশাল	২৲
„ তারকনাথ রায়,	কলিকাতা	২৲

১২ বৎসর।

শ্রীমতী তরঙ্গিণী দত্ত,	জপালা	২৲
„ সরযুবালা সেন,	মজাফরপুর	২৲
শ্রীযুক্ত মিয়াঁ এনায়ত উল্লা,	হলদিবাড়ী	২৲
কুচবিহার নববিধান ব্রাহ্মসমাজ লাইব্রেরী		২৲

মহিলার নিয়মাবলী।

মহিলা পত্রিকার ডাকমাশুলসহ বার্ষিক মূল্য ২৲ মাত্র। গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ মহিলার মূল্য ও অর্থসম্বন্ধীয় পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নামে এবং প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকটে ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইবেন। প্রাপ্ত প্রবন্ধাদি উপযুক্ত হইলে শীঘ্র হউক বা বিলম্বে হউক প্রকাশিত হইবে। কাহারও প্রবন্ধ ফেরত দেওয়া যাইবে না।

অনেক মহিলা পত্রিকা বৎসরাধিক কাল গ্রহণ করিয়া মূল্য দান করেন না' বড় দুঃখের বিষয়। যাঁহারা মূল্যদানে অসমর্থ তাঁহারা যেন অবিলম্বে পত্রিকা ফেরত পাঠাইয়া দেন, অথবা আমাদিগকে তাহা পাঠাইতে নিষেধ লেখেন। তাহা হইলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইব না। পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়া প্রাপ্য মূল্য না পাইলে অনেক সময়ে আমরা সেই মূল্যের জন্য ভি, পিতে মহিলা পাঠাইয়া থাকি।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১২শ ভাগ] অগ্রহায়ণ ১৩১৩ ; ডিসেম্বর ১৯০৬। [৫ম সংখ্যা।

স্ত্রীনীতিসার।

বালক বালিকাদের পাঁচ ছয় বৎসর বয়ঃক্রম হইলে মা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন যে, প্রত্যেক জীবকে ঈশ্বরই অন্ন দান করিয়া প্রতিপালন করেন, তাঁহার অনুগ্রহেই দেহরক্ষা জীবনরক্ষা হয়। তাঁহারই বিধানে ক্ষেত্রে শস্যাদি উৎপন্ন হয়; উহা ভক্ষণ করিয়া জীব জীবন ধারণ করে। তিনিই সর্ব্ব জীবের জীবিকাদাতা ; হিন্দুরা অন্নদায়িনী জননী বলিয়া তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা দান করেন। অন্নভোজনের সময় বালক বালিকারা যেন কৃতজ্ঞতার সহিত অন্নদাতা ভগবান্‌কে নমস্কার করে। তাহারা যেন পশু পক্ষীর ন্যায় ভোজন না করে। তিনি পান ভোজনের সময় স্নানাবগাহনের সময় তাহাদিগকে ঈশ্বরকে স্মরণ ও ভক্তি করিতে শিক্ষা দিবেন, এবং নিজে এই উচ্চ নীতির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবেন। তাহা হইলে বাল্যকাল হইতে তাহারা পান-ভোজনাদিতে পবিত্রতা রক্ষা করিতে শিক্ষা পাইবে। তাহাদের পানাহার ইতর জীবের পানাহারের ন্যায় নিরীশ্বর হইবে না।

কোন বালক বা বালিকা কখনও কোন সুরস ফল বা মিষ্টান্ন পাইলে স্বার্থপর হইয়া একা নিজে যেন ভক্ষণ না করে, ভাই ভগিনীদিগকে যেন তুল্য রূপে ভাগ করিয়া দেয়, মা তাহাদিগকে এরূপ উপদেশ দিবেন। স্বার্থপরতা পশুভাব, নিঃস্বার্থতা দেবভাব ইহা বুঝাইয়া দিবেন। প্রেম মানুষকে নিঃস্বার্থ দেবতা করিয়া তোলে, অপ্রেম স্বার্থপর পশু করিয়া থাকে। প্রেমেতে সুখসম্মিলন হয়, অপ্রেমে বিবাদ বিসংবাদ ঘটে, সংসার দুঃখ অশান্তির আলয় হয়। মা নানা উপায়ে বালক বালিকাদিগকে ইহা শিক্ষা দিবেন।

বালক বালিকাগণ যেন পিতাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করে, তাঁহার আজ্ঞাবহ হইয়া থাকে, তাঁহার প্রতি কোন রূপ অবিনয় অশিষ্টতা প্রকাশ না করে, কোন জ্যেষ্ঠ গুরুজনের নিকটে যেন উদ্ধত অবিনীত না হয়, মা এরূপ শিক্ষা দিবেন।

—

পার্ব্বত্য অসভ্য রমণীদের চরিত্র।

ভারতের প্রাচীন ইতিহাস বলে, আর্য্য-জাতি এদেশের আদিম নিবাসী নহেন। গারো কুকী খসিয়া সাওঁতাল কোল প্রভৃতি পার্ব্বত্য অসভ্য জাতি আদিম নিবাসী। পূর্ব্বে ভারতের সকল স্থান অরণ্যাকীর্ণ ছিল, সেই অরণ্যে বর্ত্তমান গারো কুকী খসিয়া প্রভৃতির পূর্ব্ব পুরুষগণ বাস ও বিচরণ করিত। আর্য্যগণ ইরাণ দেশ হইতে আসিয়া বাহুবলে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া এদেশ অধিকার করেন, সর্ব্বত্র আধিপত্য স্থাপন ও রাজ্য বিস্তার করিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন। উক্ত অনার্য্য বর্ব্বর লোকেরা আর্য্যদিগের বুদ্ধি-বলে ও অস্ত্রবলে পরাস্ত হইয়া ভীতপ্রাণে নিবিড় অরণ্যে ও পর্ব্বতে যাইয়া লুক্কায়িত হয়। আর্য্যগণ ভারতের স্থানে স্থানে গ্রাম নগর স্থাপনপূর্ব্বক সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে থাকেন। তাঁহাদের অনেকে নির্জ্জনে নদী তটে ও পর্ব্বত মূলে স্থিতি করিয়া যাগ যজ্ঞ তপস্যায় জীবন যাপন করিতে প্রবৃত্ত হন। সুযোগমতে বৈরনির্য্যাতনোদ্দেশ্যে সেই সকল বন্য অসভ্য লোক অকস্মাৎ আসিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণপূর্ব্বক তাঁহাদের তপস্যা ও যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়ার বিঘ্ন সম্পাদন করে, এবং তাঁহাদের সর্ব্বস্ব লুটপাট করিয়া লইয়া যায়। তখন বিপন্ন ও নিগৃহীত আর্য্য তপস্বিগণ অনন্যোপায় হইয়া ইন্দ্রপবনাদি দেবতার নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করেন, এবং তাঁহাদের স্তব স্তুতি করিতে থাকেন; অথবা সেই দুর্দ্দান্ত অসভ্য লোকদিগের উৎপাত নিবারণের জন্য পরাক্রান্ত রাজা বা কোন বীরপুরুষের শরণাপন্ন হন। তখন দুর্জ্জয় বীরপুরুষেরা যাইয়া তপস্যার বিঘ্ননি-বারণ করিয়াছেন, সেই অত্যাচারী বন্য অসভ্য লোকদিগকে বধ করিয়াছেন, বা তাড়াইয়া দূর করিয়া দিয়াছেন। সেই সকল দুষ্ট দুরাচার বন্য লোকদিগকে রাক্ষস বা অসুর বলা হইয়াছে। তখন অনেক অসভ্য স্ত্রীলোকও আসিয়া আর্য্য তপস্বীদিগের প্রতি বিষম উৎপাত করিত। ত্রেতাযুগে ভাগীরথী তীরে বিশ্বামিত্র মুনি তপস্যা করিতে ছিলেন। তারকানাম্নী বিকটাকারা রাক্ষসী তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ করিয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত উৎপাত আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার উৎপাতনিবারণের জন্য তিনি শ্রীরামের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। তখন রামচন্দ্র বালক ছিলেন, কিন্তু শৌর্য্য বীর্য্যে জগদ্বিশ্রুত হইয়াছিলেন। মহাবীর রামচন্দ্র তপোধন বিশ্বামিত্রের সঙ্গে তাঁহার তপোবনে যাইয়া তারকাকে বধ করেন। আরা জিলার বক্‌সার সবডিভিশনের অদূরে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের তপোবন ছিল। এক্ষণও সেই তপোবনের স্মৃতিচিহ্ন আছে। বহু যাত্রিক তাহা দর্শন করিতে যায়। বক্‌সার নগরের পার্শ্বে তারকানালা নামে একটী ক্ষীণ পয়ঃপ্রণালী আছে। কথিত আছে শ্রীরাম তারকাকে বধ করিয়া তাহার বিরাট দেহ সেই প্রণালীতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। উহা আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। উহার অদূরে গঙ্গাতীরে কয়েকটি মন্দির বিদ্যমান, মন্দির সকলে রাম মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। তারকা-নালার নিকটে তরুশাখায় দলে দলে মর্কট.

বৃন্দ বাস করে। প্রাচীন ইতিহাস ও বর্ত্তমান ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে "জোর যার মুল্লুক তার" এই কথাই সত্য বলিয়া সপ্রমাণ হয়। যাহা হউক ইতিহাসচর্চ্চা করা আমাদের লক্ষ্য নহে। পার্ব্বত্য অসভ্য নারীদিগের চরিত্র কাহিনী বর্ণন করা এ প্রবন্ধের লক্ষ্য।

* আমরা আসাম ও বঙ্গদেশের অরণ্য ও পার্ব্বত্যভূমিতে এবং হিমাচলের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভ্রমণ করিয়া নানা জাতীয় পার্ব্বত্য অসভ্য স্ত্রীলোক দর্শন করিয়াছি ও তাহাদের প্রকৃতি এবং আচার ব্যবহারের প্রতি কিয়ৎ পরিমাণে লক্ষ্য করিতে পারিয়াছি। আমরা তাহাদের সরল স্বাভাবিক ভাব দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি। অনেকের চরিত্র বাঙ্গালী মেয়েদের চরিত্র অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। তাহারা লেখাপড়া জানে না, কখনও কোন শাস্ত্রের উপদেশ শ্রবণ করে নাই, কেবল স্বভাবের দ্বারা পরিচালিতা। তাহারা সভ্যলোকদিগের ন্যায় কুটিলতা প্রবঞ্চনা জানে না, সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তিযুক্তা ও শ্রমনিপুণা। তাহারা পরস্পর দ্বেষ হিংসা করে না, এবং কলহ বিবাদ করিয়া পল্লীকে বিকম্পিত করিয়া তোলে না। এক্ষণ আর তাহারা পূর্ব্ববৎ রাক্ষসী ও দানবী নহে। কালে তাহাদের প্রকৃতির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সকলের না হউক অনেকের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সেই পার্ব্বত্য অসভ্য লোকদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহ বিরল। গারো খসিয়া প্রভৃতি অসভ্য জাতির কন্যাগণ বয়ঃস্থা হওয়ার পূর্ব্বে পরিণীতা হয় না। তাহারা যৌবনকালে স্বাধীনভাবে স্বেচ্ছানুসারে পাত্র মনোনীত করিয়া বিবাহ করে। পিতামাতা বলপূর্ব্বক স্বীয় কন্যাকে বাল্যকালে পাত্রস্থ করে না। আমরা খসিয়াহিলে কয়েক দিন স্থিতি করিয়া দেখিয়াছি যে, বয়ঃস্থা খাসিয়াকন্যাগণ যুবা পুরুষদিগের সঙ্গে স্বাধীনভাবে মিশামিশি করে, একত্র মিলিয়া কাজ কর্ম্ম করিয়া থাকে, ইতস্ততঃ বেড়িয়া বেড়ায়, কিন্তু তাহাতে তাহাদের চরিত্রের কখনও স্খলন হইয়াছে আমরা এরূপ শুনিতে পাই নাই। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে। সভ্য বাঙ্গালী যুবক যুবতীদের এরূপ সংমিশ্রণে কত বিপদের আশঙ্কা করা যায়। সর্ব্বত্র অসভ্য নারীদের মধ্যে কোনরূপ অবিরোধ ও আবরণ নাই, তাহারা মুক্তভাবে যথা তথা গমন করে, পুরুষদিগের নিকটে যাইতে সঙ্কুচিত হয় না; অপর পুরুষের সঙ্গে স্বাধীনভাবে কথাবার্ত্তা কহে, কাজকর্ম্ম করে, কিন্তু ভাবভঙ্গিতেও কুভাব প্রকাশ করে না। তাহারা কুটিলভাবে দৃষ্টিপাত, কুৎসিত উপহাস বিদ্রূপ করিতে জানে না বলিলেই হয়। সভ্য ইংরাজ ও বাঙ্গালীদিগের দ্বারা আজ কাল তাহাদের অনেকের চরিত্র বিকৃত হইয়াছে, তাহারা সেই সরলতা ও পবিত্রতা হারাইয়াছে। কোন কোন বাঙ্গালী যুবক খসিয়া যুবতীকে বিবাহ করিয়াছে, কিয়দ্দিন পরে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়িত ভাবে অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। যুবকের এরূপ বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্যে যুবতী মর্ম্মাহত হইয়াছে। তবে ভুটিয়া নারীগণের এবং চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদে-

শের ভুমিয়া নারীদিগের চরিত্রের প্রশংসা শুনা যায় নাই। কুকীদের মধ্যে ব্যভিচার ঘটিলে ব্যভিচারীর প্রতি গুরুতর শাসন হয়, রাজা প্রাণদণ্ড করিয়া থাকেন। চুরি চাতুরী মিথ্যা প্রবঞ্চকের জন্যও কঠিন দণ্ড হয়। রাজা সেই অপরাধে অপরাধীকে নিজের দাস করিয়া রাখেন।

অসভ্য নারীগণ নিতান্ত সরল ও সত্যপ্রিয়। তবে আমাদের ন্যায় সভ্য বাঙ্গালীদের দোষে, তাহাদের অনেকে মিথ্যা কপটতা শিখিয়াছে। আমরা যখন ময়মনসিংহনগরে বাস করিতে ছিলাম; আমাদের বাড়ীতে একদিন তিনটী গারো কন্যা জ্বালানী কাষ্ঠ বিক্রয় করিবার জন্য আসিয়াছিল। তিন জনেই অবিবাহিতা, তাহাদের বয়ঃক্রম ১৮।১৯ বৎসর ছিল। আমাদের একজন বন্ধু তাহাদের কাঠের দর জিজ্ঞাসা করেন, তাহারা এক এক বোঝার মূল্য তিন আনা বলিয়াছিল। বন্ধু নয় পয়সা বলেন। পরে তাহারা নয় পয়সাতেই বিক্রয় করিতে সম্মত হয়। তাহাতে তিনি তাহাদিগকে অনুযোগ করিয়া বলেন, "তোরা না মিছা কথা বলিস না? নয় পয়সা দরের কাঠের দর তিন আনা কেন বলি?" তাহাতে গারো কন্যারা চটে তাঁহাকে বলিয়াছিল, "আমরা কি মিছা কথা কই, তরাইতো আমাদের মিছা কথা হিকাইয়াছিস।" অর্থাৎ বিক্রেতা দ্রব্যজাতের প্রকৃত মূল্য বলিলে পর বাঙ্গালী ক্রেতারা সেই মূল্যে তাহা সহজে ক্রয় করিতে চাহে না, গোলযোগ করে। অতএব বাধ্য হইয়া উচিত মূল্য গোপন করিয়া বিক্রেতাকে তদপেক্ষা উচ্চ মূল্য বলিতে হয়। এই রূপে মিথ্যা বলিতে অভ্যাস হইয়া থাকে। পার্ব্বত্য অসভ্য লোকেরা সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলে না, কেবল বাঙ্গালীদিগের দোষে তাহারা মিথ্যা কথা কহিতে শিক্ষা করিতেছে।

আমরা সম্প্রতি দার্জিলিং পর্ব্বতে গিয়াছিলাম, সেখানে পাহাড়ী, নেপালী ভুটিয়া লেপচা জাতীয় নানা শ্রেণীর স্ত্রীলোক দলে দলে দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক পাহাড়ীও নেপালী যুবতী তথাকার বাঙ্গালী ভদ্রলোক ও সাহেবদিগের গৃহে চাকরাণীর কাজ ও আয়ার কাজ করিয়া থাকে। দার্জিলিংপ্রবাসী কোন কোন বাঙ্গালী মহিলা বলিয়াছেন, এই সকল লোক অতিশয় সরল সত্যবাদী এবং কাজ কর্ম্মের সুনিপুণ ও বিশ্বস্ত; চুরি চাতুরী কিছুই জানে না। ইহারা গৃহের কোন জিনিষ কখনও চুরি করে না, মিথ্যা কথা বলে না। মূল্যবান্ অলঙ্কারাদি বাক্স হইতে বাহিরে রাখিয়া গৃহের সমুদায় দ্বার উন্মুক্ত রাখিলে কিছুই চুরি হওয়ার আশঙ্কা নাই। অনেক পাহাড়ী যুবতী অতিশয় রূপবতী, তাহাদের চরিত্রের স্খলন হইয়াছে কেহতো আমাদিগকে বলে নাই। হিমাচলবাসিনী ভুটিয়া লেপচা জাতীয় সাধারণ নারীগণ গৌরবর্ণা, অনেকে দিব্য লাবণ্যশালিনী। সেই সকল নারী বাজারে শাক সবজী ইত্যাদি পণ্যজাত বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, এবং মোট বহন করিয়া থাকে। এক এক জন যুবতী দুই মণ আড়াই মণ মোট পৃষ্ঠে বহন করিয়া পার্ব্বত্য বন্ধুর পথে সবেগে চলিয়া

যায়। তাহারা এরূপ শক্তিশালী যে,দুই জন বাঙ্গালী বা হিন্দুস্থানী যুবা পুরুষ, এক জন ভুটিয়া নারী কর্তৃক বাহিত মোট বহন করিতে সক্ষম নহে। যুবতীগণ পৃষ্ঠে মোট বহন করিয়া অবনত মস্তকে চলিয়াছে, এদিকে তাহাদের হস্ত দ্বয়ের বিরাম নাই, জুতা মুজা ইত্যাদি সিলাই করিতেছে; ষ্টেশনে এবং ইতস্ততঃ পথে বাজারে এরূপ দৃষ্ট হয়। সেই সকল নারী সস্মিতবদনা, স্ফূর্ত্তিশালিনী অলঙ্কৃতা। ভুটিয়া নারীদিগের কর্ণভূষণ ও কণ্ঠভূষণ বৃহদাকার ও বিচিত্র। অনেকে বহু মূল্যের উজ্জ্বল স্বর্ণালঙ্কার সর্ব্বদা কর্ণে ও কণ্ঠে ধারণ করে। ইহারা দার্জ্জিলিং ও কর্সিয়াং পর্ব্বতের পথে নানা কার্য্যে দলে দলে বেড়াইয়া বেড়ায়, বা পথপ্রান্তে অনেকে দলবদ্ধ ভাবে স্থিত করে। আমরা দার্জ্জিলিং হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় সিপাহী শ্রেণীর কতকগুলি হিন্দুস্থানী মোসলমানের সঙ্গে এক গাড়ীতে ছিলাম। তাহাদের দুই এক জন যে যে স্থানে ভুটিয়া ও পাহাড়ী যুবতীদিগকে দেখিয়াছে, তাহাদের প্রতি কুৎসিত ভাব প্রকাশ করিয়াছিল,এবং অশ্লীল কথা বলিয়াছিল। ইহা দেখিয়া শুনিয়া আমাদের মনে বড় দুঃখ হইয়াছিল, সেই দুরাত্মাদের ব্যবহারে ঘৃণা জন্মিয়াছিল। এই সকলই লোক শয়তানের চেলা।

আসামের ভিন্ন ভিন্ন পর্ব্বতশ্রেণীতে ও অরণ্যমধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর অসভ্য জাতি বাস করে। তন্মধ্যে খসিয়া, মিরি, মিকির, মিসমী জাতি নিরীহ ও শান্ত,নাগা, ডফ্‌লা ও আকা প্রভৃতি দুষ্ট ও দুরন্ত। তবে ইংরাজশাসনে শাসিত হইয়া তাহারাও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক শান্ত হইয়া আসিয়াছে। মধ্য আসাম তেজপুর নগরের অনতিদূরে হিমালয়শ্রেণীতে ডফ্‌লারা বাস করে। তেজপুরে একটী ডফ্‌লা নারীকে বীর নারীর ন্যায় সশস্ত্র দৃষ্ট হইয়াছিল। গোয়ালপাড়া অঞ্চলে খ্রীষ্টান মিশনারীদিগের যত্নে অনেক গারো কন্যা লেখা পড়া শিক্ষা করিয়াছে, তাহারা গারো স্কুল সকলে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিতেছে। এক জন মিশনারি সাহেব আমাদিগকে গোওয়ালপাড়া পর্ব্বতের উপর গারো স্কুল প্রদর্শন করিতে লইয়া গিয়াছিলেন। সেই স্কুলে গারো পুরুষদিগের সঙ্গে মেয়েরাও বাঙ্গলা সাহিত্য ব্যাকরণাদি শিক্ষা করিতেছিল। মিশনারী সাহেবদিগের যত্নে ছোটনাগপুরের বন্য জাতীয় কোল ও সাঁওতাল কন্যাদিগের কেহ কেহ লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া ধাত্রীর কার্য্য করিতেছে, ও শিল্পকার্য্যে সুনিপুণা হইয়াছে, কোল ও সাঁওতাল রমণীগণ কৃষ্ণাঙ্গী, কিন্তু তাহাদের মুখমণ্ডল ও অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুগঠিত, তাহারা শারীরিক সৌন্দর্য্য সৌষ্ঠব হইতে বঞ্চিত নহে। কোল সাঁওতাল গারো খসিয়া প্রভৃতি বন্য জাতীয় নারীগণ আনন্দোৎসবাদি উপলক্ষে পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া দলবদ্ধভাবে নৃত্য করে। কিন্তু পুরুষের সঙ্গে তাহাদের অশ্লীলতাব্যঞ্জক নৃত্য হয় না। কোল ও সাঁওতাল জাতীয় নারীগণ নম্রপ্রকৃতি লজ্জাশীলা। ইহারা অপর অনেক অসভ্য জাতীয় নারীর ন্যায় ভূষণপ্রিয়া নহে। কিন্তু

অসভ্য গারো রমণীগণ অত্যন্ত অলঙ্কার-প্রিয়া। তাহারা কর্ণলতিকায় বৃহৎ ছিদ্র করিয়া পাঁচ সাতটি বড় বড় পিত্তলের আংটী ধারণ করে, তাহার ভারে অনেকের কর্ণ ছিন্ন হইয়া যায়। তাহারা কণ্ঠে পুঞ্জ পরিমাণে পুঁতির মালা পরিয়া থাকে। তাহাদের অলঙ্কার সকল অদ্ভুত। নয়নীতাল পর্ব্বতের শ্রমজীবিনী অনেক যুবতী অতিশয় সুশ্রী লক্ষিত হইয়াছে। তাহাদিগকে অত্যন্ত লজ্জাশীলা নম্রপ্রকৃতি বোধ হইয়াছিল। একদা আমরা দেরাদুন হইতে ৮ মাইল দূরে অরণ্যাকীর্ণ পথে মসুরী পর্ব্বতের পাদদেশে সহস্র ঝরা নামক বিচিত্র প্রস্রবণ দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিবার সময় একটী পরম রূপবতী যুবতী পার্ব্বত্য পথে আমাদের সম্মুখবর্ত্তিনী হয়। যুবতী আমাদিগকে দেখিয়াই লজ্জায় মস্তক অবনত করে, অপ্রতিভ হইয়া পথের একপ্রান্তে যাইয়া দণ্ডায়মান। আমরাও সসম্ভ্রমে অপসৃত হই। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখি একজন যুবা পুরুষ আসিতেছে, বোধ হইল সেই লাবণ্যবতী যুবতীর অনুগামী তাহার স্বামী বা অন্য কোন আত্মীয় পুরুষ। তাহাকে দেখিয়া কন্যাটীর সাহস হইল। মহাকবি কালিদাস এবং অন্যান্য আর্য্য কবি এই সকল নারীকে হিমাচল-শিখরবাসিনী অপ্সরা বা কিন্নরী বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকিবেন। মূর্খ অসভ্য নারীদিগের নিকটে। জ্ঞানাভিমানিনী সভ্যা মহিলাদিগকে কত সুনীতি শিক্ষা করিবার আছে।

নারীজাতির প্রকৃত উন্নতি কিসে হয়?

বর্ত্তমান যুগে এদেশে এক শ্রেণীর সভ্য ভব্য কৃতবিদ্য যুবা পুরুষ সকল আছেন, তাঁহারা মনে করেন বাঙ্গালী মহিলাগণ স্কুল কলেজে পুরুষ ছাত্রদিগের প্রতিযোগিনী হইয়া শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে, এবং উচ্চ শিক্ষালাভ করিলে, বড়বড় উপাধি অধিকার করিলে, সাইকেলে চড়িয়া বগি হাঁকাইয়া স্বাধীনভাবে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে পারিলে, সভায় বক্তৃতাদানে সুদক্ষ হইলে, Garden party এবং Teaparty ইত্যাদিতে পুরুষদিগের সঙ্গে যোগদান করিয়া আমোদ গল্পে রত হইতে পারিলে, টেনিস নাটকাদির আমোদে মত্ত হইলে, নিত্য English dinner ভক্ষণ করিলে, তাঁহাদের উন্নতির পরাকাষ্ঠা হয়, এরূপ উন্নতিসাধনে তাঁহাদিগকে উৎসাহ দেওয়া ও সাহায্য করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে বঙ্গীয় পরিবারসকল স্বর্গের দৃশ্য ধারণ করিতে পারে। সেই সকল নব্য কৃতবিদ্য পুরুষ তদ্রূপ নারীজীবন গঠনে স্বর্গীয় পরিবারস্থাপনে প্রাণপণে যত্ন করিয়া থাকেন। অপর এক শ্রেণীর পুরুষ আছেন তাঁহারা ধর্ম্ম ও নীতিকে সর্ব্বোপরি প্রাধান্য দান করিতে ব্যস্ত। তাঁহারা বলেন, নারীগণের শিক্ষা স্বাভাবিক ও নারীপ্রকৃতির অনুরূপ ধর্ম্মানুমোদিত হইবে, যাহাতে তাঁহারা সুপত্নী সুমাতা সুগৃহিণী হইতে পারেন, তাঁহাদের স্বাভাবিক কোমলভাব

সকল বিকাশ প্রাপ্ত হয়, তাহারা কোন রূপ অস্বাভাবিক বিজাতীয় জন্তু হইয়া না উঠেন, যত্নপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে এরূপ শিক্ষা দান করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে বঙ্গীয় পরিবারে সুখ শান্তি অব্যাহত থাকিবে। যাহাতে তাঁহাদের মনে ধর্ম্ম ভাব প্রবল হয়, পূজার্চ্চনায় অনুরাগ হয় তাঁহারা সেবাপরায়ণা সতী পুণ্যবতী হইয়া পতিপুত্র প্রভৃতিকে ধর্ম্মের পথে, পুণ্যের পথে আকর্ষণ ও পরিবারের শোভাবর্দ্ধন করেন, যত্নপূর্ক তাঁহাদিগকে এরূপ শিক্ষিত করা সমুচিত। ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলে উক্ত হইয়াছে, "তদ্রূপ নারীগণ লজ্জা ও সুশীলতা সহকারে ভদ্র বসনে আপনাদিগকে সুসজ্জিত করুন, কেশবিন্যাস, স্বর্ণমুক্তা, অথবা বহু মূল্য বেশে ভূষিত না হইয়া সাধ্বা স্ত্রীগণের উপযুক্ত সৎক্রিয়া দ্বারা সুশোভিত হউন।"

"পুণ্যবতী স্ত্রী স্বামীর শিরোভূষণ, যে স্ত্রী লজ্জিত করে সে তাহার অস্থির ক্লেদ।"

হিন্দুশাস্ত্রান্তর্গত মহাভারত অনুশাসন পর্ব্ব বলেন ;—

"যা সাধ্বা নিয়তাচারা সা ভবেদ্ধর্ম্মচারিণী। শ্রুত্বা দম্পতিধর্ম্মং বৈ সহধর্ম্মকৃতং শুভম্।"

যে সাধ্বী স্ত্রী সদাচারা হইয়া দাম্পত্য ধর্ম্ম শ্রবণপূর্ব্বক উত্তমরূপে তদ্ধর্ম্ম সাধন করিয়াছেন তিনিই ধর্ম্মচারিণী হন।

"বিভর্ত্ত্যন্নপ্রদানেন কুটুম্বঞ্চৈব নিত্যদা-নকামেষু ন ভোগেষু ঐশ্বর্য্যে ন সুখে তথা। স্পৃহা যস্যা যথা পত্যৌ সা নারীধর্ম্মভাগিণী।"

যে নারী নিত্য অন্নদান করিয়া কুটুম্ব দিগকে প্রতিপালন করেন, পতিতে যেমন স্পৃহা এমন ভোগ ঐশ্বর্য্য সুখ কামনায় স্পৃহা নাই, সেই নারীই ধর্ম্মভাগিণী হন।

"শুশ্রূষাং পরিচর্য্যাঞ্চ দেবতুল্যং প্রকুর্ব্বতী বশ্যভাবেন সুমনাঃ সুব্রতা সুখদর্শনা।"

সদাচারা প্রিয়দর্শনা নারী সন্তুষ্ট চিত্তে দেবতুল্য স্বামীর বশ্যভাবে সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকেন।

আমরা সীতা সাবিত্রী প্রভৃতির তুল্য আর্য্যগুণসম্পন্না সতীসাধ্বী পুণ্যবতী বঙ্গরমণী দেখিতে পাইলে পরমানন্দিত হই। তাঁহারা বঙ্গের গৌরব পরিবারের ভূষণ স্বরূপ হন, তাঁহাদের দ্বারা পিতৃকুল পতিকুল পবিত্র হয়। আমরা ধর্ম্মহীন শিক্ষা ও সভ্যতার পক্ষপাতী নহি, ধর্ম্মোন্নতি আত্মোন্নতি ব্যতীত কেবল বাহ্যোন্নতি ও শারীরিক সুখস্বচ্ছন্দতা অসারের অসার, ইহা স্বকীয় ও জাতীয় অধোগতির কারণ। বাহিরের সংস্কার ধর্ম্মানুগত না হইলে উহা পরিণামে দুঃখ বিপৎকে ডাকিয়া আনয়ন করে। এক সময় ভক্ত কেশবচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "আমি ইচ্ছা করি আমাদের কন্যাগণ ভগিনীগণ আর্য্যগুণসম্পন্না হন, তাঁহারা ভক্তিরসার্দ্র হইয়া একতন্ত্রিযোগে হরিগুণগান করেন, নিশাসমাগমে নির্জ্জনে বসিয়া যোগধ্যানে মগ্ন হন, আমি এরূপ ইচ্ছা করি। ইহা হইলে স্বর্গের দৃশ্য, আনন্দ জনক হয়। কেশবচন্দ্র সেই উদ্দেশ্য সাধন-জন্য আর্য্যনারীসমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন। আর্য্য নারীসমাজের সভ্যগণ তাঁহার শুভ ইচ্ছা কত দূর জীবনে সাধন করিতে-

ছেন জা'ন না। কিন্তু অপর কাহার কাহার ইচ্ছা যে তাহা না করিয়া তাঁহারা Tea-party তে যাইয়া যোগ দান করেন, ধর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া ইতস্ততঃ আমোদ গল্প করিয়া বেড়ান। যে পর্য্যন্ত বঙ্গ বালাগণ অন্তর্মুখীন না হইবেন, তাঁহারা আত্মোন্নতি বিধানে যত্ন না করিবেন, কেবল বহির্মুখীন হইয়া নীতি ধর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া বাহ্যিক সুখ সভ্যতা আমোদোল্লাসে ব্যস্ত থাকিবেন সে পর্য্যন্ত সমুদায় নিষ্ফল হইবে, বরং বিষময় ফল উৎপন্ন হইবে। সারধর্ম্ম-প্রকৃত ধর্ম্ম ব্যতীত কেবল বাহ্যিক চাক্‌চিক্যে কোন্ ব্যক্তির বা কোন জাতির পক্ষে উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে? সদ্ধর্ম্ম ও সুনীতিকে জীবনের অবলম্বন করিয়া চলিলে জ্ঞান সভ্যতার প্রকৃত উন্নতি হইবে, সর্ব্বাঙ্গ উন্নতি সাধিত হইবে।

আমাদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

(হায়দরাবাদ—সিন্ধ।)

বিগত কার্ত্তিক মাসে করাচির ভ্রমণ-বৃত্তান্তে উল্লিখিত হইয়াছে যে, গত বৎসর ২০শে কার্ত্তিক অপরাহ্নে দেওয়ান তারাচাঁদের সঙ্গে আমরা করাচি হইতে হায়দরাবাদে যাত্রা করিয়াছিলাম। আমরা সেই দিন মধ্যরজনীতে হায়দরাবাদে উপনীত হই। দেওয়ান তারাচাঁদ আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার আবাসে লইয়া যান, তথায় আমাদের অবস্থিতির ব্যবস্থা করেন। তারাচাঁদ হায়দরাবাদ ট্রেণিং কলেজের প্রিন্সিপাল। তিনি অতিশয় আতিথেয় পুরুষ, দূরদেশ হইতে সমাগত অতিথিদিগকে তিনি অতিশয় আদর শ্রদ্ধা করেন, অতিথি যাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারেন তৎপ্রতি তাঁহার বিশেষ যত্ন ও মনোযোগ। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, আমরা যে কয়েকদিন হায়দরাবাদে থাকিব তাঁহার গৃহে স্থিতি করিয়া তাঁহার সেবা গ্রহণ করি। কিন্তু তিনি বড়লোকের ন্যায় জীবন যাপন করেন, আমাদের সেইভাবে তাঁহার আবাসে বাস করিতে ইচ্ছা হয় নাই, সমাজ বাড়ীতে প্রচারক ও ব্রাহ্ম অভ্যাগতদিগের অবস্থিতির জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘর আছে, সেস্থানে নির্জ্জনে গরিবানামতে স্থিতি করিব, আমাদের একান্ত অভিলাষ হইয়াছিল। বিশেষতঃ আমরা ভাবিয়াছিলাম, যে সিন্ধী ভদ্রলোকের বাড়ীতে বাস করিলে সিন্ধীদের প্রণালী মতে প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জনাদি ভোজন করিতে বাধ্য হইব, তদ্রূপ ভোজনে ৫।৭ দিন জীবন ধারণ করা আমাদের পক্ষে বিষম কষ্টকর হইবে। যত দিন হায়দরাবাদে থাকিতে হয় সমাজবাড়ীতেই থাকিব। পরলোকগত গোপালচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের দুইটী কুমারী কন্যা তথাকার বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের গর্ভধারিণী তাঁহাদিগের সঙ্গে বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগের বাড়ী নিকটে, মাধ্যাহ্নিক ভোজনের ব্যবস্থা সেখানে করিব, তাহা হইলে বাঙ্গালীর মত আহার পাইয়া প্রাণটা বাঁচিবে। আমরা মনে মনে এরূপ স্থির করিয়া দেওয়ান তারাচাঁদকে তাহা জানাইয়াছিলাম। এই প্রকার ব্যবস্থায় আমাদের একান্ত আগ্রহ দেখিয়া তিনি অগত্যা সম্মত

হইলেন, এবং আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া সমাজবাড়ীতে লইয়া গিয়া তথায় থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন, পরে বাঙ্গালী মহিলাদের নিকটে লইয়া গেলেন। কুমারী দিগের মা আমাদিগকে প্রতিদিন রাঁধিয়া খাওয়াইবেন ভাবিয়া আনন্দিত হইলেন।

১৮৪৩ সালে ইংরাজেরা সিন্ধুদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে এদেশে মীরদিগের আধিপত্য ছিল। মীরেরা বেলুচিস্থান হইতে আসিয়া সিন্ধুদেশ অধিকার করিয়াছিলেন, হায়দরাবাদ নগর তাঁহাদের রাজধানী ছিল। সিন্ধু প্রদেশের শেষ অধিপতি মীর নসিরখাঁর পুত্র মীর হোসেন আলি জীবিত আছেন। তিনি ব্রীটিশ-গবর্ণমেণ্ট হইতে তিন সহস্র মুদ্রা মাসিক বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহার জ্ঞাতি কুটুম্বদিগের অনেকে দুই এক হাজার টাকা বৃত্তি ভোগ করেন। নগরের পশ্চিম প্রান্তে মীরদিগের পুরাতন বৃহৎ দুর্গ বিদ্যমান। সৌভাগ্যসূর্য্য অস্তমিত হওয়ার পরও মীর বংশের অনেকে সেই দুর্গে বাস করিয়া আসিয়াছেন। এত বড় সুদীর্ঘ বৃহৎ দুর্গ অল্পই নয়নগোচর হইয়াছে। দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার সুযোগ আমাদের হয় নাই।

নগরের দক্ষিণ প্রান্তে কয়েকটি মক্‌বরা (সমাধিমন্দির) বিদ্যমান, সে সকল দর্শনযোগ্য। ২৫শে আষাঢ় অপরাহ্ণে প্রথমতঃ মীর মহমুদের মক্‌বরা দর্শন করা যায়, তিনি বন্দিভাবে কলিকাতায় নীত হইয়াছিলেন, কলিকাতাতেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। দ্বিতীয় মক্‌বরাতে মীর করম আলির এবং মীর মোহম্মদখাঁর কবর। এই দুইটী মক্‌বরার অভ্যন্তর ভাগ বিচিত্র কারুকার্য্যযুক্ত। তাহা দর্শন করিয়া নয়ন মন মুগ্ধ হয়। অপর একটি মক্‌বরার ভিতরে পাঁচ জন মীরের কবর, আর একটী মক্‌বরাতে দুই জন বেগমের কবর বিদ্যমান। তদ্ভিন্ন আরও অনেক গুলি সুন্দর সুন্দর মক্‌বরা আছে। দিবাবসান হওয়াতে সে সকল দর্শন করিতে পারা যায় নাই।

সিন্ধুদেশের অধিবাসীর মধ্যে চারি ভাগের তিন ভাগই মোসলমান। এ দেশে হিন্দু মোসলমানের আহারাদিসম্বন্ধে কোন বিচার নাই। পল্লিগ্রামে এক গৃহে মোসলমান ও হিন্দু একত্র রন্ধন ও ভোজন করে। হিন্দুরা মোসলমান ভিস্তীর জল পান করিয়া থাকে। পঞ্জাব প্রদেশ নিবাসী নিরাকার একেশ্বরবাদ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাত্মা গুরুনানকের প্রভাব এই সিন্ধুদেশে প্রবল। গুরুনানকের প্রতি সকলেই ভক্তিমান্। সিন্ধু দেশের বহু লোক গুরুনানকের মতাবলম্বী। স্থানে স্থানে নানকপন্থীদের ধর্ম্মমন্দির বিদ্যমান। এদেশের হিন্দুগণ বাঙ্গালী হিন্দুদিগের ন্যায় প্রতিমাপূজক নহে।

স্বর্গগত স্বদেশহিতৈষী মহাত্মা দেওয়ান নেভোল রাও সখীরামের এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গগত সাধু নবযুবক হীরানন্দের পবিত্র স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ সমাধি বেদিকা সমাজ বাড়ীর প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে স্থাপিত। এই দুই পুণ্যশ্লোক স্বদেশপ্রেমক ভ্রাতা সিন্ধুদেশের নরনারীদিগের সেবার জন্য জীবনউৎসর্গ করিয়াছিলেন। ভক্ত

নেভোল রাও সক্কর নগরে উষ্ট্রপৃষ্ঠ হইতে পতিত এবং সর্ব্বজন প্রিয় হীরানন্দ বাঁকিপুর নগরে সান্নিপাতিক জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সিন্ধুদেশ তাঁ।দের নিকটে বিশেষ ঋণী। সে দেশের সমস্ত লোক তাঁহাদিগের প্রতি একান্ত ভক্তিমান্। নেভোল রাও ডিপুটী কলেক্টর ছিলেন, সাত শত টাকা বেতন পাইতেন, সমস্ত টাকা জনহিতার্থে ব্যয় করিতেন। নিজে ফকিরের ন্যায় সমাজগৃহের অন্তর্গত একটি কুটীরে বাস করিতেন। বিচারকার্য্য, সাধনভজন এবং পরসেবা তাঁহার জীবনের নিত্য ব্রত ছিল। তিনি বিশুদ্ধাচার শান্ত ধীরপ্রকৃতি লোক ছিলেন। শুদ্ধচরিত্র যুবক হীরানন্দ বাল্যকালে কলিকাতায় আমাদের সঙ্গে বাস করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং এম এ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বিষয় কর্ম্ম ও অর্থোপার্জ্জনের প্রত্যাশী হন নাই, নানা উপায়ে স্বদেশের সেবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সিন্ধী বালকদিগকে সুনীতিশিক্ষাদানের জন্য হায়দরাবাদ নগরে হীরানন্দ কর্ত্তৃক উচ্চ শ্রেণীর স্কুল স্থাপিত আছে। তিনি দুই জন চরিত্রবান্ সুশিক্ষিত বাঙ্গালী ব্রাহ্ম যুবাকে স্কুলে নিজের সহকারিরূপে কার্য্য করিবার জন্য হায়দরাবাদে লইয়া গিয়া স্থাপন করিয়াছিলেন। হীরানন্দের প্রতিষ্ঠিত স্কুল বিদ্যমান, কিন্তু তিনি প্রধানতঃ যে উদ্দেশ্যে উক্ত বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার পরলোকযাত্রার পর তাহাতে সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে না। বাঙ্গালী যুবকদ্বয়ের উক্ত স্কুলের সঙ্গে আর যোগ নাই। হীরানন্দ নানা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বিশেষ ভাবে সিন্ধী রমণীদিগের দুঃখমোচন ও উন্নতিসাধনজন্য তাঁহার প্রাণপণ যত্ন ছিল। উপযুক্ত ধাত্রীর অভাবে প্রসবকালে প্রসূতিদিগকে বিষম যাতনা ভোগ করিতে হইতেছে, সেদেশের মূর্খ নিষ্ঠুর দাইদিগের অত্যাচারে অনেক প্রসূতি প্রাণত্যাগ করিতেছে দেখিয়া ধাত্রীর কার্য্য শিক্ষাদানের জন্য হীরানন্দ বোম্বাই নগরে যাইয়া নিজে রীতিপূর্ব্বক ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি জনহিতৈষী মহাত্মা নেভোল রাওয়ের প্রকৃত অনুগামী কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। ভগবান্ সেই দেবপ্রকৃতি যুবাকে নরলোকে থাকিতে দিলেন না, অচিরে দেবলোকে লইয়া গেলেন। কলিকাতাতে নববিধানাশ্রিত যুবকমণ্ডলী প্রতিবৎসর হীরানন্দের পরলোকযাত্রার দিন বিশেষ ভাবে উপাসনাদি করিয়া থাকেন। সিন্ধুদেশের স্থানে স্থানে হীরানন্দের পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন তদ্দেশীয় লোকের দ্বারা স্থাপিত। করাচি নগরে হীরা-কুটীর প্রতিষ্ঠিত আছে, তথায় প্রত্যহ সায়ংকালে ব্রাহ্মগণ মিলিত হইয়া সঙ্গীত ও সৎপ্রসঙ্গাদি করিয়া থাকেন। করাচির প্রায় ১৫ মাইল দূরে হীরানন্দের নামে একটি কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠিত। তাহা দর্শন করিবার জন্য করাচি নগরস্থ কোন কোন ব্রাহ্ম বন্ধু অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তথায় যাইবার পথ সুগম নহে, উষ্ট্রারোহণে ব্যতীত যাওয়া সুবিধা নয় বলিয়া আমরা

যাইতে প্রস্তুত হই নাই। উষ্ট্রের উপর হইতে নিপতিত হইয়া দেওয়ান নেভোল রাও প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। আমরাতো দুর্ব্বল কোমলাঙ্গ বাঙ্গালী, উষ্ট্রারোহণে নিতান্ত অপটু, পরিশেষে এই বৃদ্ধ বয়সে উটের উপর হইতে পড়িয়া বিদেশে কি প্রাণ হারাইব? বিশেষতঃ একদিন উটের উপর চড়িয়া তিন দিন হয়তো শরীরের ব্যথায় শয্যাগত হইয়া থাকিব। বাঙ্গালীর মধ্যে কেবল সাধু অঘোরনাথই উটের উপর চড়িয়া মরুভুমি অতিক্রম পূর্ব্বক পঞ্জাবের সীমান্ত প্রদেশে প্রচার করিতে গিয়াছিলেন, তিনিও শরীরের ব্যথায় কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন, কোন কোন ভক্ত যাইয়া তাঁহার গা টিপিয়া দেন, তাহাতে সুস্থির হন। এ সকল ভাবা গিয়াছিল। উষ্ট্রারোহণজনিত ক্লেশের ভয়ে হীরানন্দের স্মৃতিচিহ্ন কুষ্ঠাশ্রম দেখিতে যাওয়া হয় নাই।

২৫শে আষাঢ় রবিবার প্রাতে হায়দারাবাদব্রহ্মমন্দিরে হিন্দী ভাষায় সামাজিক উপাসনা হয়। অনেকগুলি সিন্ধী ভ্রাতা ও ভগিনী তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। ব্রহ্মদর্শনবিষয়ে হিন্দীতে উপদেশ হইয়াছিল। বাঙ্গালী শিক্ষয়িত্রীদ্বয় শ্রীমতী কুমারী আমোদিনী ও কুমারী প্রমিলা হারমোনিয়ম বাদ্যযোগে সুমধুর হিন্দী সঙ্গীত করিয়াছিলেন। উপাসনান্তে ব্রাহ্মগণ প্রায় সকলেই স্ব স্ব খাদ্যসামগ্রী স্ব স্ব গৃহ হইতে আনয়নপূর্ব্বক সমাজবাড়ীর প্রাঙ্গণে তরুতলে একত্র বসিয়া ভোজন করিয়াছিলেন। সমাজবাড়িটী বৃহৎ, অঙ্গন ভূমিতে ছায়াপ্রদ বড় বড় বৃক্ষ আছে। ব্রাহ্মগণ নিশাগমে মন্দিরের রোওয়াকে দলবদ্ধভাবে বসিয়া সৎপ্রসঙ্গ ও সঙ্গীতাদি করিয়া থাকেন। অন্ততঃ আমরা যে কয়েক দিন বাস করিয়াছিলাম, এরূপ দেখিয়াছি। ডাক্তার ঈশ্বর দাস সস্ত্রীক উপস্থিত হইতেন। ২৭শে আষাঢ় রাত্রিতে হিন্দী ভাষায় বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল, "ব্রহ্মের ত্রিবিধ প্রকাশ" উপদেশের বিষয় ছিল। সেখানকার ব্রাহ্মদিগের অনেকে সুবিনীত ভক্তিভাবাপন্ন এবং কৃতবিদ্য। সকলে যে উপাসনাদিতে নিষ্ঠাবান্ এরূপ বোধ হইল না। ট্রেণীং কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল দেওয়ান কেবলরামল বয়োবৃদ্ধ বিজ্ঞ অভিজ্ঞ ব্রাহ্ম। তিনি অনেক সময় সামাজিক উপাসনার কার্য্য করেন। সম্পাদক প্রভু দাস, সহকারী সম্পাদক তেজোমল, ভক্ত গায়ক রূপচাঁদ।

হায়দরাবাদের লোকসঙ্খ্যা ন্যূনাধিক ষাট হাজার। একদিন উর্দ্দু ভাষায় বক্তৃতা হয়। এস্থান নেজাম হায়দারাবাদের ন্যায় মোসলমান প্রধান নগর নহে। এ নগরে উর্দ্দু ভাষাভিজ্ঞ লোক বিরল। বোধ হইল কেবল দেওয়ান কেওয়ালমল বক্তৃতার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন।

২৮শে আষাঢ় অপরাহ্নে বাজার এবং ফুলেলী নামক স্থানে সিন্ধুনদের কেনাল দর্শন করা গিয়াছিল। বাজারের রাস্তার পার্শ্বস্থিত একটী শিখধর্ম্মশালা দর্শন করিতে যাওয়া হইয়াছিল, উহার অভ্যন্তর ভাগ সুসজ্জিত এবং শ্বেতপ্রস্তরে গঠিত, তাহাতে ঐশ্বর্য্যাড়ম্বরের অভাব নাই। মন্দিরপ্রাঙ্গণে যুবা মহান্তজী কতিপয়

ইয়ারের সঙ্গে পাশা খেলিতেছেন দৃষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার বিরুদ্ধে অনেক কথা শুনা গেল। সিন্ধু কেনালের সন্নিহিত বাজারের রাস্তায় একদল রমণী বেশভূষা করিয়া সঙ্গীত করিতে ২ চলিয়াছিলেন, তাঁহাদের পশ্চাতে মুকুটমণ্ডিত মস্তক সুসজ্জিত একটি যুবকসহ বাদ্যোদ্যম সহকারে একদল পুরুষও চলিয়াছেন, এরূপ দৃষ্ট হইয়াছিল; উহা বিবাহের প্রোসেশন ছিল।

দুই তিন জন সিন্ধী ভদ্রলোকের গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া মাধ্যাহ্নিক ভোজন করা গিয়াছিল। বাঙ্গালী ভদ্রলোকদিগের ভোজে যেমন দধি ক্ষীর মিষ্টান্নাদির আড়ম্বর হয়, সিন্ধী ভদ্রলোকদিগের ভোজের ব্যাপারে তাহার কোন সংস্রব দেখা গেল না। দুই তিন প্রকার ব্যঞ্জনমাত্র অন্নোপকরণ ছিল। একটি সিন্ধী বন্ধুর গৃহে ভোজন হওয়ামাত্র কতকগুলি তরমুজ খণ্ড থালায় করিয়া সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছিল, গৃহস্বামী আমাদের সঙ্গে একত্র ভোজন করিতে বসিয়াছিলেন। তিনি লবণমিশ্রিত করিয়া সে সকল উৎসাহসহকারে ভক্ষণ করিয়াছিলেন। আমরা লবণযুক্ত তরমুজ খাইতে পারিলাম না, নিতান্ত বিস্বাদ বোধ হইল। আমরা গতবারে করাচিবন্দরের ভ্রমণবৃত্তান্তে, সিন্ধী লোকদিগের রন্ধনপ্রণালী বিবৃত করিয়াছি, তাহার আর পুনরুল্লেখ করা গেল না। করাচির ব্রাহ্মপরিবারের মহিলাগণ স্বহস্তে রন্ধনাদি করেন, হায়দারাবাদে সেরূপ শ্রুত ও দৃষ্ট হইল না। প্রত্যেক পরিবারের ঘরের ভিতরে এক একটা বৃহৎ দোলা টাঙ্গান আছে, গৃহিণীগণ দোলাতে বসিয়া সর্ব্বদা দোল খান, রসুন ও পলাণ্ডুর সিল্কা ছাড়াইয়া থাকেন এবং পাঁপর প্রস্তুত করেন, কাজের মধ্যে এই কাজ করিয়া থাকেন। রন্ধন করিবার জন্য পাচক নিযুক্ত থাকে। রন্ধন ও গৃহকর্ম্মাদিতে যে তাঁহারা সুনিপুণা এরূপ বোধ হইল না। তবে আমরা হায়দারাবাদ নগরে অল্পদিন ছিলাম, সবিশেষ অবগত নহি।

নগরের অভ্যন্তরে ইতস্ততঃ অপরিষ্কৃত সঙ্কীর্ণ গলি বিদ্যমান। তাহাতে সময়ে সময়ে প্লেগ রাজত্ব করে। প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহের ছাদের উপর তিন চারি হস্ত পরিমাণ ঊর্দ্ধাভিমুখীন এক একটি বাতায়ন আছে, উহা গৃহের চূড়ার ন্যায় লক্ষিত হয়, সেই বাতায়নযোগে গৃহে পর্য্যাপ্ত বায়ু ও আলোর সঞ্চার হইয়া থাকে। এরূপ বায়ু ও আলোসঞ্চারের ব্যবস্থা অন্য কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। আমরা গ্রীষ্মকালে হায়দারাবাদে গিয়াছিলাম; তখন দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল। আমরা কিছুই গ্রীষ্মানুভব করি নাই।

আমরা ২৮শে আষাঢ় বেলা একটার সময় আজমিরে যাত্রা করিব, তথা হইতে ক্রমে কলিকাতায় চলিয়া যাইব, এরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। পাথেয়ের অকুলন ছিল। অনেক বড় বড় নগরে ব্রাহ্মসমাজের কাজ করিয়াছি, কোন ব্রাহ্মভ্রাতা আমাদের পাথেয়ের অভাব আছে কি না জিজ্ঞাসাও করেন নাই, এবং তাহা জানিয়া অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে সেই অভাব মোচন

করিতে যত্ন করেন নাই। অনেকে হয়তো মনে করিয়াছেন আমাদের জমিদারী আছে, জমিদারী হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়া সেই অর্থের সাহায্যে দেশ দেশান্তরে যাইয়া প্রচার করিয়া থাকি। ইহা তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভুল। আমরা হায়দারাবাদ হইতে যাত্রা করার দিন স্থির করিয়া কলিকাতায় শ্রদ্ধাস্পদ ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রকে এরূপ পত্র লিখি যে, আমাদের পাথেয়ের অকুলন, অবিলম্বে ২৫ টাকা টেলিগ্রাফযোগে না পাঠাইলে আমরা যাত্রা করিতে পারিতেছি না। যাত্রার পূর্ব্বদিন ২৭শে তারিখ পর্য্যন্ত টাকা পঁহুছে নাই। আমরা টাকা পাঠাইবার বিষয়ে কোন সংবাদ পর্য্যন্তও প্রাপ্ত হই নাই। অগত্যা দেওয়ান কেরওয়ামলকে বলিতে হইল, আমাদের পাথেয়ের অভাব, টেলিগ্রাফে টাকা পাঠাইবার জন্য কান্তি বাবুকে লিখা হইয়াছে, এক্ষণ পর্য্যন্ত টাকা পঁহুছে নাই, কাল সকালে টাকা না পঁহুছিলে আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক ধারে ২৫টী টাকা দিবেন, অচিরেই সেই টাকা পরিশোধ করা যাইবে। তিনি বলিলেন, "তজ্জন্য কোন চিন্তা নাই, কলিকাতাপর্য্যন্ত যাইতে ত্রিশ টাকার প্রয়োজন হইবে, তাহা আমরা দিব।" সহৃদয় বন্ধু দেওয়ান তারাচাঁদ যখন শুনিতে পাইলেন, আমরা পাথেয়ের জন্য কলিকাতা হইতে টেলিগ্রাফে টাকা আনাইতেছি, তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া আমাদের নিকটে আসিয়া বলিলেন, "এ কি কথা! কলিকাতায় পাথের চাহিয়া পাঠান হইয়াছে, আমি শুনিয়া বড় দুঃখিত হইয়াছি, আপনি কি অস্থানে আসিয়াছেন, আমরা কি আপনাদের কেহ নই? মিশনফণ্ডের অর্থস্বচ্ছলতা কত আমরা জানি। আমাদিগকে না জানাইয়া কেন টাকা পাঠাইবার জন্য কান্তি বাবুকে লেখা হইল। কান্তি বাবুই বা আমাদিগকে কি মনে করিবেন? পাথেয়ের টাকা আমরা দিব।" তখন হায়দারাবাদ ব্রাহ্মসমাজ ৩০ টাকা আমাদের সঙ্গে দেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। তন্মধ্যে দেওয়ান তারাচাঁদ ১০ টাকা দিয়াছিলেন, এরূপ জানি। যাত্রার প্রাক্কালে কলিকাতা হইতে টেলিগ্রাফেও টাকা পঁহুছিয়াছিল।

যাত্রা করিবার দিন প্রাতঃকালে সহকারী সম্পাদক তেজোমল আসিয়া আমাদিগকে অনুরোধ করিলেন, "সিন্ধুনদ নগর হইতে ৩ মাইল দূরে, সিন্ধুতে স্নানাবগাহন করিয়া যাইতে হইবে।" তিনি গাড়ী লইয়া আসিলেন। তিনি ও ভক্ত রূপচাঁদ সঙ্গে চলিলেন। সিন্ধুর জল কর্দ্দমময়, তাহাতে স্নান করাতে দেহ ও বস্ত্র কর্দ্দমলিপ্ত হইল, স্নানের ফল কিছুই হইল না, বরং বিপরীত ফল ফলিল। তথা হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইবামাত্র দেওয়ান কেরওয়ামলের অনুরোধক্রমে একটী বালিকাবিদ্যালয় পরিদর্শন করিবার জন্য তাঁহার সঙ্গে যাইতে বাধ্য হওয়া গেল। সেই বালিকাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বোধ হয় কুন্দন মল। সেই স্কুলেই আমাদের স্নেহপাত্রী বাঙ্গালী কুমারীদ্বয় শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিতেছেন। তাঁহাদের শিক্ষাদাননৈপুণ্যে সংবৎসরের মধ্যে বিদ্যালয়ের আশ্চর্য্য

উন্নতি হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীর বালিকাগণ সিন্ধীভাষায় সুমধুর সঙ্গীত করিয়াছিল, আমরা সঙ্গীতের ভাব বুঝিতে না পারিলেও স্বরমাধুর্য্যে মুগ্ধ ও আনন্দিত হইয়াছিলাম। বালিকাদের ইংরাজী ও সিন্ধী হস্তলিপি এবং সিলাইকার্য্য অতি সুন্দর বোধ হইয়াছিল। দেওয়ান কেরওয়ামল সিন্ধী ও ইংরাজী সাহিত্য ব্যাকরণ গণিতাদির পরীক্ষা করিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। সিন্ধীভাষা শিক্ষাদানের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। সিন্ধী বালিকারা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী বলিয়া বোধ হইল। এদেশে বালক ও বালিকাদের পরিচ্ছদ একবিধ। বালিকারা বালকদিগের ন্যায় কোট পায়জামা পরিধান করে, এবং মস্তকে টুপি ধারণ করিয়া থাকে। তবে বালকগণ মস্তকের কেশচ্ছেদন করে, বালিকারা তাহা করে না।

বেলা ১টার সময় ষ্টেশনে যাত্রা করা গেল। ব্রাহ্মবন্ধু প্রভু দাস, রূপচাঁদ এবং তেজোমল শকটারোহণে ষ্টেশনে যাইয়া আজমিরের টিকিট ক্রয় করিয়া দিলেন, এবং তাঁহারা আমাদিগকে ট্রেণে উঠাইয়া বিদায় হইয়া চলিয়া গেলেন। বেলা প্রায় ৪টার সময় ট্রেণ অকূল মরুভূমিতে পঁহুছিল। তথায় শুভ্র বালুকাপুঞ্জ ব্যতীত অন্য কিছুই নয়নগোচর হইল না। পর দিন প্রাতে ৯টা বা ১০টার সময় ইতস্ততঃ সুদূরে দুই একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বত এবং সবুজ বৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হইল। তখন আমরা বুঝিতে পারিলাম যে,দুস্তরমরুভূমি শেষহইয়া আসিয়াছে। রাজপুতনার এই সিকতাময় সুবিস্তীর্ণ ভীষণ মরুক্ষেত্র যোধপুর রাজ্যের অন্তর্গত। ইংরাজদের অসাধ্য কিছুই নাই। অভ্রভেদী উত্তুঙ্গ শৈলশিখর, দিগন্তব্যাপিনী নিবিড় অরণ্যানী, সুবিস্তীর্ণ তটিনী, সুদূরব্যাপী সিকতাময় ভয়ঙ্কর মরুক্ষেত্র, সর্ব্বত্র তাঁহারা বুদ্ধি ও ক্ষমতাবলে লৌহবর্ত্ম বিস্তার করিয়া ধূমযান চালাইতেছেন।

পিপাসানিবারণের জন্য দেওয়ান তারাচাঁদ বোতলপূর্ণ শরবত, ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য নানাপ্রকার খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে দিয়াছিলেন। তাঁহার আশ্চর্য্য স্নেহ, দয়া ও যত্ন। করাচিনিবাসী এক জন পরিণতবয়স্ক সম্ভ্রান্ত পুরুষ স্বীয় যুবক পুত্রসহ এক গাড়ীতে আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি ট্রঙ্ক হইতে ব্রাণ্ডির বোতল বাহির করিয়া পুত্রসহ পান করিতে প্রবৃত্ত হন, এবং আমাকে বলেন, "আপ্‌কা গ্লাস দীজে। হাম আপ্‌কে লিয়ে ব্রাণ্ডী দোতেহেঁ।" আমরা, "শরাব পিতে নহিঁ" বলাতে ভদ্রলোকটি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ভদ্রলোক হইয়া মদ খায় না, তাঁহাদের পক্ষে আশ্চর্য্যের বিষয়। পরে তাঁহার পুত্রও আমাদের প্রতি সেই অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলেন,আমরা ঘৃণার সহিত "শরাব ছোতেভী নহিঁ" বলাতে সে বলিল, "মাফ কিজে, হাম্ নহিঁ জানতে।" শ্রুত হইল সিন্ধুদেশের স্ত্রী পুরুষ সকলেই মদ্য পান করে; তবে তাহারা পরিমিত পায়ী, মাতাল হয় না। প্রিয়তম হীরানন্দ মদ্যপাননিবারিণী সভা ইত্যাদি স্থাপন করিয়া সিন্ধুবাসী লোকদিগের পানদোষ-

নিবারণে বিশেষ যত্ন চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে অনেকে মদ্যপান হইতে বিরত হইয়াছে। বোধ হয় সেস্থানের ব্রাহ্মদের পানদোষ একেবারে নাই। মদ্যপান না করাতে উক্ত ভদ্রলোক কতকগুলি মিষ্টান্ন ও আম্র এবং লিচুফল আমাদিগকে উপহার দিয়াছিলেন। আমরা ২৯শে তারিখ অপরাহ্ণে আজমির নগরে উপনীত হইয়াছিলাম। সত্বর হইয়া বেলুচিস্থানের অন্তর্গত কোওয়েটা নগরে আমাদের যাওয়ার প্রস্তাব ছিল। কোওয়েটায় পত্রাদিও লিখা হইয়াছিল, কিন্তু অর্থের অপ্রতুলতা এবং কলিকাতায় শীঘ্র যাওয়া আবশ্যক হওয়াতে কোওয়েটাগমনের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া আমরা আজমিরে উপস্থিত হইয়াছিলাম।

চীনের সভ্যতা, সাহিত্য ও নারীধর্ম্ম।

জগতের ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলে দৃষ্ট হয়, চীন অতি প্রাচীন কালে সভ্যতালোকে সমুদ্ভাসিত হইয়াছিল। ঠিক কোন্ সময়ে এই প্রাচীন জাতি উন্নতির উচ্চশিখরে অধিরোহণ করিয়াছিল, তাহা এখন জানিবার উপায় নাই; ইতিহাস ইহার উত্তরদানে অসমর্থ। খ্রীষ্টীয় শকের বহুকাল পূর্ব্বে এমন কি মিশর, আসিরিয়া, বেবিলন, গ্রীস, রোম প্রভৃতি রাজ্যের অভ্যুদয়েরও অনেক পূর্ব্বে চীনবাসিগণকে সভ্য ও সমাজবদ্ধ জাতিতে পরিণত অবস্থায় পরিলক্ষিত হয়। পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিশ্রুত সাতটি আশ্চর্য্যবস্তুর মধ্যে "চীনের প্রাচীর" অন্যতম। প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। সর্ব্ববিধ্বংসী কালের প্রবল নিষ্ঠুর প্রভাবকে বিদ্রূপ করিয়া আজিও উহা সম্পূর্ণ অবিকৃত ভাবে চীন সাম্রাজ্যের উত্তর প্রান্ত পরিবেষ্টনপূর্ব্বক মানবীয় শ্রম ও শিল্পের সাক্ষিস্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে, এবং সমগ্র জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। সিনবংশীয় প্রথম চীনসম্রাট এই প্রাচীর নির্ম্মাণ করাইয়া জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এই প্রাচীরের দৈর্ঘ্য প্রায় দেড় সহস্র মাইল, উচ্চতা ১৫ হইতে ৩০ ফুট এবং বিস্তৃতি নিম্নভাগে প্রায় ২৫ ফুট হইবে, ইহার উপরি ভাগ এত প্রশস্ত যে, দুই তিনটী গাড়ী তাহাতে অনায়াসে পাশাপাশি চলিয়া যাইতে পারে। চীনের সভ্যতার প্রাচীনত্বের ইহা জীবন্ত সাক্ষী। উক্ত চীনসম্রাট এই প্রাচীর নির্ম্মাণ করাইয়া যেমন প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তেমনি সাম্রাজ্যের উৎকৃষ্ট গ্রন্থসমূহের ধ্বংস সাধন করাইয়াও তিনি খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার আদেশক্রমে সাম্রাজ্যের যেস্থানে যে গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছিল তাহার অধিকাংশই অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করা হইয়াছিল। অতি অল্প সংখ্যক গ্রন্থই উহা হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। এই জন্যই চীনের প্রকৃত প্রাচীন ইতিহাস জানিবার পথ একেবারে অবরুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

চীনের সুবিস্তীর্ণ সাহিত্য আলোচনা করিলে, চীন সভ্যতার অতি প্রাচীনত্ব

আরও প্রমাণিত হয়। পাশ্চাত্য বুধমণ্ডলী চীনের অনন্ত সাহিত্যভাণ্ডার দেখিয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়াছেন। চীনবাসিগণ কেবল যে সাহিত্য আলোচনায়ই নিরত থাকিতেন তাহা নয়। তাঁহারা সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি, শাসননীতি, সমাজনীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল বিষয়েই প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। যে মুদ্রাযন্ত্র ইংলণ্ডে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে মাত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহার প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে উহা চীনরাজ্যে সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয়। পৃথিবীর সমস্ত সভ্যজাতি এই আবিষ্কারের জন্য চীনের নিকট ঋণী। চীনের জ্ঞান ও সভ্যতা আরও কয়েকটী আবিষ্কার দ্বারা সভ্যজগৎকে ঋণবদ্ধ করিয়াছে; তন্মধ্যে কাগজ ও বারুদপ্রস্তুতপ্রণালী এবং নাবিকের দিক্‌দর্শন যন্ত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যাঁহারা চীনের কতগুলি বদ্ধমূল কুসংস্কার; অতিরিক্ত রক্ষণশীলতা প্রভৃতি দেখিয়া তাঁহাদিগকে নিতান্ত অসভ্য বর্ব্বর জাতি বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

এদেশের সিভিলিয়ানগণ যেমন প্রতিযোগী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিচার ও শাসনভার প্রাপ্ত হন, চীনেও তদ্রূপ পরীক্ষার রীতি প্রবর্ত্তিত আছে। প্রধানতঃ সাহিত্য বিষয়েই পরীক্ষা হইয়া থাকে.এবং পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিগণকে বিশেষ উপাধিতে বিভূষিত করা হয়। প্রতিবৎসর এইরূপ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক উপাধি বিতরণের ব্যবস্থা আছে। সাম্রাজ্যের অধিকাংশ লোকই এই উপাধিলাভের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া থাকে। পরীক্ষার্থীর বয়স সম্বন্ধে কোনও বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই, অশীতিপর বৃদ্ধও তাহাতে উপস্থিত হইতে পারেন। এই সম্মানিত উপাধিলাভের জন্য লোকের কি প্রকার আগ্রহ, তাহা পরীক্ষার্থিগণের সংখ্যা দেখিলেই অনুমান করা যায়। এরূপ দেখা গিয়াছে, কোনও বৎসর মাত্র একশত উপাধির জন্য দশ হইতে বিশ সহস্র পরীক্ষার্থী প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়াছে। চীনবাসিগণ অত্যন্ত রক্ষণশীল। তাঁহারা কিছুতেই পূর্ব্বসংস্কার ছাড়িতে চাহেন না। বর্ত্তমান যুগের উন্নততর শাসন প্রণালী ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি এখনও তদ্দেশে উপযুক্তরূপ প্রচলিত হয় নাই। বিগত রুষজাপান সমরের ফলে ইহাদের চক্ষু প্রস্ফুটিত হইয়াছে। শাসন ও সমরবিভাগে ইতিমধ্যেই অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। আশা করা যায়, অল্পকালমধ্যেই চীন পুনরায় জাগিয়া উঠিবে।

চীনের অনন্ত সাহিত্য ভাণ্ডারে স্ত্রীজাতির আচার ব্যবহার ও কর্ত্তব্যাদিসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা রহিয়াছে। নারীধর্ম্ম বিষয়ে চীন সাহিত্যে এত অধিক গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে যে, জগতের অপর কোনও জাতি উহার সহিত সমকক্ষতা করিতে পারে না। ঐ সকল গ্রন্থের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। স্ত্রীজাতি ও তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে প্রাচীনকালে চীনদের কি প্রকার ধারণা ছিল, এস্থলে তাহারই যৎকিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া যাইতেছে।

চীন সাহিত্যে একটী প্রসিদ্ধ কবিতায় নারীসম্বন্ধীয় বিবরণ সর্ব্বপ্রথম পাওয়া যায়। তাহাতে উক্ত হইয়াছে যে, কোনও বালিকা ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র বিনয়ের চিহ্ন-স্বরূপ তাহাকে ভূমিতে শয়ান করিয়া রাখিতে হইবে, এবং বয়স্কা হইলে যে তাহাকে বস্ত্রবয়নজন্য তাঁত চালাইতে হইবে, তাহার নিদর্শনস্বরূপ তখনই ঐ শিশুর হস্তে একটি ক্ষুদ্র ইষ্টক খণ্ড স্থাপন করিতে হইবে। বালিকাগণ রন্ধনকার্য্য ব্যতীত অপর কোন বিষয়ের চিন্তায় মস্তিষ্ক আলোড়িত করিবে না, এবং তাহাদের মনে সততই এ বাসনা জাগরূক থাকিবে যেন তাহারা মাতা পিতার কষ্ট লাঘব করিতে পারে। তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে নারীজীবনের কর্ত্তব্যসম্বন্ধে চীনবাসিগণের এইরূপই সংস্কার ছিল। ইহার প্রায় এক সহস্র বৎসর পরে রচিত অপর এক গ্রন্থে রমণীর দৈনিক কার্য্য ও কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ, বিধিবদ্ধ নীতি ও অনুশাসন দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে লিখিত হইয়াছে যে, স্ত্রী ও পুরুষ একাসনে উপবেশন করিবে না, বস্ত্রাদি রাখিবার জন্য উভয়ে একই আল্না ব্যবহার করিবে না, অথবা একে অপরকে হাতে হাতে কোনও জিনিষ আদান প্রদান করিবে না। বধুগণ ভাশুর বা দেবরের সঙ্গে কথোপকথন করিবে না, এমন কি পরস্পর কুশল প্রশ্ন-পর্য্যন্ত করিতে পারিবে না। কোন ভ্রাতার বিবাহসম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইয়া গেলে পর, তিনি আর তাঁহার সহোদরা ভগিনীর সহিত একাসনে উপবেশন বা একই পাত্রে আহার করিতে পারিবেন না।

নারীজীবনে "তিনটী বশ্যতা" আছে। তরুণ বয়সে চীনবালিকাকে তাহার পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বশ্যতা স্বীকার করিতে হইবে, তৎপর বিবাহান্তে তাহার স্বামীর ও স্বামীর মৃত্যুর পর, পুত্রের অধীন হইতে হইবে। পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রমে তাহাকে খোপা বাঁধিতে হইবে, অর্থাৎ তৎপর আর আলুলায়িতকেশী থাকিতে পারিবে না। বিংশতি বৎসরে তাহার বিবাহ কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে হইবে। (বর্ত্তমান সময়ে বিবাহের বয়স অনেক কমান হইয়াছে)। বর-নির্ব্বাচনের ভার কন্যার মাতাপিতার উপর সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত ছিল।

পতিগৃহে যাইয়া চীনবালিকা স্বামীর নাম গ্রহণ করিবেন। তদবধি তাঁহাকে শ্বশুর শাশুড়ীর প্রতি আপন পিতা মাতার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে হইবে। প্রত্যুষে কুক্কুটধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে গাত্রোত্থান করিয়া উষ্ণজল ও গামছা লইয়া শ্বশুর শাশুড়ীর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত থাকিতে হইবে। এরূপ আরও অনেক নিয়মের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলি বহুকাল যাবৎ অপ্রচলিত হইয়া আছে।

পাঁচশ্রেণীর পুরুষের সহিত চীনবালিকার বিবাহ দেওয়া নিষিদ্ধ। ১ম ;—রাজদ্রোহীর পুত্র, ২য়, দুর্নীতিপরায়ণ পরিবারের সন্তান, ৩য়, ফৌজদারীর আসামী, ৪র্থ ঘৃণিত রোগগ্রস্ত ব্যক্তি, ৫ম, এরূপ জ্যেষ্ঠ পুত্র যিনি তাহার পিতাকে সমাধিস্থ

করিয়াছেন, অর্থাৎ এমন অধিক বয়স্ক যিনি তাঁহার পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বেই বিবাহ করিতে পারিতেন।

সাত প্রকার কারণে পরিণীতা ভার্য্যার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছেদ (Divorse) অনুমোদিত; যথা, শ্বশুর শাশুড়ীর প্রতি অসদ্ব্যবহার, বন্ধ্যাত্ব, ব্যভিচার, ঈর্ষ্যা, ঘৃণিতব্যাধি, কলহপ্রিয়তা ও অপহরণ প্রবৃত্তি। কিন্তু যে স্ত্রী পরিত্যক্তা হইলে তাহার আর অপর আশ্রয়স্থান থাকে না, যে স্ত্রী শ্বশুর ও শাশুরীর মৃত্যুতে দুই বার তিন বৎসর ব্যাপী শোক গ্রহণ করিয়াছে, অথবা যে স্ত্রী স্বামীর সহিত দরিদ্রতা হইতে ক্রমে সাংসারিক ভোগৈশ্বর্য্যে উন্নীত হইয়াছে, তাহার প্রতি উল্লিখিত বিধি প্রযোজ্য হইবে না।

অঙ্কগণনায় যুগ্মসংখ্যাকে পুরুষ ও অযুগ্মসংখ্যাকে স্ত্রী মনে করা হয়। ঐ সংখ্যা গুলি যে স্বভাবতই এরূপ তাহা নয়। চীনবাসিগণের মতে, যুগ্মসংখ্যায় পুরুষ প্রকৃতি ও অযুগ্ম সংখ্যায় নারীপ্রকৃতির আধিক্যবশতঃ এইরূপ কল্পনা করা হইয়াছে। স্ত্রীপ্রকৃত সংখ্যার মধ্যে ৭ অঙ্ক প্রধান, কারণ ঐ সংখ্যায় নারীপ্রকৃতির লক্ষণ গুলি বিশেষ রূপে প্রতিভাত হয়। "সুওয়েন" নামক চিকিৎসা গ্রন্থের মতানুসারে, সাত মাস বয়সে শিশুবালিকার দন্তোদ্গম হইতে থাকে, সাতবৎসর বয়সে তাহার দুধের দাঁত পড়িতে আরম্ভ হয়, চতুর্দ্দশ বৎসরে বালিকা প্রথম ঋতুমতী হয়, একুশ বৎসর বয়সে তাহার জ্ঞানদন্ত বিনির্গত হয়, অষ্টাবিংশ বৎসরে অস্থি দৃঢ় হইতে থাকে ইত্যাদি ইত্যাদি।

সুশিক্ষিতা চীনমহিলা লেডী সাহু, তাঁহার লিখিত "মহিলাদিগের প্রতি উপদেশ" নামক গ্রন্থের অবতরণিকায় বলিয়াছেন:—"ছেলেরা নিজেদের পথ নিজে দেখিয়া লইতে পারে, সুতরাং তাহাদের জন্য আমার তত চিন্তা হয় না, কিন্তু গভীর দুঃখের বিষয় যে কত সহস্র সহস্র বালিকা, বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইবার অনেক পূর্ব্বে এমন কি, যাহারা পত্নীর কর্ত্তব্যজ্ঞান-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এমন অবস্থায় বিবাহিতা হইয়া থাকে।" তিনি উক্ত গ্রন্থে নারীদিগের প্রতি উপদেশস্থলে বলিয়াছেন:—

বিনম্র ও সম্ভ্রমশীলা হও; অপরকে সম্মুখে রাখিয়া আপনি পশ্চাতে থাকিবে। আপনার কৃতকার্য্যতায় কখনও গর্ব্ব প্রকাশ করিবে না, অথবা অকৃত কার্য্যতায় নিজের ত্রুটীতে অন্ধ হইবে না। অপমান ও তিরস্কার সহ্য করিয়া থাকিবে।

পত্নীকে পতির ছায়া ও প্রতিধ্বনি হইতে হইবে। আচরণ, বাক্য, চেহারা ও কর্ত্তব্য এই চারিটি বিষয় রমণীর শক্তি বিকাশের ক্ষেত্র। যথার্থ আচরণজন্য অত্যধিক মানসিক ক্ষমতার কোনও আবশ্যকতা নাই, হৃদয়ের সরলতা, পবিত্রতা, লজ্জাশীলতা ও কর্ত্তব্যবোধ, ইহাতেই যথার্থ আচরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অশ্লীল শব্দ পরিত্যাগপূর্ব্বক সুন্দর ভাষায় অনতিদীর্ঘ বাক্যালাপেই যথার্থ বাক্য প্রয়োগের দৃষ্টান্ত। নিয়মিত স্নান ও বসন ভূষণের পরিচ্ছন্নতাতেই রমণীর সৌন্দর্য্য পরিস্ফুটিত হয়। হাঁসি তামাসা ও

খেলা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনন্যমনে বস্ত্রবয়ন ও আহার্য্য দ্রব্যের উপযুক্তরূপ বিতরণাদির উপর পর্য্যবেক্ষণ, এগুলিতেই প্রকৃত কর্ত্তব্য পালন হয়। এই চারিটি বিষয়ে রমণীগণ কখনই উপেক্ষা করিবেন না।

R. M. S.

মহিলাদিগের রচনা।

নিত্যানিত্য সুখ দুঃখের আলোচনা।

ভগবান্ সংসারে সর্ব্বজীবাপেক্ষা মনুষ্যকে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত করিয়া সৃজন করিয়াছেন। জানি না এই মনুষ্যজাতিমধ্যে তাঁহার কি মহতী ইচ্ছা গোপনে নিহিত রহিয়াছে। ভগবান্ আমাদের নানা প্রকার জানিবার ও বুঝিবার জ্ঞান পরিস্ফুট হইবার জন্য নিত্য নিত্য নূতন রকমের উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা সংসারাসক্ত জীব তাঁহার মনোনীত কার্য্য করিতে পারি কৈ? যদিও জানি যে, এই সংসারটা স্বপ্নবৎ, দুদিনের জন্য আসা যাওয়ামাত্র। আজ যাহাকে ভোগবিলাসে রত দেখিতেছ, কালই দেখিবে সে ভবের লীলা সাঙ্গ করে ভগবানের স্নেহক্রোড়ে স্থান পাইয়াছে। এত দেখিয়া শুনিয়াও জ্ঞানপথ অবলম্বন করি না। যিনি তাঁহাকে চিনিয়াছেন, যিনি তাঁহার অনন্ত মহিমা বুঝিতে পারিয়াছেন, তিনিই ধন্য! তিনি কি আর এই মায়ামোহপূর্ণ অসার সংসারে মোহ মদিরায় মজিয়া থাকেন? কখনই নয়। আমরা বুঝিয়াও বুঝি না, জানিয়াও জানিতে চাহি না, দেখিয়াও দেখিতে ইচ্ছা করি না; সামান্য ঐহিক বিন্দুমাত্র সুখের জন্য মোহ নিশায় ডুবিয়া আছি। এই যে কতগুলি মাংসপিণ্ডবিশিষ্ট শরীর, আজ আমি ইহাকে সাজাইবার জন্য কত যত্ন করি, কত ব্যতিব্যস্ত হইয়া কত টাকা ব্যয় করিতেছি, যদিও মনে আছে যে, এ সব এক দিন ভস্মে পরিণত হইবে, তথাপি সৎকার্য্যে একটী পয়সা দিতে প্রাণ জ্বলিয়া যায়। নিজেকে সাজাইবার জন্য সর্ব্বদা কতই না ব্যস্ত, এইটি করিলে আমায় ভাল দেখাইবে, আহা! এইটি না করিতে পারিয়া মনে কত দুঃখ রহিল। এমনটী করিলে না জানি আমায় কত সুন্দর দেখাইত। কিন্তু এটা আবার ভাবি না যে, বাহ্যিক সৌন্দর্য্যে লালায়িত না হইয়া অন্তরের সৌন্দর্য্য বাড়াইবার জন্য মন লালায়িত ও যত্নবান্ হও, এই অসার শরীর সাজাইতে কত যত্ন পরিশ্রম করিতেছ, সে পরিশ্রম ও যত্নের পরিণাম কি হইবে? না, শ্মশানে চিতাভস্মে পরিণত হইবে। অহো ভাবিতে বুক ফাটিয়া যায়। আমরা জানি না কি সংসারে অমর হইয়া আসি নাই, যত প্রকার ভোগ বিলাস সকলই এক দিন ভস্মে পরিণত হইবে। চক্ষের উপরেও ত কত প্রকার শোচনীয় অবস্থা দেখিতেছি; তথাপিও আমাদের মনের পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। আজ দেখিতেছি কালই সকল ভুলিয়া যাইতেছি, আমরা চক্ষু থাকিতে অন্ধ। বুঝিবার ও জানি-

বার শত শত উপায় থাকিতেও আমরা মূর্খ। দয়াময়, আমার মত পাপীর কি উপায় হবে? তোমার শ্রীচরণতলে স্থান পাইব কি? হরি হে পাপী বলিয়া ঘৃণা করিলে এ পাপীর গতি কি হবে? সংসারে থাকিয়া এক জনের ঘৃণার পাত্র হইলে অন্য জনের ভালবাসার পাত্র হওয়া যায়, তোমার স্নেহ হতে বঞ্চিত হইলে আর যে কোথাও নরক ভিন্ন স্থান নাই। হে পতিতপাবন দয়াময় পিতঃ! এ অধম সন্তানকে দয়া করে তোমার শ্রীচরণতলে স্থান দিও।

মাণকার চড়—
শ্রীমতী সু—

মৃত্যু ও অমৃত।

চলে যায় ফেলে যায় শুধু তার স্মৃতি,
মন মাঝে জাগে তার প্রসন্ন মূরতি।
অনন্ত এ বিশ্ব মাঝে চারি দিকে চাই,
সে মধুর মূর্ত্তি আর দেখিতে না পাই।
কোথা হতে আসে জীব কোথা পুন যায়,
এ মহা রহস্য কিছু বোঝা নাহি যায়।
এ রহস্য অন্তরালে কে তিনি মহান্,
করিছেন সর্ব্ব কার্য্যে অশেষ কল্যাণ।
বুঝেও বুঝিতে নারে মোহে ভ্রান্ত নর,
দুঃখ কি অনন্ত সুখ আছে মৃত্যুপর।
মৃত্যুত সে মহাশান্তি পুণ্য নিকেতনে,
লয়ে যায় দুঃখী নরে উন্নতি উত্থানে।
প্রারম্ভ তথায় হয় নব জীবনের,
মৃত্যু না, অমৃত সে যে কৃপা মহানের।

কসৌলী, শ্রীমতী সা—

শোক-স্মৃতি।

(একটী বালিকা।)

কোথা গেলে বনলতা,
সুধা মাখা তব কথা,
কোন মতে পারিব না ভুলিতে,
তোমা বিনে বাড়ী আজ,
ধরিছে মলিন সাজ
শোকে মুখ না পারে তুলিতে।
চেয়ে দেখ বোন মোর,
শয্যাতে জননী তোর,
কাঁদিতেছে আকুল হইয়ে;
ভাবিছেন বারে বার,
কোথা গেলি মা আমার;
এ হৃদয় আঁধার করিয়ে।
তুমি স্বরগের ফুল,
পারিজাত সমতুল,
কেমনে রহিবে এ ধরা মাঝ;
তাই বিধি গেল নিয়ে,
বুকে শেল বিঁধাইয়ে,
ভাল দ্রব্য ভাল স্থানে সাজে।
এ বাড়ী শ্মশান সম,
হৃদয় অস্থির মম,
ইচ্ছা হয় যাই উড়ে চলে,
তুমি গেলে কোন দেশে,
এক বার হেথা এসে,
সব কথা দিয়ে যাও বলে।
সুখে থাক যেথা থাক করি আশীর্ব্বাদ,
কুসুম তোমার দিদী এই করে সাধ।

শ্রীকুসুম—

(মানব-জীবন ।)

ওই যে গাহিছে পাখী
আসন্ন সন্ধ্যায় ;
কে জানে কোথায় ওর
আবাসকুলায়।
কোথা হতে ভেসে এসে
কোথা যায় চলে
নীরবে মিশিয়া যায়
অনন্তের কোলে।
সামান্য হৃদয়ে ওর
কি ভাব সঞ্চার ;
কি ভাবিয়ে গান গেয়ে
লুকায় আবার।
কিছুই জানি না আমি
মানবজীবন ;
মনে শুধু হয় ওর
নিশার স্বপন।
কোথা হতে ভেসে এসে
পড়ে এ ভূতলে ;
দুদিনের খেলা খেলি
কোথা যায় চলে।
রেখে যায় দাগ শুধু
অপরের মনে,
চেয়ে থাকে তারা তার
তৃষিত নয়নে।

ভাগলপুর
ভিখনপুর কুটীর। } শ্রীমতী—

(শিশুর জন্মোপলক্ষে ।)

আজি এ পূর্ণিমা রাতে পূর্ণ চাঁদিমায়,
চকোর চকোরী ভাসে,
জলে কুমোদিনী হাসে,
নীলিমা আকাশ হাসে শোভে তারকায়,
জগত সংসার হাসে পূর্ণ জোছনায়।
এই অতি পূত ক্ষণে
চাঁদের হাসির সনে,
একটুকু চাঁদকণা পড়িল খসিয়া,
নিরাশ হৃদয়ে আলো উঠিল জাগিয়া।
এ যে রে চাঁদের কণা চাঁদ সমতুল,
স্বর্গীয় মধুর স্বরে
ওয়াঁ ওয়াঁ সুধাক্ষরে,
তারি মানে এর কাছে শত বুল বুল।
স্বর্গীয় কুসুম এ যে অতুল অতুল।
কি করি কোথায় রাখি ভাবি আটখান,
দেখিয়া তাহারি এই সুন্দর বয়ান,
কোমল শিশুর ঠোঁটে,
অমৃত নির্ঝর ছোটে,
সঞ্জীবনী সুধামন্ত্রে ভরা সেই হিয়া,
পাইনু পরশ, যেন আইল ভাসিয়া॥
দয়াময় দীনবন্ধু পতিত পাবন,
আজি এ নিশীথ ঘোরে,
এ ধন সঁপিলে মোরে,
কঠিন ব্যাপার এ যে শিশুর পালন,
পাপী আমি মোর কাছে কেন এই ধন।
তোমারি অনুজ্ঞাক্রমে,
আইল ধরায় নেমে,
কেমনে দিবগো পিতা ধর্ম্মশিক্ষা তারে,
অবোধ অধম আমি মত্ত পাপাচারে।
দিলে যদ দীন হীনে এই গুরু ভার,
আমি ত অধম নাথ অযোগ্য ইহার,
তোমারি চরণতলে,
এ ফুল দিলাম ফেলে,
চিরজীবী করে রাখ দিয়ে পদাশ্রয়,
সকলি তোমার ইচ্ছা তুমি সর্ব্বময়।

প্রার্থনা চরণে তব জগত জীবন,
নাথ ওহে করি প্রভু পতিত পাবন,
প্রাণেরি ভকতি ভরে,
মুক্ত কণ্ঠে যুক্ত করে,
মঙ্গল আশীষ ভিক্ষা করিছে তোমার,
বুকে নিয়ে তব দত্ত কণা চন্দ্রমার।

শ্রীত—।

পরলোকে।

আমারে প্রবাসে ফেলি,
আগে যারা গেছে চলি,
কাজ সমাপন হ'লে যবে যাব ফিরে
কুসুম মেখলাসম,
পলাতকগণ মম,
আনন্দে জড়ায়ে কিগো দাঁড়াইবে ঘিরে।
বহুদিন বর্ষ পরে,
জননীরে যবে হেরে,
তাহারা কি শত কথা আধ আধ ভাষে
সুধাবে না হেসে হেসে,
মধু ঢালি মধু রসে,
আসিবে না ছুটে কোলে স্তন্য পান আশে?
আগে কারে কোলে নিব,
আগে কারে স্তন্য দিব,
আগে কা'র চাঁদমুখে করিব চুম্বন?
তা লয়ে কি তারা মোরে,
ব্যস্ত করি আবদারে,
ব্যাকুলিবে এখানেতে করিত যেমন।
নাহি সে মিটিতে ক্ষুধা,
ফেলি এই স্তন্য সুধা,
তারা যে গিয়াছে চলি তৃষিত ক্ষুধিত
সে ক্ষুধা মিটাও বলে,
করুণ ক্রন্দনচ্ছলে,
আমার সে শিশু গুলি হবেকি তৃষিত।
মা'র মুখ বিনা যারা,
ফিরে না হেরিত ধরা
সেই দিন আঁখি খুলি কাহারে হেরিল
অমনি এ কোল ফেলি,
ছুটে তারা গেল চলি,
নিমেষে কাহার ক্রোড়ে লুকাইয়া গেল।
নয়নে কাজল লেখা,
রক্ত বিম্বাধররেখা,
মরি সে বদন বাঁকা কোথা মিশাইল
সেই নবনীত তনু কি হইয়া গেল!
কত সাশ্রু আবাহনে,
ফেরেনি যাহারা ক্ষণে,
তাহারা কি সে মায়েরে চাহিবে আবার
তাহারা কি মোর মত,
প্রতীক্ষা করিছে এত,
মিলনের শুভ দিন আনন্দ অপার
হায়—তৃষিত চাতকী চিতে,
চেয়ে আছি সেই পথে,
যে পথে তাহারা মোর করেছে পয়াণ
সেই পথে কবে যাব,
কবে তাহাদিগে পাব,
কবে এ প্রবাস মোর হবে অবসান।

খেরুওয়া, শ্রীপ্রি—

হৃদয়মরুভূমি।

এ হৃদয় মরুভূমি হেথা শুধু জলে মরীচিকা
ভালবাসা স্নেহ প্রীতি
আনিতেছে শত বিভীষিকা
সহসা এমন করে
দাবানল যাবে ধ'রে
কে জানিত মনে?
কে জানে পুড়িবে তাহে

সাধের মালতী ফুল
মল্লিকার সনে ?
কত ফুল কত মালা
কত সাধ কত খেলা
একটীও নাহি আছে তার
প্রেতাত্মার মত যেন
আমি শুধু অবশিষ্ট
আর আছে, হায় কিরণের
অবিরত অশ্রুধার !
ভাঙ্গা বুকে নাহি আর বল
নিরাশাতে জোড়া দিয়া
কত আর বাঁধিব হিয়া
ছিন্ন তন্ত্রী ছিঁড়ে অবিরল।

তুমি গেলে চলে সে সঙ্গেতে হায় নিলে
গোলাপ মুকুল সম তব স্নেহের পুত্তলী
লাবণ্যকে নিলে ভাগ করি
অসম্পূর্ণ ছিল যাহা নিলে পূর্ণ করি।
ওহে দয়াময় হরি অকালে হরি
কি সাধ পুরালে তব ?
নাথ, তব বালিকা প্রফুল্ল নলিনী
শুষ্ক মুখে হায় চারিদিকে চায়
আখি পাতা মম জলে ভেসে যায়
তোমার বিচ্ছেদ বাণ অগ্নি সমান
ভস্ম করে গেছে বুক !
তাহাতে আমার স্নেহের প্রতিমা
লাবণ্যের চন্দ্রমুখ
হাসিতে হাসিতে দিছি বিসর্জ্জন !
পারি না ভাবিতে কোথা বিপদভঞ্জন
দয়াময় হায় ঘুচাও মনের
ব্যথা দিয়ে পদতরী

বলিতে হায় যে বুক ফেটে যায়
যখন প্রাণ পাখী গেল তার চলি
সেই পবিত্র মূরতি সেই গাল টুক্ টুক্
লাগিয়ে ছিল সে মুখে সেই হাসিটুক্
বাছার আমার হয়নি মলিন
একটু চন্দ্র মুখ।

বলিল শেষ বাণী মধুর স্বরে
থাকিব না মাগো আর এ অবনী পরে।
তুই যে গো ছিলি স্বর্গের সৌরভ
চিনিতে পারি নি আমি
তুই যে গো ছিলি মন্দার কুসুম মোর
নয়নের মণি !
দেখিতে পাব না কি মা তোমার সে
হাসিমুখ খানি
কাঁদায়ে আমায় চলে গেলে হায়
নীরবে বিদ্যুৎলতা
জনম দুঃখিনী যাও তবে চলি যাও
যথা তব পিতা
আমি অভাগিনী কাঁদিতে রহিনু
জনম জনম হেথা।

গাজিপুর, শ্রীমতী কি—

সংবাদ।

স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়াতে কুচবিহারের মহারাণী ডাক্তারের উপদেশমতে জল বায়ু পরিবর্ত্তন ও সুচিকিৎসার জন্য ইংলণ্ডে যাইয়া প্রায় ৮মাস বাস করিয়াছিলেন। তিনি ঈশ্বর কৃপায় উত্তমরূপে সুস্থ হইয়া বিগত ২৪শে অগ্রহায়ণ কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন।

আগামী বড়দিনের সময় কলিকাতায় ন্যাশনেল কংগ্রেসের মহাসমারোহ হইবে, তাহার আয়োজন হইতেছে। ভারতের নানাস্থান হইতে বহু ভদ্রসম্ভ্রান্ত বক্তা গুণী মানী লোকসকল তাহাতে যোগ দান করিবার জন্য আসিতেছেন। তদুপলক্ষে এক মাস ব্যাপিয়া নানা স্থানের শিল্প দ্রব্যাদি প্রদর্শনের বৃহৎ মেলা হইবে। মহিলাদিগের নানা প্রকার শিল্প ও কারুকার্য্যাদি প্রদর্শন করা যাইবে। মহিলাগণ সেই প্রদর্শনী মেলা যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে দর্শন করিতে পারেন, তাহারও ব্যবস্থা হইবে।

আমাদের স্নেহের মোসলমান কন্যা লিখিয়াছেন ;—"মহিলায় আপনার সিন্ধু দেশভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠে সুখী হইলাম। বিশেষতঃ ডাইলে রশুন দেওয়া হয় নাই, থোম দেওয়া গিয়াছে, পড়িয়া হাঁসি পাইল। রশুনের গন্ধ আমরাও সহ্য করিতে পারি না। আমরা মসলার সহিত রশুন আনাই না। সেবার রাজগিরি গিয়াছিলাম, তথায় আমাদের কোন আত্মীয়ার বাড়ীতে রশুনের জন্য খাদ্য সামগ্রী গলাধঃকরণ করিতে আমার বড় কষ্ট হইতেছিল। খাদ্য দ্রব্যের আড়ম্বরও খুব ছিল। কিন্তু রশুনের গন্ধে সব মাটী হইয়াছিল।"

দ্বাদশবর্ষীয়া মহিলার প্রায় অর্দ্ধ বৎসর অতীত হইল, এপর্য্যন্ত বর্ত্তমান বৎসরের মূল্য অধিকাংশ গ্রাহক গ্রাহিকা হইতে পাওয়া যায় নাই, ১০।১৫ জনে মাত্র দয়া করিয়া পাঠাইয়াছেন। বহু গ্রাহক গ্রাহিকার নিকট হইতে পূর্ব্ব বৎসরের মূল্যও প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। তজ্জন্য আমরা পুনঃ পুনঃ তাকিদ পত্রাদি লিখিয়াছি। আমাদের অনুনয়পূর্ণ প্রার্থনা যে, তাঁহারা যেন দয়া করিয়া অবিলম্বে মূল্য পাঠাইয়া আমাদিগকে উপকৃত করেন।

ভাগলপুরে মহিলাসমিতির কার্য্য প্রতিপক্ষে সুচারু রূপে চলিতেছিল। শ্রদ্ধাস্পদ ব্রাহ্ম বন্ধু শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহ ও যত্নে উক্ত সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল, তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী কমলিনী দেবী সম্পাদিকার কার্য্য করিয়া আসিয়াছিলেন, দুঃখের বিষয় যে তিনি পরিণীতা হওয়ার পর প্রায় দুই বৎসর হইতে সমিতির রীতিপূর্ব্বক আর অধিবেশন হয় না। ভাগলপুরস্থ মহিলা সমিতিতে পঠিত প্রবন্ধ ও কার্য্যবিবরণাদি মহিলাতে এক সময় ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছে। বিগত আশ্বিন মাসে আমরা ভাগলপুরে গিয়াছিলাম। ১৯শে আশ্বিন উক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নে তত্রত্য মহিলাদের এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। ব্রাহ্ম সমাজের ১৬।১৭ জন মহিলা উপস্থিত ছিলেন। সৎপ্রসঙ্গাদি করা গিয়াছিল, এবং সমিতিকে পুনর্জীবিত করার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছিল। কিন্তু উপস্থিত মহিলাদিগের মধ্যে কেহই সম্পাদিকার কার্য্য ভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন না। বড় দুঃখের বিষয়।

স্বর্গগতা সাধ্বী অঘোরকামিনী দেবী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাঁকিপুরে অঘোর সমিতি-নাম্নী মহিলা সমিতির কার্য্য এক্ষণও চলিতেছে, উক্ত দেবীর তিরোধানের পর বহু বৎসর যাবৎ তথাকার ব্রাহ্মিকা মহিলারা তাহা রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন।

কটক নগরস্থ মহিলাসমিতি তত্রত্য ভূত পূর্ব্ব কমিশনার কে, জি, গুপ্তের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী প্রসন্নতারা গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। তথায় তাঁহার বিদ্যমানতা কালে উহার বিশেষ উন্নতি ছিল, তিনি কটক পরিত্যাগ করিয়া আসাতে সমিতির যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণও তাহার কার্য্য চলিতেছে, শ্রীমতী রেণাদেবী সম্পাদিকা আছেন। স্থানে স্থানে মহিলাগণ সপ্তাহান্তে বা পক্ষান্তে অন্ততঃ মাসান্তে সম্মিলিত হইয়া নিজেদের জ্ঞানোন্নতি ও নানা সৎকার্য্যসাধনের জন্য পরস্পর সদালোচনা করিলে বিশেষ শুভ ফল হয়।

ভিক্টোরিয়া মহিলা বিদ্যালয়।

ছোট ছোট দৈবঘটনা *।

২য় বক্তৃতা।

আপনাদের ছোট ছোট কয়েকটী বিষয় জানা দরকার, বাবুরা যে গুলি লইয়া বেশী আলোচনা করেন সেগুলি দরকার নাই, যেখানে পুলিসের ব্যাপার, বড় বড় ঘটনা, সে সব দিয়ে আপনাদের দরকার নাই। হঠাৎ পা ভেঙ্গে গেল, কি হাতটা কেটে গেল সেগুলি যাহাতে সেই সময়ই চিকিৎসা করিতে পারেন তা জানা দরকার। আগুণে পুড়লে কি করতে হয়, সাপে কামড়ালে কি করতে হয়, এই রকম কতকগুলি বিষয় জানা দরকার। আমাদের সমস্ত শরীরে রক্ত সঞ্চালিত হয়, যে গতিতে রক্ত সঞ্চালিত হয়ে থাকে সে গতি যে সমভাবে থাকে সমজোরে হয় তা নয়, যে নলটা দিয়ে রক্ত হৃৎপিণ্ড হইতে বাহির হয়, সেটা বুড়ো আঙ্গুলের মত মোটা, সেখান দিয়ে বুকের উপরে উঠে। হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ দিকে অসংস্কৃত রক্ত থাকে, তারপর ফুসফুসে যায়, সেখান হইতে সংস্কৃত হইয়া আসে, তার পর হৃৎপিণ্ডের ভিতর দিয়া গিয়া চারি দিকে হাত পায়ে সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া পড়ে। এই নল গুলি যতদুর যায় বিভাগের সংখ্যাও তত বাড়ে, চুলের মত সরু হয়। এই সূক্ষ্ম নল শরীরের চারিদিকে বিস্তৃত আছে; কোথাও কাটিলে প্রথমে সাদা দেখা যায়—তারপর রক্ত এসে পড়ে, উপরকার চামড়া বেশী স্থিতিস্থাপক। যেমন সেখানে ফোপে কত বড় বাড়ে, প্রায় দ্বিগুণ হয়, সারলে আবার কোন চিহ্ন থাকে না। কাটলেই চামড়াটা সবচেয়ে দূরবর্ত্তী হয়ে যায়, চর্ব্বির জায়গা হলে চর্ব্বি দেখা যায়, তার পর লাল ডিম ডিম মাংস দেখা যায়, তারপর মাংস পেশী, শেষকালে হাড় দেখা যায়। স্থানানুসারে রক্তস্রাবের পরিমাণ অল্প বা অধিক হয়, যদি রক্তবহ নল কেটে গিয়ে থাকে তার রক্ত বন্ধ করতে একটু বেশী আয়োজন করিতে হয়। আপাততঃ যেগুলি জানা সহজ সে বিষয় বলিব, ছেলেটা দৌড়িতে দৌড়িতে মাথায় লেগে পড়ে গেল, থুথনি কেটে গেল, উঠে গেল, সে রক্ত বেশী নয়। প্রথমতঃ কাটলেই স্থিতিস্থাপক গুণে ফাঁক হবে। কখনও অবিরত রক্তস্রাব হয়, কিন্তু ইহার সীমা আছে, যখন কৈশিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নল গুলি কুকঁড়ে যায়, আবার পেশী গুলো যখন কুঁকড়ে গেল, তখন ঔষধ বিনা সেরে যায়। রক্তস্রাব হয় কেন? জীবন থাকার দরুণ ক্রমাগত রক্ত চলছে, যতক্ষণ হৃৎপিণ্ড চলবে ততক্ষণ রক্ত পড়বে, যেই মুখটী বন্ধ হয়ে আসে তখন রক্ত পড়া বন্ধ হয়।

---

* ১৯০৩ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর শ্রীযুক্ত ডাক্তর দেবেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় যে বক্তৃদান করিয়াছিলেন তন্মূলক।

যে খানটা কেটে যায় সেখানে আপনি আঠার মত জিনিষ বাহির হয়, তখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? কাটা জায়গার দুই মুখ এক জায়গা করে রাখা; তাহা হইলে আপনি সেরে যায়। চিকিৎসা দ্বারা আমরা কেবল স্বাভাবিক কাজের অনুসরণ করি।

এই রকম করে দুই মুখ এক সঙ্গে করে বেঁধে রাখলে আঠার মত জিনিষ বাহির হয়ে মুখ বন্ধ করে, তখন সেরে আসে; সেখানে নূতন মাংস হয়। দুই মুখ এক সঙ্গে বাঁধবার সময় দেখতে হবে উহাতে অন্য কোন জিনিষ আছে কি না, যেমন কাঁকর মাটী চুল ইত্যাদি পড়লে বাহির করিতে হইবে। যেমন জায়গায় পড়বে সেই অনুসারে অপর জিনিষ উহার মধ্যে যায়। কারণ ওসব জিনিষত মাংসে পরিণত হয় না। থাকলে আরও ভোগাবে, যতক্ষণ রক্ত প্রবাহ বন্ধ না হয় ততক্ষণ সেই আঠার মত জিনিষ বাহির হয় না। পরিষ্কার করবার সময় কোন রকম ঔষধ দিয়া ধোয়ান ভাল। সকল সময়ত ঘরে ঔষধ থাকে না, তখন গরম জল ঠাণ্ডা করে ধোয়ান ভাল, তার অভাবে পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল দিয়াই ধোয়াবে। যদি মাথায় হয় তাহা হইলে আগে চুল কেটে দেবে, তারপর সোহাগের খই করে গুঁড় করে এক ভাগ সেই গুঁড়ো আর তিন ভাগ পাউডার মিশিয়ে সেখানে দেবে। তিন আঙ্গুল চার আঙ্গুল কেটে গেলেও, ডাক্তার ডাকতে হলেও ডাক্তার আসবার আগে ঐরকম করে ধুয়ে দেওয়া ভাল। সেখানটা না বাঁধলে তাতে বাতাস লাগে, কিন্তু কাটার মধ্যে বাতাস লাগান ভাল নয়। আচ্ছা আপনারা হয়ত দেখেছেন, যে গরমি কালে চারি দিকের দরজা বন্ধ করলে একটা ফুটোতে যেখান দিয়ে আলো আসছে সেখানে দেখতে পাবেন কত সব গুঁড়ো মাটী ধুলো অন্য অন্য সব পদার্থ আছে। তার মধ্যে ধুলো বালী গায়ের ময়লা মৃত গরু ভেড়ার অংশ ও মল মূত্র শুকিয়ে শুকিয়ে সব আছে। তা ছাড়া কত গাছ পালাও আছে। বর্ষাকালে শীঘ্র ছাতা পড়ে। সেগুলি আর কিছু নয় বাতাসের সেই সব জিনিষ, যখন বেশী গরম বা শীত নয়, জলো বাতাস থাকে তখন সেগুলি হয়। যদিও এই জিনিষ এমনি চোখে দেখা যায় না। কোন কোন শরীরে কাটলে পাকে, কারও কারও পাকে না, কারও কারও দাগ থাকে, কারও থাকে না। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা একটু জানা দরকার। জোড়ার জায়গা বাঁধতে হলে আড়াআড়ী করে অর্থাৎ একটার উপর আর একটা বাঁধতে হয়। যদি থুতনি কেটে যায় Bandage কে ২। ৩ টা ভাগ করে ছিঁড়ে ২।৩ টা বেঁধে দেওয়া দরকার। আঙ্গুলে কাটলে সরু Bandage দরকার।

জলের জন্ম ও তাহার গতিবিধি *।

সকলেই কাপড় কাচিয়া রৌদ্রে শুকাইতে দেন। যদি রৌদ্র না হয়, তাহা হইলে

---

* ২৫শে সেপ্টেম্বর ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীনাথ দত্ত মহাশয় যে বক্তৃতা-দান করিয়াছিলেন, তন্মূলক।

বাতাসে শুকাইয়া যায়। কাপড় হইতে যে জলটা যায়, সেই জলটা কোথায় যায়? কাপড় কাচিয়া জল শুদ্ধ যে শুকাইতে দেওয়া হইল, সে জলটা কোথায় গেল? কাপড় জল অধিকক্ষণ থাকে না, শুকাইতে দেওয়ার খানিক পরেই জল চলিয়া যায়। সে জল আর কোথায়ও যায় না, তাহা বাষ্পাকারে পরিণত হয়। এবং বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া উর্দ্ধে উঠিয়া যায়। বর্ষাকালে,নদী পুকুরের জল খুব বেশী হয়, আবার চৈত্র বৈশাখ মাসে নদী পুকুরের জল একেবারে শুকাইয়া যায়। এই রকমে আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই যে, ক্রমান্বয়ে জলের হ্রাস এবং বৃদ্ধি হইতেছে। জল যে কমিয়া যায় ইহা সমস্তই বাষ্পাকারে শূন্যে মিলাইয়া যায়। জল যে বাষ্পাকারে পরিণত হয় ইহা আমরা কি প্রকারে বুঝিতে পারি? জল যথার্থই বাষ্প হয় কি না তাহা বুঝিবার অতি সহজ উপায় আছে, একটী সামান্যরূপ পরীক্ষা দ্বারা আমরা ইহা নির্দ্ধারণ করিতে পারি।

একটা বাটীতে খানিক জল রাখিয়া আমরা যদি একটু উত্তাপ দেই, তাহা হইলেই দেখিতে পাইব সে জল বাষ্প হইয়া উর্দ্ধে উঠিতেছে। কিংবা একটা বাটীতে খানিকটা জল দিয়া আমরা যদি সেই জল সেই বাটীতে সেই ভাবে কয়েক দিন রাখিয়া দেই, তবে আর সে জল কয়েক দিন পরে দেখিতে পাইব না, দেখিব বাটীর জল শুকাইয়া গিয়াছে। একটা পাত্রে জল দিয়া উনুনে চড়াইয়া দিলে, খানিক পরেই আর জল দেখিতে পাইব না, কেবল একটা ধোঁয়া দেখিতে পাইব। সেই যে ধোঁয়া, ইহা আর কিছুই নয়, সমস্ত জলটা ধোঁয়ার আকারে চলে যায়, সেই ধোঁয়া বাষ্প। সেই বাষ্প উঠিবার সময় এক হাত বা আধ হাত পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার পর আর তাহা দেখা যায় না, অদৃশ্য হইয়া যায়। এই জল যে বাষ্প হ'য়ে যায় ইহা কি সব সময়ে দিন রাত্রে, শীতকালে গ্রীষ্মকালে, সকল সময়ে সমস্ত ঋতুতেই বাষ্প হয়? শীতকালে পুকুরের বা নদীর জলে কুয়াসা দেখা যায়। কুয়াসা আর কিছুই নয়, সেটা বাষ্প। বাষ্প যে জিনিষ, কুয়াসাটাও সেই একই জিনিষ। শীতের জন্য কুয়াসা দৃশ্য হয়। তাহা হইলে কি দুপুরে বিকালে বাষ্প হয় না? তা হয়, দুপুরে সূর্য্য উঠ্‌লে তাহা অপেক্ষা অধিক বাষ্প হয়। পুকুর হইতে যে বাষ্প উঠে তাহা আমরা দেখিতে পাই না। এখন যদি শীতকাল হোত তবে আপনারা দেখ্‌তে পেতেন। আমরা যে কথা বলি, তাহা হইতে, (অর্থাৎ আমাদের মুখ হইতে) বাষ্প নির্গত হইতেছে। অন্য সময়ে তত দৃষ্টি গোচর হয় না, কিন্তু শীতকালের প্রাতঃকালে আমরা খুব বুঝিতে পারি যে, আমাদের মুখ হইতে বাষ্প নির্গত হইতেছে। সেই সমস্ত বাষ্প। সকালে, বিকালে, সব সময়েই বাষ্প সকল মিশিয়া জলে পরিণত হইতেছে। সর্ব্বদা জল হইতে অসংখ্য অসংখ্য বাষ্প উঠিতেছে, এবং সেই সকল বাষ্প আবার মিশিয়া জল হইতেছে। আমরা পৃথিবীর যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি সেই দিকেই জল দেখিতে পাই। চতুর্দ্দিকে কত নদ, নদী, সমুদ্র, পুকুর রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আমাদের চতুর্দ্দিকে জল, জল ছাড়া মানুষ থাকিতে পারে না! আমরা এই ঘরে যে বসিয়া আছি, এখানেও জল আছে।

ক্রমশঃ

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১২শ ভাগ | পৌষ ১৩১৩; জানুয়ারী ১৯০৭। [৬ষ্ঠ সংখ্যা।

স্ত্রীনীতিসার।

খ্রীষ্টমন্দির গিরজাতে যাইয়া দেখা যায়, মা উপাসনা করিবার জন্য উপবিষ্ট, তাঁহার সঙ্গে তাঁহার ক্ষুদ্র বালক বালিকাগণ যাইয়া বসিয়াছে, তাহাদের মুখে একটী কথা নাই, তাহারা শান্ত ও বিনম্রভাবে উপবিষ্ট আছে। উপাসনাসমাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা কোনরূপ চঞ্চলতা প্রকাশ করে না। এমন কি যে পর্য্যন্ত মন্দিরে স্থিতি করে তাহাদের হইতে কোনরূপ অবিনয় অশিষ্টতা প্রকাশ পায় না। এরূপ শিষ্ট শান্ত থাকিতে, দেবমন্দির ধর্ম্মমন্দিরসম্বন্ধে শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রকাশ করিতে জননী তাহাদিগকে উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন। হিন্দুদিগের পূজার্চ্চনার সময় চঞ্চলপ্রকৃতি বালক বালিকাদিগের ছুটা ছুটি, চিৎকার ও উৎপাত অধিক বাড়ে। এক দিকে ঢাক ঢোল কাঁসরের ভীষণ শব্দ, অন্য দিকে ছেলেদের গোলযোগ, পুরোহিত ঠাকুর এবং বাড়ীর কর্ত্তা ও কর্ত্রী যে কেমন করিয়া এই অবস্থায় দেবদেবীর পূজায় মন স্থির রাখিতে পারেন আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। তখন নিতান্ত সিদ্ধ সংযত লোকেরাও মনঃসংযোগ করিতে অক্ষম বলিয়া বোধ হয়। পূজা নয় যেন একটা তামসিক আমোদের ব্যাপার। ব্রহ্মমন্দিরে অনেক ব্রাহ্মিকা বালক বালিকা সহ উপাসনা করিতে যাইয়া মন্দিরের শান্তিভঙ্গ এবং অন্যের উপাসনার বিঘ্ন আনয়ন করেন। অনেক মা নিজেও শান্ত ভাবে থাকিতে পারেন না, বালক বালিকাদিগকে আর কেমন করিয়া শান্ত শিষ্ট রাখিতে সুক্ষম হইবেন। এ অতি দুঃখের বিষয়।

মা উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা যেন ধর্ম্মমন্দির শিশু সন্তানদিগকে শান্ত ও শিষ্ট থাকিতে শিক্ষা দেন।

অনেক বালক বালিকা এরূপ দুরন্ত যে, জ্যেষ্ঠ গুরুজনকে সম্মান করে না, তাঁহাদের সম্বন্ধে তাহাদিগের কথায় কার্য্যে, ও ভাবে অনেক সময় অত্যন্ত দুর্নীতি প্রকাশ পায়। মা যেন এসকল হইতে না দেন, শাসন করেন।

রক্ষণশীলা ও উন্নতিশীলা নারী।

প্রাচীন শ্রেণীর রমণীদিগকে রক্ষণশীলা, নব্যশ্রেণীর মহিলাদিগকে উন্নতিশীলা বলা যায়।

রক্ষণশীলা নারীগণ প্রাচীন রীতিনীতি আচার ব্যবহার রক্ষা করিয়া চলিতে ও তদনুসারে জীবন যাপন করিতে যত্নবতী। তাঁহারা ঠাকুরমা ও দিদীমার নিকটে যেরূপ শিক্ষা পাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে যেরূপ আচরণ করিতে দেখিয়াছেন পদে পদে কথায় কথায় সেই প্রকার আচরণ করেন। তাঁহাদের মনে কোন নূতন ভাব ও নূতন চিন্তা আইসে না, তাঁহারা নূতন কিছু জানিতে শিখিতে চাহেন না। ঠাকুর মা দিদীমার চরিত্র কথা ও কার্য্যপ্রণালী তাঁহাদের শাস্ত্র পুরাণ ও তন্ত্র। এই প্রাচীন-শ্রেণীর স্ত্রীলোক বয়সে প্রাচীন না হই-লেও রীতি নীতি ব্যবহারে প্রাচীনা। তাঁহারা লেখা পড়ায় উদাসীন ও নানা কুসংস্কারের অধীন। তাঁহারা প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে গৃহকর্ম্ম করেন, সন্তান পালন করেন, অবগুণ্ঠনে আচ্ছাদিত হইয়া অন্তঃপুরে গৃহকোণে বসিয়া থাকি-তেই ভাল বাসেন। অন্য লোকের কথা দূরে থাকুক শ্বশুর ও ভাশুরকে দেখিলেও লজ্জায় মুখ অবনত করেন। তাঁহাদের পদে পদে ভয় ও লজ্জা। সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই তাঁহাদের মন সর্ব্বদা আবদ্ধ। কিন্তু সাধারণতঃ তাঁহারা ভক্তিমতী, নিষ্ঠাবতী দেবভক্তি পতিভক্তি গুরুজনভক্তি তাঁহা-দের জীবনের অলঙ্কার, তাঁহারা বুঝিয়া হউক বা না বুঝিয়া হউক, প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে দেব দেবীর পূজা ও ব্রতনিয়মাদি পালন করেন, নিষ্ঠাপূর্ব্বক স্বামীর সেবা পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন। শ্বশুর খাশুড়ী পিতা মাতা প্রভৃতি গুরু জনকে সুখী করিবার জন্য যত্ন করেন, আতিথ্য সৎকারে অনুরাগ প্রকাশ করেন। তাঁহারা নিজের সুখ সচ্ছন্দতার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করেন না, আহারাদিতে বৈরাগ্য প্রকাশ করেন, নিজে না খাইয়া নানা উপকরণে যত্ন-পূর্ব্বক অন্যকে ভোজন করাইয়া থাকেন। অনেক সময় আশ্চর্য্য কষ্টসহিষ্ণুতার পরিচয় দান করেন। তাঁহারা বহু দর্শন ও লেখা পড়াদিতে সমুন্নত না হইলেও তাঁহাদের অনেক স্বাভাবিক সদ্গুণ আছে, তাঁহাদের জীবনে শিক্ষা করিবার অনেক বিষয় আছে।

রক্ষণশীলা রমণীগণ সকল বিষয়ে প্রাচীনত্ব রক্ষা করিয়া চলিতে ব্যস্ত। তাঁহারা জাতিভেদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ, ছোট বড় জাতি বিচার করিয়া চলেন, তাঁহাদের মতে কোন জাতি নিতান্ত অস্পৃশ্য, তাহাদের সংস্পৃষ্ট অন্ন জল স্পর্শ করিলেও তাঁহারা আপনাদিগকে অশুচি মনে করেন। তাঁহারা বেশভূষাদিতেও প্রাচীনত্ব রক্ষা করেন। এসকল রক্ষণশীলা রমণী হিন্দুজাতির অন্তর্গত। মোসলমান মহি-লারাও রক্ষণশীল, কিন্তু অন্য রূপ। তাঁহাদের পরদা ও অবরোধ প্রথা অধিকতর দৃঢ়। তাঁহারা এক প্রকার অসূর্য্যম্পশ্যা হইয়া অন্তঃপুরে যবনিকার অন্তরালে বাস করেন। কোন বিষয়ে তাঁহারা প্রাচীন রীতি নীতির

বন্ধন শিথিল করিতে পারেন না। হিন্দু কুলবধূগণ অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া আবশ্যক মতে অপর লোকের সম্মুখে উপস্থিত হন, কিন্তু কথা কহেন না, মনের ভাব ব্যক্ত করিতে হইলে মধ্যবর্ত্তী যোগে ব্যক্ত করিয়া থাকেন। মোসলমান মহিলারা যবনিকার অন্তরাল হইতে বহিঃস্থিত অন্য পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কথা কহিয়া থাকেন, তাহাতে প্রায় সঙ্কুচিত হন না। কিন্তু সম্মুখে উপস্থিত হইতে সম্পূর্ণ সঙ্কুচিত হন। তবে কেহ কেহ বোর্কানামক অবগুণ্ঠনবিশেষে নিজের সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া আবশ্যকমতে পরদার বাহির হইয়া থাকেন। রক্ষণশীলা হিন্দু মহিলাদিগের ন্যায় অন্য অনেক বিষয়ে তাঁহারা রক্ষণশীলা।

উন্নতিশীলা রমণীগণ জাতি-ভেদ ও কুসংস্কারবন্ধনে আবদ্ধ নহেন, তাঁহারা নিয়ত অন্তঃপুরে যবনিকার অন্তরালে স্থিতি করেন না, অবগুণ্ঠনে মুখমণ্ডল আচ্ছাদন করিয়া থাকেন না; আবশ্যকমতে প্রকাশ্য সভা সমিতিতে যোগ দান করেন, প্রমুক্ত ভাবে বিচরণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে লেখা পড়ার চর্চ্চা আছে। অনেকে কলেজে উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া উপাধি লাভ করিয়াছেন, গ্রন্থাদি রচনা করিয়া যশস্বিনী হইয়াছেন। অন্য পুরুষের সাক্ষাতে তাঁহারা কোন রূপ সঙ্কুচিত হন না, পুরুষের সঙ্গে একত্র বসিয়া ভোজনপর্য্যন্ত করেন। জাতিভেদ যখন মানেন না তখন মোসলমান পাচকের প্রস্তুত অন্ন ভোজনে তাঁহাদের আপত্তি নাই। তাঁহারা নূতন প্রণালীতে বেশ ভূষা করেন, এবিষয়ে প্রাচীন প্রণালীর পক্ষপাতী নহেন, জুতা মুজা ফ্রক জেকেট ইত্যাদি ব্যবহার করেন, পরিমিত ভূষণে ভূষিতা হন। প্রাচীন শ্রেণীস্থ রক্ষণশীলা মহিলাদিগের ন্যায় তাঁহারা কখনও কর্ণে, নাসিকায়, মস্তকে, বাহু মূলে, কোমরে ও চরণে অলঙ্কার নামে কতকগুলি সোণা রূপার বোঝা বহন করেন না, সচরাচর কণ্ঠে হার মণিবন্ধে বালা বা চুড়ী ব্যবহার করেন। তাঁহারা ইয়ুরোপী সভ্যতার— ইয়ুরোপীয় মহিলাদিগের অনুকরণ করিয়া স্বাধীন ভাবে চলেন। ইঁহাদের অধিকাংশ নামেমাত্র হিন্দু সমাজভুক্ত কিন্তু হিন্দুয়ানী আচার ব্যবহার হইতে বিমুক্ত। অনেক উন্নতিশীল মহিলা ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত আছেন।

আমরা মহিলাদের অস্বাভাবিক রক্ষণশীলতা ও বাহ্যিক উন্নতিশীলতা দেখিয়া সুখী নহি। আমরা ধর্ম্মোন্নতি সুনীতির উন্নতি মহিলাদের জীবনে দর্শনের বিশেষ প্রার্থী। ঈশ্বরনিষ্ঠায় উপাসনাশীলতায় প্রকৃত উন্নতি হয়। উভয় শ্রেণীর মহিলাদের জীবনে তাহার অভাব অত্যন্ত লক্ষিত হইতেছে। জাতীয় বিশুদ্ধ রীতি নীতির উচ্ছেদ সাধন করিলে, সকল বিষয়ে ইয়ুরোপীয় মহিলাদিগের আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিলে, কেবল বাহ্যিক সভ্যতা ভোজন পরিচ্ছদাদির পারিপাট্য সাধন করিয়া চলিলে জাতীয় প্রাচীন রীতিনীতি কিছুই ভাল নয় বলিয়া তাহা পরিত্যাগ করিলে কখনও প্রকৃত উন্নতি হয় না।

জীবন ভগবদ্ভক্তিবিহীন হইলে সকলই অসারের অসার। আর্য্য মহিলাগণ, তোমরা ভক্তিমতী হও, আন্তরিক প্রেরণার আলোকে চল, দেবীজীবন লাভ করিয়া ধন্য হও।

আমাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত।

(আজমির)

রাজপুতনা প্রদেশের অন্তর্গত আজমির অতি সমৃদ্ধ প্রাচীন নগর। এই নগরে সুপ্রসিদ্ধ মোসলমান সাধু মাইনোদ্দিন চোস্তীর সমাধি বিদ্যমান। এই সাধু সম্রাট্ আকবরেরও বহুকাল পূর্ব্বে ন্যূনাধিক পাঁচ শত বৎসর হইল জীবিত ছিলেন। ইঁহার জীবনের জ্যোতি ভারতের সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইয়াছিল। এই সাধুর প্রতি সম্রাট্ আকবরের প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। সম্রাট্ ইঁহার প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শনার্থ দিল্লী হইতে পদব্রজে আজমিরে ইঁহার সমাধিক্ষেত্র দর্শন করিতে যাইতেন, এবং সমাধিক্ষেত্রের খাদেমদিগকে (সেবকদিগকে) এবং তত্রত্য দীন দুঃখীদিগকে অকাতরে দান বিতরণ করিতেন। সেখানে বাদশাহী প্রাসাদ ও মস্জেদ বিদ্যমান, তাহা অতিশয় সুসজ্জিত ও রমণীয়। তথায় আতিথ্যসৎকারের মহাঘটা, শত সহস্র লোক অতিথি হইয়া থাকে। শ্রুত হইল সেখানে সহস্রাধিক খাদেম নিযুক্ত আছে। হিন্দুতীর্থাদিতে যেমন যাত্রিকদিগের উপর পাণ্ডাদের অত্যাচার হয়, এখানেও তদ্রূপ খাদেমদিগের অত্যাচার হইয়া থাকে। বৎসরান্তে সাধু মাইনোদ্দিনের সমাধিক্ষেত্রে মহাসমারোহসহকারে বিশেষ উৎসব হয়, রাত্রিতে দীপমালায় সমাধিভূমি আলোকিত হইয়া থাকে। তখন আজমির নগর লোকারণ্য হয়, নানা স্থান হইতে সহস্র সহস্র যাত্রিক ও মোসলমান ফকির আগমন করিয়া থাকে। মোসলমানদিগের পক্ষে মক্কাশরিফ ও মদিনাশরিফ পবিত্র তীর্থ, তাহার পরই উক্ত সাধুর অধিষ্ঠানপ্রযুক্ত আজমির তীর্থ স্বরূপ হইয়াছে। উহাকে আজমির শরিফ (মহা আজমির) বলা হয়। আজমিরের অদূরে একটি রেলওয়ে জংশনে এক জন ফকির আসিয়া আমাদের গাড়ীতে স্থান গ্রহণ করেন, আজমির শরিফে যাইতেছেন বলিয়া তাঁহাকে আর টিকিট খরিদ করিতে হয় নাই, টিকিট ব্যতিরেকেই তাঁহাকে যাইতে দেওয়া হইয়াছিল। সম্রাট্ আকবরের পারস্যভাষায় বিরচিত জীবনচরিত আকবর নামা গ্রন্থে এবং আইন আকবরী পুস্তকে মহা প্রভাবান্বিত সাধু উক্ত মাইনোদ্দিন চোস্তীর বিশেষ বিবরণ বিবৃত।

১৯০৫ সন ১৩ই জুলাই (২৯শে আষাঢ়) অপরাহ্নে আমরা আজমির নগরে উপনীত হই। আমাদের ভাগলপুরস্থ বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু হরচন্দ্র মজুমদার মহাশয় আজমিরে রেলওয়ে আফিসে বহুকাল নিযুক্ত ছিলেন। এক্ষণ সেখানে তাঁহার আত্মীয় ও কুটুম্ববিশেষ শ্রীযুক্তবাবু উমেশচন্দ্র সেন আছেন। তিনি সপরিবারে তথায় বাস করিতেছেন। হরচন্দ্র বাবু

আমাদের পরিচয়দানে উমেশবাবুকে পত্র লিখিয়াছিলেন, আমরাও হায়দরাবাদ হইতে কোন্ দিন কোন্ ট্রেণে আজমিরে পঁহুছিব তাঁহাকে জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। আমাদিগকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য তিনি যথা সময়ে ষ্টেশনে আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে পাঠাইয়াছিলেন। আমরা তাঁহার গৃহে যাইয়া সাদরে আতিথ্যগ্রহণ করি।

আজমির মোসলমানপ্রধান নগর। কিন্তু রীতিমত লেখাপড়া জানে এরূপ মোসলমান বিরল। বন্ধুবর হরচন্দ্র বাবু তত্রত্য তাঁহার এক জন মোসলমান বন্ধুকে একটী উর্দ্দূ বক্তৃতাদানের ব্যবস্থা করিবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন। উক্ত মোসলমান বন্ধু তাঁহার পত্র পাইয়া আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসিয়াছিলেন, এবং সভা আহ্বানের উদ্যোগী হইয়াছিলেন, কিন্তু আমরা বক্তৃতায় এস্লাম ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বা কিছু বলি, তজ্জন্য সেখানে গোলযোগ ঘটিয়া উঠে, এই ভয়ে পরে তিনি বিরত হন। আমাদের সম্বন্ধে সে বিষয়ে তাঁহার কোন আশঙ্কা করার কারণ ছিল না। আজমিরে আর্য্যসমাজের দল প্রবল। মহাত্মা দয়ানন্দ সরস্বতীর অনুগামী আর্য্যগণ তথায় অত্যন্ত উৎসাহসহকারে আর্য্যধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, উক্ত মহাত্মার নামে হাইস্কুল লাইব্রেরী অনাথালয় চিকিৎসালয় ও মুদ্রাযন্ত্রাদি স্থাপন করিয়াছেন, দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত দুঃখী গরীব নিরাশ্রয় লোকদিগকে উক্ত সমাজের লোকেরা আশ্রয় দান করিয়া অকাতরে অন্ন বিতরণ করিয়া থাকেন; সময়ে সময়ে উৎসব ও বক্তৃতাদি করিয়া আর্য্যধর্ম্ম প্রচার করেন। তথায় প্রচার উপলক্ষে কখন কখন মোসলমানদের সঙ্গে তাঁহাদের সঙ্গে দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া উক্ত মোসলমান বন্ধু ভয় পাইয়াছিলেন যে, উর্দ্দূ বক্তৃতায় আমরা বা মোসলমান ধর্ম্মের কিংবা মোসলমানদের বিরুদ্ধে কিছু বলি এবং মোসলমানেরা তজ্জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া কোনরূপ গোলযোগ উপস্থিত করে। আমরা যে কাহাকে আক্রমণ করি না, কোন ধর্ম্মের কোন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের এবং কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নিন্দা করি না, বরং সকল ধর্ম্মশাস্ত্র সকল মহাপুরুষ এবং সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় হইতে সত্যগ্রহণ গুণগ্রহণ করিয়া থাকি, আমাদের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষণ হইবার নয় ইহা তিনি বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

আজমির নগর প্রাকারে পরিবেষ্টিত, নগরের ভিতরে প্রবেশের জন্য কয়েকটি তোরণ বিদ্যমান। দিল্লী দরওয়াজা, আগ্রা দরওয়াজা প্রভৃতি আটটী তোরণ আছে। নগরের বহির্দ্দেশে ইতস্ততঃ গিরিমালা পরিশোভিত। নগরের অভ্যন্তরে একটি পুরাতন দুর্গ আছে। নাতি সমুচ্চ শৈলমালায় পরিবেষ্টিত সমগ্র নগর স্বাভাবিক দুর্গের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। আমরা নগরের উপকণ্ঠে কয়সরগঞ্জ পল্লীতে স্থিতি করিয়াছিলাম। আজমিরের প্রধান দর্শনীয় পূর্ব্বোল্লিখিত ময়ইনোদ্দিন চোস্তীর দরগা।

কলিকাতা হইতে আজমির ১০৯৬ মাইল দূরে; নগরের লোকসংখ্যা ন্যূনাধিক ১২৫০০৩। আজমিরের তারাগড় পর্ব্বতের উপর পৃথ্বীরাজের দুর্গের ভগ্নাবশিষ্ট তোরণ বিদ্যমান। সেস্থানে গোরা সিপাহীদিগের স্বাস্থ্যনিবাস রহিয়াছে। সেই পর্ব্বত অতিশয় স্বাস্থ্যকর বলিয়া অনেক বড়লোক স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য তথায় যাইয়া বাস করেন। উক্ত পর্ব্বতের উচ্চতা প্রায় ২৫০০ ফিট্। এই পর্ব্বতের উপর গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত বড় বড় আফিস স্থাপিত। পাহাড়ের ইতস্ততঃ মোসলমানদিগের বসতি। এই তারাগড় পর্ব্বতের সমন্তাৎ বড়পীর,মীরাপীর প্রভৃতি অনেকগুলি পীরের দরগা আছে দূর হইতে সেই সকল দরগা লক্ষিত হয়। সেই পর্ব্বতশিখরে আরোহণ কষ্টসাধ্য বলিয়া আমরা উঠিতে পারি নাই।

আজমির নগরে "আড়াই দিন্‌কা ঝোপড়া" নামে প্রসিদ্ধ পৃথ্বিরাজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটি প্রাচীন মন্দির বিশেষ দর্শনযোগ্য। মন্দিরটি অতিশয় বৃহৎ বিবিধ সূক্ষ্ম কারুকার্য্যযুক্ত, উৎকৃষ্ট পাষাণে নির্ম্মিত। সম্রাট্ আলাউদ্দিন গোরী আজমির অধিকার করিয়া এই মন্দিরকে মস্‌জেদে পরিণত করিয়াছেন। মন্দিরের বাহিরে পাষাণময়ী বহু দেবমূর্ত্তি রাশীকৃত এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দৃষ্ট হইল। আড়াইদিনের যুদ্ধে এই মন্দির আলাউদ্দিনের প্রেরিত সৈন্যগণ অধিকার করিয়াছিল, তজ্জন্য "আড়াই দিন্‌কা ঝোপড়া" নামে উহা অভিহিত এবং তদবধি মস্‌জেদে পরিণত হইয়াছে। এই মস্‌জেদের অনেক স্থান ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, রাজপ্রতিনিধি লর্ড মেও ইহার জীর্ণ সংস্কারের জন্য লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। পরে একদিকে ছাদ ভগ্ন হইয়াছিল, লর্ড কুর্জ্জনের দ্বারা নূতন আকারে প্রস্তুত হইয়াছে। মোসলমান রাজগণ ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মমন্দিরাদি কীর্ত্তি ধ্বংস করিতেন, উদার ইংরাজরাজ যত্নপূর্ব্বক তাহা রক্ষা করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ ভারতের অনেক প্রাচীন জীর্ণ মন্দির ও বিনাশোন্মুখ কীর্ত্তি লর্ড কুর্জ্জন দ্বারা সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। তিনি কীর্ত্তিমান্ লোকদিগের কীর্ত্তি সংরক্ষণে অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন। ইহা তাঁহার জীবনের বিশেষ মহত্ত্ব।

আজমিরের আয়নাসাগর অতিশয় রমণীয়। উহা প্রথমে প্রস্রবণ বিশেষ ছিল। আয়না নামক ভূপাল সেই প্রস্রবণকে খনন করিয়া হ্রদের আকারে পরিণত করিয়াছিলেন, তাঁহার নামানুসারে উহার নাম আয়নাসাগর হইয়াছে। উহার পূর্ব্বকূল শ্বেত প্রস্তরে গ্রথিত, শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত কতকগুলি রমণীয় প্রাচীন হর্ম্ম্য শ্রেণীবদ্ধরূপে বিদ্যমান। স্থানটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। সম্রাট্ জাহাঙ্গির ও অন্যান্য বাদশা আজমিরে যাইয়া বেগমগণ সহ সেই স্থানে বাস করিতেন। বেগমদিগের জন্য নানা পণ্যজাতে পূর্ণ বাজার ছিল, সেই বাজার আচ্ছাদিত থাকিত, তথায় পুরুষদিগের প্রবেশাধিকার ছিল

না। রাজ্ঞী এলিজাবেথের দূত সার টমাস রো: আজমিরে যাইয়া আয়না-সাগরের তীরে জাহাঙ্গীর বাদশার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। রাজপুতনার চীফ কমিশনর সাহেব আয়নাসাগরের তীরস্থ একটি উচ্চ প্রাসাদে স্থিতি করেন। আয়না সাগরের পার্শ্বেই একটি সুন্দর উদ্যান বিদ্যমান।

আজমিরের জৈনমন্দির মহাসমৃদ্ধি-সম্পন্ন। ইহার নির্ম্মাতা সেট মূল চাঁদ কিয়ৎকাল হইল পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। মন্দিরটি বোধ হয় পাঁচতালা, এক্ষণও মন্দিরের অনেকাংশ নির্ম্মিত হয় নাই। মন্দিরের ভিতরে ঐশ্বর্য্যাড়ম্বর দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। মন্দিরের নীচের ও উপরের এক এক ঘরে এক এক প্রকার দৃশ্য। কোথাও অযোধ্যাপুরী, কোথাও রামলীলা, কোথাও রাম রাবণের যুদ্ধের দৃশ্য অতি পরিপাটীরূপে সাজান রহিয়াছে। রক্ষিত ঐতিহাসিকমূর্ত্তি এবং প্রাসাদ ও দেবমন্দিরের অধিকাংশ স্বর্ণমণ্ডিত।

আজমিরে চর্চ্চ অব ইংলণ্ড এবং রোমাণ ক্যাথলিকচর্চ্চ প্রভৃতি আছে, তন্মধ্যে কয়সর গঞ্জস্থ রোমাণ ক্যাথলিক চর্চ্চ অতিশয় বৃহৎ। তাহার অন্তর্গত ননারী, লাইব্রেরী, স্কুল, বোর্ডিং ইত্যাদি বিদ্যমান।

আজমিরের মেওকলেজে ভারতবর্ষের সমুদায় রাজকুমার বিদ্যাশিক্ষা করেন। কুচবিহারের রাজকুমার ভিক্টর নারায়ণ তখন সেই কলেজে অধ্যয়ন করিতেছিলেন।

আজমিরে বিবাহকর্ম্মাদি উপলক্ষে অন্য সম্প্রদায়ক বাঙ্গালী বাস করেন। তাঁহারা প্রায়ই নিস্তেজ ও নির্বীর্য্য। কোন সৎকার্য্যে তাঁহাদের উৎসাহ ও উদ্যম দেখা যায় না। তাঁহাদের মধ্যে ধর্ম্ম চর্চ্চাদির সম্পূর্ণ অভাব, সাংসারিক ক্ষুদ্র বিষয়েই মন আবদ্ধ।

বঙ্গদেশে স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে অনেক কৃতবিদ্য ব্রাহ্ম পর্য্যন্ত প্রাচীন শ্রেণীর হিন্দুদিগের কুসংস্কারের কার্য্য রাখিবন্ধন ও অরন্ধন নিয়ম পালন করিয়া থাকেন, তাঁহারা কি স্থানান্তরে যাত্রা করিবার জন্য কুসংস্কারী হিন্দু দিগের ন্যায় শুভ দিন ও শুভক্ষণ নির্ণয় করেন? এবং দিন ক্ষণের দোষ কাটাইবার জন্য কোনরূপ তুক্ তাক্ করিয়া থাকেন? আমরা আজমিরে যাঁহার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম তাঁহার একটি পুত্র কলিকাতায় যাত্রা করিবার সমুদ্যত হয়, যে দিন যে সময়ে ট্রেণে সেই বালক যাত্রা করিবে স্থির করিয়াছিল, সেই দিন যাত্রার জন্য শুভ তিথি ছিল না। সেই তিথিতে যাত্রা করিলে পুত্রের অকল্যাণ হইবে ভাবিয়া পিতা অতিশয় ভীত ও চিন্তিত হইলেন। বালকটি স্কুলের ছাত্র, তাহার ছুটি শেষ হইয়া আসিয়াছে, যাত্রা না করিলে নয়। পিতা কয়সরগঞ্জস্থ একজন বৃদ্ধ পণ্ডিতের নিকটে যাইয়া ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। পণ্ডিতজী বলিলেন, "আজ অমুক দণ্ডে শুভযোগ আছে, তিনটী পয়সা, একটি উপবীত, একটি গুবাক এবং এক মুট চাউল একটা নেকড়া দ্বারা পুঁটুলী বাঁধিয়া উহা সেই শুভ তিথি থাকিতে এক জন লোক

যেন ষ্টেশনে কোন কর্ম্মচারীর নিকটে রাখিয়া আইসে, আজকার শুভক্ষণে বালক গৃহান্তরে যাইয়া যাপন করিবে, কাল যখন ইচ্ছা ষ্টেশনে যাইয়া উক্ত পুঁটুলীটী যেন সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়। কলিকাতায় পঁহুছিয়া এক জন ব্রাহ্মণকে যেন তাহা দান করে। তাহা হইলে সকল বিঘ্ন নিবারণ হইবে, অশুভ ফলে যাত্রার দোষ কাটিয়া যাইবে।" গৃহস্বামী তদ্রূপ ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। আমাদের এরূপ সংস্কার ছিল, যাঁহারা ইংরাজী লেখা পড়া শিখিয়াছেন তাঁহারা অন্ততঃ এই সকল কুসংস্কারের দায় হইতে মুক্ত হইয়াছেন। এদেশের বড় বড় বিদ্বান পুরুষেরা হস্তে রাখিবন্ধন করিয়া এক প্রদেশের সঙ্গে অপর প্রদেশের যোগস্থাপনে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। যেহেতু তাঁহাদের মতে প্রেম বন্ধনে যোগ হয় না। ভরসা করি, তাঁহারা যাত্রার জন্য এই পুঁটুলী বন্ধন নিয়মটিও পালন করিবেন।

পাঠিকারা পুষ্কর তীর্থের নাম শ্রবণ করিয়া থাকিবেন, উহা হিন্দু দিগের পরম তীর্থ, রেলওয়ের প্রসাদে বঙ্গদেশ হইতে বহু স্ত্রী পুরুষ যাত্রিক উক্ত তীর্থদর্শনার্থ সহজে গমন করিয়া থাকেন আজমিরনগর হইতে পুষ্কর ৬ মাইল দূরে, শকটারোহণে যাইতে হয়। সাম্বার নগরে যাত্রা করার পূর্ব্ব দিন প্রাতঃকালে আমরা পুষ্করে গিয়াছিলাম। গৃহস্বামী উমেশ বাবুর দুই পুত্র আমাদের সহযাত্রী হইয়াছিল।

আজমির হইতে পুষ্করে অনেক গুলি পর্ব্বত পার হইয়া যাইতে হয়। রাস্তা ক্রমোন্নত ও বক্র। অশ্বশকট ভুজঙ্গগতিতে চালিত হয়। কোন কোন স্থানে দুর্গমতাবশতঃ আরোহী সহ শকট চালিত হইতে পারে না। শকট হইতে অবতরণ করিয়া আরোহীকে পদব্রজে চলা আবশ্যক হইয়া থাকে। পার্ব্বত্য দুর্গের অভ্যন্তরে পুষ্করতীর্থ এরূপ বলাযায়। পথে গিরিশ্রেণীর সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য দেখিয়া হৃদয় পুলকিত হয়। পুষ্করে একটি সুবৃহৎ পুরাতন সরোবরের তীরে অনেক গুলি দেবমন্দির বিদ্যমান। অন্য কোন তীর্থে ব্রহ্মার মাহাত্ম্য বড় দেখা যায় না। কিন্তু পুষ্করে ব্রহ্মার মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা বড়, এস্থানে মহা ঘটাসহকারে বিরিঞ্চিদেবের পূজা হইয়া থাকে। যাত্রিকগণ মন্ত্র পাঠ করিয়া সরোবরে স্নানাবগাহন করে, উক্ত সরোবরের জলে বড় বড় মাছ ভাসিয়া বেড়ায়, কুমীরেরও অভাব নাই। শ্রুত হইল কখন কখন দুই এক জন যাত্রিক কুম্ভীর দেবতার গ্রাসে আত্মবলিদান করে। আমরা পবিত্র তীর্থ বারি ভাবিয়া পুষ্কর সরোবর-নীরে স্নানাবগাহন করি নাই। এস্থানে দেবমন্দিরের সঙ্গে একটি মস্‌জেদ বিদ্যমান দৃষ্ট হইল। পরধর্ম্ম বিদ্বেষ মোসলমানবাদশাগণ কর্ত্তৃক প্রায় সকল হিন্দু তীর্থেই দেব মন্দিরের পার্শ্বে বা দেব মন্দিরকে চূর্ণ করিয়া এক একটি বৃহৎ মস্‌জেদ নির্ম্মিত হইয়াছে। পুষ্করে বিশেষ বিশেষ পর্ব্বাহে যাত্রিকের অত্যন্ত ভিড় হয়। এস্থানেও শত সহস্র পাণ্ডা। অর্থাপপাসু পাণ্ডাগণ বড়ই বিরক্ত করিয়া থাকে। কোন্ স্থান হইতে কোন্ যাত্রিক

আসিয়াছে এক এক জন পাণ্ডার খাতায় নাম লেখা এবং তাহা তাহাদের মুখস্থ, তাহারা অনর্গল বলিয়া যায়। একজন ছোকরা পাণ্ডা দূরতর পূর্ব্ব বঙ্গের ঢাকা চট্টগ্রামাদি জিলার অনেকগুলি যাত্রিকের নাম মুখস্থ বলিয়া গেল। পুষ্করের পার্শ্বে একটি দুরারোহ উচ্চ পর্ব্বত শিখরে সাবিত্রী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত, দূর হইতে সাবিত্রী মন্দির নয়নগোচর হয়। এরূপ প্রবাদ যে সাবিত্রী-প্রতিমার পূজা করিলে তাহার কপালে সিন্দুরের ফোঁটা দিলে সধবা চিরকাল সধবা থাকে। তজ্জন্য নানা দেশ হইতে সধবারা ব্যাকুল অন্তরে সাবিত্রীমূর্ত্তির কপালে ফোঁটা দিবার জন্য বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া উক্ত পর্ব্বতে আরোহণ করেন। সেখানে এক জন অর্থগৃধ্নু পাণ্ডার অত্যন্ত দৌরাত্ম্য, প্রচুর অর্থ দানে তাহাকে সন্তুষ্ট না করিলে সে ফোঁটা দিতে দেয় না। আমরা জলযোগাদি করিয়া সেইদিন অপরাহ্নে আজমিরে ফিরিয়া আসি।

মাতৃজীবন *।

ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত আটীয়া পরগণার নাগরপুর গ্রামে মাতৃদেবীর জন্ম হয়। শৈশবে পিতৃমাতৃহীনা হইয়া তিনি সিংহয়াগী গ্রামে মাতামহীর নিকট প্রতি-পালিতা হন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ মাতুল পদ্মলোচন ঘোষ মহাশয় যথা সময়ে বীর-সিংহ গ্রাম নিবাসী গুরুপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দেন। তাঁর দাম্পত্য জীবন অতি মিষ্ট এবং সুখের ছিল। ক্রমে তাঁহারা ছয়টি সন্তান লাভ করেন, তন্মধ্যে তিনটী পুত্র ও তিনটী কন্যা। আমি তাঁহাদের সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ সন্তান। মার স্নেহমমতা অতুল, কোনও রূপ প্রতিকূলতায় সে স্নেহ পরাভূত হইত না। পঠদ্দশাতে ১৬।১৭ বৎসর বয়সে আমি ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করি। মা আমার অতি নিষ্ঠাবতী হিন্দু মহিলা। ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ ও ভিন্ন জাতির লোকের সঙ্গে পান আহার করিয়া আমি হিন্দু সমাজচ্যুত হই। এই ঘটনায় মাতৃদেবী ভয়ানক মর্ম্মান্তিক ক্লেশ পাইয়াছিলেন। আমাকে পুনরায় হিন্দু সমাজে গ্রহণ করিবার জন্য বহু প্রয়াস হইয়াছিল। আমার মন ফিরাইবার জন্য মাতৃদেবী আমাকে সম্মুখে লইয়া বিবিধ প্রকার বিলাপ ধ্বনিতে ক্রন্দন করিতেন। মৃত সন্তান সমক্ষে রাখিয়া মাতা যেমন ক্রন্দন করেন, সেই রূপ অধীরা হইয়া উচ্চনাদে মা কান্দিতেন। আমি তখন নিরুপায় হইয়া ভগবানের পদাশ্রয় গ্রহণ করিতাম, দয়াল কাণ্ডারী প্রাণে অবতীর্ণ হইয়া মনে বিলক্ষণ বল ও স্থৈর্য্য দান করিতেন। মা আমাকে এই রূপে ভগবানের দিকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া দিতেন। মার প্রাণ বড় কোমল ছিল, তিনি আমাকে শক্ত কথা বলিতে পারিতেন না। এক দিন তিনি আহারপান ত্যাগ করিলেন, আমি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া

---

* বিগত ২৩শে পৌষ ভাই বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ তাঁর মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ইহা পাঠ করিয়াছিলেন।

হিন্দু সমাজে উঠিতে যতক্ষণ স্বীকৃত না হই, ততক্ষণ আহার পান করিবেন না। আহারের সময় হইল, আমাকে খাইতে ডাকিলেন, আমি বলিলাম "তুমি খাইলে আমি খাইব"। একথা লইয়া মাতা পুত্রে অনেকক্ষণ আব্দার চলিল। যত বেলা বাড়িতে লাগিল তত মাতা পরাস্ত হইতে লাগিলেন। পরিশেষে সন্তান বাৎসল্যের জয় হইল, মা খাইতে সম্মত হইলে সন্তান আহার করিলেন। মাকে কত জনে কত কথা শিখাইয়া দিত, আমার প্রতি কঠোর ব্যবহার করিতে বলিয়া দিত, কিন্তু আমার কাছে আসিয়া তিনি সে সকল ভুলিয়া যাইতেন। ইহার অল্প দিন পরে আমার পিতৃবিয়োগ হয়। তখন মার বয়স অনুমান কিঞ্চিন্ন্যূন পঁয়ত্রিশ বৎসর। প্রায় ছয়ত্রিশ বৎসর কাল তিনি কঠোর বৈধব্যব্রত অতি নিষ্ঠার সহিত উদ্‌যাপন করিয়াছেন। পরলোকে পুনর্মিলনে তাঁহার গভীর আস্থা ছিল। কয়েক মাস পূর্ব্বে আমার কনিষ্ঠা ভগ্নীর নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন যে এত দীর্ঘ কাল যে পরলোকগত স্বামী আত্মার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথিবীতে থাকিতে হইবে তাহা কখনও ভাবি নাই। কি প্রবল পবিত্র দাম্পত্য প্রেম, মরণেও তাহার বিচ্ছেদ নাই!

তিনি গয়া, কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন ও জগন্নাথক্ষেত্র প্রভৃতি তীর্থ পর্যটন করিয়াছিলেন। বিধবা হইবার অল্প দিন পরেই তিনি হরিবলা হন। ব্যাধি গ্রস্ত হইলে মা ঔষধ সেবন করিতেন না, হরিনাম ও তুলসীতলার মৃত্তিকা তাঁহার সকল পীড়ার মহৌষধি ছিল। পীড়ার অবস্থায় তিন বার স্নান, তেতুল গোলা কাঁচা লঙ্কা সেবন ও সরিষার তেল ও কাঁচা লঙ্কা গায়ে মালিস, ইহাই তাঁহার পক্ষে হরির বিধান ছিল। একদা তাঁহাকে বিষধর সর্পে দংশন করে, তিনি অচেতন হইয়া পড়েন। তাঁহাকে তুলসীতলায় লইয়া গিয়া স্নান করান হয় ও তুলসীতলার মৃত্তিকা গায়ে লেপন করা হইল, আর অবিশ্রান্ত হরিনাম উচ্চারিত হইতে লাগিল, তেতুলগোলা ইত্যাদিও সেবন করান হইল। ক্রমে ঘোর অচেতন অবস্থা হইল, লোকে বলিতে লাগিল "বুড়ঠাকুরাণী মারা গেলেন"। কয়েক ঘণ্টা পরে পুনরায় তাঁহার চেতনা হইল। দংষ্ট্র স্থান ছুরিকা দ্বারা বিদারণ করিয়া দিলে অনেক গুলি কাল রক্তপাত হইল। ক্রমে তিনি সুস্থ হইলেন, কিন্তু মাসাধিক কাল দেহে গ্লানি ছিল। যখন তাঁর সংজ্ঞা লোপ হয় নাই তখন বলিয়াছিলেন যেন কোনও রূপ ঔষধ প্রয়োগ কিম্বা ওঝার চিকিৎসা করা না হয়। হরিনাম করিতে করিতে প্রাণ গেলেও ভাল।

আমার কনিষ্ঠা ভগ্নী শ্রীমতী বামাসুন্দরী বাল্যকালে বিধবা হন। আমি তাঁহাকে ব্রাহ্ম সমাজে আনিয়া বিবাহ দিয়াছিলাম। ইহাতেও মা বড় মর্ম্মপীড়া পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেও রুষ্ট হইয়া আমার প্রতি বিরূপ হন নাই। বহুদিন সে ক্লেশ বহন করিয়াছিলেন। পরিশেষে বামা সন্তানাদি লাভ ও স্বামী

পুত্র লইয়া সুখে বাস করিতেছেন শুনিয়া তাঁর মনঃকষ্ট নিবারিত হইয়াছিল। আমার বিবাহের প্রায় ত্রিশ বৎসর পর কয়েক মাস পূর্ব্বে মাতৃদেবী সেই কন্যার গৃহে কয়েক দিন থাকিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন, নাতী নাতিনী ও নাতবউ দেখিয়া পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। জামাতা তাঁহাকে এক প্রস্ত বাসনপত্র ও বস্ত্রাদি দান করিয়াছেন, নাতি নাতিনীরা কত আদর যত্ন করিয়াছেন বলিয়া আমার নিকট আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বিধাতার লীলা অদ্ভুত। আমার কার্য্যাবলী যেন মাতার অগাধ স্নেহের পরীক্ষক হইল। আমি অনেক বয়স পর্য্যন্ত বিবাহ করি নাই। মা বলিতেন তুই বিবাহ করিবিনা, সন্তান হবে না, সন্তানের জন্য মা বাপের প্রাণ কেমন করে তাহাও বুঝিবি না।" যদি বা আমার বিবাহ হইল, তাহাও একটী বৈদ্যকুলের বিধবার সঙ্গে। তাহাতেও মা অসন্তুষ্ট হইলেন না। বধূ আমায় কেমন যত্ন আদর করেন, স্বভাব রীতি নীতি কেমন ইত্যাদি বিষয় অনুসন্ধান করিতেন। কয়েক বৎসর পরে আমি স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া বাড়ী গেলাম, মা বুকভরা ভালবাসার সহিত সকলকে গ্রহণ করিলেন। মাত্র ৩।৪ দিন আমরা বাড়ী ছিলাম, আমার সহধর্ম্মিণী মার স্নেহ ভালবাসায় এত মুগ্ধ হইয়া গেলেন যে তাঁর জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত অতি ভক্তির সহিত মার কথা বলিতেন।

প্রাচীনা হিন্দুনারীর যে সকল সদ্‌গুণ সম্ভব, তাহা মাতে দীপ্যমান ছিল। দেব তায় নিষ্ঠা ভক্তি, সাধু ব্রাহ্মণে ভক্তি, অতিথি সেবা, আত্মীয় কুটুম্বের সমাদর এসকল গুণ মাতে অপর্য্যাপ্ত ছিল।

প্রায় সত্তোর বৎসর বয়সে বিগত ৬ই পৌষ শুক্রবার টাঙ্গাইলের অন্তর্গত বীর সিংহ গ্রামে মাতৃদেবী সজ্ঞানে হরিনাম করিতে করিতে তনুত্যাগ করিয়াছেন। ব্রহ্মকন্যা ব্রহ্মমাতার বক্ষে স্থানলাভ করিয়াছেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আমার হরিলাভ হইয়াছে, তাঁহার এবিশ্বাস হইয়াছিল। "তুমি হরিকৃপা পাইয়াছ, আমার প্রতি এখনও তাঁর কৃপা হইল না" এভাবের কথা তিনি কখনও আমাকে বলিতেন। হরিভক্তিতে তাঁর প্রাণ অভিষিক্ত হইয়াছিল। হরিনাম, হরিকথাই ভাল বাসিতেন। পীড়ার বৃদ্ধির সংবাদ পাইয়া আমার সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভাই শ্রীমান যোগেন্দ্র বাড়ী আসিয়াছিলেন, তিনি লিখিয়াছেন, আমি শেষ বার বাড়ী যাইয়া দেখি মার আর সংসারের দিকে কোনও টান নাই, মায়া নাই, কেবল হরিনাম করেন ও হরিনাম শুনিতে চাহেন। মৃত্যুর তিন দিন পূর্ব্বে বলিলেন, "বাবা হরি ঠাকুরকে কি দেখিলে, আহা কি অপরূপ সুন্দর রূপ তাঁহার"।

শেষ সময় উপস্থিত দেখিয়া আমার ভাই কাঁদিতেছিলেন, মা বলিলেন, এখনতো কাঁদিবার সময় নয়, হরিনাম করিবার সময়, হরিনাম কর। হরিকে ডাকিলে তোমরা সংসারেও সুখে থাকিবে।

চীনের সভ্যতা, সাহিত্য ও নারীধর্ম্ম। *

(শেষাংশ)

রমণীগণ গৃহকর্ম্মে সুনিপুণা, মাতা-পিতার প্রতি ভক্তিমতী, শ্বশুর শাশুড়ী ও পতির একান্ত আজ্ঞানুবর্ত্তিনী দাসী হইয়া থাকিবেন, ইহাই নারীজীবনের একমাত্র প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া চীনসাহিত্যে সর্ব্বত্র উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহারা রাষ্ট্রসংক্রান্ত কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন না, এমন কি রন্ধনাদি গৃহকার্য্য ব্যতিরেকে পারিবারিক অপরাপর বিষয়াদিতেও কোন কথা বলিতে পারিবেন না। তবে কোন মহিলা বিশেষ বুদ্ধিশালিনী ও অত্যধিক মানসিক ক্ষমতাসম্পন্না হইলে এবং প্রাচীন ও বর্ত্তমানকালের অবস্থাদি সম্বন্ধে তাঁহার বিশিষ্টজ্ঞান থাকিলে, তিনি তাঁহার পতির সাহায্যকারিণীরূপে গৃহীতা হইতে পারেন।

অতি প্রাচীনকালেই চীনে স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। চীনসাহিত্যে অনেক বিদুষী মহিলা ও গ্রন্থকর্ত্রীর নামোল্লেখ রহিয়াছে; তাঁহাদের রচিত বহুগ্রন্থ অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। সাং নাম্নী জনৈক মহিলার লিখিত একখানি গ্রন্থে বালিকাদের প্রতি নিম্নলিখিত উপদেশ দৃষ্ট হয়:—পথ চলিবার সময় পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া চাহিবে না, কথা বলিবার সময় বেশী মুখব্যাদন করিবে না, উপবিষ্ট অবস্থায় হাঁটু দুটীকে ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিবে না, দণ্ডায়মান অবস্থায় আঁচল নাড়িবে না, আহ্লাদ হইলে উচ্চৈঃস্বরে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিবে না, অথবা রুষ্ট হইলে চেঁচাইবে না। বাটী হইতে বহির্গত হইবার সময় মুখাচ্ছাদন ব্যবহার করিবে। অপর পরিবারের পুরুষের সহিত কখনও বাক্যালাপ করিবে না, ইত্যাদি।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক সু-মা কোয়াঙ্ তল্লিখিত "পারিবারিক শিষ্টাচারবিধি" নামক গ্রন্থে বধূদের আচরণ সম্বন্ধে বিস্তৃত উপদেশ দিয়াছেন। তাহাতে উক্ত হইয়াছে, বধূমাতা তাঁহার শ্বশুর শাশুড়ীর আহারের সময়ে ও শয়নাগারে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদের আজ্ঞাপালন ও পরিচর্য্যা করিবেন—তাঁহাদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিবেন, এবং মৃদুস্বরে তাঁহাদের কথার উত্তর দিবেন। তাঁহাদের আদেশ ব্যতীত তিনি তাঁহাদের সমক্ষে উচ্চরবে বাক্যোচ্চারণ, নিষ্ঠিবন নিক্ষেপ, উপবেশন অথবা সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। তাঁহারা পীড়িত হইলে গুরুতর কারণ ব্যতীত তাঁহাদের সমক্ষ পরিত্যাগ করিয়া তিনি অন্যত্র যাইতে পারিবেন না এবং তিনিই সমস্ত ঔষধি প্রস্তুত করিয়া তাঁহাদিগকে সেবন করাইবেন।

এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল তাহাতে পুরুষের নিকট চীনললনাগণের একান্ত বশ্যতা ও দাসত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে।

---

* "দি নাইণ্টিন্থ সেঞ্চুরী" নামক পত্রিকায় প্রবন্ধবিশেষ ও "ষ্টরী অব্ চায়না" নামক গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত।

কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে চীন রমণীর অবস্থা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রচিত গ্রন্থবিশেষে দৃষ্ট হয় চীনরমণীগণ, এমন কি তৎকালেও পুরুষের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষমা ছিলেন। কোন কোন গ্রন্থকার রমণীর প্রাধান্যে পারিবারিক বিশৃঙ্খলা ও অশান্তিবৃদ্ধি দেখিয়া বলিয়াছেন, রমণীর হস্তে কখনও পরিবার পরিচালনের ক্ষমতা ন্যস্ত করিবে না। ডিউক ওয়াই তাঁহার পত্নীর স্বেচ্ছাচারিতার ফলে আপনার জীবন হারাইয়াছিলেন ও রাজ্যে ঘোর অশান্তি আনয়ন করিয়াছিলেন। সম্রাট ওয়েন্‌টাই রাজ্ঞীর একান্ত বশীভূত হইয়া আপন বংশের অধঃপতন সংঘটন করিয়াছিলেন। এইরূপ আরও অসংখ্য দৃষ্টান্তের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। রমণীর বাহ্য সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ ও সুচতুর বাক্যাবলীতে প্রতারিত ঘোর স্ত্রৈণ পুরুষদের কিরূপ অশেষ দুর্গতি, লাঞ্ছনা ও শোচনীয় অবস্থা হয়, গ্রন্থবিশেষে তাহারও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।

চু-সী নামক বিখ্যাত রাজনৈতিক, সমালোচক ও ঐতিহাসিক বলেন:— সু-মা কোয়াঙের মতে, রমণী হইতেই পরিবারের উন্নতি বা অবনতি সংঘটিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অর্থ ও পদের লালসায় বিবাহ করেন, তিনি তাহা পাইতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিবেন, আর তাঁহার পিতামাতার প্রতি রূঢ় ব্যবহার করিবেন। সেই স্ত্রী স্বভাবতঃই একটু গর্ব্বিতা হইয়া পড়িবেন। এতদপেক্ষা ঘোরতর অভিশাপ আর কি হইতে পারে? আত্মসম্মান বোধ বিশিষ্ট কোন্ ব্যক্তি স্ত্রীর অর্থে—ধনশালী ও স্ত্রীর ক্ষমতায় উচ্চপদ লাভ করিতে ইচ্ছা করেন? টিংলুর মতে আপনাপেক্ষা উচ্চতর বংশে কন্যা সম্প্রদান করিবে ও অপেক্ষাকৃত হীনতর বংশ হইতে পুত্রবধূ আনয়ন করিবে, কারণ তাহা হইলে ঐ কন্যা ও পুত্রবধূ সতত সম্ভ্রমশীলা হইয়া তাহার কর্ত্তব্যপালন করিবে। বিধবার পাণিগ্রহণ সঙ্গত কিনা তৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইলে চু সী বলিয়াছিলেন, "বিবাহের উদ্দেশ্য শুধু এক জন সঙ্গিনী লাভ করা; যে রমণী পুনর্ব্বিবাহ দ্বারা আপনার সুখ্যাতিকে কলঙ্কিত করে, তাহাকে বিবাহ করা ও তদ্দ্বারা স্বকীয় সুযশ নষ্ট করা একই কথা।" অন্নবস্ত্রের সংস্থানবিহীনা কোনও অসহায়া দরিদ্রা বিধবা পুনরায় বিবাহ করিতে পারেন কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছেন, "শীত ও অনশন মাত্র এ দুটীই সেই বিধবার কষ্টের কারণ, কিন্তু চরিত্রগত অপযশের তুলনায় অনশন অতি তুচ্ছ বিষয়।"

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মিং বংশীয় সম্রাট্ ইয়ংলোর মহিষী স্ত্রীজাতির আচরণ সম্বন্ধে "অন্তঃপুরাঙ্গনাগণের জন্য উপদেশ" নামক গ্রন্থে স্বকীয় অভিমত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ঐ উপদেশ মালা বিংশতি প্রকার বিভিন্ন শীর্ষকে বিভক্ত, এতদ্ব্যতীত বালিকাগণের শিক্ষাবিষয়ে অতিরিক্ত এক অধ্যায়

তাহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। চরিত্রের সরলতা ও শুদ্ধতা, প্রকৃতির মধুরতা, মিতব্যয়িতা, শিশু ও আত্মীয়স্বজনের প্রতি সস্নেহ ব্যবহার, নারীচরিত্রে এই কয়েকটী বিষয়কে তিনি প্রধান লক্ষ্য করিতে বলেন। তিনি আরও বলেন, বংশরক্ষার জন্য কোনও ব্যক্তি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিলে নিঃসন্তান পত্নী তাহাতে ঈর্ষ্যা প্রকাশ না করিয়া বরং হৃষ্টা হইবেন। কোন রমণীর বৈধব্যদশা উপস্থিত হইলে, তিনি আজীবন বৈধব্য ব্রত পালন করিবেন ও তাঁহার পুত্রের অধীন হইয়া থাকিবেন। যে সকল রমণী বিবাহ প্রতিজ্ঞা উল্লঙ্ঘন পাপজনক মনে করিয়া উদ্বন্ধনে বা অন্য প্রকারে প্রাণত্যাগ পূর্ব্বক পতির অনুগামিনী হইয়াছেন, উক্ত গ্রন্থে তাঁহাদের অনেকের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে।

চীনসাহিত্যে নারীজাতির উপর এত অজস্র অন্যায় গালিবর্ষণ ও গ্লানিকর বাক্য প্রয়োগ হইয়াছে যে, তাহা সংগ্রহ করিলে বিরাটগ্রন্থ হয়। কিন্তু তা বলিয়া যে তাহাতে রমণীর প্রশংসাসূচক কিছুই নাই এমন নহে। খ্রীষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ কি পঞ্চম শতাব্দীর জনৈক ঐতিহাসিক বলিয়াছেন, "রমণীর সততা অপরিসীম, তাঁহাদের ক্রোধের ফল চিরস্থায়ী।"

চীন পরিবারে রমণীগণের কর্ত্তব্য রন্ধন ও তদ্রূপ সামান্য কার্য্যে আবদ্ধ থাকিলেও বস্তুতঃ তাঁহাদের অবস্থা তত হীন নহে। তাঁহারা স্বামীর সহিত সর্ব্বপ্রকার সম্মানের অধিকারিণী হন ও সন্তানগণের নিকট হইতে তুল্যরূপ শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বাধ্যতা প্রাপ্ত হন। চীনবাসিগণ তাঁহাদের বিস্তৃত সাহিত্যে নারীজাতির সম্মানার্থ প্রসিদ্ধ রমণীগণের জীবনচরিত লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। এই সকল জীবনীর সংখ্যা এত অধিক যে জগতের অপর কোনও জাতি উহার সহিত সমকক্ষতা করিতে পারে না। উচ্চশ্রেণীর নারীগণকে নিম্নোক্ত চতুর্দ্দশ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে :—

১ম—"মু"। উচ্চনীতিজ্ঞানসম্পন্না সাধ্বী স্ত্রী ও জননীগণ এই শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। এই শ্রেণীতে চারি শতেরও অধিক উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

একদা কোনও উচ্চপদস্থ রাজ কর্ম্মচারীর জননী তাঁহার পুত্রের ধনাগার পরিদর্শন করিতে যাইয়া উহা প্রচুর পরিমাণ অর্থে পরিপূর্ণ দেখিতে পাইয়াছিলেন। তখন তিনি পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমার পিতা রাজধানীতে ও বিভিন্ন প্রদেশে অনেক উচ্চ উচ্চ পদে বহুকাল কাজ করিয়া গিয়াছেন কিন্তু তিনি কখনও এত অধিক অর্থ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। ইহাতেই বুঝিতে পারিতেছ, তুমি তাঁহাপেক্ষা কত অপরিমেয়রূপে হেয়।

২য়—"মিয়াও"। পিতৃমাতৃপরায়ণা রমণীগণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাতে ১১৫ জন রমণীর জীবনী আছে।

৩য়—"আই"। এই শ্রেণীতে কর্ত্তব্যপরায়ণা, আত্মোৎসর্গকারিণী বীররমণীগণের ৪৭৫টী দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে।

কোনও যুদ্ধক্ষেত্রে একজন সেনানী নিহত হইলে, ঐ দলের সেনাপতি মৃত ব্যক্তির জননীর নিকট দুঃখ ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করিবার জন্য এক জন কর্ম্মচারী প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই শোকসংবাদ পাইয়া বীরজননী সংবাদ বাহককে বলিয়াছিলেন, "আমাদের পরিবারে সব শুদ্ধ ৩০০ শত জন লোক, তাহারা সকলেই সম্রাটের বদান্যতায় বহুকাল যাবৎ প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে ইহাদের সকলের নিধন হইলেও সম্রাট্ হইতে প্রাপ্ত অনুগ্রহের পরিশোধ হয় না; এমতাবস্থায়ও কি আমরা সামান্য একটী পুত্রের নিধনে কাতর হইব? মিনতি করি, আপনারা এবিষয় আর ভাবিবেন না।"

৪র্থ—"লীয়ে"। যে সকল রমণী অপযশঃ অপেক্ষা মৃত্যুকে শ্রেয়স্কর মনে করিয়াছেন এবং এমন কি, পতিবিয়োগের পর বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা আত্মহত্যাকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়াছেন তাঁহারা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এরূপ প্রায় ৬০০০ মহিলার কাহিনী ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৫ম—"চীয়ে"। যে সকল মহিলা পতিবিয়োগের পর পুনর্ব্বিবাহ করেন নাই এবং এমন কি অনেক সময় তজ্জন্য পিতা মাতার ইচ্ছা ও আদেশের প্রতিকূলবর্ত্তিনী হইয়াও চলিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এই শ্রেণীর অন্তর্ভূত করা হইয়াছে। চীনের অনেক তোরণদ্বার, এই শ্রেণীর মহিলাদের স্মৃতিরক্ষার্থ নির্ম্মিত হইয়াছে।

৬ষ্ঠ—"সি"। বিজ্ঞ ও কর্ম্মকুশলা নারীগণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাতেও তিন শতাধিক দৃষ্টান্ত আছে।

৭ম—"সাও"। যাঁহারা কাব্য সাহিত্যাদিতে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় ৫১৫টী জীবনী এই শ্রেণীতে বিবৃত হইয়াছে। ইহাদের—অধিকাংশই স্ত্রীকবি।

এক ব্যক্তি তাঁহার পরিণীতা ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়া অপর এক রমণীসহ স্থানান্তরে যাইয়া বসতি করিতেছিলেন। পরিবর্জ্জিতা দুঃখিনী পত্নী পতিকে ফিরিয়া পাইবার জন্য এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করেন। তিনি এক বর্গফুট পরিমাণ একখানি রুমাল প্রস্তুত করিয়া তাহাতে নীল, লোহিত, পীত প্রভৃতি পাঁচ প্রকার বিভিন্ন বর্ণে ৮৪১টী অক্ষর এমন সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও কৌশলপূর্ণ ভাবে ফুটাইয়াছিলেন যে ঐগুলি নানাভাবে পাঠ করিলে দুই শতেরও অধিক বিভিন্ন প্রকারের বিশুদ্ধ কবিতা হইত। ঐ সকল কবিতায় তাঁহার প্রতি স্বামীর অন্যায় ব্যবহারের উল্লেখ ও স্বকীয় দুঃখকাহিনী বিবৃত ছিল। এই রুমালখানি তিনি স্বামীর নিকটে প্রেরণ করেন। উহা প্রাপ্ত হইয়া ভ্রান্ত স্বামী পুনরায় সাধ্বী পত্নীর নিকট ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

৮ম—"হুই"। হাস্যরস পূর্ণ সুচতুর উক্তির জন্য যে সকল বুদ্ধিশালিনী মহিলা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। মাত্র সাতটী উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

৯ম—"চাই"। যে সকল প্রখ্যাতা রমণী পুরুষের বেশ পরিধান করিয়া যুদ্ধে গমন করিয়াছেন, হিংস্র পশু শিকারে বা 'ফুটবল' ক্রীড়ায় খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, যাঁহারা মৃতা হইয়াও পুনর্জ্জীবনলাভ করিয়াছেন, যাঁহারা স্বর্গে নীতা হইয়াছেন, কিংবা জীবিতাবস্থায় সমাহিত হইয়াছেন, যাঁহাদের অধিক সংখ্যক সন্তান সন্ততি জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, যাঁহাদের হাত নাই, অথবা হস্তপদে অঙ্গুলীর, সংখ্যা কম—যাঁহাদের সমস্ত দেহ রোমাবৃত, ইত্যাদি ইত্যাদি এই শ্রেণীতে তাঁহাদের ২৫০টী উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে।

১০ম—"চিয়াও"। সঙ্গীত ও চিত্রাঙ্কনাদি ললিতকলায় সুদক্ষা রমণীগণ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

১১—"ফু"। যে সকল রমণী সংসারে বিশেষ সুখের অধিকারিণী হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ইঁহাদের ২০টী উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। একটী উদাহরণে দেখা যায়, কোনও সৌভাগ্যবতী রমণী তাঁহার চিবুকস্থ ৫ইঞ্চ দীর্ঘ কতিপয় শ্মশ্রুর জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন!

১২শ—"য়েন্" অতুলরূপশালিনী রমণীগণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাতে মাত্র ৪৫টী উদাহরণ আছে।

এই উদাহরণ গুলি পাঠ করিলে রমণীর আদর্শসৌন্দর্য্য সম্বন্ধে চীনবাসিগণের ধারণা অবগত হওয়া যায়। তাঁহাদের মতে, অগ্নিতরঙ্গের ন্যায় জলন্ত চক্ষু, লোহিত রাগরঞ্জিত ওষ্ঠযুগল, শ্বেতোজ্জ্বল দন্তপংক্তি, দীর্ঘকর্ণ, কৃষ্ণকুন্তল মসৃণচর্ম্ম রমণীসৌন্দর্য্যের আদর্শ। রমণীদেহের উচ্চতা ৫ফুট ৪ইঞ্চ ও পদতলের দৈর্ঘ্য ৭৷৷ ইঞ্চ মাত্র হওয়া আবশ্যক। চীনবাসিবাগণ পদের ক্ষুদ্রায়তন রক্ষার জন্য লৌহনির্ম্মিত পাদুকা ব্যবহার করিয়া থাকে। এই পাদুকাবন্ধনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে কোনও চীনবালিকা তাহার জননীকে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, প্রাচীন ঋষিগণ স্ত্রীজাতির অত্যন্ত মর্য্যাদা করিতেন; রমণীগণ যাহাতে অলসভাবে বেড়িয়া না বেড়ায়, তদুদ্দেশে তাঁহাদিগকে গৃহে রাখিবার জন্য, এই পদবন্ধনের রীতি প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে।"

১৩—"হেন্"। যে সকল রমণী অশেষবিধ সাংসারিক ক্লেশ ও নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছেন—এই শ্রেণীতে তাঁহাদের প্রায় ২০০ উদাহরণ বিবৃত হইয়াছে।

১৪শ—"হউ"। ধর্ম্মপ্রাণা রমণীগণ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কোনও চীনমহিলা তাঁহার স্বামীকে "ঈশ্বর বলিয়া কেহ নাই" এই শীর্ষকে প্রবন্ধ লিখিতে দেখিয়া "যদি ঈশ্বর না থাকেন, তবে তাঁহার সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতেছ কেন?" এই বলিয়া তাঁহাকে বারণ করিয়াছিলেন। সেই উক্তি দ্বারা তিনি চীন সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন।

উল্লিখিত চতুর্দ্দশ শ্রেণীতে সর্ব্বশুদ্ধ ২৪০০০এরও অধিক পৃথক্ পৃথক্ জীবনী লিখিত হইয়াছে। চীনবাসিগণ যে রমণীজাতির কেবলই নিন্দাবাদ করেন নাই, বস্তুতঃ যথেষ্ট মর্য্যাদা করিতেন,

ইহা হইতে তাহা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে।

দাদামহাশয় ও নাতিনী।

দাদা। সরলা, খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে কখন শোবে?

সরলা। ঠিক রাত্রি ৯টার সময় খেয়েছি, ১০টার সময় শুতে যাব। আপনি তো বলেছিলেন খাবার পর ১ঘণ্টা বস্‌তে হয় তারপর শুতে হয়। আপনি আমাকে যখন যাহা শিক্ষা দেন তাহা পালন করিতে আমি খুব চেষ্টা করি।

দাদা। আজ সকাল থেকে তুমি কি কি খেয়েছ, তাহা একবার আমায় বলত?

সরলা। সকাল বেলা ৬॥০টার সময় চা এবং toast টোষ্ট। ৯॥০টার সময় ভাত, মাছের ঝোল আর চড়চড়ি, অম্বল এবং একটুখানি দুধ। স্কুলের টিফিনের সময় একটি রসগোল্লা ও দুখানি কচুরী। স্কুল থেকে এসে ৪খানি রুটী ও আলুর ডালনা। রাত্রিতে ভাত, ডাল, ভাজা, মাছের কালিয়া আর একটু দুধ।

দাদা। তোমার খাওয়া বেশ সাদা সিদে রকমের, তবু অনেকগুলি জিনিষ খেয়েছ কিন্তু এতোগুলি জিনিষ কেন খেলে জান?

সরলা। তা আমি জানি না। ঠাকুরমা তো খাবার ব্যবস্থা করেন। তিনি যে দিন যে রকম খেতে দেন সেই রকম খাই। তিনি তরকারি বদ্‌লে বদ্‌লে দেন মাঝে মাঝে মাংস ও ডিম দেন। আর কত রকম করে মাঝে মাঝে খাওয়ান।

দাদা। মানুষকে জীবনধারণ করিবার জন্য অনেক প্রকার খাদ্য খেতে হয়, কিন্তু কোন্ কোন্ খাদ্য খাওয়া উচিত এবং তাহা কি পরিমাণে তাহা অতি অল্প লোকেই জানে এবং জানিলেও অবস্থাবশতঃ এবং লোভপ্রযুক্ত খাদ্যসম্বন্ধীয় নিয়ম রক্ষা করিতে পারে না। শরীর তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বহু আয়াস এবং যত্ন দ্বারা পান ভোজনের তত্ত্ব যাহা জানিতে পারিয়াছেন তাহা তাঁহারা স্বীয় লিখিত গ্রন্থ দ্বারা প্রচার করিয়াছেন। জনসাধারণের শারীরিক স্বাস্থ্য ও সুখের উন্নতি করিবার জন্য শরীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের কতই যত্ন কতই চেষ্টা। সত্য সত্য তাঁহারা বিশ্বনিয়ন্তা করুণাময় বিধাতার প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া এ সংসারে উপস্থিত হইয়াছেন এবং জীবের দুঃখ মোচনের জন্য ব্রতধারী হইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ করিতেছেন এবং বিধাতার গৌরব প্রচার করিতেছেন। করুণানিধি বিশ্বপালক আমাদের পান ভোজন এবং সুখ স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করিয়াই নিশ্চিন্ত নন। তিনি পণ্ডিতদিগের প্রাণে অবতীর্ণ হইয়া সেই সমস্ত ব্যবস্থাতত্ত্ব জনসাধারণের জন্য প্রচার করিতেছেন। আহা! তাঁহার কতই করুণা! পাপী, তাপী, দীন, অধম, সাধু, মহাজন, মূর্খ ও পণ্ডিত সকলের জন্য তাঁহার প্রেম অজস্রধারে বর্ষিত হইতেছে। যতই তাঁহার প্রেমবিষয়ে ভাবি ততই প্রাণ ভাবে নিমগ্ন হইয়া যায় এবং

তাঁহার নিয়োজিত সেবকের প্রতি প্রাণ কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়।

সরলা। আপনি ঈশ্বরের কথা কহিতে গেলে একেবারে মেতে উঠেন কত কথা বলেন তাহা আমার শুনতে বেশ ভাল লাগে। এখন খাদ্যসম্বন্ধে কি বলিতে ছিলেন বলুন।

দাদা। বিধাতা আমাদের জন্য বহুবিধ খাদ্য দ্রব্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং কিরূপ খাদ্য আমাদের খাওয়া উচিত তাহা জানাইবার জন্য একটি সহজ উপায় করিয়া দিয়াছেন। এই উপায়টি জানিতে পারিলেই ব্যাপারটি সহজ হইয়া যায়। তিনি দুই প্রকারে পূর্ণ খাদ্য (Complete Food) সৃষ্টি করিয়াছেন। একটি ডিম অপরটি দুগ্ধ। প্রথমটি পক্ষিশাবকের জন্য এবং দ্বিতীয়টি স্তন্যপায়ী শিশুর জন্য। ডিমের ভিতরে কি আছে তুমি অবশ্য দেখেছ? এর খানিকটে লাল হড়্‌হড়ে ও সাদা প্রায় স্বচ্ছ, আর খানিকটে হল্‌দে ঘন তরল পদার্থ। সাদা অংশটি ভ্রূণ আর হল্‌দে অংশ (ডিমের কুসুম) ভ্রূণের খাদ্য। ভ্রূণের অস্থি মাংস রক্ত পালক ইত্যাদি গঠিত হবার উপযোগী সমস্ত উপকরণ ডিমের কুসুমের ভিতর অতি আশ্চর্য্য কৌশলে নিহিত আছে। দুগ্ধের ভিতরও স্তন্যপায়ী শিশুর সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মুখ চুল ইত্যাদি গঠিত হইবার উপকরণ আছে।

সরলা। ডিম ও দুধের ভিতরে এতো কথা তাতো কিছুই জান্‌তাম না। কি কি উপকরণ আছে বলুন।

দাদা। বিধাতার সৃষ্টির সামান্য একটু অণুর ভিতরে মহাতত্ত্ব নিহিত আছে। এখন উপকরণের কথা বলি। প্রধানতঃ তিন প্রকার খাদ্যের প্রয়োজন। ১ Protid প্রোটিড, যদ্দ্বারা মাংস প্রস্তুত হয়। ২ Heat giving food, উত্তাপকারী খাদ্য। ৩ Bone making food, অস্থি নির্ম্মাণকারী খাদ্য। এই তিন প্রকার খাদ্য ডিম্ব ও দুধের মধ্যে আছে। ডিমের ভিতরে Albumen (সাদাবস্তু) আছে। এই দ্রব্যের দ্বারা পক্ষীশাবকের মাংস গঠিত হয়। দুগ্ধেতে ছানা (ছানার বৈজ্ঞানিক নাম Casim) আছে। এই ছানার দ্বারা স্তন্যপায়ী জীবের দেহ প্রস্তুত হয়। ডিম্ব কুসুমের ভিতর পীতবর্ণের তৈল আছে। এই তৈল দ্বারা শাবকের দেহের উত্তাপ হয়। দুগ্ধের ভিতরেও তৈলাক্ত পদার্থ আছে। সে পদার্থের নাম শর বা মাখন। এই মাখন দ্বারা পশু শাবকের দেহের উত্তাপ প্রস্তুত হয়। ডিম্ব এবং দুগ্ধের ভিতরে ধাতব পদার্থ আছে তদ্দ্বারা হাড়্‌ নখ, চুল, পালক প্রস্তুত হয়। এই দুই প্রকার খাদ্যের মধ্যে যে জল আছে তদ্দ্বারা খাদ্য হজমের পক্ষে সহায়তা হইয়া থাকে।

সরলা। তবে কি মানুষ দুগ্ধ এবং ডিম্ব ছাড়া আর কিছু খাবে না?

দাদা। না, তা নয়, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার জন্য ভিন্ন ভিন্ন খাদ্য বিধাতা প্রস্তুত করিয়াছেন। পক্ষী ভ্রূণের তরল বস্তু ব্যতীত আর কিছু শোষণ করিতে পারে না। শিশুও পানীয় দ্রব্য ব্যতীত আর

কিছু গ্রহণ করিতে পারে না। এই জন্য পরম জ্ঞানময় ও করুণাময় সুচতুর বিধাতা তাহাদের খাদ্যের জন্য তরল পদার্থের ব্যবস্থা করিয়াছেন কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেমন অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং নানা প্রকার দৈহিক যন্ত্র সকল পূর্ণতা লাভ করিতে থাকে খাদ্যের প্রকার সেইরূপ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই জন্য ভিন্ন ভিন্ন বয়সের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন খাদ্যের বিধি। সে বিধি লঙ্ঘন করিলে জীবন ও স্বাস্থ্য থাকে না। কিন্তু খাদ্যের প্রকার যতই ভিন্ন হউক না কেন, মূলতঃ কয়েকটি মৌলিক খাদ্য খাইতেই হইবে।

সরলা। এই মৌলিক খাদ্যগুলির বিষয় আমাকে আর একটু ভাল করে বলুন।

দাদা। আচ্ছা বলি শুন। মাংস দেখতে কেমন নিরেট বা ঘন পদার্থ কিন্তু বাস্তবিক এত ঘন পদার্থ নয়। শতকরা ৭৭ ভাগ জল আছে। অর্থাৎ ১০০ ছটাক মাংসের ৭৭ ছটাক জল এবং ২৩ ছটাক সার পদার্থ আছে। মাংসকে আগুনে দিলে এই জলীয় ভাগ বাষ্পাকারে উড়িয়া যায় এবং সার ভাগটি থাকিয়া যায়। এক খণ্ড হাড় যদি মিউরিয়েটিক্ এসিডে (অর্থাৎ নুনের সার) ভিজাইয়া রাখা যায়, তাহা হইলে কয়েক দিন পরে এর আকার থাকে কিন্তু কাঠিন্য চলে যায়। ইহাকে অনায়াসে ছুরি দিয়া কাটা বা নোয়ান যায়, এই বস্তুর নাম Osscne। এইটিকে সিদ্ধ করিলে গঁদের মতন হইয়া যায়। চর্ম্ম, নখ, চুল, পালক নির্ম্মাণের সংযতা করে। খানিকটা রক্ত আগুনে শুষ্ক করিয়া লইলে ইহার জলীয় ৭৬ ভাগ উড়িয়া যায় এবং ২৪ ভাগ ঘন পদার্থ থাকে। এই ঘন পদার্থের ভিতরে দুই প্রকার পদার্থ আছে। Myosem এবং Osseine (মাওসিম্ ও ওসীন্)। দেখ কি আশ্চর্য্য সুকৌশলে তরল পদার্থ রক্তের মধ্যে মাংস ও অস্থি নির্ম্মাণের মৌলিক পদার্থ দুইটি মিশ্রিত রহিয়াছে। এইরূপে সেগুলি রক্তে মিশ্রিত না থাকিলে আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারিতাম না। রক্তের দ্বারা আমাদের শরীরে কি প্রকার উপকার সাধিত হয় সে বিষয়ে তোমাকে অন্য দিন বলিব, তাহা শুনিলে তুমি মোহিত হইয়া যাবে এবং সহস্র কণ্ঠে হরিগুণ গাইতে ইচ্ছা হইবে। উপরে যে পদার্থ গুলির কথা বলিলাম সে সমস্ত গুলি "প্রোটিট্ ফুড্।" এখন বেশ বুঝিতে পারিলাম মাংস ও হাড়ের সার ভাগ এবং দুগ্ধ ও ডিমের সার ভাগ একই প্রকার পদার্থ।

সরলা। আচ্ছা দাদামহাশয় মানুষের ভ্রূণ কি প্রকারে রক্ষিত হয়, গঠিত হয় তাহা তো বলিলেন না।

দাদা। সে সম্বন্ধে বিধাতা যে সুকৌশল করিয়াছেন, তাহা যতই আলোচনা করা যায় প্রাণ ততই বিস্ময় ও ভক্তিরসে পূর্ণ হইয়া যায়। ভ্রূণের সঞ্চারের দিন হইতে সে মাতৃগর্ভে মাতৃদেহের অণু লইয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং কতকটা দেহ গঠিত হইলে ভ্রূণের নাভির সঙ্গে ও মাতৃদেহের সঙ্গে একটি নল দ্বারা

যোগ হইয়া যায় তাহা চলন ভাষায় অমৃত নাড়ী বলে। এই নাড়ীর ভিতর দিয়া মাতৃদেহের রক্ত এবং রস ভ্রূণ শোষণ করিতে থাকে। এই জন্য গর্ভাবস্থায় ঋতু বন্ধ হইয়া যায় এবং সেই রক্তই বিশেষ ভাবে ভ্রূণকে পুষ্ট এবং রক্ষা করে এবং দুগ্ধাকারে শিশুদেহ পোষণ ও পুষ্টি করে। দেখ দিদি, মার কাছে আমরা কত ঋণী। তাঁহার দেহের রক্ত পান করিয়া আমরা জীবনধারণ করি! হায়! এ সংসারে কত পাষণ্ড নরনারী আছে যাহারা মাতৃঋণ প্রায় ভুলিয়া যায়। কন্যাগণ পতি ও সন্তান লাভ করিয়া মার কথা ভুলিয়া যান। মার প্রতি অকৃতজ্ঞতা কি ভয়ানক পাপ তাহা তুমি বুঝিতে পারিলে কি?

এই চলন প্রবাদ যা তোমার ঠাকুরমা মাঝে মাঝে বলেন তার অর্থ খানিকটা তুমি বুঝিতে পারিলে। তোমার ঠাকুরমার নিজের সম্বন্ধে এরূপ অভিযোগ করিবার কারণ নাই। তোমার বাবা সত্য সত্য কুলপাবন সৎপুত্র। করুণাময়ের গৌরব তাঁহার জীবনে দিন দিন অধিকতর প্রকাশিত হউক ইহা আমাদের প্রার্থনা এবং আশীর্ব্বাদ।

সরলা। আচ্ছা দাদামহাশয়, যদি দুধ আর ডিমে সকল প্রকার খাদ্য পাওয়া যায় তবে খালি দুধ ও ডিম খেয়ে থাকলেই হয়? এত প্রকার খাদ্যের প্রয়োজন কি?

দাদা। না দিদিমণি, তা হবে না, তা হলে খোদার উপর (খাদ্কারি)। বিধাতার কোন কার্য্য অভিপ্রায় শূন্য নয়। তিনি যে এত প্রকার খাদ্য করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার বিশেষ অভিপ্রায় আছে। ভিন্ন ভিন্ন বয়সের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন খাদ্যের প্রয়োজন এবং ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের খাদ্যেরও প্রয়োজন। তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি দুগ্ধে প্রায় ৯০ ভাগ জল ১০ ভাগ সার এবং এই সার ভাগের মধ্যে কত প্রকার খাদ্যের মিলন। বালকের শরীর এই অল্প পরিমাণ খাদ্যে চলে কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হয় সেই জন্য নানা প্রকার খাদ্যের প্রয়োজন হয়। এই সকল খাদ্য জীর্ণ করিবার জন্য নূতন একটি যন্ত্র প্রস্তুত হয়। সেই যন্ত্রের নাম দাঁত। এবং অন্যান্য জীর্ণ করিবার যন্ত্র সকল ক্রমে পুষ্ট এবং বলবান হয়। মনে কর, যদি তুমি দুধ পান করিয়া বাঁচিতে চাও তাহা হইলে প্রয়োজনীয় সার পদার্থের জন্য এত দুধ পান করিতে হইবে তাহা হয়তো তোমার পেটে ধরিবে না, এবং তুমি জীর্ণ করিতে পারিবে না, কারণ তোমাকে আধ সের সার পদার্থ গ্রহণ করিবার জন্য এক মণ জল পান করিতে হইবে। কারণ তুমি জান দুধে ৯০ ভাগ জল এবং ১০ ভাগ সার।

ক্রমশঃ

পুস্তক প্রাপ্তি।

কাগজ—ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু এম্ বি, এফ্ সি এস্ প্রণীত। আমরা এই পুস্তকখানির আদ্যন্ত পাঠ করিয়া

বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। ইহাতে সাধারণের বোধগম্য সরল ভাষায় কাগজের ইতিহাস হইতে আরম্ভ করিয়া কাগজের বিভিন্ন উপাদান, তাহাদের দেশীয় ও ইংরেজী নাম, প্রাপ্তিস্থান, এবং কারখানার যন্ত্রাদির চিত্র সম্বলিত বিবরণ ও কার্য্য প্রণালী সংক্ষেপে সুন্দর বর্ণিত হইয়াছে। ব্যবসায়েচ্ছু উদ্যমশীল যুবকগণ ইহা পাঠে যথেষ্ট উপকৃত হইবেন। ডাক্তার বসু মহাশয় বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলনের দিনে এই পুস্তক প্রকাশ করিয়া সর্ব্বসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবকসম্প্রদায় স্বদেশী হুজুকে হৈ চৈ না করিয়া এই প্রকার শিল্প বাণিজ্যে শিক্ষা ও কলকারখানা প্রতিষ্ঠার দিকে মনোযোগী হইলে তাঁহাদের শিক্ষার সার্থকতা ও দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে।

মহা মহিলা সমিতি।

(একটী উৎকল কন্যা হইতে প্রাপ্ত।)

গত ২৯শে ডিসেম্বর কলিকাতা নগরীতে বেথুন কলেজে Ladys conference নামে ভারতবর্ষীয় মহিলাদিগের একটী মহা সম্মিলনী হইয়াছিল। এই সম্মিলনীতে প্রায় দুই শত মহিলা (ভারতের বহু প্রদেশ হইতে আগত) উপস্থিত ছিলেন। মাননীয়া বরোদার মহারাণী এই সম্মিলনীতে সভাপতির পদে বরিত হইয়াছিলেন।

সভাস্থল সুন্দর রূপে সজ্জিত হইয়াছিল। এই সভার কার্য্য সমুদায় সুচারু রূপে সম্পাদিত হইয়াছে। কেবল মহিলাদিগের আয়োজনে এবং শৃঙ্খলায় এইরূপ মহা সম্মিলনীর কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন হওয়া নারীজাতির পক্ষে গৌরবের বিষয়।

যে সমস্ত মহিলা "প্রবন্ধ" পাঠ করিয়াছেন, তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে।

মাননীয়া কুচবিহার মহারাণীর বক্তব্য, এবং মাননীয়া সভাপতি মহোদয়ার বক্তব্য সুন্দর হইয়াছিল। আশা করা যায়, ভারতের প্রত্যেক শিক্ষিত এবং শিক্ষিতা নরনারী এই মহা মহিলা সমিতির কার্য্য বিবরণী বক্তব্য এবং প্রবন্ধ সকল পাঠ করিতে পাইবেন। এবং এই মহা মহিলা সমিতি কংগ্রেস বা কনফরেন্সের মত বৎসরে বৎসরে হইয়া ভারতকে দিন দিন উন্নতির পথে লইবে ইহাই আমরা আশা করি।

একটী ক্ষুদ্র বালিকার পত্র।

আমাদের একটী নাতনীর পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকা নিম্নলিখিত পত্রখানা তাহার পিতাকে সুন্দর ও সুস্পষ্ট অক্ষরে লিখিয়াছে।

শ্রীচরণকমলেষু

বাবা আমি ইংরাজী বই পাইয়াছি আমি Cart stand hand এই সব পড়ি লীলুর তিনটী দাঁত উঠিয়াছে সে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে আমাকে দেখিলে আনন্দিত হইয়া আমার কোলে আসে।

সে বড় দুষ্ট হইয়াছে এবং সর্ব্বদাই তাহার মুখে হাসি লাগিয়া রহিয়াছে আমরা ভাল তুমি কেমন আছ। ইতি Sailabala Sen. তোমার শৈল

মহিলাদিগের রচনা।

ফুল।

ফুল তুমি ফুটে রও,
চুপ করে কেন রও,
দুটী কথা মোর সাথে করে আজি যাও না।
আছি একা একা বসে,
হৃদয় নাহিক হাসে,
আজি তব হাসি দেখে ভুলে গেছি বেদনা।
এস ভাই এস না।
এস ভাই এস কাছে
সুধাইতে সাধ গেছে,
ধরায় অতুল সাজে কোথা হতে সেজেছ?
বিতর সুবাস রাশি
প্রাণ ভরা সদা হাসি
স্বর্গীয় সুষমা রাশি কোথা বল পেয়েছ
আহা কিবা সেজেছ?
এত রূপে এত গুণে,
ভরা, তবু আছ মৌনে,
মধুর হৃদয় খানি কেন নাহি খুলেছ।
কে তোরে সাজাল ভাই,
দেখা তাঁর নাহি পাই,
বলনা কুসুম আহা তুমি নাকি জেনেছ!
কোথা তাঁরে পেয়েছ?
কুসুম বলনা কথা
চুপ করে কেন হেথা
কিবা ভাব সংগোপনে হৃদি ভরে রেখেছ
কার সনে কথা কও,
হেন আমোদিত রও,
কার পানে চেয়ে চেয়ে অত হাসি হাসিছ?
সাধনাকি সাধিছ?
জীবন কর্ত্তব্য ধীরে
সাধিছ কাহারে স্মরে
নীরব সাধনা সাধি নীরবেই ঘুমিছ।
একবার কও কথা
মরণ মধুর ব্যথা
কার কোলে মাথা রাখি সব ভুলে গিয়েছ।
আমরা মলিন অতি
তাই কি গো ফুল সতী
মানবের সাথে তুমি কথা নাহি কহিছ।
ধন্যরে দেবের বালা
মরতে করিছ আলা
তব পুণ্য জ্যোতি দিয়ে ধন্যরে তাঁহার
নমিনু চরণে আমি তুমিরে যাহার।

ভক্তি।

১

তুমি হে মহান মহত সুজন
তোমার তুলনা নাই।
ক্ষুদ্র অতিশয়, আমি অভাজন
তোমা পানে চেয়ে রই।

২

মহান্ সে গিরি উদার হৃদয়
পরশে গগনে কায়।
ক্ষুদ্র সে তটিনী কুলুকুলু করে
চরণে বহিয়া যায়।

৩

তেমনিই আমি ভক্তি বিহীনা।

ভকতি কুসুমাঞ্জলী ;
মহত সুজন তব পাদ পদ্মে
সযতনে দিব ঢালি।

৪

উদার হৃদয়, উদার মূরতি
যেনগো দেবতা তুমি।
দেবতার মত স্নেহ ভালবাসা
দেব, বলে জানি আমি।

সম্বলপুর। শ্রীমতী স—

পতিতার প্রতি সহানুভূতি।

ওদেরে করোনা সখি ঘৃণা।
আহা ওরা বড়ই দুঃখী বড়ই অনাথা
সংসারেতে আশ্রয় বিহীনা,
ওদেরে করোনা সখি ঘৃণা।
চল যাই উহাদের কাছে।
সুধাইব উহাদের দুঃখের কাহিনী,
কত ব্যথা হৃদয়েতে আছে,
চল সখি উহাদের কাছে,
কেন পড়ি সংসারের কোণে।
নিজ হাতে ললাটেতে মাখিছে কর্দ্দম,
প্রতি দিন এ ছার সেবনে,
কেন পড়ি সংসারের কোণে।
কেন ওরা কিসের লাগিয়া,
জ্যোতি ভরা গগনের পানে নাহি চাহি
অন্ধকার লয়েছে বরিয়া,
কেন ওরা কিসের লাগিয়া।
কেন ওরা দেখিছে না চাহি,
কত সুখ কত শান্তি পুণ্য পবনেতে
গেল যারা এ জীবন বাহি,
হায়! কেন দেখিছে না চাহি।
নিজ হাতে জীবনের পথ,
কণ্টকে আবৃত করি তাহে দ্রুত ধেয়ে,
বাড়াইছে চরণের ক্ষত
কেন করি কণ্টক আবৃত।
নিজ হাতে পরিয়া নিগড়,
সুদীর্ঘ জীবন মাঝে পেল না কেনগো
মোচনের হায়! অবসর
নিজ হাতে পরিয়া নিগড়।
চল সখি উহাদের কাছে,
সুধাইব উহাদের সে দুঃখ কাহিনী
কত ব্যথা হৃদয়েতে আছে
চল সখি উহাদের কাছে।
জননীর স্তন্য পান করি,
ওরাও লভিয়াছিল মানব জীবন,
পাপ পুণ্য জীবনেতে ধরি,
তবে কেন হেন দশা হেরি,।
ওদের কি লাগেনাক ভাল,
ইহ পরলোক ব্যাপী সুধারস পান,
তেয়াগী এ তীব্র হলাহল,
ওদের কি লাগেনাক ভাল।
না না সখি তাহা কভু নয়,
না জানি কি নিদারুণ খেদে লাঞ্ছনায়,
উহাদের এ দুর্গতি হায়!
না জানি কি খেদে লাঞ্ছনায়,
না জানি কি বিপাকেতে পড়ি
ইহ পর লোক সব দিয়া জলাঞ্জলি
নরকেতে পড়িছে আছাড়ি,
নাজানি কি বিকাতে পড়ি
হায় ওরা লভিলে সুযোগ,
তাহলে কি তেজি স্বর্গ সুধারস পান
জীবনে এ আনিত দুর্যোগ
অন্তহীন নরকের ভোগ,
জীবনের দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে,
না জানি কি ছলে বলে মোহ আকর্ষণে
পড়ে গেছে এ হেন আবর্ত্তে,
জীবনের দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে।
নতুবা সাধ করি কেহ
তেজি এ অমৃতবর্ত্ম নরকের পথে
দেয় ঢালি জীবন প্রবাহ,
হায় ভাগ্যহীনা বিনা কেহ।

উহাদেরো মানুষেরি হৃদি,
লাজ অপমান ঘৃণা বহি প্রতি দিন
যে যাতনা সহে নিরবধি,
সীমাহীন দুঃখের বারিধি।

নাহি ব্যথা তার তুলনায়,
সংসারের রোগ শোক শত দীনতায়
যে দুর্ভাগ্য বহে ওরা হায়,
নাহি দুঃখ তার তুলনায়।

চল সখি উহাদের কাছে,
সুধাইব উহাদের দুঃখের কাহিনী
কত ব্যথা হৃদয়েতে আছে,
চল সখি উহাদের কাছে।
সখিরে নয়নে যত আছে জল
জগতের দুঃখ হেরি ঢালিবার তরে
আজ তাহা ঢাল অবিরল,
হেরি এই অভাগীর দল।
সুধাও গো
কেন ওরা উঠিতে চাহে না
তেজি এ লাঞ্ছনা ঘৃণা লাজ অপমান
নরকের পিশাচ বাসনা
কেন ওরা বাঁচিতে চাহে না।

ওদের ত আছে পায়ে বল।
আছে দৃষ্টি আছে শ্রুতি আছে আশা ভাষা,
কেন তবে এত হীন বল,
চরণেরে করেছে বিকল।
সব সখি সব ওর আছে,
কিসের নিগড়ে তবে হইয়া জড়িত
জীবনেরে এত জড়ায়েছে,
পাপ হতে উঠিতে নারিছে।

চল সখি চল ওর কাছে,
সুধাইলে সে কাহিনী পারিবে জানিতে,
কেন ওরা আপনি ডুবিছে,
সুধা তেজি গরল ভাখিছে।

জগতের নাশি শীতলতা,
অযুত করুণ কণ্ঠ বিদারি গগন,
জানাইবে কত নির্ম্মমতা।
নিদারুণ সমাজ পেষণে,
রমণীর প্রতি হয় কত অবিচার,
মুহূর্ত্তের চরণ স্খলনে,
হেরিবে তা চল ওই খানে।

খেরুওয়া। শ্রী প্রি—

সংবাদ।

কলিকাতার মহা প্রদর্শনী মেলাতে ভারতবর্ষের নানা স্থানের মহিলাদিগের প্রস্তুত অতি সুন্দর সুন্দর শিল্পজাত দ্রব্য রক্ষিত হইয়াছে। সে সকল বিশেষ দর্শন যোগ্য। অনেক মহিলা সেখানে বসিয়া কারুকার্য্যাদি করিয়া থাকেন। বরদা রাজ্যের মহিলাদের ল্যাস প্রস্তুত প্রণালী সকলে সোৎসুক নয়নে দর্শন করিবেন। মহিলাদিগের মেলা দর্শনের জন্য বিশেষ দুই দিন বেলা ১১টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট ছিল, শেষ দিন কোন পুরুষ দর্শকের মেলা স্থানে প্রবেশের অধিকার ছিল না। শ্রুত হইল দ্বিতীয় দিবস ১৪ হাজার মহিলা উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজ প্রতিনিধি লর্ড মিণ্টো মেলার দ্বার উন্মোচন করিয়াছিলেন।

ভারতের মহারাণী স্বর্গগত কেশব চন্দ্র সেন মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ নির্ম্মলচন্দ্র সেনের নবকুমারীর God mother (ধর্ম্মমাতা) হইয়াছেন। মহারাণী কুমারীকে জিমিনাবাই নামে অভিহিত করিয়াছেন। কুমারীর বাঙ্গলা নাম শ্রীলতা হইয়াছে।

মহিলাতে প্রকাশের জন্য যাঁহারা পদ্য বা গদ্য রচনা পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন কাগজের দুই পৃষ্ঠায় না লিখিয়া এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠান। দুই পৃষ্ঠায় লিখিত হইলে কম্পোজিটারদিগের কম্পোজ করিতে বড় অসুবিধা হয়।

মহিলার দ্বাদশ বর্ষের ৬মাস অতীত হইল। গ্রাহক গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই বৎসরের মূল্য অবিলম্বে পাঠাইয়া আমাদিকে উপকৃত করিবেন।

ভিক্টোরিয়ামহিলাবিদ্যালয়।

জলের জন্ম ও তাহার গতিবিধি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এই দেখুন আমি দুইটা গ্লাশে জল রাখিতেছি, গ্লাশ দুটী দেখুন, দুটীই শুক্‌ন, এবং দুটা গ্লাশের একটা গ্লাশেও ছেঁদা বা ফুটা নাই। এখন এই দুটা গ্লাশের একটা গ্লাশে আমি খানিকটা বরফ দিলাম, দেখা যাক্ বরফ দিয়া কোনরূপ পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায় কি না। বরফ দিয়াছি জল ঠাণ্ডা করিবার জন্য। অবশ্য নীচের জল বেশী ঠাণ্ডা হবে। এখন দেখুন, নীচেটা ঘামিতে আরম্ভ হয়েছে। এ জল কথনো ভিতরের জল হ'তে পারে না ; তবে এ জল কোথা হ'তে এল, গ্লাশের চারি দিকে বাতাস আছে,তাহা বোধ হয় আর বলিতে হইবে না। এই গ্লাশে যদি জলের সহিত বরফ না দিয়া, শুধু বরফ দিতাম তাহা হইলে অতি শীঘ্র শীঘ্র এই গ্লাশ ঘামিতে থাকিত। চারি দিকের ঠাণ্ডা বাতাস লেগে জমে গিয়েছে। এই জল আর কিছুই নয় বাতাস। জলীয় বাষ্প মিলিয়া জল হয়েছে হাওয়ায় জলীয় বাষ্প যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে, অবশ্য সব বাতাসে সমান পরিমাণে জলীয় বাষ্প নাই, বর্ষাকালের বাতাসে জলীয় বাষ্প অধিক পরিমাণে থাকে। এই সমস্ত জলীয় বাষ্প বাতাসের সঙ্গে মিশে যায়। সমস্ত সময়েই কি বাতাস বাষ্প হয়ে যাচ্ছে? ইহার কি কোন ব্যতিক্রম নাই? ইহার কোনই ব্যতিক্রম নাই, সদা সর্ব্বদাই এইরূপ বাষ্প হইতেছে। মনে করুন যেন দুইটা কেট্‌লি আছে। দুইটাতেই খানিক জল দিয়া যদি উনানে বসাইয়া দেই। একটা উনানে কম আগুন আর একটাতে বেশী আগুন আছে। এখন দেখিবেন যে উনানটার উত্তাপ বেশী, সেই কেট্‌লীর জল আগে শুকাবে, আর যে উনানের উত্তাপ কম সেই উনানের কেট্‌লীর জল দেরিতে শুকাবে। এমন কি উত্তাপ কম থাকিলে জল শুকাইতে এক মাস লাগিবে।

কেট্‌লী উনানে দেওয়ার একটু পরেই দেখিবেন নীচের দিক্‌টা ঘামিতে আরম্ভ হয়েছে। বাষ্পের সঙ্গে আর উত্তাপের সঙ্গে অনেক তফাৎ আছে। দিনে যত জল বাষ্প হবে, রাত্রে তাহার অনেক কম জল বাষ্প হবে। কেট্‌লীর সমস্ত জলটাই বাষ্প হ'য়ে যেতে পারে। এই বাষ্প শীতকালে যেমন দেখা যায়, গ্রীষ্মকালে সেরূপ দেখা যাবে না। গ্রীষ্ম বেশী, শীত কম। গ্রীষ্ম ৬ মাস, শীত ৩ মাস। এই ৩ মাসেই বাষ্পের বিষয় আমরা অধিক বুঝিতে পারি। বৃষ্টির দিনে যে জল থাকে, ও যাহা বৃষ্টিতে বৃদ্ধি পায়, তাহার পরের দিন যদি আবার রৌদ্র হয়, তাহা হইলেই দেখিতে পাইবেন, জল কত কমিয়া গিয়াছে। এই ঘরে যদি আমি খানিকটা বাষ্প পুরিয়া

রাখি, অবশ্য সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। এইরূপ সমস্ত দরজা জানালা উত্তম রূপে বন্ধ করিয়া খানিকটা বাষ্প দিলে সেই সমস্ত বাষ্প জমিয়া জল হইবে। এইরূপ করিয়া এই ঘরের মধ্যেই আপনাদিগকে জল করিয়া দেখাইতে পারি। প্রথমেই একেবারে জল হইবে না, প্রথমতঃ সেই সমস্ত বাষ্প জমিয়া কুয়াসার ন্যায় দেখাইবে, পরে সেই সমস্ত কুয়াসা একত্রিত হইয়া বৃষ্টির আকারে ফোঁটা ফোঁটা হইয়া পড়িবে। এই ঘরটা বড় হ'লে মেঘ হ'য়ে জল হোত, মেঘ আর কিছুই নয় কুয়াসা। কুয়াসা গুলি একত্রিত হ'লেই মেঘ হয়। এই ঘরে খানিকটা কুয়াসা হলে, সেই সব কুয়াসা মিলে মেঘ হ'বে তাহার পর সেই মেঘ হইতে বৃষ্টি হইবে। মেঘটা ঘনীভূত হইলেই বৃষ্টির আকারে পড়িবে। আবার ঘর পরিস্কার করে যদি ষ্টীম দেওয়া যায় ঘরটা গরম হইয়া উঠিবে। খুব বেশী আগুন দিলে অতি শীঘ্র গরম হয়ে উঠিবে। যখন আগুণ ছিল না তখন যত ষ্টীম দেওয়া গিয়াছিল আগুন না থাকাতে অধিক ষ্টীম লাগিবে। আগুন সরাইয়া লইয়া কুয়াসা দিলে জলীয় বাষ্পের কণা গুলি যখন আরও ঘন হয় তখন আবার কুয়াসার আকারে পরিণত হয়। এইরূপে আমরা জলের উৎপত্তি সম্বন্ধে বুঝিতে পারি।

যে দেশ যেমন ঠাণ্ডা সেই দেশে সেইরূপ জলীয় বাষ্প আছে দেখা যায়। এই জীলয় বাষ্পটী আবার বাতাসের সঙ্গে ছড়াইয়া পড়ে যেমন বঙ্গ দেশ, কলিকাতা অবশ্য হুগলী নদীর পারে। চারিদিকে জল বলিয়া আমাদের হাওয়া জলে পরিপূর্ণ। আমাদের দেশে বেশী জল আছে বলিয়া দেশটী ভিজা, বেনারস ইত্যাদি যায়গায় শুষ্ক দেখা যায়। তাহার কারণ আমরা যেমন জলের মধ্যে আছি সেখানে সেরকম নহে। যত পশ্চিমে যাওয়া যায় ততই বাতাস শুষ্ক দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে জলের অংশ কম সেইটীই স্বাস্থ্যকর স্থান, যাঁহাদের বাত আছে তাঁহারা যদি সেখানে বাস করেন তাহা হইলে খুব উপকার লাভ করিতে পারেন। পঞ্জাব ইত্যাদি স্থানের বাতাস শুষ্ক, তাহাই পশ্চিমের লোক গুলি বেশী বলবান। বলও বেশী এবং তাহাদিগকে অধিক স্থূলকায় দেখা যায়, যেখানে উত্তাপ বেশী সেখানে জলিয় বাষ্প খুব কম। বিষুব-রেখা যেখানকার যত বেশী নিকট ততই সূর্য্যের উত্তাপ সেখানে বেশী। যত উত্তরে বা দক্ষিণে যাওয়া যাইবে ততই সূর্য্যের উত্তাপ কম দেখা যাইবে। সূর্য্যের উত্তাপ কম হইলে শীত বেশী হইবে। আমরা যেন দেখিয়াছি এক হাঁড়ি জল উনানে দিলে তাহা শীঘ্রই শুষ্ক হইয়া যাইবে। বেশী উত্তাপ দিলে জলটি শীঘ্র শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যাইবে।

সমুদ্রের যেখানে যেখানে বিষুবরেখা পড়ে সেই বিষুবরেখার দুই পার্শ্বের জলটি বাষ্প হইয়া উঠে সেই বাষ্পটী উর্দ্ধে উথিত হইয়া বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া যায়। আরব্য সাগর, বঙ্গ সাগর বিষুবরেখার নিকটে। রাশি রাশি জল বঙ্গসাগর ও আরব সাগর হইতে বাষ্প হইয়া উঠিয়া যাইতেছে। দক্ষিণে উত্তরে সকল স্থানেই জল বাষ্প হইয়া

উঠিতেছে। কিন্তু উত্তরে যত বাষ্প দেখা যায় দক্ষিণে তত যায় না। পুকুর ও নদী হইতে যত বাষ্প হয় তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক বাষ্প সমুদ্র হইতে হইয়া থাকে সেই সমস্ত বাষ্প বায়ুর সঙ্গে মিশিয়া যায়। বাতাস সব সময়ে সমান হয় না, ফাল্গুন চৈত্র মাসে পশ্চিম দিক হইতে বাতাস বহে, যাঁহাদের দক্ষিণ পশ্চিম খোলা নহে তাঁহাদের বৃষ্টি হইলে বড়ই কষ্ট হয়, ফাল্গুন চৈত্র মাসের হাওয়া দক্ষিণ পশ্চিম দিকে আসিবে।

কলিকাতার বাতাস যে আমরা পাইয়া থাকি তাহা শুষ্ক। (Equator) বিষুবরেখা হইতে ক্রমাগত বাষ্প উত্থিত হইতেছে। দার্জ্জিলিংয়েতে যে দিন সূর্য্য উঠে না কুয়াসা ঘরে আসিয়া কাপড় চোপড় ভিজাইয়া দিয়া যায়, সেই কুয়াসাটী আর কিছুই নহে কেবল মেঘ। দার্জ্জিলিংয়েতে যাঁহারা গিয়াছেন তাঁহারাই দেখিয়াছেন যে, ঘরে মেঘ আসিয়া কিরূপে সমস্ত ভিজাইয়া দেয়। শীতকালে বাতাসটী উত্তর দিক হইতে আসে। উত্তরে সমুদ্র নয় স্থল রহিয়াছে। স্থল হইতে বাষ্প উঠিতে পারে না, সেইজন্য শীতকালে জল খুব কম হয়। যখন বৃষ্টি পড়ে খানিকটা যদি ফেলিয়া দিই তাহা হইলে বাষ্প হইবে। উঁচু নীচু স্থান হইলে বসিয়া যাইবে।

সাধু ফ্রান্সলিন *।

আজ আপনাদিগকে একটী সাধুর বিষয় বলিব, ইঁহার নাম ফ্রান্সলিন। ইনি কিরূপ চরিত্রের লোক ছিলেন, ইঁহার জীবন কিরূপ ছিল, তাহাই দেখান আজ এই বক্তৃতার উদ্দেশ্য।

সাধু ফ্রান্সলিনের সম্বন্ধে অনেক কথা জানা গিয়াছে, দুই ব্যক্তি তাঁহার অনেক কথা সংগ্রহ করিয়া বই ছাপাইয়াছেন। তাঁহাদের নাম—

ইনিই তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন, কারণ ইনি সাধুর জন্মস্থানে বাস করিতেন।

এসেসি নামক সহরে সাধুর জন্ম হয়। ১১৮১ খৃষ্টাব্দে সাধুর জন্ম হয় এবং ১২৪০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। শুনিতে পাওয়া যায় তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন। অবশ্য এখন যেরূপ ভণ্ড তপস্বী অধিক সংখ্যক দেখিতে পাওয়া যায় তিনি সেরূপ সন্ন্যাসী ছিলেন না। তিনি এক জন বাস্তবিক ধর্ম্মনিষ্ঠ সন্ন্যাসী ছিলেন।

তাঁহার সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু সময়ে যেরূপ শরীরের স্থানে স্থানে রক্ত নির্গত হইয়াছিল, শুনিতে পাওয়া যায় সাধু ফ্রান্সলিনের মৃত্যু সময়েও শরীরের নানা স্থানে রক্ত নির্গত হইয়াছিল। তিনি

---

* ১৯০২ সালের ২১শে জুলাই শ্রীযুক্ত প্রমথলাল সেন মহাশয়ের যে বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন তন্মূলক।

যীশু খ্রীষ্টকে অন্তরের সহিত ভক্তি ও বিশ্বাস করিতেন। চিত্রকরেরা যেরূপ করিয়া নিবিষ্ট মনে চিত্র আঁকেন, একটী ফুল বা অন্য কোন কিছু দেখিয়া তাঁহারা যেরূপ সেইটা খুব মন দিয়া দেখিয়া চিত্র আঁকেন; তিনিও সেইরূপ যীশু খ্রীষ্টকে নিবিষ্ট মনে দেখিতেন, দেখিতেন অর্থে তিনি যীশুকে প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেন।

তিনি যে এক জন প্রেমিক লোক ছিলেন এরূপ মনে হয় না, কিন্তু তিনি যে এক জন কষ্টসহিষ্ণু তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি শরীরকে নানারূপ কষ্ট দিতেন। তিনি সন্ন্যাসীদের ন্যায় একটী আশ্রম করেছিলেন। তাঁহার সেই আশ্রমের মধ্যে আরও তাঁহার অনেক সঙ্গী বাস করিত। তিনি একটী গম্বুজের মধ্যে অনেক দিন বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্যান্য সঙ্গীরা সেই গম্বুজের বাহিরে বাস করিত।

ইউরোপে ভয়ানক শীত। সেইরূপ শীতে সন্ন্যাসীদের বাস করা অতীব কষ্টকর। সেখানকার শীত দেখিলে আর আমাদের মনে হয় না যে সেখানে সন্ন্যাসীরা বাস করে, কিন্তু শুনিলে অবাক্ হইতে হয় যে সেখানেও সন্ন্যাসীরা বাস করে। সেখানে বাস করিতে হইলে খুব সাহসের আবশ্যক। ফ্রান্সলিন তাঁহার জীবনে তাহা করিয়া ছিলেন। তিনি যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সে সময়ে সমাজের বড়ই শোচনীয় অবস্থা ছিল। ধর্ম্মের নামে মানুষ মহা অধর্ম্ম করিত। সেখানকার পোপেরা ভাল লোক ছিলেন না। সে সময়ে ৫ বৎসর অন্তর পোপ বদলী করা হইত। এখনকার যেরূপ লর্ডগণ ৫ বৎসর অন্তর বদলী হন, তখন ঠিক সেইরূপ ৫ বৎসর অন্তর পোপ দিগকে বদলী করা হইত। ৫ বৎসর পূর্ণ হইলেই নূতন পোপের নিকট সমুদায় ধর্ম্মভার ন্যস্ত করা হইত। তখন আবার পোপে ও রাজায় বড়ই ঝগড়া বিবাদ হইত। পোপ রাজার বিরুদ্ধাচরণ করিতেন এবং রাজাও তাঁহাদিগকে শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা করিতেন; তাঁহাদের এইরূপ ঝগড়া বিবাদে সাধারণ লোকে বড়ই মুস্কিলের মধ্যে পড়িত। তাহারা পোপের পক্ষ সমর্থন করিবে, কি রাজার পক্ষ সমর্থন করিবে, ইহা লইয়া বড়ই গোল পড়িত। সাধু ফ্রান্সলিন যখন জন্মগ্রহণ করেন সেই সময়ে নয় জন পোপ ছিলেন। ইহাতেই বুঝিতে পারি সেই সময়ে রোমের অবস্থা কিরূপ ছিল। এই পোপদের সময়ে রোমের অবস্থা বড়ই মন্দ ছিল। ধর্ম্ম চরিত্রও তাহাদের ঠিক ছিল না। সাধু লোক তখন বড় একটা দেখা যাইত না। কতকগুলা পোপ থাকিলে কি হয়? তাহাদের কোনই মূল্য ছিল না। এইরূপ শোচনীয় সময়ে ফ্রান্সলীন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ফ্রান্সলিন যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই সময়ের লোকেরা টাকা দিয়ে পদ কিনে নিত, টাকা দিয়ে পোপকে পর্য্যন্ত বশীভূত করিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তখনকার পোপেরা ভাল লোক ছিলেন না, তাই তাঁহারাও ঘুস খাইতে সঙ্কুচিত হইতেন না। এখন যেমন লোকে বড় বড় পদ পায়, তখন

সেইরূপ লোকে টাকা দিয়া পদ ক্রয় করিত। এই সমস্ত লইয়া পণ্ডিতদের সহিত খুব তর্ক বিতর্ক হইত। তখনকার সদাগরেরা খুব বড় বড় পদ পাইতেন, সদাগরেরা খুব বড়লোক ছিলেন। ফ্রান্সলিনের পিতাও এক জন সদাগর ছিলেন। তিনি সদাগর, সুতরাং তাঁহাকে নানাস্থান ঘুরিতে হইত, ফ্রান্সলিনও তাঁহার পিতার সহিত সেই সমস্ত স্থানে যাইতেন। সে সময়ে রেলগাড়ী ছিল না, তখন দেশ পর্য্যটন করা বড়ই কষ্টকর ছিল, তবুও ফ্রান্সলীন তাঁহার পিতার সহিত পদব্রজে যাইতেন। তাঁহার মনে মনে ইচ্ছা ছিল যে খুব বড়লোক হইব। বড়লোকদের ন্যায় আমার নাম চারিদিকে ঘোষিত হইবে। এমন কি তিনি একস্থানে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন যে আমি খুব বড় মানুষ হইব। আমার খুব পদমর্য্যাদা ও টাকা কড়ি হইবে। আমি এত বড় লোক হইব যে লোকে আমাকে পূজা করিবে। ছেলে বেলায় তিনি ভাল লোক ছিলেন না। তিনি নাকি বড়ই দুরন্ত ছিলেন। খুব দুষ্টামী করিতেন। নানা প্রকার অন্যায় রূপ আমোদ প্রমোদ করিতেন। কিন্তু এ সমস্তের মধ্যেও তাঁহার একটী বিষয়ে বিশেষ বিশেষতঃ দেখা যাইত। তিনি গরীব লোকদের ছেলেদের বড়ই দয়া করিতেন। তাঁহার মধ্যে তখন ততটা ধর্ম্মভাব লক্ষিত হইত না, কিন্তু এই গরীবদের প্রতি দয়ার ভাব খুব প্রবল ভাবে দেখা যাইত। একবার একটী ভিক্ষুক আসিয়া ভিক্ষা চাহিতেছিল, তিনি তখন আফিসে কাজ করিতেছিলেন। ভিক্ষুক ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে তাহাকে চলিয়া যাইতে বলিলেন, কিন্তু ভিক্ষুক না গিয়া বার বার ভিক্ষা প্রার্থনা করিতে লাগিল। অবশেষে তিনি বিরক্ত হইয়া আফিস হইতে আসিয়া ভিক্ষুককে তাড়াইয়া দিলেন। তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়ার খানিকক্ষণ পরে, তাঁহার খুব অনুতাপ হইতে লাগিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে এখন যদি আমার নিকট একজন বড় লোক সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন, তবে আমি কি করিতাম! তাঁহাকেও কি আমি এইরূপ ভাবে তাড়াইয়া দিতে পারিতাম! না তাহা কখনই পারিতাম না তাঁহাকে তাড়াইয়া দিতে না পারিলে ইহাকে তাড়াইয়া দিলাম কেন? এই ভাব তাঁহার মনে আসায়, তাঁহাকে একেবারে অস্থির করিয়া তুলিল, তাঁহার বড়ই অনুতাপ হইতে লাগিল অবশেষে তিনি সেই ভিক্ষুকের সন্ধানে ছুটিলেন। তাহাকে অনেক কষ্টে অনুসন্ধান করিয়া ভিক্ষা ও আহারীয় দ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে দিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিলেন, এবং নিজেও পরমাহ্লাদিত হলেন।

একবার তাঁহার আশ্রমে একটী কুষ্ঠ রোগী আসিয়া ছিল, প্রথমতঃ সেই কুষ্ঠ রোগী দেখিয়া তাঁহার বড়ই ঘৃণা হয়, কিন্তু পরক্ষণেই আবার তজ্জন্য অনুশোচনা আরম্ভ হয়। অবশেষে তিনি সেই কুষ্ঠ রোগীকে নিজের কাছে রাখিয়া নিজ হস্তে তাহার সেবা করিতেন তারপর এরূপও শোনা যায় যে যত স্থানে যত কুষ্ঠ রোগী ছিল সকলকে

আনাইয়া তিনি তাহাদের সেবা নিজ হস্তে করিতেন, এবং এরূপও শোনা যায় যে তিনি তাহাদের ক্ষত স্থান আরাম হইবার জন্য মুখ দ্বারা সমস্ত রক্ত পুঁজ চুষিয়া ফেলিতেন।

এইরূপ তাঁহার মহত্বের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার মধ্যে আর একটা ভাব এই দেখা যাইত যে লোকে যেরূপ দুঃখ কষ্ট ইত্যাদি রূপ নানা কারণে বিষাদিত হয়, তাঁহাকে সেরূপ দেখা যাইত না। তিনি কখনও বিষাদিত মনে দিন কাটাইতেন না। তাঁহার মন সর্ব্বদা বেশ প্রফুল্ল থাকিত। তাঁহার মধ্যে সরলতার ভাব খুব অধিক ছিল। খুব সরল ছিলেন। আর একটু সামান্য কারণে তিনি অধৈর্য্য হইতেন না।

এক সময়ে দেশে কি লইয়া একটা খুব গোলযোগ বাধে। রাজায় ও প্রজায় এই রূপ গোলযোগ উপস্থিত হয়। সাধু ফ্রান্সলিন সেই গোলযোগে রাজার পক্ষ সমর্থন না করিয়া গরীবদের পক্ষ সমর্থন করেন, এই লইয়া বড়ই বিবাদ উপস্থিত হয়। ফ্রান্সলিনের উপর রাজারা ভয়ানক চটিয়া যায়, কিন্তু তথাপি তিনি ভীত না হইয়া গরীবদের পক্ষেই থাকেন। শেষে রাজারা তাঁহাকে জেলে দিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য তিনি তাহাতে ভ্রুক্ষেপও করিলেন না। জেলে গিয়াও তাঁহার সেই প্রফুল্ল ভাব। জেলে গিয়াও তিনি বেশ প্রফুল্লিত ভাবে জীবন কাটাইতেন। আর তাঁহার মধ্যে প্রভুত্বের ভাব খুব ছিল। অর্থাৎ তিনি সর্ব্বস্থানে নিজের প্রভুত্ব রক্ষা করিতেন। জেলে গিয়াও তাঁহার এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যাইত না। তিনি সেখানেও নিজের প্রভুত্ব রক্ষা করিতেন। (ক্রমশঃ)

মূল্যপ্রাপ্তি

১০ম বৎসর।

শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকুমার সেন,	বহরমপুর	২৲
„ ক্রোধেশচন্দ্র সেন,	চিরক	২৲
„ ক্ষুদিরাম বসু,	কলিকাতা	১৲

১১শ বৎসর।

শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ কর্ম্মকার,	ময়মনসিংহ	২৲
„ মাধবচন্দ্র ঘটক,	পাথরাইল	২৲
„ কালিকাদাস দত্ত, রায়বাহাদুর	কুচবিহার	২৲
„ যাদবলাল সেন,	কুচবিহার	২৲
„ ক্ষুদীরাম বসু,	কলিকাতা	১৲
„ গগনচন্দ্র সেন,	জামালপুর	২৲
„ জগচ্চন্দ্র সেন,	মুন্সিগঞ্জ	২৲
„ দামোদর পাল,	বাঁকিপুর	২৲
„ শশিভূষণ সেন,	ঢাকা	২৲

শ্রীমতী সুরবালা সেন,	লাম্ডিন	
" চপলাসুন্দরী দত্ত,	পুরুলিয়া	
" সুদক্ষিণা সেন,	ভবানীপুর	
" প্রসন্নতারা গুপ্ত,	বালীগঞ্জ	
" কুমুদিনী সেন,	কলিকাতা	
	১২শ বৎসর।	
শ্রীমতী সতীদেবী,	ছাপরা	২৲
" চপলাসুন্দরী মজুমদার	কালীঘাট	২৲

মহিলার নিয়মাবলী।

মহিলা পত্রিকার ডাকমাশুলসহ বার্ষিক মূল্য ২৲ মাত্র। গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ মহিলার মূল্য ও অর্থসম্বন্ধীয় পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নামে এবং প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকটে ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইবেন। প্রাপ্ত প্রবন্ধাদি উপযুক্ত হইলে শীঘ্র হউক বা বিলম্বে হউক প্রকাশিত হইবে। কাহারও প্রবন্ধ ফেরত দেওয়া যাইবে না।

অনেক মহিলা পত্রিকা বৎসরাধিক কাল গ্রহণ করিয়া মূল্য দান করেন না' বড় দুঃখের বিষয়। যাঁহারা মূল্যদানে অসমর্থ তাঁহারা যেন অবিলম্বে পত্রিকা ফেরত পাঠাইয়া দেন, অথবা আমাদিগকে তাহা পাঠাইতে নিষেধ লেখেন। তাহা হইলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইব না। পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়া প্রাপ্য মূল্য না পাইলে অনেক সময়ে আমরা সেই মূল্যের জন্য ভি, পিতে মহিলা পাঠাইয়া থাকি।

মাসিক পত্রিকা।
যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ

১২শ ভাগ] মাঘ ১৩১৩ ; ফেব্রুয়ারী ১৯০৭। [৭ম সংখ্যা।

স্ত্রীনীতিসার।

বালক বালিকাগণ যাহাতে উত্তম ভোজ্য পরিচ্ছদাদিতে আসক্ত হইয়া না পড়ে, সামান্য খাওয়া পরায় সন্তুষ্ট থাকে, মা তাহাদিগকে সেরূপ শিক্ষা দিবেন। মধ্যে মধ্যে ব্যঞ্জনাদি উপকরণশূন্য অন্ন ভোজন করিতে এবং সামান্য স্থূল বস্ত্র পরিতে দিবেন। বিলাসী ঔদরিক লোকেরা যে অসার অপদার্থ তিনি ইহা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন। তাহাদের ভাল খাওয়ায় ভাল পরাতে যাহাতে প্রবৃত্তি না হয় তৎপ্রতি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিবেন। রুটি ইত্যাদি খাদ্য বস্তু তাহারা যেন উত্তম রূপে চিবাইয়া খায়, কেহ যেন সহভোজী অপর বালক বালিকার গ্রাসের প্রতি দৃষ্টি করিয়া না থাকে। আহারে প্রবৃত্ত হওয়ার প্রাক্‌কালে যেন অন্নদাতা ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া তাহারা তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা দান করে, মা তাহাদিগকে এরূপ শিক্ষিত করিবেন।

মা সময়ে সময়ে ঈশ্বর ও পরলোকের অস্তিত্ব ও আত্মার অমরত্ব এবং পাপপুণ্যের দণ্ড পুরস্কারাদি বিষয়ে ছেলে মেয়েদের সঙ্গে আলোচনা করিবেন। তিনি তাহাদিগকে ধর্ম্মের বড় বড় কথা শিক্ষা দিবেন না, তাহাদের অন্তরে প্রথমতঃ সুনীতিরূপ দৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত করিবেন। সেই ভিত্তির উপর ধর্ম্মপ্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত হইলে উহা স্থায়ী হইবে। গৃহ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত না হইলে অচিরে ভাঙ্গিয়া পড়ে। বালক বালিকারা যেন ধর্ম্মের বড় বড় কথা বলিয়া না বেড়ায়, ইঁচড়ে পাকা কাঁটালের মত না হয়।

জননী বালক বালিকাদিগকে তাহাদের ধারণা শক্তির উপযোগী ধর্ম্ম শিক্ষা দিবেন। তাহাদের প্রাত্যহিক পূজোপসনাতে যোগদান করিতে দিবেন, বাধা দিবেন না বরং সে বিষয়ে উৎসাহ দিবেন। পূজার্চ্চনা দর্শন করিলে তাহাদের ধর্ম্মভাব প্রবল হইবে, ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিবে। কিন্তু অসত্য কুসংস্কার হইতে তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে দূরে রাখিবেন।

মহিলা সম্মিলন।

কিয়ংকাল পূর্ব্বে এই বঙ্গদেশে এক পরিবারের মহিলাদের সঙ্গে অন্য প্রতিবেশী পরিবারের মহিলাদের প্রায় দেখা সাক্ষাৎ হইত না। প্রত্যেক মহিলা সর্ব্বদা নিজ নিজ গৃহেই বদ্ধ থাকিতেন। তবে বিবাহাদি পারিবারিক অনুষ্ঠানোপলক্ষে ভিন্ন ভিন্ন আত্মীয় কুটুম্ব পরিবারের মহিলাগণ নিমন্ত্রিত হইয়া অনুষ্ঠানক্ষেত্রে কিয়ৎক্ষণের জন্য সমবেত হইতেন। তখন পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ প্রসঙ্গ হইত। তখন সাধারণতঃ তাঁহারা পরস্পর এইরূপ কথা বার্ত্তা কহিতেন। অমুকের স্বামী বেশ রোজগার করে, স্ত্রীকে অতিশয় আদর সোহাগ করে, বোম্বাই শাড়ী এবং হীরা মুক্তার দামী গহেনা দ্বারা সে তাহাকে সাজাইয়া থাকে, অমুকে, বড়ই কুন্দুলে, স্বামীর সঙ্গে প্রায়ই কুন্দল করিয়া থাকে, স্বামী তাহার মনোমত গহেনা যোগাইতে পারে না, বলিয়া সে রাগ করিয়া প্রায়ই তাহার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া থাকে, স্বামীর সঙ্গে তাহার কোন দিন ভাব হয় নাই। অমুক গিন্নী বড়ই কৃপণ, স্বামী যাহা রোজগার করে সমুদায় তার চরণে ঢালিয়া দেয়। সে নিজের জন্য পুঁজি করিয়া রাখে, ছেলেমেয়েদিগকেও ভাল খেতে পরতে দেয় না। কেবল আপনার জন্য ভাল ভাল গহেনা গড়াইয়া লয়। বুড় বয়সেও সে ভারি সৌখীন। অমুকে বড়ই অগোছাল, সংসারের কোন কাজ জানে না, শিখিতেও চায় না। বড় আল্‌সে, কেবল গল্প করে দিন কাটায়। অমুকের একটি ছেলে হয়েছে, ছেলেটি টুকটুকে, বড়ই সুন্দর। ননদ শাশুড়ীর সঙ্গে অমুকের সর্ব্বদাই ঝগড়া হয়, ঘরে একটুও শান্তি নাই। অমুকের মিথ্যা কথা কহিতে কিছুই বাধে না। ছয় মাস নয় মাসের পর কোন ক্রিয়া কাণ্ড উপলক্ষে নিমন্ত্রিত আত্মীয় মহিলারা একত্রিত হইলে পরস্পর এইরূপ সদালাপ করিতেন। কাহার গহেনা কেমন, কাহার শাড়ী কত টাকায় কেনা হইয়াছে, তাঁহারা পরস্পর এই সকল দেখিতেন ও অনুসন্ধান লইতেন। পূজা পার্ব্বণ ও ব্রতোপবাসের কথা বার্ত্তাও হইত। সে কালের মহিলারা লেখা পড়া জানিতেন না। রামায়ণ মহাভারতাদি পুরাণ শাস্ত্রের চর্চ্চা ছিল। পুরাণোল্লিখিত অনেক বিষয় পাঠকের মুখে শুনিয়া অনেকে স্মরণ করিয়া রাখিয়াছেন। তাহার দুই একটা গল্প কেহ কেহ বলিতেন। রন্ধন পরিবেশন এবং গৃহ কর্ম্মাদির কথা কিছু হইত। কোন উচ্চ বিষয়ে তাঁহাদের ধারণা ও চিন্তা ছিল না, সে বিষয়ে প্রায় কোন কথাও হইত না।

বর্ত্তমান কালে মহিলাদের অনেকেই স্কুল কলেজে বা গৃহে বিশেষ ভাবে বিদ্যা চর্চ্চা করিয়া উন্নতি লাভ করিয়াছেন, পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে তাঁহাদের বুদ্ধি মার্জ্জিত হইয়াছে, তাঁহারা নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়া হৃদয়কে প্রশস্ত ও উন্নত করিয়াছেন, পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে এই সকল বিদুষী মহিলারা সাংসারিক সামান্য কথা কহিয়া বা বস্ত্রালঙ্কারের প্রসঙ্গ

করিয়া তৃপ্ত হন না। তাঁহারা অনেক সময় জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা কহেন, নানা দেশের নানা জাতির উন্নতি অবনতির চর্চ্চা করেন। কিন্তু আত্মোন্নতিসাধনার্থ সমবিশ্বাসী মহিলাদিগের মধ্যে সম্মিলিত উপাসনা প্রার্থনাদি হয় তা বড় দেখা যায় না। নব্য শ্রেণীর মহিলারা সর্ব্বদা অন্তঃপুরে বদ্ধ হইয়া থাকেন না তাঁহারা আবশ্যক মতে ইতস্ততঃ বিচরণ করার সময়ে প্রতিবাসী মহিলাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিয়া কথোপকথনাদি করেন, নিজেদের উন্নতি বা জনহিতসাধন উদ্দেশ্যে তাঁহারা সভা সমিতি করিয়া তদ্বিষয়ে যত্ন চেষ্টা ও উৎসাহ প্রকাশ করেন, এরূপ বড় লক্ষিত হয় না। তবে পাক্ষিক বা মাসিক মহিলাসমিতি আছে, তাহাতে দশ বিশ জন মহিলাসভ্য শ্রেণীভুক্ত আছেন, সেই সভাতে রচনা পাঠ ও আলোচনাদি হইয়া থাকে। সেই সকল সমিতির কার্য্য নির্জ্জীব ভাবে চলিতেছে, তদ্দ্বারা আশানুরূপ কার্য্য হইতেছে না। এরূপ সমিতির সংখ্যাও অত্যল্প। গত ২৯শে ডিসেম্বর বেথুন কলেজ গৃহে মহিলাদিগের মহাসম্মিলন হইয়াছিল। ৪।৫ শত সম্ভ্রান্ত মহিলা মিলিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে ভারতবর্ষের নানা বিভাগের ১৩। ১৪ জন মহারাণী ছিলেন। বরোদা রাজ্যের মহামান্যা মহারাণী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, নানা বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা হইয়াছিল। ইংরাজী বাঙ্গালা হিন্দী ইত্যাদি ভাষায় রচিত জ্ঞানগর্ভ উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ সকল ১৪।১৫ জন বিদুষী মহিলা কর্তৃক পঠিত হয়। সভাপতির বক্তৃতা অতিশয় হৃদয় গ্রাহিণী হইয়াছিল। যথাস্থানে তাঁহার ইংরাজী বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করা গেল। প্রতি বৎসর এইরূপ মহাসমিতি হইলে, তাহার অন্তর্গত নানা স্থানে শাখা সমিতির কার্য্য চলিলে, হীনাবস্থাপন্না ভারত রমণীদের অশেষ কল্যাণ হইতে পারে। স্ত্রী পুরুষের সমবেত উন্নতি ব্যতীত জাতীয় উন্নতি হয় না। এই দুইয়ের মিলনে মানব জাতি। মানব জাতির অর্দ্ধাঙ্গ নারী, পুরুষ অর্দ্ধাঙ্গ। দুইয়ের উন্নতিতে পূর্ণ জাতীয় উন্নতি এক্ষণও নারীজাতির উন্নতি, বহু দূরে পশ্চাতে পড়িয়া আছে। পুরুষজাতির উন্নতি কিছু অগ্রসর হইয়াছে। উন্নত শ্রেণীর কৃতবিদ্য মহিলাদের সমবেত উৎসাহ যত্ন ব্যতীত এই মহাকার্য্য সংসাধিত হওয়া অসম্ভব। স্বার্থপর পুরুষদিগের প্রতি তাঁহারা আশা ভরসা স্থাপন না করিয়া নিজেরা অগ্রসর হইতে থাকুন। ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে অচিরে কৃত কার্য্য হইবেন।

আমাদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

(সাম্বার।)

আমরা যখন সিন্ধু দেশ হইতে রাজপুতনার পথে আজমীর জয়পুর প্রভৃতি নগর হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিব মনস্থ করিয়াছিলাম, তখন ভাগলপুর ডিভিশনের স্কুলইন্‌স্পেক্টর পি, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী আমাদিগকে এরূপ লিখিয়াছিলেন, "আপনি আজমিরে যাইতেছেন, আজমির হইতে জয়পুরে যাইবার মধ্য পথে সাম্বার নগর, উক্ত নগরের

পার্শ্বেই প্রকাণ্ড লবণের হ্রদ। তাহা দর্শনীয় বিষয়। সেখানে আমার ভ্রাতা ডাক্তার পি এন্ দেব (প্রিয়নাথ দেব) সপরিবারে স্থিতি করিতেছেন। আপনি সাম্বারে লবণের হ্রদ দেখিয়া আসিবেন। পি, এন্ দেব ও তাঁহার পত্নী-আপনাকে পাইলে অত্যন্ত আনন্দিত হইবেন। তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের লোক।" আমরা করাচি নগরের অবস্থানকালে এই পত্র পাইয়াছিলাম। তখন সাম্বারে যাইব এরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। তৎপূর্ব্বে সাম্বারের নাম শুনিয়াছি কি না সন্দেহ। ৩০শে আষাঢ় আজমির হইতে পুষ্করতীর্থে যাওয়া হইয়াছিল তাহার পরদিন ১লা শ্রাবণ পূর্ব্বাহ্নে আজমির হইতে সাম্বারে যাত্রা করা যায়। আজমির মোসলমান তীর্থ পুষ্কর হিন্দুতীর্থ। আজমিরে সাধু মাইনোদ্দিন চোস্তীর দরগাতে প্রায় হাজার (খাদেম সেবক বা পাণ্ডা) নিযুক্ত, পুষ্করে ২২শত পাণ্ডা যাত্রিকগণের শোণিত শোষণ করে। যাহা হউক এস্থানে এ বিষয়ের আলোচনা প্রাসঙ্গিক নহে।

আমরা ১লা শ্রাবণ অপরাহ্নে সাম্বারে উপনীত হই। আমরা যে তথায় যাইব, ভাগলপুর হইতে মিসেস চাটর্জ্জি ডাক্তার পি, এন্ দেবকে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, আমরাও যাত্রাকরার পূর্ব্বে তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম। আমরা অপরাহ্নে পাঁচ টার সময় সাম্বার ষ্টেশনে উপনীত হই। ডাক্তার পি, এন্ দেব ষ্টেশনে আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। আমরা তাঁহার সঙ্গে এক মাইল অন্তর তাঁহার আবাসে চলিয়া যাই। তখন আমরা তাঁহার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হই। তিনি আমাদের পুরাতন বন্ধু শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ গুপ্ত মহাশয়ের জামাতা। গৃহে উপস্থিত হওয়া মাত্র গৃহিণী আমাদের সম্মুখে আসিয়া আত্মপরিচয় দান এবং আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন।

ডাক্তার প্রিয়নাথের আবাসের অদূরেই লবণহ্রদ। সেই হ্রদের দীর্ঘতা ২০ বিশ মাইল, তাহার পরিসর ৩ মাইল। প্রতি বৎসর দুই কোটি টাকার লবণ এই হ্রদ হইতে উৎপন্ন হয়। নয়জন ইয়ুরোপীয় পুরুষ প্রধান কর্ম্মচারী এবং সহস্রাধিক দেশীয় লোক নিম্ন শ্রেণীর কর্ম্মচারী লবণ প্রস্তুতির কার্য্যে নিযুক্ত। শ্রীমান্ প্রিয়নাথ উক্ত হ্রদ সম্পর্কীয় কর্ম্মচারীদিগের পীড়া হইলে চিকিৎসা করিয়া থাকেন। তিনি যুবাপুরুষ, বিলাতে চিকিৎসা শাস্ত্রের শিক্ষা প্রাপ্ত, গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে এই সাম্বারের হ্রদ জয়পুর ও যোধপুরের মহারাজের অধিকারভুক্ত ছিল। এই হ্রদের লবণ দ্বারা তাঁহাদের বার্ষিক ৩০।৩২ লক্ষ টাকা আয় হইত। গবর্ণমেণ্ট উভয় মহারাজকে বার্ষিক ৩২ লক্ষ টাকা প্রদানাঙ্গীকারে এই হ্রদ গ্রহণ করিয়াছেন, এক্ষণ ইহার লবণ দ্বারা দুই কোটি টাকা আয় হইয়াছে। ভারতবর্ষ লবণ বিক্রয়ে গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বশুদ্ধ ৬ কোটি টাকা আয় হয়, তন্মধ্যে দুইকোটি টাকা সাম্বারের লবণে আয়।

ডাক্তর দেব আমাদের পঁহুছাবার অব্যবহিত পরেই তথাকার খাজাঞ্জি বাবুকে

ডাকিয়া আনেন, তিনি বহু বৎসর হইতে সাম্বারে আছেন। সাম্বারে যাহা দর্শনীয় আমাদিগকে তাহা প্রদর্শন করিবার ভার ডাক্তর দেব তাঁহার উপর অর্পণ করেন। খাজাঞ্জি বাবু পর দিন প্রাতঃকালে উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া হ্রদের তীরে যাইবেন এই স্থির হয়। সাম্বার বালুকাকীর্ণ স্থান, তথাকার পথে গোযান ব্যতীত অন্য কোন যান চালিত হইতে পারে না। সেথানে অশ্বযানের সম্পূর্ণ অভাব। ডাক্তার দেব উষ্ট্রারোহণে রোগীর চিকিৎসা করিতে যান। আমাদের জন্য একটি উৎকৃষ্ট গোযান উপস্থিত করা হইয়াছিল।

লবণহ্রদের পার্শ্বে একস্থানে একটি বৃহৎ পুরাতন সরোবর বিদ্যমান। সরোবরের কূলে অনেকগুলি দেব দেবীর মন্দির স্থাপিত। প্রথমতঃ খাজাঞ্জি বাবু আমাদিগকে সেথানে লইয়া যান। সেস্থানে যাইয়া তিনি পুরাণ বর্ণিত দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠার আখ্যায়িকা স্মরণ করাইয়া আমাদিগকে বলিলেন, এস্থানে দৈত্যরাজ কন্যা শর্ম্মিষ্ঠার প্রাসাদ ছিল, সরোবরের একটি নিম্নতল স্থানকে তিনি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন এই স্থানে বৃহৎ কূপ ছিল। গর্ব্বিত রাজকুমারী শর্ম্মিষ্ঠা কর্ত্তৃক শুক্র কন্যা দেবযানী সেই কূপ গর্ভে নিপাতিত হইয়াছিলেন। সরোবরের ইতস্ততঃ গঙ্গা দেবীর মন্দির ব্রহ্মার মন্দির ইত্যাদি কতকগুলি দেবদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে, অনেক মন্দিরে পূজা হোমাদি হইয়া থাকে। আমরা লবণ হ্রদের পুলিন ভূমিতে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম। হ্রদ অধিক গভীর নহে। কোনস্থান ৩।৪ হস্তের অধিক গভীর হইবে না। পুলিন ভূমিতে সারি সারি চৌবাচ্চা খনন করিয়া তন্মধ্যে ক্ষুদ্র প্রণালীযোগে হ্রদের জল আনিয়া জমা করা হয়, জল শুকাইলেই লবণ রাশি চৌবাচ্চায় সঞ্চিত হইয়া থাকে। পরে কোদালের দ্বারা তাহা কাটিয়া লওয়া হয়, তদনন্তর বিশেষ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় পরিষ্কার করা হইয়া থাকে। লবণ চুরি না যাইতে পারে এই উদ্দেশ্যে স্থানে স্থানে প্রহরী নিযুক্ত আছে। সময়ে সময়ে দুই তিন হাজার মুটে এই হ্রদে কাজ করে। লবণের হ্রদ দর্শন করিয়া সাম্বার নগরে প্রবেশ করা গেল, নগর অতি সামান্য, রাস্তা অপরিষ্কার জঞ্জাল পূর্ণ। নগরের পার্শ্বে জয়পুর মহারাজের পুরাতন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান। নগরটি জয়পুর ও যোধপুর এই দুই রাজ্যের রাজার অধিকারভুক্ত। নগরে উভয় রাজার বৈঠক খানা ও বিচারালয় বিদ্যমান। সাহেবদিগের কুঠী ও ডাক্তার খানা ইত্যাদি নগরের বাহিরে খোলা মাঠে প্রতিষ্ঠিত।

সাম্বারে ডাক্তার পি, এন দেবের আবাসে এক দিন মাত্র আতিথ্য গ্রহণ করিয়া ২রা শ্রাবণ প্রাতঃকালে জয়পুরে যাত্রা করা যায়। গৃহিণী শয্যাত্যাগ করিয়াই আমাদের জন্য খিচরান্ন প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আমরা খিচরী ভোজন করিয়া ষ্টেশনে চলিয়া যাই। আমাদের স্নেহের কন্যা গৃহিণী সাম্বারের কিছু লবণ একটি কৌটায় পুরিয়া আমাদের সঙ্গে দিয়া-

ছিলেন। ষ্টেশনে যাওয়ার রাস্তার উভয় প্রান্তে বৃক্ষশ্রেণী। অনেকগুলি বৃক্ষশাখায় জলপূর্ণ বৃহৎ হাঁড়ী ঝুলান দৃষ্ট হইয়াছে। শ্রুত হইল আকাশের তৃষিত পক্ষী সকল সহজে জলপান করিবে সেই উদ্দেশ্যে সেই সকল জলপূর্ণ ভাণ্ড সংরক্ষিত হইয়াছে। ক্ষুদ্র জীবের প্রতি আশ্চর্য্য দয়া প্রকাশ।

R. M. Railwayর একটি ব্রাঞ্চ লাইনের অন্তর্গত সাম্বার ষ্টেশন। জংশনের পরের ষ্টেশনই সাম্বার' সম্বোরে যাইবার দিন ৭।৮ ঘণ্টা ষ্টেশনে বসিয়া ট্রেনের প্রতীক্ষা করিতে হইয়াছিল।

আমাদের সম্রাটপত্নী আলেকজান্দ্রা।

জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক সময় অনেক দেশে স্ত্রীলোকের দ্বারা এরূপ বিশেষ প্রয়োজনীয় মহা মহা ব্যাপার সম্পাদিত হইয়াছে যাহা কদাচ পুরুষের দ্বারা সম্ভবে না। অনেকের ধারণা যে পুরুষ অপেক্ষা রমণীগণ প্রায় সকল বিষয়েই খাটো, বিশেষ বীরোচিত কার্য্যে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নয়। যুগযুগান্তর হইতে পুরুষেরা নারীগণকে চাপা দিয়া চলিয়া আসিতেছে বলিয়া কোন কোন বিষয়ে তাঁহারা সময়ে সময়ে কম ক্ষমতা দেখাইলেও উহা তাঁহাদের প্রকৃতিগত দুর্ব্বলতাবশতঃ নহে। সকলেই জানেন, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী যুদ্ধের সময় ঝাঁসির রাণী যেরূপ বল, বীর্য্য, সাহস, কষ্ট সহিষ্ণুতা, ত্যাগস্বীকার, কৌশল প্রভৃতি প্রকাশ করিয়া পৃথিবীর পূজার্হ হইয়া গিয়াছেন এরূপ কয়জন পুরুষে পারে? যাঁহাদের বিরুদ্ধে তিনি অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন তাঁহারাও উক্ত বীরনারীর ভূয়সী প্রশংসা করিতে দ্বিধা করেন নাই; এবং সে দিন লর্ড কর্জ্জনও তাঁহার যশোঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

যাহা হউক স্ত্রীলোক যে সংসারের ভিত্তি স্বরূপ, এ কথা বোধ হয় সর্ব্ববাদী সম্মত। সর্ব্বদা সর্ব্বত্র দেখা গিয়াছে যে নারীগণের উন্নতি অবনতির সঙ্গে সমাজের উন্নতি অবনতি গ্রথিত। এরূপ ক্ষেত্রে নারীজাতির উন্নতিসম্বন্ধে উদাসীন থাকিয়া পুরুষেরা যদি সহস্র উপায়ে উচ্চে উঠিতে চেষ্টা করেন তাহা বালির বাঁধের মত ক্ষণকালের নিমিত্ত ফলপ্রদ হইতে পারে, দুই দিনের জন্য দেখিতে ভাল শুনিতে ভাল, কিন্তু প্রকৃত স্থায়ী উপকারে কখনই আসিতে পারে না। পুরাকালে যখন ভারতবর্ষ উন্নতিসোপানে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিল তখন আর্য্যরমণীগণ সুদৃঢ় স্তম্ভস্বরূপ হইয়া দেশকে উন্নত রাখিতে যত্নবতী ছিলেন। আমাদের মধ্যে অনেকে জানেন এবং বিশ্বাস করেন যে ইয়ুরোপীয় নারীগণ উন্নত বলিয়াই ইয়ুরোপীয় সমাজ আমাদের অপেক্ষা উচ্চাসনে আরূঢ়; এই জন্য তাঁহারা ইউরোপীয় ছাঁচে আমাদের রমণীগণকে গড়িতে প্রয়াস পান। বিগত অগ্রহায়ণ মাসের মহিলাতে কোন চিন্তাশীল লেখক তাহা সুন্দররূপে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

এখন দেখা যাউক ইউরোপীয় রমণীগণ কি কি উপায়ে কি ভাবে উন্নত হইয়াছেন। শুধু কি পুরুষগণের সহিত বাহ্যিক সকল বিষয়ে সমান ভাবে বিচরণ করিয়া তাঁহারা আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করেন? কখনই নহে। তাঁহারা সুশিক্ষা দ্বারা চরিত্রগঠনকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া ধন্য হইয়াছেন এবং তাঁহাদের সন্তানগণকে সদুপদেশ ও সুদৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষিত ও উৎসাহিত করিয়াছেন।

এদেশের মেম সাহেবদিগকে ভোগ বিলাস ও আলস্যে দিন যাপন করিতে দেখিয়া অনেকে মনে করেন ইংরাজ রমণী মাত্রে ঘোর বিলাসিনী, মেহনতের ধার দিয়া যাইতে চাহেন না। তাঁহাদের অনুকরণে আমাদের অনেক রমণী কেবল মাত্র ব্যসনাসক্তি দ্বারা সুসভ্য হইবার প্রয়াস পাইতেছেন। দুঃখের বিষয় ইদানীং (ব্রাহ্ম সমাজে ইহার মাত্রা কিছু অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হইতেছে; পরন্তু বিলাতের ব্যবস্থা ভিন্নরূপ। ইউরোপের রমণীগণ বড় ছোট সবাই গৃহস্থালীর কাজ যথাসম্ভব নিজেরা করিয়া থাকেন; ভদ্র ঘরের গৃহিণী ও অবিবাহিত কন্যাগণ বাজার করা ও পাকশালার কার্য্যে সাহায্য করা প্রাত্যহিক কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন। আমাদের দেশে আলস্যে জীবন অতিবাহিত করিতে পারা গৌরবের কথা। মেয়েরা কথায় বলে অমুক কি সৌভাগ্যবতী, এমন ঘরে পড়িয়াছে যে জলঘটিটা পর্য্যন্ত গড়াইয়া খাইতে হয় না। দাস দাসী পরিবেষ্টিতা সুকোমল পর্য্যঙ্কশায়িনী কুলবধুর অবস্থাই আমাদের দেশের স্ত্রীলোকের একমাত্র বাঞ্ছনীয় ও শ্লাঘার বিষয়। বিলাতে কিন্তু অলস একটা ভয়ানক গালাগালি। লণ্ডনে আমাদের বাসায় এলিজেবেথ (Elizabeth) নাম্নী একটী চাকরাণী ছিল; উক্ত নামের সংক্ষিপ্ত শব্দ লিজি (Lizzy)। আমি এক দিন রঙ্গ করিয়া তাহাকে বলিয়াছিলাম, "লিজি তুমি বড় লেজি (lazy অর্থাৎ অলস)। ইহাতে সে দশ মিনিট ফোঁপাইয়া কাঁদিয়াছিল এবং আমাকে দশবার অনুযোগ করিয়াছিল :—"আমাকে কেন অন্য গালি দিলে না, 'লেজি' কেন বলিলে।"

মানসিক তেজ ও হৃদয়ের উচ্চতা এই দুইটী উপকরণেই আমাদের মনুষ্যত্ব। মস্তিষ্কটা পুরুষের হাতে দিয়া হৃদয়টা রমণীর হাতে রাখিলেই সমীচীন শ্রমবিভাগ হইয়া মানবসমাজ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে সক্ষম হয়। এতদ্দারা এরূপ বলিতে চাই না যে মস্তিষ্কশক্তিতে আমাদের অপেক্ষা স্ত্রীলোক কোন অংশে কম। কারণ পৃথিবীর সর্ব্বযুগে অনেক স্ত্রীলোক ঐ দিকে বিশেষ বলের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া উঁহার অন্যতম উদাহরণ, অনেকে উঁহাকে বর্ত্তমান যুগের আদর্শ রমণী বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত নন। পরন্তু ভিক্টোরিয়ার দিগন্তব্যাপী যশ সত্বেও ইহা জোর করিয়া বলা যাইতে পারে যে হৃদয়ের প্রকৃত মহত্ত্বে আমাদের বর্ত্তমান সম্রাটপত্নী উঁহার সমকালিক কোন স্ত্রীলোক অপেক্ষা খাটো নন, বরং সকলের

উপর দুই এক হাত উচ্চেই অবস্থিত। বিলাতে থাকা কালীন আমরা স্বচক্ষে অনেকবার দেখিয়াছি, যে দোকানে ওয়েল্‌স্‌ প্রিন্সেস্‌ আলেকজান্দ্রার প্রতিকৃতি প্রদর্শিত সেখানে সর্ব্বদা ভয়ানক লোকের ভিড়, ফুট্‌পাথের উপর বহু নিম্ন শ্রেণীর লোক প্রেমের সহিত একদৃষ্টে ছবিখানির দিকে চাহিয়া তাঁহার গুণগান করিতেছে। এরূপ দৃশ্য আর কাহারও ছবির সম্মুখে কখন দেখি নাই। অন্যে যাহাই বলুক আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এইরূপ আইসে যে যেদিন এই দেবীমূর্ত্তি ইংলণ্ডের গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন সেই দিন হইতে বৃটনের ভাগ্য বিধাতা বিশেষভাবে প্রসন্ন, এবং যত দিন ইনি বৃটিশ সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বিরাজ করিবেন ততদিন ইংরাজ জাতির অকল্যাণ নাই।

সকলেই জানেন দেবী আলেক্‌জান্দ্রা দিনামাররাজের কন্যা। ডেন্‌মার্ক অতি ক্ষুদ্র রাজ্য, উহার আয় নিতান্ত কম। যখন ইহার বিবাহ হয় তখন সম্রাট এডওয়ার্ডের শ্বশুর যুবরাজ ছিলেন, সুতরাং সামান্য বৃত্তিভোগী। বিবাহ লণ্ডনেই সুসম্পন্ন হয়, তদুপলক্ষে ডেন্‌মার্কের যুবরাজ কন্যাকে যখন আনয়ন করা হয় তখন দেখা যায় তাঁহার পরিচ্ছদ অতি সামান্য। জাহাজ টেম্‌সে উপনীত হইলে ইংলণ্ডেশ্বরীর পক্ষ হইতে যাঁহারা ভাবী রাজবধূকে সম্ভাষণ করিবার জন্য প্রেরিত হন তাঁহারা উহা লক্ষ্য করিলে সরলা রাজকুমারী স্পষ্ট ভাষায় পিতার দৈন্য প্রকাশ করত বলেন, "আমাদের কাপড় চোপড় আমরা নিজেরাই সেলাই করিয়া থাকি, পিতা দর্‌জির পয়সা কোথা হইতে দিবেন।" এই অবস্থা ভিক্টোরিয়ার গোচর হইলে তৎক্ষণাৎ জাহাজে দর্‌জি পাঠাইয়া রাজোচিত পোষাকের বন্দোবস্ত হইলে কন্যা নির্দ্দিষ্ট প্রাসাদে আনীত হন।

বিবাহের পর দেবী আলেক্‌জান্দ্রা কিরূপ পতিভক্তি ও অপত্যস্নেহ প্রকাশ করত ইংলণ্ডের রাজপ্রাসাদ পবিত্র করিয়াছেন তাহা কাহার কাহারও অগোচর নাই। গৃহকার্য্যাদি নিজেত সমস্তই পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন, আবার কন্যাগুলিকে সে বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা দিতে ক্রুটি করেন নাই। বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে প্রত্যহ ঘরে পাকশালার কাজ ও বাহিরে বাজার করা এক দিনের জন্যও ছাড়িতে দেন নাই। ইহা দ্বারা পাঠিকাগণ বুঝিতে পারিবেন যে বিলাতের সম্ভ্রান্ত মহিলারা শুধু পায়ের উপর পা দিয়া নবেল পড়িয়া দিন কাটান না।

আলেক্‌জান্দ্রা দেবীর হৃদয়ের গভীর প্রেম ও উদার প্রশস্ততা সম্বন্ধে ইংলণ্ডে যে কত কথা প্রচারিত তাহার সংখ্যা নাই। তাঁহার দয়ার্দ্র কোমল চিত্তের বর্ণনা করা এ ক্ষুদ্র লেখনীর অসাধ্য ব্যাপার। তবে গোটাকতক মাত্র কথা পাঠিকাগণের গোচর করিতে চেষ্টা পাইব। তিনি মধ্যে মধ্যে পারিস নগরে হাওয়া খাইতে গিয়া থাকেন, তথায় রাজকীয় কায়দা কানুনের হাত এড়াইয়া সাধারণ ভাবে বিচরণ করিতে পাইয়া বড়ই আনন্দ অনুভব করেন। হাঁসপাতালে গিয়া

রোগীদের সংবাদ লওয়া এবং সময়ে সময়ে তাহাদের সেবা শুশ্রূষা করিবার অবকাশ পাওয়া তাঁহার পক্ষে যেন বড়ই সুখের কথা। এ সম্বন্ধে সম্রাট এড্‌ওয়ার্ড একদিন প্রকাশ করিয়াছিলেন যে Her Majesty never looked so truly happy as when reading about sick children or when going to visit a hospital. অর্থাৎ আর্ত্ত শিশুদের বিষয় পড়িবার বা হাঁসপাতাল দেখিতে যাইবার সময় রাজ্ঞী যেমন প্রকৃত সুখব্যঞ্জক প্রফুল্ল বদন প্রকাশ করেন এমন আর কখন নয়। পারিসে ঐ ভাবে একদা কোন হাঁসপাতালে গিয়া দেখেন তাঁহার একটি ভূতপূর্ব্ব বালকভৃত্য সেখানে রোগশয্যায় শায়িত; দেখিবামাত্র চিনিলেন এবং তাঁহার চাকরী ছাড়াতে তাহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন, পরে ডাক্তারকে ডাকিয়া তাঁহার হাতে কিছু অর্থ দিয়া বালককে বিশেষ যত্ন করিতে অনুরোধ করিলেন এবং আরোগ্য হইলে তাঁহার নিকট পুনঃপ্রেরণের জন্যও বলিয়া গেলেন।

হাঁসপাতালের রুগ্ন শিশুদিগকে সর্ব্বদা নানাবিধ খেলনা ও খাদ্যদ্রব্য পাঠাইয়া দেওয়া যেন মহারাণীমার নিত্য কর্ত্তব্য। কখন এরূপ শুনা যায় নাই যে দুস্থ শিশুর পক্ষ হইতে কোন আবেদন তিনি অগ্রাহ্য করিয়াছেন্। বারান্তরে কয়েকটী বিশেষ কথা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশের রহিল।

দাদামহাশয় ও নাতনী।

সরলা। তবে আমাদের কি কি খাওয়া উচিত?

দাদা। পূর্ব্বে বলিয়াছি আমাদের প্রাত্যহিক পান ভোজনের সঙ্গে তিন প্রকার মৌলিক খাদ্য গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই তিন প্রকার মৌলিক খাদ্য অংশতঃ কোনও না কোন প্রকারে এবং কোন না কোন পরিমাণে নানা প্রকারের খাদ্য আছে। এই জন্য আমাদের বিভিন্ন প্রকার খাদ্য খাওয়া উচিত।

সরলা। সে সব খাদ্যের নাম বলুন।

দাদা। নানা কারণে আমাদের শরীরের মাংস ক্ষয় হইয়া যায়, সেই জন্য সেই মাংস পূরণ করিবার জন্য Protid food মাংসকারী খাদ্য নিতান্ত আবশ্যক। Protid food(প্রোটিড ফুডের) মধ্যে মাংস সর্ব্ব প্রধান এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য। মাংস সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শরীরের মাংসকে পুষ্ট করে এবং সহজে জীর্ণ হয়। কিন্তু সকল প্রকার মাংসই একই পরিমাণে জীর্ণ হয় না। ছাগ, ভেড়া, হাঁস, মুরগী এবং পক্ষীর মাংস সহজে জীর্ণ হয়। দুগ্ধে ছানা এবং Cheese (পনির) Protid food ডিমের Albumen Protid food, কিন্তু ছানা এবং Albumen সব অধিক পরিমাণে খাইলে জীর্ণ হয় না। মৎস্যের ও fat মাংস অত তত সুমিষ্টকর খাদ্য নয়। ইহাতে জলীয় অংশ নিতান্ত বেশী।

সরলা। ভাত জল রুটি ইহাতে কি শরীর পুষ্টি করে না?

দাদা। হাঁ করে, প্রোটিড ফুড Protid food সম্বন্ধে আমার এখন সকল কথা বলা হয় নাই। গমের আটা ১২ পারসেণ্ট Gluten ৬০ ভাগ শ্বেতসার এবং ১৪ ভাগ জল। বাকি ১৪ ভাগের মধ্যে চিনি তৈলাক্ত পদার্থ এবং ধাতব পদার্থ। এর মধ্যে Gluten প্রোটিড ফুড (Protid food) ওটমিলে শতকরা ১৮ ভাগ Gluten আছে। চাউলে শত করা ৬ ভাগ মোটে Gluten আছে। দেখ সকল খাদ্য অপেক্ষা চাউলেই অল্প পুষ্টিকর। এই চাল খেয়েই বাঙ্গালীরা জীবন ধারণ করে। ভদ্র এবং ধনী লোকেরা চালের সহিত অন্য কিছু কিছু খান তাঁদের এক রকম চলে কিন্তু শ্রম-জীবী এবং গরিব লোকের প্রাণ কেবল ই ভাতের উপর নির্ভর করে। এই জন্য তাহাদের অধিক পরিমাণে ভাত খেতে হয়। ডাল, মটর এবং সিম জাতীয় খাদ্যে এক প্রকার সার পদার্থ আছে তাহার নাম (Legumin) ইহাও প্রোটিট্ ফুড্ (Protid food)। বাঁধাকপি, ফুলকপি, শালগম, গাজর এসকলের ভিতরেও প্রোটিট্ ফুড্ (Protid food) পাওয়া যায়। Heat making food এর কথা কাল বলিব।

সরলা। দাদা মহাশয়, সময় আছে আজই তুমি "Heat making food" এর কথা বল না শুনি।

দাদা। তৈলাক্ত পদার্থ এবং চিনি Heat making food। তৈলাক্ত পদার্থ দুধ, ডিম্ মাংস ও কোন কোন শস্যেতে পাওয়া যায়। যেমন সরিষা, তিল, অলিভ্ ও অন্যান্য বস্তুতে তেল পাওয়া যায়। গম থেকেও তেল পাওয়া যায়। মাংসের চর্ব্বি, মাছের চর্ব্বি দুধের সর, মাখম ঘি এই সমস্ত তৈলাক্ত পদার্থ ইহার দ্বারাই শরীরের Heat হয় এবং (Starchy food) শ্বেতসার খাদ্য হজম করিবার জন্য কোন প্রকার তৈলাক্ত পদার্থ অতি অল্প পরিমাণে খাওয়া উচিত এই জন্য রুটীতে একটু ঘি মাখাইতে হয়। আলু ভাতে বেগুন ভাতে ইত্যাদিতে একটু তেল কিংবা ঘি মাখাইতে হয় এবং ভাতের সঙ্গে একটু খাইলে ভাল হয়। সকল রকম তরিতরকারিতে ঘি বা তেল দ্বারা প্রস্তুত করা যায়।

চাল, ওট্‌মিল, গম, মক্কা বা ভুট্টা বার্লি, এরারুট ও সাগুতে Starch এবং নানা রকম ফল তরিতরকারিতেও Starch থাকে। এই Starch জিভের লালার সহিত মিশ্রিত হয়ে চিনি হয় এবং চিনি দেহের ভিতর যাইয়া পুড়িতে থাকে এবং তাহাতেই শারীরিক উত্তাপ হয়।

আক্, বিট্‌পালম, আঙ্গুর এবং নানা প্রকার ফলে চিনি থাকে। গোলআলু রাঙ্গাআলু কচু ইত্যাদিতে Starch থাকে এবং ইহা চিনিতে পরিণত হয়। মোটা-মুটি সমস্ত খাদ্যের আস্বাদনে মিষ্টরস পাওয়া যায় তাহাতে Starch বা চিনি থাকে।

শরীর রক্ষার জন্য উত্তাপের বড় প্রয়োজন একন্য আমাদের খাদ্যের অধি-কাংশ অংশ Heat Making। করুণাময় পরমেশ্বরের কেমন সুব্যবস্থা।

সরলা। দাদা মহাশয়, ভাত, রুটী, ডাল, মাংস ও দুধ খেলেই তো হয়, এতো প্রকার তরিতরকারি খাবার প্রয়োজন কি?

দাদা। অন্যান্য খাদ্যে যাহা কিছু আছে সে সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ফলে ও তরিতরকারিতে পাওয়া যায় কিন্তু ফল এবং তরিতরকারিতে এক রকম পদার্থ পাওয়া যায় যাহা আর কোন খাদ্যে পাওয়া যায় না। ইহাকে Mineral material (ধাতব পদার্থ) বলে। এই পদার্থ হাড় প্রস্তুতির জন্য আবশ্যক হয়। এই পদার্থ নানা প্রকারের যথা পটাস্ (Potas) সোডা (Soda) চুণ (lime) লবণ (Poasphate-) দ্বারায় নানা প্রকার চর্ম্ম রোগ হইতে আমরা রক্ষা পাই। লবণ না হলে কোন খাদ্যবস্তু শীঘ্র হজম হয় না। খাদ্যের সঙ্গে জলপান করা প্রয়োজন। জলের ভিতরে লবণ থাকে এবং জল উদরস্থ খাদ্যবস্তু তরল করে জীর্ণ কার্য্যের সুবিধা করে এবং শরীরের নানা প্রকার উপকার করে। শরীর ধারণের পক্ষে জলের অত্যন্ত প্রয়োজন। এজন্য করুণাময় ঈশ্বর সকল প্রকার খাদ্যে অধিকাংশ পরিমাণে জল মিশ্রিত করিয়া রাখিয়াছেন। খাদ্যের ভিতরে জল মিশ্রিত করিবার জন্য বিধাতা কি আশ্চর্য্য সুকৌশল করেছেন এবং তাঁহার প্রেমের কতই বিকাশ করেছেন। সমস্ত ফল, শস্য, তরিতরকারি ইত্যাদি গাছের মূল দ্বারা শোধিত জল গ্রহণ করে। গাছের মূল জমী হইতে জল টানে। জমী মেঘ হইতে জল পায়। সূর্য্য সমুদ্র হইতে জল টানিয়া মেঘ প্রস্তুত করে। দিদিমণি, এখন একবার ভেবে দেখ আমাদের প্রতিদিনের পান ভোজনের জন্য করুণাময় পরমেশ্বর প্রতিনিয়ত কি বিরাট ব্যাপার করিতেছেন। এই সমস্ত জানিলে এমন কে পাষণ্ড আছে যে প্রতিদিন আহারের সময় করুণাময় বিধাতার চরণে ভক্তি এবং কৃতজ্ঞতা পূর্ণ হৃদয়ে নমস্কার না করিয়া থাকিতে পারে? হায়! আমাদের মধ্যে কয়জন এ সমস্ত বিষয় স্মরণ করিয়া আপনাদের মনুষ্যজন্ম সার্থক করে।

মহিলাদিগের রচনা।

পত্র।

শ্রীচরণেষু,

আমাদের স্নেহের ভগিনী কুসুমের লিখিত একটী রচনা আপনার নিকট পাঠাইতেছি। মৃত্যুর ৫ মাস পূর্ব্বে ইহা সে লিখিয়াছিল তাহার স্বর্গারোহণের পর তাহার খাতা পত্র গুলি খুঁজিতে খুঁজিতে এটী বাহির হইয়া পড়ে। আমি তাহার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ অতি যত্নে রাখিয়া দিয়াছিলাম। আপনা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া আজ তাহা মহিলায় প্রকাশের জন্য পাঠাইতেছি। বয়সে কনিষ্ঠা হইয়াও ধর্ম্মে সে আমাদের জ্যেষ্ঠা ছিল। তাহার সুমধুর স্বভাব ও সরলতার জন্য সে সকলের প্রিয়া ছিল। আপনাদের ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রীবর্গ আজ অবধি তাহার সুমধুর ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেন।

তাহার স্বহস্ত লিখিত রচনা পাঠাই-

নাম কার্য্যশেষ হইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক পাঠাইয়া দিবেন।

আমার প্রণাম জানিবেন। ইতি

১নং বারষ্ট্রীট, রেঙ্গুন। } স্নেহের,
১৫ই জানুয়ারী,১৯০৭। } শ্রীমতী পু—

জীবন কুসুম।

ভাই

পদ্মতো কত পঙ্কিল ও দুর্গন্ধ পূর্ণ পুষ্করিণীতে প্রস্ফুটিত হয় তাই বলে তো কেউ কখন তাহাকে ঘৃণা করে না, বরং যখন তাহা সেই পঙ্কিলে প্রস্ফুটিত হইয়া তাহার শোভা বর্দ্ধন করে, তখন কত ব্যক্তির এমন কি কত সাধুদিগের লোভ হইয়া থাকে। পদ্ম ঐ রকম ঘৃণিত স্থানে জন্মিয়াও কত দেব দেবীর চরণে অর্পিত হয়। এস ভাই, আজ আমরা পদ্মের বিষয় চিন্তা করি ও তাহার ন্যায় প্রস্ফুটিত হইয়া জগৎ পিতার গুণকীর্ত্তন করি।

আজ কি আমরা পঙ্কিল পূর্ণ অর্থাৎ পাপময় সংসারে জন্মি নাই? পাপময় সংসারে আছি বলিয়া কি পাপেতে লিপ্ত হইয়া থাকিব? না ভাই এস আজ আমরা পদ্মের ন্যায় প্রস্ফুটিত হইতে চেষ্টা করি। লোকে সংসারকে ঘৃণা করে তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু যখন এই পদ্মের ন্যায় এই সংসার পঙ্কিলে প্রস্ফুটিত হইব, দেখিবে কত জন আমাদিগের প্রতি লোভ করিবে ও প্রশংসা করিবে।

ভাই, লোভ ও প্রশংসা করিলে এই অহঙ্কারে একেবারে উন্মত্ত হইয়া যাইও না। লোকের নিকট হইতে প্রশংসা পাইবে, ভাই, ইহা ভাবিয়া কখন প্রস্ফুটিত হইও না। কিন্তু সেই দেবাদিদেব মহাদেব তোমাদিগকে কত প্রশংসা করিবেন তাহাই চিন্তা কর, দেখিবে তোমার প্রাণ আজ আনন্দে নৃত্য করিতে থাকিবে। ভাই, পদ্ম তো কত দেবদেবীর চরণে অর্পিত হয়, সেই মঙ্গলময় বিধাতা কি আমাদিগকে পদ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ করিয়া সৃজন করেন নাই! এস ভাই তবে আর ম্লান হইয়া থাকিও না, আমরাও যাহাতে সেই পদ্মের ন্যায় এক মঙ্গলময় দেবতার চরণে অর্পিত হইতে পারি, তাহার জন্য যত্নবতী হই।

ভাই পদ্ম তো পঙ্কিলে এবং কত সময় কত গুপ্ত স্থানে আপনাআপনি প্রস্ফুটিত হইয়া আপনা আপনি শুকাইয়া যায়, সেত কখন কাহার নিকট আদর ও প্রশংসা পাইবে ইহা ভাবিয়া প্রস্ফুটিত হয় না। তবে কেন এস না, ভাই, আজ আমরাও ঐ পদ্মের ন্যায় ঈশ্বরের নিকট প্রস্ফুটিত হইয়া তাঁহারই চরণতলে শুকাইয়া যাই। ভাই, লোকে আমাদিগকে গ্রাহ্য করে আদর ও প্রশংসা করিল না বলিয়া মনে কোন প্রকার ক্ষোভ করিও না, ভাই, পার্থিব আদর ও প্রশংসা অপেক্ষা কি স্বর্গীয় আদর ও প্রশংসা শ্রেষ্ঠ নয়? তবে এস, ভাই, আজ আমরা পদ্মের ন্যায় পঙ্কিল ও গুপ্ত স্থানে প্রস্ফুটিত হইয়াও সেই মঙ্গলময় পিতার সুকন্যা হইয়া তাঁহার চরণতলে গিয়া স্বর্গীয় আদর ও প্রশংসার অধিকারিণী হই।

শিশুহারা।

কোথা তুই গেছিশ চলিয়া ?
কাহারে না বলে কয়ে,
পাষাণে বাঁধিয়া হিয়ে,
কেমনে গেলিরে ফাঁকি দিয়া।
মহানন্দা নদী তীরে,
বিজন কানন ক্রোড়ে,
অযতনে ধূলায় লুটিয়া।
খেলা ধূলা সব ফেলি,
মা বাপ সবারে ভুলি,
আজ কিরে রয়েছ ঘুমিয়া ?
কত দিন গেল চলে
আজো কি রয়েছ ভুলে,
তোর সেই প্রিয় ভাই বোন।
সাধের দোলনা তোর,
খেলনা সাজান ঘর,
তাকি ভাল লাগেনা এখন ?
সেই ঘন বন সুশীতল,
সেই শূন্য নদী কূল
এত কি লেগেছে ভাল
শ্যামল সে তরু ছায়াতল।
কে কোথা আপন মাকে,
এমনে ভুলিয়া থাকে
এত দীর্ঘ দিবস ধরিয়া !
ডাকিলে দেয়না সাড়া
এমন পাষাণে গড়া
হয় নাকি অত ক্ষুদ্র হিয়া !
তোর বাবা এখন ভুলিয়া,
উঠিলে সাঁঝের তারা,
ডেকে ডেকে হয় সারা
তোরে নিয়ে খেলিবে বলিয়া।
ঘরেতে জ্বালায়ে বাতি,
কাঁদিয়া কাটায় রাতি
তোর শূন্য শিথানে বসিয়া।
আসিলে আঁধার নিশা,
যেন হারা হয় দিশা
ভাবি মোরা এ আঁধারে হায়,
তরাশ পাইয়া উঠে
আবার আসিবে ছুটে
ঝড়ে জলে থাকিবি কোথায় !
এ তো দারুণ শীতে,
এই রে হিমানী বাতে
অনাবৃত ধরণী শয্যায়,
ভেবেছিনু তুই রেতে,
পারিবি না কোন মতে
পুনঃ চলে আসিবি হেথায়।
সে শুধা কল্পনা ঘরে,
আগুন দিয়াছে কেরে
ভাঙ্গিয়াছে সে মধু স্বপন।
বরষ হইল পার,
তুই তো এলিনা আর
গে'ছে শীত বরষা কখন।
আবার বসন্ত এল,
হাঁসিল লতিকাকুল
পিক বধূ গাহিল মধুরে,
সকলি আসিবে যাবে
তুই শুধু এই ভবে
আসিবি না আর কভু তবে।
আয় খোকা ঘরে আয়
মোর বুকে মাথা থুয়ে,
আয় রে ঘুমাবি শুয়ে
আর তুই যাস্‌নে কোথায়।

কি তোর বেদনা আছে,
কবি তা আমার কাছে
আঁচলে মুছিয়া দিব তার।
না না পারিব না তারে,
আমি যে পাষাণী ওরে
হৃদয় যে পাষাণ আমার।
তাই রে সারাটি নিশি,
তোর সে শিথানে বসি
সে যাতনা দেখিনু তোমার।
সে ঘোর তৃষায় তোরে,
তাই না পারিনু যেরে
জল দিতে হায়! একরতি!
সে তীব্র যাতনা ওরে,
এক নিমেষের তরে
ঘুচাইতে হোল না শকতি।
সেই রাঙ্গা চাঁদ মুখে,
দিল যে কালিমা মেখে
মরণ আসিয়া পলকে রে।
আমি'ত পাষাণী হয়ে
সকলি দেখিনু চেয়ে
নিয়ে গেল সোণার ছবিরে।
দুহাতে বুকেরে চাপি,
নীরবে মুদিয়া আঁখি
বিভু কাছে চাহিলাম বল।
দেখিলাম সবি হায়,
সুধুনা দেখিনু তায়,
সে আত্মা কেমনে চলে গেল!
সকলি তো যাব ভুলে,
শুধু তোর কোন কালে
সে করুণ ব্যাকুল চাহনি,
সে জ্বালা পীড়িত মুখ
ছাইয়া রহিবে বুক
ভুলিতে তা নারিব কখনি।
মিছা মোরা ডাকি যে তোমারে
তুই এ জগৎ পরে
নাই আসিবিনা তর
তুমি যে গিয়াছ স্বর্গপুরে।
এ মহা পাপের ধরা
দারুণ আঁধারে ভরা
আর তুই আসিস না হেথা,
ক্ষুদ্র শিশু দেখি তোরে
কত না যতন করে
কোলে তুলে লবেন বিধাতা।
আবেগ রচয়িত্রী।

বারেক দেখাও।

"মুক্ত কর দ্বার প্রভু
এসেছি দুয়ারে
দয়া করে একবার
দাও পশিবারে।
পশেনাক সেই স্থানে
জন কোলাহল,
অনন্ত, বসন্ত যথা
জাগে অবিরল।
মরম বেদনা প্রাণে,
নাহিক মানব।
সেথা সবি হাস্যোজ্জ্বল
সবি অভিনব।
রাশি রাশি পারিজাত
শোভিছে তথায়।
মধুর সঙ্গীত ধ্বনি
পরাণ মাতায়
শোক তাপ জরা মৃত্যু
নাহিক তথায়।

যথায় তোমার পাশে
শিশু ছেলে মেয়ে।
হাঁসিছে খেলিছে প্রভু
গান গেয়ে, গেয়ে।
সেই সে পবিত্র স্থানে
শুধু দুঃখিনীরে।
একবার দয়াময়
দাও পশিবারে।
সে বাঞ্ছিত নিধি দুটি
ধরিয়া হৃদয়ে।
থাকিতে আমারে দাও
বিভোর হইয়ে।

সংবাদ।

বিগত ২৯শে ডিসেম্বর তারিখ বেথুন কলেজ গৃহে মহিলাদিগের এক মহাসভা হইয়াছিল। সেই সভায় দুই শত মহিলা সমবেত হইয়াছিলেন। ১৪।১৫ জন রাণী উপস্থিত ছিলেন, বরদা রাজ্যের মহারাণী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইংরাজী বাঙ্গলা ইত্যাদি ভাষায় ১৩। ১৪ জন মহিলা কর্ত্তৃক নানা বিষয়ে রচিত বক্তৃতা পাঠ হইয়াছিল। বরদা মহারাণীর বক্তৃতা অতিশয় সারগর্ভ ও হৃদয় গ্রাহিণী হইয়াছে। আমরা আগামীতে সেই বক্তৃতার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিতে যত্ন করিব।

একজন ইয়ুরোপীয় পরিব্রাজক মহা নগরী কলিকাতায় উপনীত হইয়া রাজপথে পুরুষের মহা ভিড় দেখেন, স্ত্রীলোক দেখিতে না পাইয়া বলিয়াছিলেন এই কি রাজ্যে উপস্থিত হইলাম, স্ত্রীলোক নাই? বর্ম্মাতে তাহার বিপরীত দৃশ্য। সে দেশের হাট বাজারে যাইয়া দেখ একশত জনের মধ্যে নব্বই জনই স্ত্রীলোক। দোকানদারী কেনা বেচা ইত্যাদি সমুদায় কাজ স্ত্রীলোকে করিয়া থাকে, পুরুষ বড় দেখিতে পাওয়া যায় না।

বর্ম্মাতে দুর্গন্ধ পচা মৎস্যে এক প্রকার খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত হয়। তাহার নাম নপ্পি। বর্ম্মার রমণীগণের উহা প্রিয় খাদ্য। এই নপ্পি খাইয়া তাহাদের বুদ্ধি যেন বেশ খুলিয়া যায়। সেই নপ্পি একটু শুঁকিলে আমাদের অন্ন প্রাসনের অন্ন পর্য্যন্ত বাহির হইয়া পড়ে। বর্ম্মার রমণীগণ বিশেষ বিশেষ শিল্পকার্য্যে যেরূপ আশ্চর্য্য-দক্ষতা প্রকাশ করে, য়ুরোপীয় শিল্প নিপুণা মহিলাগণ সেই কার্য্যে তাহাদের প্রতিযোগিতা করিয়া উঠিতে পারে না।

ভূপালের বেগম স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তথাকার বালিকাবিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ করিয়াছেন এবং তাঁহার রাজ্যে বহুল পরিমাণে যাহাতে বালিকাদের শিক্ষা বিস্তার হয় তৎপক্ষে নানাবিধ বিশেষ উপায় বিধান করিতেছেন। প্রতি গৃহস্থকে শিক্ষার উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করাইয়া তাহাদের সন্তানগণের যাহাতে উত্তম শিক্ষা দানে মতি জন্মে তৎপক্ষে চেষ্টিত আছেন।

আফগানিস্থানের আমিরও মেয়েদের শিক্ষাকল্পে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। এইরূপ মুসলমানদের মধ্যে যখন বড় বড় লোকেরা মেয়েদের শিক্ষা বিস্তা-

রের প্রয়াসী হইয়াছেন তখন অচিরে মুসলমান সমাজ মধ্যে উন্নতির পথ খুলিয়া যাইবে আশা করা যায়।

বিগত ৬ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকার সময় শ্রদ্ধেয় কালীচরণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তিনি একজন ভক্ত বিশ্বাসী খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি ছিলেন। এদেশের সর্ব্ববিধ উন্নতির বিষয় তিনি অক্লান্ত ভাবে যত্ন করিয়াছেন। ভিক্টোরিয়া কলেজের মেয়েদের শিক্ষাসম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি এবং যত্ন ছিল। তিনি সময়ে সময়ে উপদেশ দ্বারা মেয়েদিগকে উচ্চ শিক্ষা দানে সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহার অভাবে আমরা একজন নারীহিতৈষী বন্ধু হারাইলাম। আমাদের আচার্য্যদেব কেশবচন্দ্র সহ তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল।

মিসেস বুথ টকার ভারত হইতে বিদায়কালীন বক্তৃতাতে প্রকাশ করিয়াছেন যে মুক্তিফৌজের প্রধান উদ্দেশ্যই ঈশ্বরসহ মনুষ্যের সম্বন্ধ জন্মান। প্রতি মেয়ে এরূপ দৃষ্টান্তানুসরণ করিয়া আপন আপন সন্তান সন্ততি ও আত্মীয়বর্গকে ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত করিতে প্রয়াসী হইলে প্রতি পরিবারে শান্তি বিরাজ করিতে পারে।

এবৎসরও বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট বৃত্তিদান করিয়া কয়েকটী মেয়েকে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্যে শিক্ষার্থ বিলাত প্রেরণের উদ্যোগী হইয়াছেন। সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরা এরূপ কার্য্যে ব্রতী হইয়া যাহাতে আপনং চরিত্র এবং গুণপনা দ্বারা দেশের স্ত্রীজাতির শিক্ষা এবং চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করিতে পারেন তৎপক্ষে উদ্যোগী হওয়া উচিত। দিন দিন যাহাতে আমাদের দেশের মহিলাদের জ্ঞান এবং চরিত্রের আদর্শ উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে পারে তৎপক্ষে এরূপ উদ্যোগ একটী সুপন্থা আমরা গবর্ণমেণ্টকে এজন্য ধন্যবাদ দিতেছি।

মেঃ বিলিং বেহার অঞ্চলের ইনস্পেক্টর বাঁকিপুর উচ্চশ্রেণীর নারীবিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিচালনা সম্পূর্ণরূপে মেয়ে শিক্ষক দ্বারা করাইতে দৃঢ়ব্রত হইয়াছেন। বস্তুতঃ নারীবিদ্যালয়গুলিতে শুদ্ধ শিক্ষয়িত্রী দ্বারাই পরিচালিত হওয়া সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ। কিন্তু দেশের অবস্থার প্রতি বিলিঙ সাহেবের দৃষ্টি রাখা চাই। আমাদের দেশের মেয়েরা এখনও স্বাধীন ভাবে চলিতে শিখেন নাই, বিশেষতঃ দেশের লোকের এখনও স্ত্রীজাতির উপর সেরূপ সম্মান জ্ঞান হয় নাই যেরূপ ইউরোপ এবং আমেরিকাতে হইয়াছে। আমরা আশা করি এমত স্থলে স্কুলের মধ্যে এক জন প্রাচীন লোক সস্ত্রীক শিক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া স্কুলের বোর্ডিং প্রভৃতির তত্ত্বাবধান কার্য্যে আরও দুই এক বৎসর থাকিলে ভাল হয়।

ভ্রম সংশোধন।

গত পৌষমাসের মহিলায় সংবাদস্তম্ভে দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফে একটি বড় ভুল হইয়াছে, "বরদার মহারাণীস্থলে" "ভারতের মহারাণী" লিখিত হইয়াছে।

প্রেরিত পত্র।

ঢাকা বালিকাশ্রমের (Dacca Rescue Home) মাতৃস্থানীয়া সেবিকা সাধ্বী নগেন্দ্রবালা মল্লিক তাঁহার প্রিয়তম পতি ও পাঁচটি অল্পবয়স্ক সন্তান সন্ততি রাখিয়া বিগত ১লা ফেব্রুয়ারি শুক্রবার রাত্রি ৯॥০ টার সময় দেহত্যাগ পূর্ব্বক অমর লোকে শান্তিদায়িনী জননীর ক্রোড়ে স্থান লাভ করিয়াছেন। তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ বিনাড়ম্বরে অতি গম্ভীর ভাবে ১০ ফেব্রুয়ারি প্রাতে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ঢাকাস্থ নববিধান মণ্ডলীর সমুদায় বিশ্বাসিগণ ও অন্যান্য কেহ কেহ শ্রাদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন, তদুপ লক্ষে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা কুমারী হরিপ্রভা মল্লিক যে সংক্ষিপ্ত মাতৃজীবন বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে প্রকাশ করা গেল।

সর্ব্বমঙ্গলকারিণী মা, তুমি আমাদের মা দিয়াছিলে। তুমি তোমার ইচ্ছাতে আজ দশ দিন হইল তাঁহাকে তোমার কোলে স্থান দিয়াছ। আজ আমরা তাঁহাকে হারাইয়া হাবুডুবু খাইতেছি, তবু তিনি যে তোমার কোলে চিরশান্তিতে রহিয়াছেন ইহা মনে রাখিয়া শান্তভাবে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে পারি তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর। তুমি যে একটি ক্ষুদ্র জীবনেও তোমার কি মহিমা প্রকাশ কর ও কত কার্য্য করাও তাহা ইহার জীবনে যথেষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এখন আমরা আমাদের ক্ষুদ্র মনে তাঁহার জীবন সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিতে পারি তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর। আমার কোনও সাধ্য নাই। তোমার কাছে প্রার্থনা করি তুমি জয়যুক্ত হও।

ঢাকা জেলার অন্তর্গত সানড়া গ্রামের সম্ভ্রান্ত গোস্বামী পরিবারে মা জন্মগ্রহণ করেন। ঠাকুর কবীন্দ্র গোস্বামী এই বংশের আদি পুরুষ। ইনি শ্রীচৈতন্য দেবের সমকালীন ভক্তদিগের মধ্যে একজন প্রধান ভক্ত ছিলেন। পূর্ব্ব বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারের জন্য ইনি প্রেরিত হন।

এই বংশে পূর্ব্বোক্ত সানড়া গ্রামে শ্রীযুক্ত গোপিকা মোহন গোস্বামী জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অত্যন্ত উদার প্রকৃতি ও দয়ালুহৃদয় ছিলেন। তিনি যদিও বৈষ্ণব-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তবুও প্রকৃত পক্ষে একেশ্বরবাদী ছিলেন। ঈশ্বর এক অদ্বিতীয় ও মহাপুরুষগণ তাঁহার প্রেরিত ভক্ত তিনি এই বিশ্বাস করিতেন, এবং সাধু মহাজনদিগকে অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। ঈশাচরিত্র অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিতেন। আমার পিতা ব্রাহ্ম ধর্ম্ম অবলম্বন করার পর তিনি অনেক সময়ে পিতার সহিত ঐশ্বরিক আলোচনা ও সৎপ্রসঙ্গাদিতে অত্যন্ত সুখ অনুভব করিতেন। একবার যখন তিনি গুরুতর পীড়ায় মরণাপন্ন হইয়াছিলেন, আমার পিতৃদেব ও মাকে লইয়া গিয়া অনেক সময়ে তাঁহাদের মুখে ভগবানের নাম গান শুনিতেন এবং মৃত্যুকালে পিতা ও মাতার সহবাসে থাকিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন।

তাঁহার দয়াও অতি আশ্চর্য্য। স্নান করিতে গিয়া কোন দীন দুঃখী দেখিলে

পরিধেয় বস্ত্রখানি তাঁহাকে দিয়া গামছা-খানি পরিধান করিয়া বাড়ী আসিতেন। একবার শীতকালে এক দরিদ্র ব্যক্তি অত্যন্ত শীতার্ত্ত হইয়া তাঁহার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া একখানি বস্ত্র চাহিলে তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রখানি দিয়া লেপের নীচে রহিলেন। এইরূপ কত সময়ে তাঁহার কত দয়া প্রকাশ পাইয়াছে। অন্যেরদুঃখ দেখিয়া কখনও তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না। মা ইহার জ্যেষ্ঠা কন্যা। মার বয়স যখন পাঁচ বৎসর তখন মা নিজ গ্রাম হইতে পিতা মাতা সকলকে ছাড়িয়া পিতৃ-স্বসার নিকট কলিকাতার নিকটবর্ত্তী এড়িয়াদহ নামক স্থানে গমন করেন এবং বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পিসীমার কাছে থাকিতেন। তাঁহাকে পিসীমা স্বীয় কন্যার ন্যায় ভাল বাসিতেন ও পালন করিতেন। মার সম্পর্কিত আর এক পিসীমার নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। স্ত্রীলোকের চাল চলন হাব ভাব কিরূপ হওয়া উচিত তৎপ্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি প্রায়ই বলিতেন "পুড়বে মেয়ে উড়বে ছাই তবে মেয়ের গুণ নাই।" মাও তাঁহার এই কথা শিক্ষা করিয়াছিলেন। আশ্রমের মেয়েদের তিনি কত সতর্কতার সহিত পালন করিতেন। কোনরূপ সৌখনীতা ও বাবুয়ানা করিয়া কোন ভাব ভঙ্গিতে নিজের ও তৎসঙ্গে অন্যের মন কলুষিত না হয়, তজ্জন্য বিশেষ সাবধানতা লইতেন সময় সময় শাসন করিতেন। সে জন্য লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন। হতভাগিনী নির্ব্বোধ আমরা ও তাঁহার সদুদ্দেশ্য না বুঝিয়া বিরক্ত হইয়াছি। হায়! আর কে সেই ভাবে দেখিবে।

এড়িয়াদহের স্কুলে মা লেখা পড়া শিক্ষা করেন এবং ১ম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। উচ্চপ্রাইমেরী পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়াছিলেন। ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে ১২৯০ সনে বৈশাখ মাসে মার বিবাহ হয়, মার বিবাহ ঘটনাও অতি আশ্চর্য্যজনক। বিবাহের পূর্ব্বে বাবা ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত করিতেন। এক দিন রবিবারে বাবা উপাসনায় রহিয়াছেন, এমন সময় হঠাৎ এক জন মোক্তার বাবার কাছে আসিয়া বলিলেন যে, একজন ভদ্রলোক আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। বাবা আসিলে উক্ত ভদ্রলোক স্বীয় পরিচয় না দিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু বিবাহ না হয় তদুদ্দেশ্যে বাবা কেবল নিজের নানারূপ প্রতিকূল অবস্থা জানাইলেন। তথাপিও প্রস্তাবকারী অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে বাবাকে বলিলেন, তোমার অবস্থা শুনিয়া যদি কর্ম্মকর্ত্তার মত হয় তবে তুমি অমত করিও না। তিনি এই বলিয়া চলিয়া গেলে পর বাবা ভাবিলেন আমার চাকরীর জন্য ইহারা বিবাহের এত পীড়াপীড়ি করিতেছেন। চাকরী ছাড়িলে আর এরূপ করিবেন না। এই সময় বাবা ৭০৲ টাকা বেতনে কোর্ট সব্ ইনেস্পেক্টর ছিলেন। বাবা ইহা ভাবিয়া চাকরী ছাড়িবার জন্য দরখাস্ত করিলেন। সাহেব ছাড়িতে দিলেন না। এমন সময়ে দাদা মহাশয় বাবাকে সাতদিনের ছুটী লইয়া কলিকাতায় যাইতে লিখিলেন। বিবাহের দিন ঠিক করিয়া

কলিকাতায় বিবাহ হইবে নির্দ্ধারিত হইল। কিন্তু বাবা ছুটী লইতে সম্মত হইলেন না; বলিলেন, যদি ঢাকা আসিয়া বিবাহ দেন তবে হইবে। কিন্তু এত অল্প দিনের মধ্যে আসা অসম্ভব সুতরাং তাঁহারা আপত্তি করিলেন। বাবা বলিলেন তাহা হইলে বিবাহ হইবে না, দাদা মহাশয় তাড়াতাড়ি মাকে লইয়া ঢাকায় আসিলেন। বাবা তখন ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছিলেন বলিয়া হিন্দুমতে বিবাহ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। কিন্তু এই বিবাহ ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়া আর আপত্তি করিলেন না, ঈশ্বরেচ্ছায় বিবাহ এমন ভাবে হইল যে তাহাতে বিশেষ আপত্তিজনক কোন অনুষ্ঠান হয় নাই। পুরোহিত এখানে ছিল না। ঘটনাচক্রে একজন পুরোহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনাবৃত স্থানে বিবাহ সভা হইয়াছিল। বৃষ্টি হওয়ায় তাড়াতাড়ী কোন রকমে সম্প্রদান কার্য্য শেষ করিয়া বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পর মা কলিকাতায় গেলেন ইতি মধ্যে বাবা ঢাকা হইতে মুন্সীগঞ্জে বদলী হইলেন। কয়েক মাস পরে মা মুন্সিগঞ্জে আসেন। এখানে মা ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দিতে আরম্ভ করেন। কিছুদিন পরে ঢাকায় নববিধান সমাজের মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে মাকে লইয়া উৎসবে যোগদান করেন।

অনন্তর বাবা আবার ঢাকায় বদলী হইয়া আসেন। এখানে আসিয়া নিয়মিত রূপে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিতেন। মা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে তাঁহার অনুগামিনী হন। এই সময় বাবার চাকরী ছাড়িতে ইচ্ছা হয়, এবং প্রায়ই বলিতেন আমার আর এই কার্য্য করিতে ইচ্ছা হয় না। তদুত্তরে মা একদিন বলিলেন "তুমি চাকরী ছাড়িবে বল কিন্তু ছাড় নাত।"

এই কথা শুনিয়া বাবা অত্যন্ত উৎসাহন্বিত হইয়া বলিলেন চাকরী ছাড়িলে বড় কষ্ট পাইতে হইবে তাহা বহন করিতে পারিবে কি? মা আনন্দের সহিত সম্মত হইলেন। এই সময়ে মা পঞ্চদশ বয়স্কা বালিকা ছিলেন। কার্য্য ছাড়িবার পর মা কত দুঃখ কষ্টে পড়িয়াছেন, কিন্তু চাকরী ছাড়াতে কখনও কষ্ট বোধ করেন নাই।

ইহার প্রায় এক বৎসর পরে মা দীক্ষিত হইলেন। এই সময়ে মা তদানীন্তন বিধানপল্লীতে ব্রাহ্ম পরিবারের সহিত একত্র বাস করেন। ভক্তিভাজন উপাচার্য্য মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী ইন্দুমতী, স্বর্গগত ভক্তিভাজন গোপীকৃষ্ণ সেন মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী ক্ষীরোদাসুন্দরী প্রভৃতি মার তৎকালীন সঙ্গিনী ছিলেন। ইহাঁরা সকলে একত্র অত্যন্ত আগ্রহের সহিত উপাসনাদি করিতেন।

দীক্ষিত হইবার পর বাবা যখন নিরামিষ আহার করিতেন, মাও তাঁহার সহিত ৫। ৬ বৎসর নিরামিষ ভোজনে সন্তুষ্ট থাকিতেন। আমার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী জন্মগ্রহণ করার পর মা মরণাপন্ন হওয়াতে আবার আমিষ ভোজন করিতে বাধ্য হন।

এই সময়ে প্রচারকগণ মধ্যাহ্নে একত্র আহার করিতেন। স্বর্গগত প্রচারক শ্রদ্ধেয় অন্নদাপ্রসন্ন সেন মহাশয় অন্ন ভিক্ষা করিতেন ও আমার পিতৃদেবও সময় সময় তাঁহার ঐ কার্য্যের সহায়তা করিতেন। মা

স্বহস্তে অনেক দিন পর্য্যন্ত প্রচারক বর্গকে রন্ধন করিয়া আহার করাইতেন।

নীমতলীতে যখন বিধান পল্লী উঠিয়া আসে তখন বাবা কিছু অন্যের সাহায্যে কিছু ঋণ করিয়া এক খানি বাড়ী তৈয়ার করিলেন। মা ঋণ করা অত্যন্ত কষ্টকর মনে করিয়া যে যৎসামান্য স্বর্ণ অলঙ্কার ছিল তাহা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করিলেন। এইরূপে প্রচারক পরিবারের সঙ্গে মিশিয়া দয়াময় পরমেশ্বরের অপার করুণা সম্ভোগ করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে হইতে একাদশ বর্ষ কাটাইলেন।

১৮৯৬ সনের জুন মাসে নারায়ণগঞ্জের ডাক্তার বাবু অভয়চরণ দাস তথাকার একটী অসহায়া বালিকাকে দুরবস্থায় পাইয়া ঢাকায় পাঠাইয়া দেন। কিন্তু অন্যত্র তাহার স্থান না হওয়ায় বাবা তাহাকে আশ্রয় দেন। মাও তাহাকে যত্নের সহিত গ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে পুলিসের লোক আর একটী বালিকা লইয়া আসে। সে সময়ে বাবা বাড়ীতে ছিলেন না এবং ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিতেন না। মা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত তাহাকে আশ্রয় দিলেন। পরে বাবা আর একটী কন্যাকে রাত্রি ১০।১১ টার সময় উদ্ধার করিয়া লইয়া আসেন। মা তাহাকে আদরের সহিত গ্রহণ করিলেন এবং নিজের বিছানায় রাখিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে দুই তিনটী বালিকা দ্বারা উদ্ধারাশ্রমের সূত্রপাত হইল। ক্রমশঃ আরও বালিকা আসিতে লাগিল। একটী ছয় বৎসরের বালিকাকে তাহার মা সৎ ভাবে পালন করিবার জন্য এই ক্ষুদ্র আশ্রমে দেয়।

মা বালিকাটীকে কোলের শিশুকে রাখিয়া কোলে করিয়া সান্ত্বনা দিতেন এবং রাত্রিকালে তাহার জন্য কত কষ্ট পাইয়াছেন। আর এক সময়ে একটি ৯ দিনের শিশু আশ্রমে আসে। তাহাকে মা ছোট কোলের শিশুকে রাখিয়া স্তন্যদান করিতেন। একবার শিশুটীর রক্ত আমাশয় হইয়াছিল, মা তখন অত্যন্ত অস্থির হইয়া তাহার শুশ্রূষা করিতেন। আর একবার শিশুটীর সর্ব্ব শরীরে গলিত ক্ষত হইয়াছিল। মা স্বহস্তে অত্যন্ত যত্নের সহিত সেবা শুশ্রূষা করিয়া তাহাকে আরোগ্য করেন। আর একটী বালিকার এখানে আসিয়াই কলেরা হয়, মা তখন পূর্ণ গর্ভাবস্থায় ছিলেন। তথাপিও সাহস করিয়া তাহার সেবা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ডাক্তার মহাশয় মার অবস্থা দেখিয়া সতর্ক করিলেন। কিন্তু মা অকাতরে সেবা করিতে লাগিলেন। আশ্রমের আর একটী কন্যা গর্ভাবস্থায় এখানে ছিল। তাহার প্রসব বেদনা হইবার পর মা সমস্ত রাত্রি দিন অতি যত্নের সহিত তাহার সেবা করেন। এইরূপে একদিকে নিজের অপোগণ্ড শিশু সন্তান আবার নানা শ্রেণীর নানা বয়সের এবং নানা রূপ প্রকৃতির বালিকা ও স্ত্রীলোককে লইয়া দশ বৎসরের অধিক কাল কত কষ্ট ও উদ্বেগ সত্ত্বেও তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছেন। কখনও সদ্য প্রসূত শিশু কখনও বালিকা কখন বয়স্কা এমন কি পতিতা স্ত্রীলোকদের লইয়া স্নেহ ও যত্ন সহকারে পালন করিয়াছেন। এইরূপে ৫০টী বালিকাকে পালন করেন। যদি কখনও কোন বালিকা দুরবস্থায় কিংবা অভিভাবকহীন হইয়া রহিয়াছে শুনিতে পাইতেন অমনি ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন এবং অনেক সময়ে নিজে গিয়া লইয়া আসিতে প্রস্তুত হইতেন। সময় সময় উৎসবাদি উপলক্ষে বালিকাগণের নিমন্ত্রণ না হইলে আমাদেরও আহারাদিতে যোগ দিতে দিতেন না। বালিকাগণ নিমন্ত্রিত হইলেও স্বতন্ত্র ভাবে বসিবার বন্দোবস্ত হইত বলিয়া মা নিজে বালিকাদের সঙ্গে একত্র আহার করিতেন।

ক্রমশঃ

ভিক্টোরিয়ামহিলাবিদ্যালয়।

সাধু ফ্রান্সলিন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এক দিন সমবয়স্ক লোকদিগের সহিত হাসি, ঠাট্টা, গল্প করিতে করিতে হঠাৎ তাঁহার মনটা বড়ই খারাপ হইয়া যায়। তিনি আর তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তা না বলিয়া নীরবে চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন। তাহাতে তাঁহার বন্ধুরা তাঁহাকে নানারূপ ঠাট্টা করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার হঠাৎ এইরূপ ভাবান্তরের কারণ বুঝিতে না পারিয়া সকলেই তাঁহাকে নানা কথা বলিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলিলেন, ফ্রান্স লিনের বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইয়াছে, তাই ওরূপ গম্ভীর হইয়াছেন। ফ্রান্সলিন এই কথা বলিলেন—আমি বিবাহ করিলে কি যে সে লোককে বিবাহ করিব, আমি খুব ধনী, মানী, ঐশ্বর্য্যশালী দেখিয়া বিবাহ করিব। তাঁহার এই কথার মধ্যে গুহ্য ভাব ছিল। তিনি কাহাকে বিবাহ করেছিলেন?—দরিদ্রতাকে তিনি সহকারিণী করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন—আমার মধ্যে কিছুই থাকিবে না। আমার বলিতে আমি সংসারে কিছুই রাখিব না। কাপড়, চোপড়, বিলাসিতা, সাজসজ্জা ইত্যাদি হইতে আমি দূরে দূরে থাকিব। তিনি তাই দরিদ্রতাকে বিবাহ করেছিলেন। সেই হইতে তিনি আর কোনরূপ ভোগ-বিলাসিতা করিতেন না, অতি সামান্য ভাবে থাকিতেন।

তিনি যে আশ্রম কোরেছিলেন, তাহার এই একটি বিশেষ নিয়ম ছিল যে কেহ বসিয়া থাকিতে পারিত না। সকলেই খাটিয়া খাইত, না খাটিলে তাঁহার কাছে কেহ থাকিতে পারিত না। তিনি অলসতার প্রশ্রয় দিতেন না। তিনি নিজেও খাটিতেন এবং অন্যান্য সঙ্গীরাও খাটিতেন।

তিনি প্রকৃতির শোভা দেখিতে বড়ই ভাল বাসিতেন। এক এক সময়ে তিনি প্রকৃতির শোভা দেখিতে দেখিতে মোহিত হইয়া যাইতেন। তিনি প্রকৃতির শোভা দেখিয়া তাঁহার সঙ্গীদের বলিতেন—দেখ, কি সুন্দর, প্রকৃতির শোভা, বড় চমৎকার। এই প্রকৃতির শোভার মধ্যে প্রভু পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষভাবে দেখা যাইতেছে। তাঁহার এই কথায় তাঁহার সঙ্গীরা পরস্পর বলাবলি করিত, প্রকৃতির শোভা আর সুন্দর কি? কই আমরা ত ইহার মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিতে পাই না; প্রকৃতির শোভা তো আমাদের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারে না। যদি ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে হয় তো ধর্ম্মালয়ে করিতে হয় ধর্ম্মালয় ভিন্ন সাধন ভজন হয় না, তাহাদের এইরূপ বিশ্বাস। তাঁহারা বলিতেন ধর্ম্মালয়ে অথবা নির্জ্জনে সাধন করিলেই ঈশ্বরকে লাভ করা যায়। প্রকৃতির শোভা দেখিয়া মোহিত হইয়া, প্রকৃতির শোভার মধ্যে ঈশ্বরের মহিমা উপলব্ধি করা যায়, তাহা সকলে বুঝিতে সক্ষম হন্ না। সাধু ফ্রান্সলিন যখন প্রকৃতির শোভায় তন্ময় হইতেন, তিনি যখন প্রকৃতির বর্ণনা করিতেন, তখন তাঁহাকে ঠিক যীশু খ্রীষ্টের ন্যায় দেখাইত।

সাধু ফ্রান্সলিন এক দিন ধর্ম্ম মন্দিরে প্রার্থনা করিতে গিয়া, তাঁহার জীবনে ঘোর পরিবর্ত্তন দেখা গেল। তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। প্রার্থনায় এইরূপ বলিলেন,—হে ঈশ্বর, আমার জীবনে তোমার ভাব বুঝায়ে দাও। আমার জীবনের সমস্ত ভার তোমাকে দিলাম তুমিই আমার জীবনের সমস্ত ভার লও; আর তোমার উদ্দেশ্য কি, তাহা আমাকে ভাল করিয়া বুঝায়ে দাও। আমার জীবন তোমার কাজে যাহাতে নিযুক্ত করিতে পারি তুমি আমাকে সেইরূপ উন্নত কর। প্রভু তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

এইরূপ প্রার্থনা করিবার পর, সাধু ফ্রান্সলিন যেন বুঝিতে পারিলেন, যে যীশু তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিতেছেন—হে আমার প্রিয় সন্তান, তুমি যেরূপ ইচ্ছা কর তাহাই হউক, তুমি যাহা চাও তাহা পাইলে। আমি তোমার অভাব পূর্ণ করিলাম। দুঃখ, ক্লেশ তোমার কিছুই থাকিবে না। সেই হইতে তাঁহার জীবনের সমস্ত মালিন্য দূর হইয়াছিল। এই ভাবটী যদি আমরা ভেবে দেখি, তবে কি দেখিতে পাই? তিনি মন্দিরে প্রার্থনা করিতে ঢুকিলেন, যখন মন্দিরে প্রবেশ করেন তখন একরূপ মন লইয়া, আর যখন মন্দির হইতে নির্গত হইলেন তখন আর এক প্রকার মন। মনের পরিবর্ত্তনে মুখেরও পরিবর্ত্তন হয়। তিনি যখন প্রার্থনা করিয়া মন্দির হইতে নির্গত হইলেন, তখন তাঁহার সেই গাম্ভীর্য্য অথচ প্রফুল্লিত ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়, যেন তিনি কোন অমূল্য দ্রব্য লাভ করিয়াছেন। তিনি প্রার্থনার পর আসিয়া বলিলেন—আমি যীশু খ্রীষ্টকে দেখিয়াছি। সেই যে দেখা, সেই দেখা খুব গম্ভীর ভাবে প্রাণের সহিত দেখা, তাঁহাকে যখন দেখিবে তখন আত্মা তাঁহাতেই তন্ময় হইয়া যাইবে, বাহিরের কোনরূপ ভাব তাহার চিত্তকে অধিকার করিতে পারিবে না। ফ্রান্সলিন ঠিক এইরূপভাবে দেখিয়াছিলেন। দেখিয়া প্রাণ মন তাঁহাতেই অর্পণ করিয়াছিলেন; তিনি স্থির চিত্তে, ধীর মনে, অনিমেষ লোচনে তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন। এইরূপ তন্ময় ভাবে যখন তাঁহাকে দেখা যায় তখন বাহিরের কোনরূপ ভাবে হৃদয়কে আলোড়িত করিতে পারে না। সাধু ফ্রান্সলিন এই ভাবে প্রভুকে দেখিতেন। তিনি শিশুদের ন্যায় সরল ছিলেন। তিনি সরল বিশ্বাসের সহিত যীশু খ্রীষ্টকে বিশ্বাস ও ভক্তি করিতেন, তাই তিনি যীশুকে দেখিতে পাইয়াছিলেন অর্থে তাঁহার আত্মা যীশু খ্রীষ্টকে দেখিয়াছিল. দেখিতে দেখিতে তাঁহার সমস্ত শরীর ও আত্মা যীশুময় হইয়া গিয়াছিল; তিনি সর্ব্বত্রই কেবল যীশু খ্রীষ্টকে দেখিতেন। আমরাও দেখিতে পাই এরূপ হওয়া আশ্চর্য্য নয়; যেমন কেহ যখন ছবি আঁকে, তখন সে এক ভাবে নিবিষ্ট মনে না দেখিলে ছবি আঁকিতে পারে না। ঠিক এই ছবি আঁকার ন্যায়, মন স্থির না করিতে পারিলে কেহ প্রভু পরমেশ্বরকে দেখিতে, অর্থাৎ লাভ করিতে পারে না।

তিনি যে প্রেমিক লোক ছিলেন তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এই প্রেম

তিনি যীশু খ্রীষ্টকে দেখিতে পাইয়া, তাঁহার প্রতি বিশ্বাস হওয়া-অবধি পাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রেমে তিনি বনের পশু, পক্ষী, এমন কি হিংস্রজন্তুদিগকে পর্য্যন্ত বশীভূত করিতে পারিতেন। একদিন তিনি বসিয়া আছেন, বসিয়া থাকিতে থাকিতে তাঁহার মনে হইল ব্যাঘ্রেরা বড়ই হিংস্র জন্তু, তাহারা বিনাপরাধে সমস্ত জীব জন্তুকে বধ করে, সুতরাং তাহারা বড়ই অন্যায় করে। তাঁহার মনে এই ভাব আসিবামাত্র তিনি বাঘের নিকট গিয়া বলিলেন,—ভাই বাঘ, তুমি যে এইরূপ ভাবে বিনা অপরাধে জীব জন্তুদের বধ কর ইহা বড়ই অন্যায় কর; দেখ ভাই, সকলেই ঈশ্বরের জীব সুতরাং কাহাকেও বিনষ্ট করা উচিত নয়। তুমি যে এরূপ কর, ইহাতে ঈশ্বর বড়ই অসন্তুষ্ট হন, সুতরাং ভাই তোমার ও সমস্ত ছাড়িয়া দিতে হইবে, তুমি আর কখন জীব জন্তু বধ করিতে পারিবে না। তোমার আহারীয় যাহা আবশ্যক হয় সমুদয় আমি দিব, তুমি আর জীব বধ করিও না। বাঘ যেন বলিল—'না আর জীব হত্যা করিব না।' তাহার পর দুজনে Hand-Sake করিয়া বিদায় হইলেন। সেই হইতে বাঘ আর কখন জীব হত্যা করিত না। বনের পাখী যখন প্রাতঃকালে গান গাহিত, তখন তিনি পাখীদের নিকটে গিয়া বলিতেন, ভাই তোমাদের ত গান করা হইয়াছে, এখন আমাকে গান করিতে দাও। তোমাদের গান বন্ধ কর, আমি এখন গান করিব। পাখী তাঁহার এই কথা শুনিয়া, তাহারা তাহাদের গান বন্ধ করিত। তিনি তখন গান করিতেন, পাখীরা শুনিত। তিনি যখন তাঁহার আশ্রমে বসিয়া গান করিতেন, সেই সময়ে বনের সমস্ত জন্তু ও পক্ষীরা আসিয়া তাঁহার গান শ্রবণ করিত। সকলের সহিত তাঁহার এইরূপ প্রণয় ছিল; কাহারও সহিত তাঁহার অসদ্ভাব ছিল না।

একদিন তাঁহার আশ্রমে কতকগুলি ডাকাত আসিয়াছিল। ডাকাতেরা আসিয়া তাঁহাদের আশ্রমে ভিক্ষা প্রার্থনা করে। ফ্রান্সলিনের সঙ্গীরা তাহাদিগকে ভিক্ষা না দিয়া তাড়াইয়া দিল। সেই ডাকাতরা খুব চটিয়া গেল এবং তাঁহাদের শাসাইয়া গেল। সাধু ফ্রান্সলিন সে সময়ে আশ্রমে ছিলেন না। তিনি আসিয়া সমস্ত শুনিয়া বলিলেন,— তোমরা এখনি তাহাদের জন্য ভিক্ষা ও আহারীয় দ্রব্য লইয়া গিয়া, তাহাদের অনুসন্ধান করিয়া দিয়া এস, এবং তাহাদের নিকট তোমাদের ত্রুটি স্বীকার করিয়া এস। তাহারা ডাকাতদের সন্ধানে গিয়া, তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ও তাহাদের নিকট সমুদায় দ্রব্য দিয়া, ক্ষমা চাহিয়া আসিল। ডাকাতরা আর তাঁহাদের কোন অনিষ্ট করিল না। এইরূপ সাধুর ব্যবহারে সকলেই সন্তুষ্ট ছিলেন।

তিনি তাঁহার সঙ্গীদের বলিতেন, ঈশ্বর হইতে যে বিদ্যা লাভ করা যায় তাহাই যথার্থ বিদ্যা। তাঁহার মধ্যে খুব মহৎ মহৎ ভাব সকল লক্ষিত হইত।

তাঁহার বয়স যখন ৪৫ বৎসর তখন তাঁহার দেহান্তর হয়। তিনি মারা গেলেন আর তাঁহার সমস্ত শরীরে রক্ত বিন্দু দেখা দিল। যীশুকে তিনি প্রাণের বস্তু করিয়াছিলেন, সেই জন্যই যীশু খ্রীষ্টের ন্যায় তাঁহারও শরীরে রক্ত দেখা গিয়াছিল। তিনি মরিবার সময় বলিয়াছিলেন,—আমাকে মাটীতে রাখ, মাটীর শরীর মাটীর সঙ্গে মিশে যাবে। এইরূপ অনেক উচ্চ উচ্চ কথা তিনি বলিয়া গিয়াছেন।

১২৪০ খৃষ্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১২শ ভাগ] ফাল্গুন ১৩১৩; মার্চ্চ ১৯০৭। [৮ম সংখ্যা।

স্ত্রীনীতিসার।

গৃহিণীর সুদৃষ্টান্তে পরিবারস্থ সকলের যেরূপ কল্যাণ হয় শত উপদেশ শ্রবণেও তদ্রূপ হয় না। গৃহিণী দুঃখ বিপদে আক্রান্ত হইয়াও স্থির থাকেন, ক্রোধের উত্তেজনায় ক্রুদ্ধ হন না, ভালবাসা দ্বারা সকলকে সন্তুষ্ট রাখেন, তিনি কোন কারণে সত্য ও ন্যায় হইতে ভ্রষ্ট হন না, দয়ার কার্য্যে এবং পরসেবায় তাঁহার প্রাণগত যত্ন, পতি পুত্র কন্যা আত্মীয় স্বজন এবং দাস দাসীর প্রতি কর্ত্তব্য পালনে কোনরূপ ত্রুটি হয় না। তাঁহার এ সকল সুনীতির দৃষ্টান্ত দেখিলে পরিবারস্থ কাহার না তাঁহার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধার উদয় হয়। তাঁহার সুনীতির অনুসরণ করিবার জন্য সকলেরই ইচ্ছা ও আগ্রহ হয়।

গৃহিণী যদি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক নিয়মিত রূপে প্রতিদিন পূজা উপাসনা করেন, ভাগবদ্‌ভক্তি ও ধর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় দেন, তাহা হইলে পরিবারস্থ সকলের বিশেষ কল্যাণ হয়। তদ্দর্শনে বালক বালিকা দিগের অন্তরে ধর্ম্মানুরাগ বর্দ্ধিত হইতে পারে। তাহারা বিদ্যালয়াদিতে ধর্ম্মশিক্ষা পায় না, যে সকল পুস্তক পড়ে সে সমস্ত এক প্রকার নিরীশ্বর পুস্তক, ধর্ম্মানুরাগ, ঈশ্বরে বিশ্বাস ভক্তি জন্মে তাহারা অন্যত্র এমন কিছু শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হয় না। মাতার ধর্ম্মানুরাগ ঈশ্বরভক্তি ও ঈশ্বরপূজা দেখিলে তাহাদের অন্তরে ধর্ম্মে অনাস্থা ও অবিশ্বাস স্থান পাইতে পারিবে না। জননীর শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত তাহাদের পক্ষে অতিশয় ফলপ্রদ। তাহারা জননীর অনুকরণ না করিয়া থাকিতে পারে না। সুমাতা অবসর ক্রমে বালক বালিকাদিগকে গল্প চ্ছলে ঈশ্বরতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্ব শিক্ষা দিতে পারেন।

ধর্ম্মের প্রতি উদাসীন ঈশ্বরবিমুখ পতি, পত্নীর ধর্ম্মনিষ্ঠা ও ঈশ্বরভক্তি দেখিলে, তাঁহার জীবনের পরিবর্ত্তন সহজে হইতে পারে। তিনি পত্নীর বিশ্বাস ও ভক্তির দৃষ্টান্ত চিরদিন অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে সুক্ষম নন।

ব্রহ্মদেশে স্ত্রী-স্বাধীনতা।

বাঙ্গালী মহিলাদের স্বাধীনতা কোথায়? তাঁহারা স্বদেশে সর্ব্বদা অন্তঃপুরে বদ্ধ হইয়া থাকেন। বাহিরে প্রায় কেহ তাঁহাদিগকে দেখিতে পায় না। পথে ঘাটে কেবল পুরুষ, স্ত্রীলোক নাই। একজন ইয়ুরোপীয় ভ্রমণকারী পুরুষ কলিকাতায় প্রথম উপনীত হইয়া নগরের ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চারণ করিয়া সবিস্ময়ে বলিয়াছিলেন, এনগরে বুঝি স্ত্রীলোক নাই, কেবল পুরুষই বাস করে। এ কিরূপ দেশে আসা গেল! কিন্তু গ্রীষ্ম ও শরৎকালে দার্জিলীং পাহাড়ে গেলে বাঙ্গালী রমণীদের স্বাধীনতা দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। সেই সময়ে বাঙ্গালী মহিলা স্বাধীনভাবে বেড়াইয়া আমোদ প্রমোদ করিবার জন্য হিমালয় শৃঙ্গ দার্জিলিঙ্গে দলে দলে উপস্থিত হন, সেখানে তাঁহারা সকালে বিকালে দলবদ্ধ ভাবে প্রমুক্তভাবে রাস্তায় বেড়িয়া বেড়ান। ইতস্ততঃ ক্রমোন্নত পথে বঙ্গীয় কুলবধূ ও কুলকন্যাদিগকে ছুটাছুটি করিতে দেখিলে তাঁহাদিগকে বাঙ্গালী মেয়ে বলিয়া সহসা মনে করিতে পারা যায় না। কোথাও বা অসঙ্কুচিত ভাবে যুবতীগণ বসিয়া যুবকদিগের সঙ্গে গল্প করিতেছেন, কোথাও বা চা পান করিতেছেন, কোথাও রাজপথে সবেগে ভ্রমণ করিতেছেন, ইহা দেখিয়া তাঁহাদিগকে সেই অবগুণ্ঠনবতী বাঙ্গালী অন্তঃপুরিকা বলিয়া কে মনে করিতে পারে? এক্ষণ আর হিমালয়শৃঙ্গ পূর্ব্ববৎ ধর্ম্মসাধন ও তপস্যা স্থান নয়, শারীরিক সাধন ও স্বাধীন ভাবে বিচরণভূমি এবং উদ্বাহ সম্বন্ধ সঙ্ঘটনের ক্ষেত্র হইয়াছে।

পৃথিবীর মধ্যে ইয়ুরোপ আমেরিকা স্ত্রী স্বাধীনতার প্রশস্ত ক্ষেত্র। সেই দুই দেশে স্ত্রীলোকেরা পুরুষের সঙ্গে একত্র বসিয়া মদ্য মাংস পান ভোজন করেন, পুরুষের সঙ্গে নৃত্য করেন, সর্ব্বত্র অসঙ্কুচিতভাবে গমনাগমন করিয়া থাকেন। অনেক পুরুষ সেই স্বাধীনা স্ত্রীলোকদিগকে অতিশয় ভয় করিয়া চলেন। সে দেশে রাজপথে, বিপণিশ্রেণীতে এবং সভা সমিতিতে স্ত্রীলোকেরই অধিক ভিড়।

বর্ম্মদেশ বঙ্গদেশের পূর্ব্ব পার্শ্বে, বঙ্গোপসাগর পার হইলেই বর্ম্মদেশে যাওয়া যায়। এখানকার স্ত্রী স্বাধীনতা ইয়ুরোপ আমেরিকার স্ত্রী স্বাধীনতাকে পরাস্ত করিয়াছে। হাট বাজারে ও মেলাস্থানে যাইয়া দেখ এক শত জনের মধ্যে নব্বই জনই স্ত্রীলোক। তাহারা দোকান পশার খুলিয়া বসিয়া আছে, কেনা বেচায় ব্যস্ত। হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, বুঝি এদেশে পুরুষ নাই। হাট বাজারে বিদেশী পুরুষদিগকে অতিকষ্টে তাহাদের ভিড় অতিক্রম করিয়া চলিতে হয়। তাহারা ৩।৪ হাত দীর্ঘ একরূপ রঙ্গিণ মোটা কাপড় পরিধান করে, তাহার উপর কোমর পর্য্যন্ত একটি সাদা কোট পরিয়া থাকে, লাল বা গোলাবী রঙ্গের একটি খর্ব্ব উত্তরীয় বস্ত্র ধারণ করে, উহা সচরাচর কণ্ঠদেশের উভয় পার্শ্বে ঝুলাইয়া থাকে। তাহাদের মস্তক সম্পূর্ণ অনাবৃত। তাহারা শীর্ষ দেশের মধ্যস্থলে খোপা বাঁধে;

চরণে চটিজুতা বা ফালা নামক পাদুকা বিশেষ ধারণ করে। অনেকের মুখে ১২ ১৪ ইঞ্চ লম্বা ২।৩ ইঞ্চ পুরু এইরূপ চুরুট শোভা বিস্তার করিয়া থাকে। সেই প্রকার চুরুট সেবনে তাহাদের অত্যন্ত অনুরাগ। ক্ষুদ্র ধূমযানের চিম্‌নীর ন্যায় তাহাদের মুখগহ্বর হইতে ধূম বিনির্গত হয়। সাধারণ শ্রেণীর বর্ম্মী স্ত্রীলোকের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কোনরূপ অলঙ্কার লক্ষিত হয় না, তবে অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন মেয়েরা হীরার কর্ণাভরণ ধারণ, কেহ কেহ হস্তে সোণার চুরী পরিধান করে, এবং পরিধানে মূল্যবান্ পট্টবস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে। সচরাচর বর্ম্মী যুবতী মাত্রেই মুখমণ্ডলে এক প্রকার শুভ্র পাউডার সংলগ্ন করে। বিশেষ বিশেষ নগরের মিয়ুনিসিপাল মার্কেটের বিপণী শ্রেণীতে সারি সারি এইরূপ যুবতীগণ বসিয়া নিজেদের বেশভূষা ও রূপ লাবণ্যে ক্রেতাদের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে। হাটে বাজারে বা রাজপথে কোন বিদেশীয় পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে বর্ম্মী যুবতীরা কিছুই সঙ্কুচিত হয় না বরং সেই পুরুষের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে। তাহাদের মুখমণ্ডল সর্ব্বদা প্রফুল্ল, তাহারা সামান্য কারণে উচ্চ হাস্য করে। তাহাদের নাক মুখ চোক বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদিগের অনুরূপ নহে। মুখমণ্ডল গোলাকার কিন্তু অনেকে বেশ সুশ্রী। ঘন কৃষ্ণবর্ণ বর্ম্মী নারী প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। হাটে বাজারে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত ও বিক্রীত হয়। বর্ম্মী যুবতীরা বাজার করিতে যাইয়া ভাত তরকারী খরিদ করিয়া ভিড়ের মধ্যেই সারি সারি খাইতে বসে। তাহাদের প্রিয় খাদ্য পচা সড়া মৎস্যে প্রস্তুত নপ্পির দুর্গন্ধ বহুদূর হইতে পাওয়া যায়। অনেক সাহেব হিন্দুস্থানী, পঞ্জাবী ও মাদ্রাজী লোকের বর্ম্মী স্ত্রী আছে। তাহাদের সন্তানাদি হইয়াছে। বর্ম্মী স্ত্রীলোকদিগের মহা প্রভাব, পুরুষেরা নিস্তেজ, নির্ব্বীর্য্য, অবাধ্যতাচরণ করিলে স্বামীকে স্ত্রীর পাদুকাপ্রহার নিঃশব্দে সহ্য করিতে হয়। স্বামী স্ত্রীকে অতিশয় ভয় করিয়া চলে। অনেক স্ত্রী অর্থোপার্জ্জন করিয়া স্বামীকে প্রতিপালন করে। মামলা মোকদ্দমা উপস্থিত মতে প্রায়ই স্ত্রীলোকেরা উকিলের নিকটে যাইয়া মোকদ্দমার অবস্থাদি বুঝাইয়া দেয়। উকিলদিগের স্ত্রী মোওয়াক্কেলই অধিক।

বালিকা বয়ঃস্থা হইয়া বিবাহের জন্য স্বেচ্ছানুসারে পাত্র মনোনীত করে। অনেকে তাহাতে পিতামাতার মত গ্রহণ করিয়া থাকে, অনেকে করে না। পিতা মাতার অমতে বিবাহ হইলে তাহাকে চোরা বিবাহ বলে। বিবাহ-বন্ধন বড়ই শিথিল। বিবাহ ভঙ্গ সহজে হয়। বিধবার পুনর্ব্বিবাহে কোন বাধা নাই।

বর্ম্মার অধিবাসিগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। তাহাদের কাহারও মৃত্যু হইলে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াতে মহা ঘটা হয়। বাদ্যোদ্যমসহ প্রসেশন বাহির হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরাও সুসজ্জিত হইয়া দলবদ্ধভাবে সেই প্রসেশনে পুরুষদিগের সঙ্গে গোরস্থান পর্য্যন্ত গমন করে। উৎসবামোদের ব্যাপারে অনেক বর্ম্মী স্ত্রীলোক প্রকাশ্য

স্থানে নৃত্য করে। কিন্তু তাহারা বিবি-দিগের ন্যায় পরপুরুষের সঙ্গে নৃত্য করে না।

অনেক সভ্যজ্ঞানী বাঙ্গালী বাবু মনে করেন, স্ত্রীলোকেরা অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া প্রমুক্তভাবে স্বেচ্ছাক্রমে যথা তথা বিচরণ এবং সকলের সঙ্গে আলাপ সম্ভাষণ করিতে পারিলেই স্ত্রীস্বাধীনতার পরাকাষ্ঠা হয়। তাহার উপরই স্ত্রীলোকের চরমোন্নতি নির্ভর করে। আমাদের সেরূপ মত নয়। বর্ম্মদেশে যেরূপ স্ত্রী স্বাধীনতা তাহা হইলে বর্ম্মী নারীদিগের উন্নতির চরম সীমা বলিতে হইবে। তাঁহাদের ন্যায় চরিত্র হীনতা, নীতিবন্ধনের শিথিলতা বোধ করি অন্য কোন দেশের স্ত্রীলোকের নাই। ঈশ্বরাধীনতাতেই প্রকৃত স্বাধীনতা; তদ্ভিন্ন স্বেচ্ছাচারিতা। স্বেচ্ছাচারিতায় স্ত্রী পুরুষ সকলেরই অধোগতি হয়। স্বেচ্ছা-চারিতায় নারীদিগকে উৎসাহ দান করিলে পদে পদে বিপদ। বঙ্গীয় কন্যাদিগকে ঈশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিয়া চলিতে শিক্ষা দাও, তাঁহারা যেন ভগবান্‌কে ভয় ও ভক্তি করিয়া চলেন। তাঁহার প্রদর্শিত আলোকে শুভ বুদ্ধির প্রেরণায় চলিলে তাঁহাদের স্বাধীনতা রক্ষা পাইবে, অন্যথা স্বেচ্ছাচারিতার ফল জীবনের বিড়ম্বনা অবশ্যম্ভাবী।

বর্ম্মাদেশের স্ত্রীস্বাধীনতার বিষয় লিখিতে গিয়া অবান্তর অনেক কথা লেখা গেল। সাধারণতঃ বর্ম্মদেশীয় রমণীগণ সামান্য লেখা পড়া জানে। বর্ম্মীভাষার সঙ্গে বাঙ্গলা ভাষার কোন একটী কথারও মিল নাই। যে সকল বাঙ্গালী মহিলা স্বামীর সঙ্গে সে দেশে বাস করিতেছেন, তাঁহাদের অনেকেই বর্ম্মী রমণীদের সঙ্গে কথোপকথন করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের ভাষা শিক্ষা করিয়া থাকেন। আমরা নিম্নে কতকগুলি বর্ম্মী কথা ও তাহার বাঙ্গলা অনুবাদ লিখিলাম। বর্ম্মদেশবাসী আমাদের একটী স্নেহের কন্যার প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া তাহা লেখা গিয়াছে। তিনি বর্ম্মী লিখিতে পড়িতে বিশেষ জানেন না, কিন্তু কেমন শুনিয়া শুনিয়া সেই ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন, শুদ্ধ রূপে অনর্গল বলিতে পারেন ;—

বাঙ্গলাভাষা।	বর্ম্মীভাষা।
দুগ্ধ	নো
জল	ইয়ো
অগ্নি	মি
নদী	ছাঁউ
সাগর	লেন্‌লে
জঙ্গল	ট
পর্ব্বত	টাঁউ
ঈশ্বর	ফয়া
আত্মা	অত্তে
পরকাল	নাউপিয়ো
পাপ	নাইয়েঁ
পুণ্য	কুদো
পূজা	শিথথো
স্বর্গ	নাম্বিয়ো
নরক	নাইয়ে গণন
শাস্তি	থায়ায়ে
পুরস্কার	সু
প্রভু	তখিখন + তখখিমা স্ত্রীলিঙ্গে
শরীর	কো
মন	সেই
রোগ	মমাবু
শোক	ভৌথ

বাঙ্গলাভাষা	বর্ম্মাভাষা	বালঙ্গাভাষা	বর্ম্মাভাষা
দুঃখ	ডোখা	হাকিম	মেন
চিকিৎসা	ছেকু	রাজা	সিম্মেন
ধর্ম্মমন্দির	ফয়া চাঁউ	উকিল	শিনি
ধর্ম্মযাজক	ফুঙ্গী	বারিষ্টার (গাউন পরা উকিল)	উওায়া
স্নান	ইয়ে ছোরে	বাদী	তেয়ালো
ভোজন	থামিনসাদি	বিবাদী	তেয়াখান
নিদ্রা	এইনিয়ে	মোকদ্দমা	আমুহ
উপবেশন	ঠাঁইবা	ধুপী	থাওয়াদি
দাঁড়ান	ঠা	নাপিত	সাডাদি
অন্ন	থামিন	চাকর	সে গান
ব্যঞ্জন	হেন	চাকরানী	মেইমা আসেগান
গমন	তোওয়া	গরু	নোওয়া
আগমন	লা	বাছুর	নোওয়াগলে
কথা কহা	মগাপিয়	ছাগল	সেই
উত্তর দান	ঠুলাই	ভেড়া	তো
বস্ত্র	আওয়	মৎস্য	ঙা
স্বামী	লেন	মাংস	আত্তা
স্ত্রী	ময়া	আরশী	ঙান
পুরুষ	ইয়াওজা	চিরুণী	বি
স্ত্রীলোক	মেই মা	সূতা	আছে
বালক	খলে	চক্ষু	মেয়েলুং
বালিকা	খলেমা	কর্ণ	না
যুবতী	আপিয়ো	মুখ	মিএহলা
যুবক	লুবিয়ো	মস্তক	গাঁঙ
বৃদ্ধ	অফোঙ্গী	চুল	সবেইন্
বৃদ্ধা	অমিজী	হস্ত	নে
মাতা	অম্মে	ক্ষুধা	ছিডাঁও
পিতা	অক্কে	তৃষ্ণা	ঙাডেে
বিবাহ	মেঙ্গলা সাঁও	আমি (পুংলিঙ্গে)	চুন
গৃহ	এঁই	„ (স্ত্রীলিঙ্গে)	চুম্মা
বিছানা	এইয়া	তিনি	তু
জ্ঞান	নিয়ান	তুমি	মোমেন
ধর্ম্ম	বাদা	মহাশয়	খেমিয়া
বৌদ্ধধর্ম্ম	বৌদ্ধ বাদা	আমরা	চুনেজো
সাধু	তাডু	তোমরা	খেমিয়াজো
সাধ্বী	তাডুমা	তাহাদের	তুজো
বাজার	জে	এই	দিহা
দোকান	সাঁই	সেই	হোহা

সংখ্যাবাচক

এক	তক্ষু
দুই	নক্ষু
তিন	তৌঙ্ক্ষু
চারি	লেগু
পাঁচ	ঙ্গাগু
ছয়	ছাউক্ষু
সাত	খোনেক্ষু
আট	শিক্ষু
নয়	কোগু
দশ	সেগু
বিশ	নছেছ
ত্রিশ	তৌজে
একশত	তয়া
এক পয়সা	তবিয়া
দুই পয়সা	নবিয়া
তিন পয়সা	তৌম্‌বিয়া
এক আনা	তায়
দুই আনা	তম্মু
তিন আনা	তৌম্বে
চারি আনা	তম্মা
পাঁচ আনা	তৌম্মু
	ইত্যাদি

বর্ম্মার বিশেষ বিশেষ রমণীর নাম—

মা শুয়ে	শ্রীমতী সুবর্ণ
মা ওঁয়ে	শ্রীমতী রোপ্য
মা ইয়ু	শ্রীমতী পাগলী ইত্যাদি
মা স্ত্রীলিঙ্গ বাচক	শ্রীমতী

বর্ম্মদেশীয় বর্ণাবলীর নাম।

কা	কাজি
খা	খাগোয়ে
গা	গাঙ্গে
ঘা	ঘাজি
ঙ	ঙ্গা
চা	চালুন
ছা	ছালেন
জা	জাগোওয়া
ঝা	জামিনঝে
ঞা	নিয়া
টা	টউম্বু
ঠা	ঠামিনটৌ
ডা	ডাড়ুওয়ে
ঢা	ঢাউঢাও
ণা	নিয়া

ইংরাজী এ, বি ছি ডি, পারসী আলেফ্ বে, তে ইত্যাদির অনুরূপ।

মহা মহিলা-সভায় বরদার মহারাণীর বক্তৃতা।

প্রিয় ভগিনীগণ, অদ্যকার এই মহিলা সভার সভাপতির পদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া আপনারা আমাকে যথেষ্ট সম্মানিত করিয়াছেন। এই সভার কার্য্য করিবার জন্য "মহিলা সমিতি" যখন আমাকে বরদায় পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তখন এরূপ সম্মানিত পদ গ্রহণে অসম্মতি জানাইতেই আমার প্রথম ইচ্ছা জন্মিয়াছিল কারণ আমি জানি, আমাপেক্ষা অনেক যোগ্যতর মহিলা আপনাদের মধ্যে আছেন। কিন্তু আবার ইহাও ভাবিয়াছিলাম, আপনারা যে ভারতবর্ষের অপর প্রান্তে আমার নিকট আহ্বান পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাও আপনাদের দয়ার পরিচায়ক, সুতরাং আপনাদের অনুরোধ উপেক্ষা করিলে উক্ত দয়ার নিতান্ত অযোগ্য প্রতিদান করা হইত। বঙ্গদেশের প্রিয় ভগিনীগণ, এই কারণেই আপনাদের আমন্ত্রণ স্বীকার করিতে আমাকে বাধ্য হইতে হইয়াছে। অতএব আপনাদের অনেকের যেরূপ ক্ষমতা আছে, তদনুরূপ যোগ্যতারসহিত

কর্ত্তব্য সম্পাদনে যদি অকৃতকার্য্য হই, তাহা হইলে আমি আপনাদেরই অনুগ্রহের আশ্রয় লইব কারণ এই সভাপতি নির্ব্বাচন জন্য আপনারাই দায়ী।

আপনাদের মধ্যে পুনরায় সমাগত হইয়া আমি যে কি পরিমাণ সুখী ও আহ্লাদিত হইয়াছি, প্রথমতঃ আমি তাহাই বলিতে চাই। অল্পদিন হইল আমি ফ্রান্স্ ও ইংলণ্ড, ইটালী ও গ্রীস্, জার্ম্মেণী ও অষ্ট্রিয়া, সুইজলেণ্ড ও আমেরিকা প্রভৃতি দূরদেশ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি এবং তত্তদ্দেশের শ্রমশিল্প, সমাজ ও শিক্ষা সংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদি বিশেষ কৌতুহলাবিষ্ট হইয়া সন্দর্শন করিয়াছি। কিন্তু আমি আপনাদের নিকট অন্য প্রকার মনোভাব লইয়া উপস্থিত হইয়াছি। নিরুদ্দেশ পর্য্যটক গৃহে প্রত্যাগত হইলে অথবা নির্ব্বাসিত ব্যক্তি তাহার আপন গৃহে পুনর্গৃহীত হইলে তাহার মনে যে ভাবের উদয় হয়, সে ভাব লইয়া আমি আজ আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত। কারণ যে একতাসূত্রে আমরা সকলে গ্রথিত, তাহাতে সমস্ত ভারতবর্ষই আমাদের গৃহ।

দুই বৎসর পূর্ব্বে আমাকে বিশেষ দয়া ও প্রীতির সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাই এই বঙ্গদেশে একই প্রকার উদ্দেশ্য ও কার্য্যে নিরত ভগিনীগণের সেই এক প্রিয় মাতৃভূমির কন্যা সমূহের মধ্যে অবস্থিতি করিয়াও আমি বরদার ন্যায় স্বচ্ছন্দসুখ অনুভব করিতেছি।

আপনাদের "মহিলা-সমিতি"ও এই প্রকার ভাব পোষণ করেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিনী মহিলাবৃন্দকে পরস্পর একতাসূত্রে গ্রথিত করা উক্ত সমিতির অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। আমাদের পুরুষগণ কংগ্রেস ও নানাবিধ সভা সমিতি দ্বারা প্রতি বৎসর সম্মিলিত হইতেছেন। কিন্তু আমার মনে হয়, জাতীয় একতাবন্ধন সুদৃঢ় করিতে পুরুষাপেক্ষা আমাদের ভারতীয় রমণীগণের প্রভাব কম নহে। আমাদের গৃহে আমরা পরস্পর সম্মিলিত হই, অবরোধের অন্তরালে পরস্পরের সহিত পরিচিত হই ও পরস্পরকে শ্রদ্ধা ও প্রীতি করিতে শিক্ষা করি, এবং আমরাই জাতীয় একতা বন্ধনকে সুদৃঢ় করি। কারণ যদিও আমরা পরস্পর সহস্র সহস্র মাইল ব্যবধানে অবস্থিতি ও বিভিন্ন ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকি, তথাপি আমরা একই প্রকার মনোভাব ও কার্য্যের বন্ধনে পরস্পর সম্মিলিত। কি উচ্চ, কি নীচ, কি ধনী, কি দরিদ্র, আমরা সকলেই আমাদের অতীত গৌরবে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করি, ভবিষ্যতের জন্য একই উদ্দেশ্যে আমরা অনুপ্রাণিত এবং একই প্রকার স্নেহ ও প্রীতির বন্ধনে আমরা সকলে এক হইয়া আছি। অতএব "মহিলা-সমিতি" ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মহিলাবৃন্দকে সমবেত করিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত সুখের বিষয়। আমরা এইরূপ যত অধিক মিলিত হইব, ততই আমরা পরস্পরকে ভালরূপ জানিতে পারিব এবং ততই

আমরা আমাদের উদ্দিষ্ট সাধারণ কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে সক্ষম হইব।

ভারতীয় সাহিত্য ও ইতিহাসের জ্ঞান বিস্তৃতি "মহিলা-সমিতির" অন্যতম উদ্দেশ্য। এবিষয়েও আমি মনে করি, পুরুষাপেক্ষা রমণীগণের প্রভাব অনেক বেশী। আমাদের সন্তানগণের বাল্যাবস্থায় আমরা তাহাদের মন সংগঠন করিয়া থাকি। আমরা তৎকালে তাহাদের অন্তঃকরণে এদেশের অতীত ইতিহাসের প্রতি অনুরাগ ও ন্যায়সঙ্গত গৌরবের ভাব সঞ্চার করিয়া দিতে পারি এবং আমরাই তাহাদিগকে আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী করিয়া তুলিতে পারি। আমার বিশ্বাস এই, উন্নত প্রদেশে অনেক মহিলা আছেন যাঁহাদের লিখিত গ্রন্থ দেশের সাহিত্যে অবিনশ্বর হইয়া থাকিবে। কিন্তু আমরা যাহারা তদ্রূপ গুণগ্রামে বিভূষিত হই নাই আমরাও আমাদের সন্তানগণকে স্বদেশের সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রতি অনুরাগী হইতে শিক্ষা দিতে পারি। আর ইহা নিশ্চিত জানিবেন, জীবনে শৈশব কালীন শিক্ষার যেরূপ স্থায়ী ও দীর্ঘকাল-ব্যাপী প্রভাব এরূপ আর কিছুরই নহে। ভারতের পৌরুষ ও রমণীত্ব আমাদেরই হাতের কাজ। তাহা হইলে, আসুন, আমরা জননীগণ ভারতের ভবিষ্যৎ পুরুষ ও রমণীগণকে দেশের কার্য্যে নিয়োগ করিতে গঠন করি।

সর্ব্বশেষ, ভারতের শিল্প ও বাণিজ্যে উৎসাহ প্রদান "মহিলা-সমিতির" অপর এক উদ্দেশ্য। যে স্বদেশী আন্দোলন সমস্ত উত্তর ভারতবর্ষ, পাঞ্জাব, গুজরাট, দাক্ষিণাত্য, মান্দ্রাজ, মহীশুর, ট্রেভাঙ্কুর, এমন কি এই বিস্তৃত ভারতভূমির সর্ব্বত্র দ্রুত ছড়াইয়া পড়িতেছে, বঙ্গদেশের মহিলাগণ উহাকে কিরূপ সাহায্য ও সমর্থন করিয়াছেন, আমি তাহা বিশেষরূপ অবগত আছি।

আপনারা যেরূপ সাহস ও মহত্বের সহিত এই মহাআন্দোলন প্রবাহ সৃষ্টি করিয়া তাহাকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছেন এবং আজ যে সমস্ত ভারতবর্ষ স্বদেশ-প্রীতির নিদর্শন এই বিরাট আন্দোলনে যোগদান করিতেছে, ভারতের সকল দিক হইতে আমরা তাহা অতিমাত্র বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করিয়াছি। প্রত্যেক প্রদেশে অলক্ষিতভাবে অসংখ্য ভারতীয় শিল্প-ভাণ্ডার খোলা হইতেছে—পশ্চিমভারতে শ্রমশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ নগরসমূহে কল-কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে—বঙ্গ-দেশে বিগত দুই বৎসরের মধ্যে হস্তচালিত তাঁতের (হ্যাণ্ড লুমের) সংখ্যা অন্ততঃ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং পরিবার-সমূহে ধাতব তৈজসপত্রের ব্যবহার দ্রুত প্রসার পাইতেছে। দেখিতে পারিলাম, সহস্র সহস্র তন্তুবায় ও কর্ম্মকারগণ—যাহারা স্ব স্ব ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া-ছিল—তাহারা পুনরায় নিজ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে। পল্লীগ্রামের বহু শিল্পকার ও কর্ম্মকার গৃহে—আমাদের দীনা দরিদ্রা ভগিনীগণের—সেই দরিদ্র শিল্পকারগণের স্ত্রী কন্যা ও জননীগণের—হৃদয়ে নূতন আশার সঞ্চার হইয়াছে এবং

কাজ করিবার জন্য নূতন উদ্দীপনা জাগিয়াছে। জাতীয় উন্নতির বিবরণ যদি ইতিহাসের বিষয়ীভূত হয়, তাহা হইলে এই বিরাট আন্দোলনের বিবরণ—যাহা এত অল্প সময়ে এরূপ সফলতালাভ করিয়াছে এবং সমগ্র জাতি এক হইয়া যাহাকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছে—তাহার বিবরণ অবশ্যই উহাতে স্থান পাইবে। তবে আসুন আমরা ভারতের মহিলাবৃন্দ সর্ব্বান্তঃকরণে এই আন্দোলনে যোগদান করি এবং পরিবারের দৈনিক ব্যবহারের দ্রব্যজাত মনোনয়নকালে ও আমাদের সন্তানগণের বেশভূষা ক্রয় করিবার সময় যেন আমরা সেই লক্ষ লক্ষ দরিদ্র তন্তুবায় ও শিল্পকারগণের—যাহাদের দুঃখ দারিদ্র্য দূর করিতে আমরা সক্ষম—তাহাদের দাবীর বিষয় আমরা ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া একবার স্মরণ করি। এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের যে স্থানেই কেন আমরা বসতি করি না এবং যাহাই কেন আমাদের ধর্ম্ম ও জীবনের অবলম্বিত ব্যবসায় না হউক, আমরা যেন সকলে এক প্রাণ হইয়া স্বদেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধিবর্দ্ধনে নিরত হই।

নূতন শতাব্দী আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে ভারতগগনে নূতন আলোকরেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে। আসুন সকলে মিলিয়া সেই দীনের সহায় পতিতপাবন সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করি যেন এই আলোকরেখা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির দীর্ঘকালব্যাপী সুদিন সমাগমসূচক উষালোকে পরিণত হয়।

আমাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত।

জয়পুরনগর।

হায়দরাবাদ (সিন্ধ) হইতে আজমির হইয়া জয়পুরে যাইব আমাদের এরূপ সঙ্কল্প ছিল। জয়পুর মহারাজের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বাবু সংসারচন্দ্র সেন মহাশয়ের আবাসে আতিথ্য গ্রহণ করিব, স্থির হইয়াছিল। তখন সংসার বাবু স্থানান্তরে ছিলেন। ভাগলপুরস্থ আমাদের বন্ধু শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁহার ঘনিষ্ঠ কুটুম্ব। উক্ত ভ্রাতা জয়পুরের মিয়ুনিসিপাল চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র সেন মহাশয়কে আমাদের তথায় যাওয়ার বিষয়ে পত্র লিখিয়াছিলেন। হায়দরাবাদ হইতে জয়পুরে যাত্রা করার পূর্ব্বে আমরা শুনিতে পাইয়াছিলাম যে, সেখানে প্লেগ পরীক্ষার জন্য যাত্রিকদিগকে গোলযোগে পড়িতে হয়, তচ্ছ্রবণে আমরা শঙ্কিত হইয়াছিলাম, জয়পুরে যাইব কি না ইতস্ততঃ করিতে ছিলাম। কেন না ইতিপূর্ব্বে নেজাম রাজ্যে প্লেগ কেম্পে বন্ধ হইয়া বড়ই ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলাম। আমরা পূর্ণ বাবুকে লিখিয়াছিলাম যে, প্লেগ পরীক্ষার গোলযোগে পড়িতে হইলে আমরা জয়পুরে যাইতে প্রস্তুত নহি। তিনি আমাদের পত্র পাইয়া লিখিয়াছিলেন, নিঃশঙ্কভাবে চলিয়া আসুন, এস্থানে প্লেগ পরীক্ষার কোন গোলযোগ নাই। এদিকে হায়দরাবাদে পাসপোর্টেরও যোগাড় করা গিয়াছিল।

আমরা সাক্কার হইতে ১৯০৫ সালের

১৯শে জুলাই অপরাহ্নে জয়পুর নগরে উপনীত হইয়াছিলাম। ১৮৮০ সালে মহারাজ রাম সিংহের পরলোকযাত্রার পর মাধব সিংহ জয়পুরের রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। এক্ষণ তাঁহার বয়ঃক্রম ৪৭ বৎসর, রাজত্বের আয় ৬৫ লক্ষ টাকা। সর্ব্বশুদ্ধ আয় প্রায় দেড় কোটি টাকা। মহারাজ ৬ বৎসর যাবৎ রাজ্য শাসনে পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার সৈন্য সংখ্যা প্রায় দশ সহস্র। মহারাজের বহুরাণী, তাঁহার রাজ্যশাসনাদি প্রাচীন প্রণালীতে হইয়া থাকে। তিনি হিন্দু ভাবে বিলাত বেড়াইয়া আসিলেন। জয়পুর নগরের লোক সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ বাট হাজার, রাজ্যের প্রজা সংখ্যা ২৬ লক্ষ। ভারতবর্ষের মধ্যে জয়পুর নগর অতিশয় সুন্দর। এনগরকে ভারতের পারিস নগর বলিয়া থাকে। নগরের রাজপথ সকল অতিশয় প্রশস্ত ও সরল, রাজবর্ত্মের উভয় পার্শ্বে গোলাপী রঙ্গের কোঠা বাড়ী সকল শোভা পাইতেছে। বোধ হয় মহারাজ জয়সিংহের নামে এই নগরের নামকরণ হইয়াছে। নগরের এক প্রান্তে কেল্লা। জয়পুরের আর্টস্কুল প্রসিদ্ধ। মহারাজের সাহায্যে এই স্কুলের কার্য্য চলিতেছে। এই স্কুলের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রনাথ সেন। ইনি ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের ভ্রাতা। আমরা স্কুলের কার্য্য দেখিবার জন্য উপস্থিত হইলে তিনি যত্ন পূর্ব্বক তাহা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই স্কুলে ১৮০ জন কারিকর নিয়ত কাজ করিতেছে। স্বর্ণ রোপা ও পিত্তলাদি নানা প্রকার ধাতু দ্রব্যে মনোরম আভরণাদি এবং শ্বেত প্রস্তরে বিচিত্র কারুকার্য্যযুক্ত থালা বাটী ও বিবিধ পুত্তলাদি এখানে প্রস্তুত হইয়া থাকে। জয়পুর কলেজের প্রিন্সিপাল ও প্রফেসারগণ বাঙ্গালী। মহারাজ উপযুক্ত বাঙ্গালীদিগকে উচ্চপদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের প্রতি আদর সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

নগরের বাহিরে জুলজিকেল গার্ডেন ও মিয়ুজিয়ম। জুলজিকেল গার্ডনে নানা প্রকার পশু পক্ষী রক্ষিত। কিন্তু সিংহ নাই, কিয়দ্দিন পূর্ব্বে ছিল, মারা গিয়াছে। নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি ও আলেখ্যের জন্য জয়পুরের মিয়ুজিয়ম প্রসিদ্ধ। মিয়ুজিয়ম দর্শন করিয়া আমাদের বিশেষ আনন্দ লাভ হইয়াছিল। মহারাজ রামসিংহের রাজত্বকালে পূর্ব্বতন মন্ত্রী স্বর্গগত হরিমোহণ সেন মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগে এই মিয়ুজিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এ নগরে প্রাঙ্গণে ও তরু শাখায়, পথে, ঘাটে ময়ুর পক্ষী দলে দলে বেড়াইতেছে ও পেখম ধরিয়া নাচিতেছে সচরাচর লক্ষিত হয়। এ নগরে পশু পক্ষী-বধ করিবার বিধি নাই। আমাদের দেশের চিলকাকের ন্যায় এখানে ময়ুর ও বন্য পারাবত প্রচুর। নগরের এক প্রান্তে আমের নামক পর্ব্বতের উপর জয়পুর মহারাজের পুরাতন প্রাসাদ, তাহা দর্শনযোগ্য। জয়পুরের চন্দন কাষ্ঠে, শ্বেত প্রস্তরে এবং পিত্তলাদি

ধাতুদ্রব্যে নির্ম্মিত সুন্দর সুন্দর পুত্তল ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। কলিকাতাস্থ বিশেষ বিশেষ আত্মীয়কে উপহার দানের জন্য স্বল্প মূল্যের তাহার কিছু কিছু খরিদ করা গিয়াছিল। জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত মকরস্ নামক স্থান হইতে শ্বেত-প্রস্তর-পুঞ্জ গোশকট যোগে জয়পুরে আনীত হয়। তদ্দ্বারা থালা, ঘটী, বাটী ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে, এবং সেই প্রস্তর ট্রেণে নানা দেশে নানা কার্য্যের জন্য প্রেরিত হয়। ইহা জয়পুরের মার্ব্বল প্রস্তর বলিয়া পরিচিত।

জয়পুর নগর উচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। নগরে প্রবেশের জন্য সাতটি বৃহৎ তোরণ বিদ্যমান। প্রত্যেক তোরণের ভিন্ন ভিন্ন নাম। আমরা আজমিরী নামক তোরণ দ্বারা নগরে প্রবেশ করিয়া চাঁদপোল দ্বারে বাহির হইয়াছিলাম। সংসার বাবুর আবাস নগরের বাহিরে। তাঁহার আবাসে আমরা চারি দিন স্থিতি করিয়াছিলাম। গৃহকর্ত্রী ও পূর্ণ বাবুর আদর যত্নের ত্রুটি ছিল না। আমরা ২১শে জুলাই রাত্রির ট্রেণে আগ্রাভিমুখে যাত্রা করি। সেই সময় সংসার বাবু কেচউলী পর্ব্বত হইতে দিল্লীতে আসিয়া স্থিতি করিতেছিলেন। দুই এক দিনের মধ্যেই জয়পুরে ফিরিয়া আসিবেন এরূপ সংবাদ পঁহুছিয়াছিল। গৃহকর্ত্রী ও পূর্ণ বাবুর অনুরোধ ছিল যে, তাঁহার আগমন পর্য্যন্ত আমরা অপেক্ষা করি। কিন্তু ২১শে জুলাই জয়পুর হইতে যাত্রা করা স্থির হইয়া গিয়াছিল, প্রতীক্ষা করিতে আর পারা যায় নাই।

আধ্যাত্মিক উদ্বাহ ব্রত।

বিশেষ দিনে স্ত্রী পুরুষ পরস্পর উদ্বাহ-বন্ধনে বদ্ধ হয়। সেই বিবাহকে প্রকৃত বিবাহ বলা যায় না। উহা বিবাহের সূত্রপাত মাত্র। প্রথম বিবাহকে শারীরিক বিবাহ বলা যায়। স্ত্রী স্বামীর এবং স্বামীস্ত্রীর সচরাচর শরীরকে বিবাহ করিয়া থাকে। বাহ্যিক শারীরিক যোগে তাহারা পরস্পর বদ্ধ হয়, শারীরিক ও সাংসারিক সুখে মত্ত হইয়া পড়ে। স্বামী ও স্ত্রী যে শরীর নয়, আত্মা; পবিত্র আধ্যাত্মিক যোগের জন্য যে তাহারা দুইজনে মিলিত হইয়াছে, কোন্ স্বামী ও স্ত্রী প্রথমে তাহা বুঝে? প্রথমতঃ তাহারা পরস্পর শরীরকেই প্রেম করে। শারীরিক ও সাংসারিক প্রসঙ্গ ব্যতীত কয় জন স্বামী স্ত্রী পরস্পর উচ্চ ধর্ম্ম প্রসঙ্গ করিয়া থাকে, পরস্পরে মিলিত হইয়া ভক্তিভাবে ঈশ্বরের পূজা করে? কয় জন স্বামী স্ত্রী জিতেন্দ্রিয়তা ও আধ্যাত্মিকভাবের পরিচয় দান করিয়া থাকে, প্রথমে শারীরিক সুখ বিলাস ব্যতীত কিছুই জানে না। ব্রাহ্ম বিবাহে বর কন্যা এরূপ মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন, "তোমার হৃদয় আমার হউক, আমার হৃদয় তোমার হউক, আমাদের উভয়ের হৃদয় মিলিত হইয়া ঈশ্বরের হউক।" উভয়ের হৃদয় মিলিত হইয়া ঈশ্বরের হইয়াছে, স্বামী, স্ত্রীকে স্বীয় সহধর্ম্মিণী—ধর্ম্ম পথের সহচরী করিয়া লইয়াছেন, এইরূপ স্ত্রী আত্মা স্বামী আত্মার সঙ্গে পবিত্র আধ্যাত্মিক বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছে, তাঁহাদের জীবন দেখিলে কি

বুঝা যায়?—তাঁহাদের কথা বার্ত্তা ও জীবনের কার্য্য কলাপ কি তাহার পরিচয় দান করে? দুঃখের বিষয় ব্রাহ্ম সমাজে স্বামী স্ত্রীর মধ্যেও ঘোরতর ভোগবিলাস ও শরীরপ্রিয়তা ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা বিশেষ-রূপে লক্ষিত হয়।

নববিধানাচার্য্য শ্রীমৎ কেশবচন্দ্র সেন সাধারণতঃ পতি ও পত্নীর মধ্যে আধ্যাত্মিকতার নিতান্ত হীনাবস্থা দেখিয়া তাহাদের চল্লিশ বৎসর বয়স হইতে পঞ্চাশ বৎসর বয়সের ভিতরে আধ্যাত্মিক উদ্বাহ সাধন বিষয়ে নবসংহিতা পুস্তকে বিশেষ বিধি বিবৃত করিয়াছেন, এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল ;—

১। "যখন স্বামী ও স্ত্রী পবিত্রতর সখ্য বন্ধন জন্য পবিত্রাত্মা কর্ত্তৃক প্রেরিত ও আহূত হয়, তখন তাহারা সেই আহ্বানের অধীন হইবে, এবং স্বর্গধামের উদ্বাহ অনুষ্ঠান জন্য তৎক্ষণাৎ আয়োজন করিবে।

২। "কারণ তাহাদের প্রথম বিবাহ অসম্পূর্ণ এবং কেবল আংশিক মাত্র। এক্ষণে তাহাদের মিলন সর্ব্বাঙ্গীণ হইবে।

৩। "এতদিন তাহারা উভয়ে উভয়ের নিকটে পৃথিবীর সহচর ছিল, এক্ষণ পরস্পর স্বর্গধামের সহচর হইবে।

৪। "কারণ বিবাহ কিসের জন্য ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র মনুষ্য বলে, বংশরক্ষা এবং পৃথিবীর স্বার্থসুখের শ্রীবৃদ্ধির জন্য।

৫। "স্বর্গের সংহিতা বলে, তাহা নহে, স্বামী স্ত্রীকে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য শিক্ষা দেওয়াই বিবাহের উদ্দেশ্য।

৬। "অতএব বিবাহিত স্ত্রী পুরুষ পুনরায় পরস্পরকে বিবাহ করুক, তাহাতে তাহাদের পৃথিবীর বন্ধুতা স্বর্গে আধ্যাত্মিক যোগে পরিণত হইবে।

৭। "চল্লিশ হইতে পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম দ্বিতীয় বিবাহ বা আধ্যাত্মিক বিবাহের পক্ষে নিতান্ত অনুকূল সময়।

৮। "জীবনের ভার সকল বহন করা হইল, তাহার প্রধান প্রধান কর্ত্তব্য সকল সম্পাদিত হইল, ঘর গৃহস্থালীর কার্য্য প্রণালী সমুদায় ব্যবস্থাপিত হইল, পৃথিবীর সুখ দুঃখের সম্বন্ধ ভোগ করা হইল, পার্থিব দাম্পত্য জীবন যথেষ্ট পরিমাণে হইয়া গেল।

৯। "এক্ষণ তাহারা আধ্যাত্মিক বিবাহের বিশেষ অধিকার, কর্ত্তব্য এবং আনন্দ চিন্তা করুক।

১০। "উপযুক্ত আয়োজনের জন্য তিন দিবস আত্ম-পরীক্ষা, ধ্যান, শাস্ত্রপাঠ, সংযম ও সমবেত প্রার্থনাতে নিয়োগ করিবে।

১১। চতুর্থ দিবসে স্বামী এবং স্ত্রী স্নান করিয়া নূতন গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিবে, এবং দেবালয়ে প্রাতঃকালীন উপাসনায় উপস্থিত হইবে।

১২। "নিয়মিত উপাসনার পর তাহারা পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া নূতন আসনের উপর বসিবে।

১৩। "স্বামী স্ত্রীকে বলিবে, অদ্য আমরা আমাদের প্রধান পুরোহিত প্রভু পরমেশ্বরের সন্নিধানে, এবং আমাদের সাক্ষিস্বরূপ অমরগণের সমক্ষে স্বর্গলোকে

স্বর্গীয় বিবাহ সম্পাদনের জন্য একত্রিত হইলাম। ঈশ্বর ধন্য হউন।

১৪। "স্ত্রী বলিবেন, স্বস্তি, ঈশ্বর ধন্য হউন।

১৫। "হে প্রিয়তমে, আমরা এই পৃথিবীর সুখ দুঃখ পরীক্ষা প্রলোভন যথেষ্ট পরিমাণে ভোগ করিয়াছি। জীবনের বিভিন্ন প্রকার পথে আমরা পরস্পর সুখদুঃখের সমভাগী হইয়া এক সঙ্গে গৃহকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছি। সহযোগী ভৃত্যের ন্যায় মনঃপ্রাণ একত্র করে আমরা প্রভু পরমেশ্বরের সেবা করিয়াছি, এবং আমরা তাহার পুরস্কারও পাইয়াছি। এক্ষণ স্বামী আত্মা ও স্ত্রী আত্মার পবিত্র ব্রত গ্রহণ, এবং অশরীরী আত্মাদ্বয়ের সম্মিলন সম্পাদন দ্বারা আমাদের পূর্ব্ব বিবাহকে সর্ব্বাঙ্গীণরূপে পরিসমাপ্ত করিবার জন্য প্রভু পরমেশ্বর আমাদিগকে আদেশ করিতেছেন, এবং একটি উচ্চতর কার্য্যক্ষেত্রে এবং আনন্দধামের দিকে আহ্বান করিতেছেন। অতএব আমরা তাঁহার পবিত্র রাজ্যে ইহকাল ও অনন্ত কালের জন্য যুগল ভৃত্য হইয়া থাকিব, এবং গভীর যোগে একে তিন হইয়া নিত্যকাল অবস্থান করিব। প্রিয়তমে, তজ্জন্য কি তুমি প্রস্তুত আছ?

১৬। "স্ত্রী। প্রভু পরমেশ্বরের আজ্ঞা পালনের জন্য আমি প্রস্তুত আছি। কিন্তু হে প্রিয়তম, এই ব্রত অতি কঠিন, আমি অবলা; অতএব ঈশ্বর আমাকে সাহায্য করুন।

১৭। স্বামী। সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর আমাদের দুর্ব্বল আত্মার সহায় হউন এবং পরিত্রাণপ্রদ আলোক এবং শক্তি বিধান করুন।

১৮। স্ত্রী। স্বস্তি।

১৯। স্বামী। এই নূতন বিবাহ বন্ধনকে সম্পূর্ণ রূপে দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য এবং এই পবিত্র গুরুতর ব্রত সিদ্ধির জন্য আমাদের প্রতি সপ্তাহকাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব প্রভু পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া ঐকান্তিকতা, বিনয় এবং প্রার্থনা সম্ভূত আশ্বস্ততা সহকারে সাতদিন এই পবিত্র ব্রত সাধন করিব।

২০। 'স্ত্রী। তাহাই হউক।

২১। "স্বামী। হে ঈশ্বরের কন্যা, এবং দাসী, তোমার দক্ষিণ হস্ত আমাকে প্রদান কর এবং মধুর আধ্যাত্মিক মিলনের নিদর্শন-স্বরূপ আমাদের হস্তদ্বয়ে এই পুষ্পমালা দ্বারা প্রকৃত প্রেমগ্রন্থি বন্ধন করিতে দাও।

২২। "স্ত্রী। তাহাই হউক।

২৩। "স্বামী। এই প্রেম গ্রন্থি যদি যথার্থ আধ্যাত্মিক বন্ধন হয়, তাহা হইলে অদ্য একটি নিত্যকাল স্থায়ী পুনর্ম্মিলনের ভিত্তি স্থাপন করিলাম। অদ্য আমরা কালে বিবাহ করিলাম, কিন্তু বিবাহ করিলাম নিত্য কালের জন্য। এখন পৃথিবী তলে আমরা মিলিত হইলাম, ভবিষ্যতে স্বর্গলোকে সম্মিলিত দৃষ্ট হইব।

২৪। "স্ত্রী। আমিও এইরূপ বিশ্বাস করি, এবং আশা করি। অতএব তাহাই হউক।

২৫। "স্বামী। হে জীবন-পথের

সঙ্গিনি, এই গৈরিক বসন, এই একতন্ত্রী, এই আসন, এই শ্লোকসংগ্রহ, এবং এই নববিধান নিশান তুমি গ্রহণ কর এবং চিরদিন বিশ্বপতির এইরূপ পতাকার নিকট বিশ্বস্তা ও ভক্তিমতী হইয়া থাক।

২৬। "স্ত্রী। কৃতজ্ঞহৃদয়ে আমি এ সকল গ্রহণ করিলাম।

২৭। "স্বামী। প্রভু পরমেশ্বরের এই আদেশ যে আমার হৃদয় এবং হস্তকে পরিষ্কার করি, ক্রোধ অহঙ্কার ইন্দ্রিয়াসক্তি ও সাংসারিকতা পরিত্যাগ করি। বিশ্বাস, সাধুতা, প্রেম ও সাধন ভজনে উন্নত হই, দরিদ্রকে ভিক্ষা, বিপন্নকে সাহায্য দিই এবং শাস্ত্রপাঠ, প্রার্থনা ধ্যান ও সৎপ্রসঙ্গ এবং আত্মসংযমন দ্বারা সমবিশ্বাসী সাধকের ন্যায় ক্রমে ক্রমে পরস্পর এবং ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইয়া সকল সাধন এবং সুখের পরিসমাপ্তিকর যোগের মধ্যে প্রবেশ করি। ঈশ্বর আমাদের মিলনকে আশীর্ব্বাদ করুন এবং ইহাকে পবিত্র ও সুখকর করুন।

২৮। "স্ত্রী। স্বস্তি।

পরে স্বামী এইরূপ প্রার্থনা করিবেন,—

২৯। "হে যোগেশ্বর, প্রকৃত যোগবন্ধন দ্বারা আমাদের আত্মাকে এমন করিয়া বাঁধ যেন আমি আমার স্ত্রীতে এবং তিনি আমাতে এবং আমরা উভয়ে নিত্য সম্মিলন এবং শান্তিতে তোমার মধ্যে স্থিতি করিতে পারি। আমাদিগকে পবিত্র এবং সাধুচরিত্র কর, সকল প্রকার অপবিত্রতা এবং অসাধুতা হইতে দূরে রাখ। আমাদিগকে পৃথিবী হইতে ঊর্দ্ধে নীত কর এবং এখন হইতে উন্নত লোকে জ্যোতির্ম্ময়ধামে মধুর মিলন এবং পূর্ণানন্দে তোমার মধ্যে অবস্থিতি করিতে দাও।

৩০। "তদনন্তর আত্মার চির আনন্দস্বরূপ আমাদের ঈশ্বর ধন্য এই বলিয়া স্বামী স্ত্রী ভক্তিভাবে প্রভু পরমেশ্বরের চরণে প্রণিপাত করিবে। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

"স্বামী স্ত্রী সপ্তাহ কাল প্রার্থনা এবং যোগসাধন করিবে এবং এক সঙ্গে বসিয়া একতন্ত্রীযোগে ঈশ্বরের পবিত্র নাম গান করিবে। তাহারা এই পবিত্র সপ্তাহের প্রতি দিন সদ্‌গ্রন্থাবলী পাঠ করিবে এবং গভীর আধ্যাত্মিক বিষয়ে কথাবর্ত্তা কহিবে। আরও তাহারা দুঃখীকে ভিক্ষা, গৃহপালিত পশু পক্ষীদিগকে আহার এবং বৃক্ষাদিকে জলদান করিবে। অপিচ ঈশ্বরের জন্য সদ্যোজাত পুষ্প চয়ন করিবে, এবং এক এক দিন মণ্ডলীর এক এক জন প্রধান ব্যক্তিকে ভোজন করাইবে এবং উপযুক্ত উপহার দিবে।"

নববিধান মণ্ডলীর অন্তর্গত আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাকিপুর নগরস্থ শ্রীযুক্ত বাবু প্রকাশ চন্দ্র রায়ের সঙ্গে তাঁহার স্বর্গগতা সাধ্বী পত্নী দেবী অঘোর কামিনী পবিত্র আধ্যাত্মিক উদ্বাহ-বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছিলেন, আমাদের এরূপ বিশ্বাস। দেবী অঘোর কামিনীর পার্থিব সুখে ও শারীরিক ভোগবিলাসে কিছুমাত্র অনুরাগ ছিল না। প্রকাশ বাবু ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট ছিলেন,

৩।৪ শত টাকা বেতন পাইতেন ; এক্ষণ তিনি পেন্সনভোগী। দেবী অঘোর কামিনী উৎকৃষ্ট বসন ভূষণ পরিধান করিতেন না। তিনি আপনার মস্তকের কেশপুঞ্জ ছিন্ন করিয়াছিলেন, আলখেলার আকার গৈরিক বস্ত্রে অঙ্গ আচ্ছাদন করিতেন। সেই বেশে স্বামীর সঙ্গে সামান্য যানারোহণে সময়ে সময়ে স্থানান্তরে যাইতেন। অঘোর কামিনী সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্মে স্বামীর অনুগামিনী ছিলেন, প্রাত্যহিক উপাসনাতে স্বামীর প্রার্থনার পর গভীর প্রার্থনা করিতেন। তাঁহার চারি পাঁচটি পুত্র কন্যা ছিল, তদ্ভিন্ন তিনি অন্য অনেক বালক বালিকার বিদ্যা শিক্ষা ও প্রতি পালনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। অঘোর কামিনী সকলকে সমান চক্ষে দেখিতেন। ভোজ্য পরিচ্ছদাদিতে যাহাতে বিলাসিতা বৃদ্ধি না পায়, তিনি তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতেন। পতি পুত্রাদিসহ সামান্যাবস্থায় জীবনযাপন করিতেন। তিনি স্বামীর উপার্জ্জিত অর্থ স্বহস্তে ব্যয় করিতেন। অর্থ সঞ্চিত থাকিত না। দাতব্য ও নানা সৎকর্ম্মে অর্থ ব্যয় হইত। পরসেবায় প্রাণ মন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। নগরের কোন পল্লীতে কোন নিরাশ্রয়া নারীর রোগশোকে দুঃখ বিপদের সংবাদ পাইলে তিনি দৌড়িয়া যাইয়া তাহার সেবায় প্রবৃত্ত হইতেন। তখন রজনীর অন্ধকার ও ঝড় বৃষ্টিকে গ্রাহ্য করিতেন না। দেবী অঘোর কামিনী স্বামীর সহিত সংসারের অসার কথা কহিয়া সময় যাপন করিতেন না। তিনি ইংরাজি জানিতেন না, সন্তানাদি হইলে পর অধিক বয়সে লক্ষ্ণৌ নগরে যাইয়া মেথডিষ্টদের ছাত্রী নিবাসে ইংরাজি শিক্ষার জন্য বৎসরাবধিকাল স্থিতি করিয়াছিলেন, তথা হইতে তিনি সর্ব্বদা স্বামীকে বড় বড় পত্র লিখিতেন। তাঁহার পত্র সকলে উচ্চ আধ্যাত্মিক কথা ব্যতীত সংসারের কথা থাকিত না। তিনি সখ্যভাবে পত্র লিখিতেন, ঈশ্বর দর্শন, শ্রবণ যোগভক্তির কথাতেই পত্র সকল পূর্ণ থাকিত। পরিশেষে তিনি স্বামীর সঙ্গে শারীরিক সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া মধুর আধ্যাত্মিক প্রেমে, স্বর্গীয় ভাবে মিলিত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে সাধ্বী অঘোর কামিনীর উচ্চ সম্মান। নববিধান মণ্ডলীর প্রেরিত দরবার তাঁহার স্বর্গারোহণের দিন বিশেষ উপাসনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বাঁকিপুরের অঘোরসমিতি নামক মহিলা সমিতি দেবী অঘোর কামিনীর জীবনের সৎকীর্ত্তি বিশেষ। এই সমিতির যোগে তিনি অনেক সৎকার্য্য করিয়াছেন। সাধ্বী পত্নী-নিষ্ঠ শ্রদ্ধেয় প্রকাশচন্দ্র রায় প্রচারকের জীবনের ন্যায় জীবন যাপন করিতেছেন।

স্বর্গগতা কিশোরী মোহিনী দেবী বাল্য কাল হইতে আমাদের নিকটে থাকিয়া ধর্ম্ম শিক্ষা ও বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাকে পাত্রস্থ করিয়াছিলাম। তাঁহার স্বামীর নাম শ্রীযুক্ত বাবু বিহারী লাল সেন, তিনি আমাদের একজন সমবিশ্বাসী সাধক বন্ধু। বাবু বিহারীলাল সেন ময়মনসিংহ জিলার সবডিভিশন কিশোর

গঞ্জের এণ্ট্রেন্স স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে ৪০ চল্লিশ টাকা বেতনে নিযুক্ত ছিলেন। কিশোরী মোহিনী তাঁহার সঙ্গে তথায় কয়েক বৎসর বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার গর্ভে দুইটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তিনি সেই সামান্য আয়ে সুশৃঙ্খলরূপে সংসারধর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, অর্থাভাবে চাকর চাকরাণী রাখিতে পারিতেন না। রন্ধন পরিবেশন ও সমুদয় পরিচর্য্যার ভার তাঁহাকে স্বহস্তে করিতে হইত। তিনি নিয়মিতরূপে পারিবারিক উপাসনায় নিষ্ঠাপূর্ব্বক যোগদান করিতেন, অপরাহ্নে অনেক প্রতিবেশিনী মহিলা উপস্থিত হইতেন, তাঁহাদের সঙ্গে তিনি সৎপ্রসঙ্গাদি করিতেন। সন্ধ্যার পর স্বামীর সঙ্গে সম্মিলিতভাবে ধর্ম্মালোচনা প্রার্থনাদি হইত। দেবী কিশোরীমোহিনীর দৈনন্দিন লিপি তাঁহার স্বামী হইতে আমরা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ মহিলাতে প্রকাশ করিয়াছি। তাহা পাঠে জানা যায় তাঁহার জীবন অতিশয় পবিত্র ছিল। তিনি ইন্দ্রিয়সংযমব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, অবৈধ ইন্দ্রিয় সেবায় বিরত ছিলেন। কোন দিন ব্রত ভঙ্গ হইলে, দৈনন্দিন লিপিতে অনুতপ্ত হইয়া আজ স্খলন হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কোন দিন উপাসনা প্রার্থনাদিতে কিরূপ আহ্লাদ পাইয়াছেন এবং কিরূপ আধ্যাত্মিক সত্য লাভ হইয়াছে, কোন্ দিন কি কারণে উপাসনা ভাল হয় নাই, হৃদয় ভক্তিরসার্দ্র হয় নাই, তিনি নিজের দৈনন্দিন লিপিতে স্পষ্ট লিখিয়াছেন। এরূপ কন্যাই ব্রহ্ম কন্যা, ইনিই স্বর্গীয় প্রকৃত সহধর্ম্মিণী ছিলেন। যৌবনকালে স্বামীর সঙ্গে ইহাদের পবিত্র আধ্যাত্মিক বিবাহ হইয়াছিল।

মহিলাদিগের রচনা।

বর্ম্মদেশে নববর্ষ বা তগুলা।

তগুলা—তগু-শব্দের অর্থ এক, লা-মাস; অর্থাৎ নববর্ষের প্রথম মাস। আমাদের বৈশাখ মাসে একই দিনে নববর্ষ আরম্ভ। নববর্ষ উৎসবময়, কি বাঙ্গালায় কি ব্রহ্মদেশে। এই মাসে ব্রহ্মদেশবাসিগণ সমস্ত বৎসর যাহাতে নির্ব্বিবাদে সুখে শান্তিতে কাটাইতে পারেন, ইহার জন্য ব্রত উপবাসাদি করেন, এই জন্য এই উৎসব তগুলা বলিয়াই খ্যাত। বৎসরের শেষ দিবসে স্ব স্ব জন্মবার অনুসারে বৌদ্ধ পুরোহিত "ফুঙ্গী" কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত ফুল দিয়া ব্রহ্মদেশবাসী স্ত্রী পুরুষ মাথা ঘসিয়া স্নানাদি পূর্ব্বক গাত্র শুদ্ধ করেন; তাহার পর নূতন মৃণ্ময় পাত্রে জল ও ফুল সাজাইয়া বুদ্ধদেবের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন, নিশীথে নববর্ষের জন্য খাদ্য সামগ্রী রন্ধন করিয়া রাখেন, নববর্ষের প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া কিছু কিছু রন্ধন করেন, এবং তাঁহারা স্নানাদির পর বিবিধ বসন ভূষণে সজ্জিত হইয়া নামমালা হস্তে ধারণপূর্ব্বক একটী ডালায় খাদ্য সামগ্রী সুন্দর সুন্দর কাচপাত্রে স্বতন্ত্র আকারে ফুঙ্গীর জন্য এবং আপনাদের জন্য লইয়া যান। এইরূপে প্রতিবাসী সকলে মিলিত হইয়া কেহ বা অশ্বযানে কেহ বা গো শকটে, কেহ কেহ

বা পদব্রজে পাহাড়ের উপরে জঙ্গলে নির্জ্জন বৌদ্ধ দেবালয়ে গমন করেন। যিনি কার্য্য বশতঃ বা গৃহে রোগ শোকাদি প্রতিবন্ধকতায় দূর মঞ্চে যাইতে না পারেন, তিনি নিকটস্থ কোন দেবালয়ে গিয়া সেই মহাযোগী বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট যাহাতে আত্মীয় স্বজন সকলের এবং নিজের আয়ুর্বৃদ্ধি হয়, সকলে সমস্ত বৎসর সুখে শান্তিতে অতিবাহিত করিতে পারেন, টাকা কৌড়ি মান সম্ভ্রম যাহাতে বৃদ্ধি হয়, এই সমস্তের জন্য আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া, ফুঙ্গীদিগকে প্রণাম পূর্ব্বক কিছু খাদ্য সামগ্রী উপহার দিয়া নিজালয়ে চলিয়া আসেন। ব্রতাদিতে ইহাঁদের অনেক প্রকার নিয়মে বদ্ধ থাকিতে হয়, যেমন আসক্তি, লোভ, মোহ, পরস্বহরণ, রাগ, দ্বেষ, মিথ্যাকথন ইত্যাদি হইতে দূরে থাকা। ইহাদের বিশ্বাস গৃহ মায়া মোহ প্রভৃতিতে পূর্ণ, এস্থলে থাকিলে সংসারিকতায় মন যাইবে, সন্তান সন্ততির প্রতি মায়া পড়িবে, রাগের উদ্রেক হইবে, এই বিবেচনায় ইহারা নির্জ্জন বৌদ্ধ মঞ্চে গমন করিয়া বৌদ্ধ পুরোহিত (ফুঙ্গী) দিগের নিকটে শাস্ত্রালোচনা, শাস্ত্রপাঠ শ্রবণ করেন, নিজের ও আত্মীয় স্বজনের হিতের জন্য ধ্যানমগ্ন প্রকাণ্ড শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত গম্ভীর বৌদ্ধ মূর্ত্তির সম্মুখে নতজানু হইয়া প্রার্থনা করেন। "অনিস্যা দোক্ষা, অনাত্মা, কায়া, টয়া" অর্থাৎ অনিত্য, দুঃখ, জন্মান্তর, নির্ব্বাণ ও নিয়ম বলিয়া মালা জপ করিয়া মনকে আসক্তি হইতে বৈরাগ্যে আনয়ন পূর্ব্বক পবিত্র ভাবে দিন যাপন করেন। প্রত্যেক ব্রতাবলম্বী বেলা ১২টার পূর্ব্বে আহার করিয়া সমস্ত দিনের জন্য উপবাসী থাকেন। রাত্রিতে কেহ কেহ পানীয় মাত্র পান করিয়া তগুলা যাপন করেন। এই বর্ম্মদেশে নির্জ্জলা উপবাস নাই। নিষ্ঠাই ব্রতের মূলমন্ত্র, এজন্য সৌখীন বর্ম্মদেশীরা উৎসবের দিনে ফুলের গন্ধ বা কোন সুগন্ধ বস্তু বিলাসিতা আসিবার ভয়ে গ্রহণ করেন না, ছেলেদের মুখ চুম্বন করেন না, মায়া মোহ ও আদরের সামগ্রী হইতে দূরে থাকেন, মিথ্যা কথার আশঙ্কায় সংযতভাবে অল্প কথা বলেন। বৃদ্ধ, বৃদ্ধা এবং ধর্ম্মপিপাসুগণ তগুলা উপলক্ষে চৈত্র সংক্রান্তি ১লা ও ২রা বৈশাখ এই তিন দিন উপরি উক্ত নিয়মে ব্রত যাপন করেন।

আমাদের দেশে চৈত্র সংক্রান্তি, চড়ক পূজায়, কলাস উৎসর্গের যে পর্ব্ব, বর্ম্মদেশে সেই পর্ব্ব বৌদ্ধ ধর্ম্মের নিয়মাবলীতে বদ্ধ হইয়া একটি মহা পর্ব্বে পরিণত। নববর্ষ উপলক্ষে সকলে সকলের গায়ে জল ঢালিয়া দেয় এই অর্থে যে, জল দ্বারা স্নান করিলে যেরূপ শরীর শীতল ও পবিত্র হয় সমস্ত বৎসর এইরূপ মন সুখে শান্তিতে ও পবিত্রতায় যাপিত হউক। এই উপলক্ষে যুবক যুবতী, এবং বালক বালিকারা মহা আনন্দে মাতিয়া যায়। যুবতীরা একসঙ্গে অনেকে দলবদ্ধ হইয়া পরস্পরের শরীরে জল ঢালাঢালি, দৌড়াদৌড়ি হাস্য চীৎকার করতঃ বাদ্যাদি সহ বড় বড় রৌপ্য পাত্র জলপূর্ণ করিয়া পাড়ায় পাড়ায় সকলের বাড়ীতে গিয়া জল খেলা করে। স্বদেশী বিদেশী, সাহেব বা বাঙ্গালী, ধনী বা দরিদ্র

কেহই জলের হাত হইতে রক্ষা পায় না। শুধু জল দেওয়া নয়, এই সঙ্গে টাকা আদায়ও আছে। সংগৃহীত অর্থে মেছুনী-দের নিকট হইতে কৈ মাগুর, শোল ইত্যাদি জীবন্ত মৎস্য ক্রয় করিয়া পুষ্করিণীতে ছাড়িয়া দেয়, জবাই করিবার জন্য যে গরু রাখা হইয়াছে কসাইদের নিকট হইতে তাহা দ্বিগুণ মূল্যে ক্রয় করিয়া ফুঙ্গীদিগকে উৎসর্গ করে, কুক্কুট বিক্রেতার নিকট হইতে কুক্কুট ও নানাবিধ পক্ষী ক্রয় করিয়া মহাঘটা করিয়া বাদ্যোদ্যমসহ নানা প্রকার সং সাজিয়া দর্শকদিগকে আমোদিত করিবার জন্য নৃত্য গীতাদি করিয়া রাজপথ দিয়া বৌদ্ধ মঞ্চে যায়।

সেখানে পশুপক্ষীদিগকে ছাড়িয়া দেয়। এই তো গেল যুবক যুবতীদের কথা। ছেলেদের জন্য আবার তগুলার সময় রাজপথে বাহির হওয়া বড়ই দুষ্কর হয়। রাস্তায় রাস্তায় জলপূর্ণ পাত্র বা পিচকারী লইয়া ছোট ছোট ছেলে মেয়ের বসিয়া থাকে, যে কেহ রাস্তা দিয়া যাক্ না কেন, পিছু পিছু ছুটিয়া সকলের গায়ে জল ঢালিয়া দিবে। কাকুতি মিনতি কদাচ শ্রবণ করে না, তবে ব্রতধারীরা মালা দেখাইয়া বারণ করিলে অব্যাহতি পান। বৌদ্ধ দেশের জল খেলা আমাদের দেশের আবির খেলার অপেক্ষা অনেক গুণে ভাল।

উৎসবাদি উপলক্ষে বৌদ্ধ পুত্র কন্যাগণ নিজ নিজ অবস্থানুসারে মাতাকে লুঙ্গী বা থামিন্ এবং পিতাকে পসো প্রভৃতি পরিধেয় বস্ত্র ফল মূলাদি সহ দান করিয়া প্রণাম করে। পিতা মাতা সন্তানদিগকে আশীর্ব্বাদ করেন এবং এই নূতন পট্ট বস্ত্র ব্রতাদিতে ব্যবহার করেন। স্বামী স্ত্রীর পরস্পর কলহ বিবাদ প্রভৃতি অমিল থাকিলে ব্রতাদি উপলক্ষে দুজনে মিলিত হইয়া বৌদ্ধ মঞ্চে গিয়া ব্রত উদ্‌যাপন করেন।

পীনমানা। শ্রী প্রঃ।

কে তুমি আমার ?

১

কে তুমি ২ ওগো বলনা আমার।
নিস্তব্ধ যামিনী যবে,
আসে মোর ধীরে ২
কে তুমি চাহিয়ে রও মম মুখপানে।
পাতিয়ে স্নেহের কর
নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে
কে তুমি রাখিছ মোরে কুসুম শয়নে।
আসে যবে উষাবালা
ধীরে নামি ধরা প'রে
কে তুমি চেতনা মন্ত্রে জাগাও আমায়।

২

কে তুমি ২ ওগো বলনা আমার।
(আমি) কাঁদি যবে একাকিনী
কে তুমি দিবস যামী
স্নেহের আঁচলে আহা আঁখি মুছে দাও।
বিষাদে মলিন প্রাণ
যবে খোঁজে শান্তি স্থান
কে তুমি হৃদয় কোলে আমারে জুড়াও।
কে তুমি সতত কাছে
বলনা প্রাণেরি মাঝে
এমনি করিয়ে আহা লুকিয়ে বেড়াও।

চকিত চপলা সম
বিজলীর রূপ যেন
এই আসি এই পুন কোথায় মিশাও।

৩

কে তুমি ২ ওগো আমারে তা বল।
জীবনের পথে ধীরে
কে তুমি মানস পুরে
তোমার সুন্দর পথে সদা নিয়ে চল।
তুমি কে সুহৃদ সখা
প্রিয়তম প্রাণ রাখা
অধম জানিনে কিছু বল মোরে বল।
হে ভূমা মহান্ স্বামী
অনন্ত আশ্রয় তুমি
আমি কি জানিব এই ক্ষুদ্র দুরবল।

৪

কে তুমি ২ মম বল সুধাধার
অনন্ত জীবন পথে
তুমি কি রহিবে সাথে
এখানের খেলা যবে ফুরাবে আমার।

সাঁজের আঁধারে।

১

দিবস যাইছে চলি
আসিতেছে ধীরে সাঝ
সোণালী রঙ্গের চিত্র
দেখা যায় ধরামাঝ।

২

শোভিছে সোণার রঙ্গে
বিটপীর শাখা সারি
ধীরে যায় দিন নাথ
পশ্চিম শিখরে স'রি।

৩

ক্রমে আলো নিবে এল
আঁধারের ম্লান ছায়
ঢাকিছে ধরণী দেহ
বহে মৃদু সান্ধ্য বায়।

৪

প্রকৃতি লুকায়ে মুখ
আঁধার-আড়ালে অই।
কি যেন গাহিছে গান
শুনিয়া স্তম্ভিত হই।

৫

আহা! এ ব্রহ্মাণ্ডখানা
কার প্রেমে নিমগন
নিরন্তর এ আরতি
কার অশ্রু অর্পণ।

৬

কি আর আছে গো মম
দিতে তোমা উপহার
দিয়াছ তুমি যা লও
আজি এই আঁখি ধার।

আবাহন।

ডাকিছে বিহগ সুমধুর স্বরে।
মুকুলিত শাখা পরে
ফুটেছে কুসুম, সুবাসে তাহার
অলি গুন্ গুন্ করে।
বহিছে সুধীরে মৃদু সমীরণ
শিহরি উঠিছে প্রাণ
পুলকে অধীর হতেছে শুনিয়া
অজানা বিহগ গান।
তরুণ লতিকা নবীন বসন্তে
মুকুলিত ফুলদলে।
সমীর আসিয়া দুলায় তাহারে
সরমে পড়ে সে ঢলে।

কাঁপিছে মৃণাল সরোবর পরে
চাহিয়া রবির পানে
ফুটিয়া মুকুল চাহিছে সলাজে
আধ বিকশিত প্রাণে।
বিকশিত ধরা নূতন শোভায়
কার তরে নাহি জানি
এসেছেন বুঝি নিজে শোভাময়ী
নব বসন্তের রাণী।
তাঁরি আগমনে বিকশিত ধরা
সবি হেরি সুশোভন
গাহিয়া বিহগ সুললিত স্বরে
করে তাঁর আবাহন।

শ্রীমতী সন্তোষ কুমারী দেবী
সম্বলপুর।

সংবাদ।

মহিলা সম্পাদক প্রায় তিনমাস যাবৎ দূরদেশে স্থিতি করিতেছেন। তাঁহার কলিকাতায় অনুপস্থিতি কালে বিগত পৌষ ও মাঘ মাসের মহিলা মুদ্রিত হইয়াছে। তিনি নিজে প্রবন্ধাদি যোগাইয়াছেন, কোন কোন বন্ধুর প্রবন্ধও তাঁহার প্রবন্ধের সঙ্গে প্রকাশিত হইয়াছে। তিন চারি জন নারীহিতৈষী বন্ধু মহিলার উন্নতির জন্য সময়ে সময়ে মহিলাতে প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিয়া থাকেন। সম্পাদক প্রয়োজন মতে তাঁহাদের প্রবন্ধ তাঁহাদের পূর্ণনাম বা আংশিক নামে চিহ্নিত ও পরিচিত করিয়া থাকেন। "আমাদের সম্রাট পত্নী আলেক জান্দ্রা" শীর্ষক প্রবন্ধ ভূলোক প্রদক্ষিণকারী বারিষ্টার সি সেন কর্ত্তৃক লিখিত। উক্ত প্রবন্ধ কম্পোজের জন্য কলিকাতায় প্রেরণ করার সময় সম্পাদক উহার নিম্নে "C. Sen" লিখিয়া দিয়াছিলেন, গত মাঘ মাসের মহিলায় উক্ত প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে, দুঃখের বিষয় উহার সঙ্গে নাম মুদ্রিত হয় নাই। সেই নাম প্রকাশিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন ছিল। উক্ত প্রবন্ধের এক স্থানে উল্লিখিত আছে, "লণ্ডনে আমাদের বাসায় এলিজাবেথ নাম্নী একটী চাকরাণী ছিল ইত্যাদি।" প্রবন্ধে লেখকের নাম প্রকাশ না হওয়াতে সহজে সকলে মনে করিতে পারেন উহা সম্পাদক কর্ত্তৃক লিখিত এবং তিনি বিলাতে গিয়াছিলেন। কিন্তু সম্পাদক কখনও লণ্ডনে যান নাই। "দাদা মহাশয় ও নাতনী" প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত বাবু রাজমোহন বসু কর্ত্তৃক লিখিত। সম্পাদক প্রবন্ধের নিম্নে R. M. Bose লিখিয়া দিয়াছিলেন বা লিখিয়া দিতে বলিয়াছিলেন। তাহা হয় নাই। তাহা লিখিত না হওয়াতে পাঠক পাঠিকাগণ মনে করিতে পারেন উহা সম্পাদক কর্ত্তৃক লিখিত। সেই প্রবন্ধে মাংস ভক্ষণের বিশেষ সমর্থন হইয়াছে। কিন্তু সম্পাদক চিরনিরামিষ ভোজী। তিনি মহিলার অনেক প্রবন্ধে বঙ্গ মহিলাদিগের মাংস ভোজনের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিয়াছেন। তাহা পড়িয়া লোকে মনে করিতে পারেন, সম্পাদকের মতের স্থিরতা নাই।

সম্প্রতি কাবোলের মহামান্য আমির হবিবোল্লা খাঁ বাহাদুর কলিকাতায় আসিয়া কয়েক দিন আমোদ প্রমোদে যাপন করি-

য়াছেন। পূর্ব্বে তিনি দিল্লি আগ্রা প্রভৃতি ভারতের কয়েকটি প্রধান নগর দর্শন করিয়া স্বীয় রাজ্যে চলিয়া যাইবেন এরূপ প্রস্তাব ধার্য্য ছিল। পরে ভারতের রাজধানী কলিকাতায় পদার্পণ করা স্থির হয়। তাঁহার এইরূপ আগমনে ভারত গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে বন্ধুতা দৃঢ়ীভূত হইল। ভূতপূর্ব্ব কোন কাবোল রাজাধিপতি রাজধানী কলিকাতায় আগমন করেন নাই। প্রথম ইঁহারই আগমন।

বর্ম্মদেশীয় কোন লোকের মৃত্যু হইলে আত্মীয় বন্ধুগণ মহা ঘটা করিয়া তাহার শব গোরস্থানে লইয়া গিয়া গোর দেয়। শব মৃত্তিকায় প্রোথিত করার পর আত্মীয় বন্ধুরা বাড়ীতে ফিরিয়া আসিবার সময় কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মৃতব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া বলে, তুমি আমাদের বাড়ীতে আসিয়া থাক, আমরা তোমাকে অত্যন্ত আদর যত্ন করিব ইত্যাদি বলিয়া গোরস্থানের একটি গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া গৃহে লইয়া আইসে এবং ঘরের এক পার্শ্বে শয্যা বিস্তৃত করিয়া তাহার উপর সেই বৃক্ষশাখাটী রাখিয়া দেয়। তদবধি সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত সেই শয্যার পার্শ্বে খাদ্য সামগ্রী সাজাইয়া রাখে, পীনমানা নগরে বর্ম্মদেশীয় একটী ভদ্র লোকের কন্যার প্লেগে মৃত্যু হইয়াছিল। তাহাকে গোর দেওয়ার পর পিতা তাহার বাড়ীতে যাইয়া থাকিবার জন্য তদ্রূপ মৃত কন্যাকে অনুরোধ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আইসেন। কিয়দ্দিন পরে এক জন স্ত্রীলোক যাইয়া তাঁহাকে বলে, আপনার মৃত কন্যা আসিয়া আমাকে বলিয়াছে যে বাবা আমাকে আদর করিয়া ডাকেন নাই, তজ্জন্য আমি তাঁহার গৃহে যাই নাই। ইহা শুনিয়া পিতা ব্যস্ত সমস্ত হন পুনর্ব্বার ধর্ম্মযাজক ফুঙ্গীসহ গোরস্থানে যাইয়া বিশেষ মন্ত্রাদি পাঠ করেন, এবং বাড়ীতে যাইবার জন্য বিশেষ কাকুতি মিনতি করিয়া কন্যাকে অনুরোধ করেন।

পাঠক পাঠিকাদিগের নিকটে আমাদের সানুনয় অনুরোধ যে মহিলার দ্বাদশ বৎসরের ৮ম মাস অতীত হইল, তাঁহারা যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক অবিলম্বে বর্ত্তমান বৎসরের মূল্য ২৲ এবং পূর্ব্ব বাকি যাহা থাকে তাহা পাঠাইয়া আমাদিগকে বাধিত করেন।

প্রেরিত পত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মা সময় সময় বালিকাদের জন্য কত কষ্ট কত অপমান সহ্য করিয়াছেন, কিন্তু অনেক সময়ে তাহাদের নিকট হইতেই বিপরীত ফল পাইয়া বড় আঘাত পাইতেন। কিন্তু নিন্দা প্রশংসা সুখ দুঃখের জন্য ব্যাকুল না হইয়া সকলই ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া সহ্য করিতেন।

মা জীবনের শেষ ভাগে একটী মর্ম্মান্তিক কষ্টে বড় আঘাত পাইয়াছেন। একটী বালিকা ১১।১২ বৎসর বয়সে আশ্রমে আসে। মা তাহাকে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়া পালন করিতে থাকেন। এই বালিকাকে তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠ কন্যার সম এমন কি আমা অপেক্ষা অধিক স্নেহের চক্ষে দেখিতেন।

দশ বৎসর কাল কত যত্ন ও স্নেহ সহকারে পালন করিয়াছেন। মার দেহত্যাগের কিছুদিন পূর্ব্বে বালিকাটীর কোন গুরুতর ত্রুটি প্রকাশ পাওয়ায় সে আত্মহত্যার উদ্‌যোগ করে। সে জন্য তাহাকে লইয়া মা পূর্ণ গর্ভাবস্থায় এবং নিজের অত্যন্ত অসুস্থতা সত্ত্বেও তিন চারি রাত্রি হস্‌পিটালে জাগরণ করেন। সে আরোগ্য লাভ করিলে মার অনভিমতে স্থানান্তরে যায়। মা সেই শোকে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন, এবং মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তও তাহার জন্য কষ্ট করিয়াছেন ও অনেকবার তাহার নাম করিয়াছেন।

ইহার পর হইতেই মার শরীর ভাঙ্গিয়া আসে। সর্ব্বাঙ্গ ফুলিয়া একেবারে চলচ্ছক্তিহীন হইয়া পড়েন। বাবা তখন গিরিধি ছিলেন। বাবা মার অসুখ হইয়াছে শুনিয়া ফিরিয়া আসিলে পর ভক্তিভাজন ডাক্তার অতুলচন্দ্র রায় মহাশয় দ্বারা চিকিৎসা করান হয়। তিনি প্রস্রাব পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে প্রস্রাবের সঙ্গে Albumen হইয়াছে। প্রসবকালে জীবন সংশয়। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায় দুই দিন পরে হঠাৎ ঈষৎ বেদনা অনুভব করিয়া অতি সহজে যমজ একটি জীবিত ও একটী মৃত পুত্র সন্তান প্রসব করেন। ক্রমে জ্বর হইল। অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া আসিল। চৈতন্য লোপ পাইল। অতুল বাবু আমাদের প্রতি সদয় হইয়া অত্যন্ত যত্নের সহিত চিকিৎসা করাতে একটু সুস্থতার দিকে আসিলেন। কিন্তু আবার নানারূপ উপসর্গ আসিয়া জীবন সঙ্কটপূর্ণ করিয়া তুলিল। এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় ফল না হওয়ায় কবিরাজ দেখান হইল। ভক্তিভাজন কবিরাজ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সেন মহাশয় শেষ কয়দিন অত্যন্ত যত্ন সহকারে দেখিয়া ঔষধের ব্যবস্থা দিলেন, একটু ফল দর্শিল, জ্বর কমিয়া গেল, কিন্তু তাঁহার জীবন লীলা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। ক্রমশঃ শরীরের তাপ কমিয়া আসিল। শুক্রবার প্রাতে জ্বর ৯৬'৪ দেখিলাম। প্রাতে ভয় হইল কিন্তু ভাবি নাই যে আজই শেষ দিন। আজই মা এই সংসারে প্রিয় পরিজনবর্গ হইতে বিদায় লইবেন। আজই প্রাণ ভরিয়া মার সহিত শেষ কথা বলিতে হইবে। প্রাতঃকালে কয়েকবার দাস্ত হইল। মধ্যাহ্নের পর আর দাস্ত হয় নাই। সমস্ত শরীর শীতল হইয়া আসিল। সন্ধ্যার সময় দুঃখ ও কৃতজ্ঞতার সহিত বাবাকে বলিলেন "তুমি আমার জন্য কত কষ্ট করিলে আমি তোমার কিছুই করিতে পারিলাম না।" তৎপরে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঔষধ পথ্য যাহা দিলাম আনন্দের সহিত গ্রহণ করিলেন। প্রায় ৮।০ টার সময়ে আমার কাছে জল চাহিলেন। আমি শেষ অল্প জল দিলাম, কিন্তু প্রাণ ভরিয়া দিলাম না। আমি ঔষধ দিবার বন্দোবস্ত করিলাম। অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত মা শেষ বলিলেন আমাকে প্রাণ ভরিয়া এক ঘটী জল দে। হঠাৎ ফিট হইল। বাবা হরিনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। জল দিলাম আর উদরস্থ হইল না। শ্বাস চলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে পরে

সাতবার ফিট হইল। ৯॥০ টার সময় প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। মা সংসারের সকল দুঃখ যন্ত্রণা এড়াইয়া শান্তিদায়িনী মার শান্তি ক্রোড়ে চিরশান্তি লাভ করিলেন। হায় সকলই শেষ হইল। আমরা মাতৃহীনা হইয়া সংসারে হাহাকার করিতে লাগিলাম। কিন্তু যিনি মাতৃহীনার মা তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল। তিনি মাকে তাঁর শান্তি ক্রোড়ে স্থান দিয়া পরলোক গত সমুদয় আত্মার সহিত মিলিত করিয়া শান্তি দিলেন ধন্য করিলেন ও আমাদের তাহা দেখিতে দিয়া সান্ত্বনা করিলেন ও শান্তি দিলেন।

মা রোগ শয্যায় প্রায় ২॥ মাস পড়িয়া ছিলেন। আমরা কত সময় তাঁহাকে কষ্ট দিয়াছি। একাকী একঘরে রাখিয়াছি। কিন্তু কখনও ত্যক্ত বিরক্ত হন নাই। আমাদের স্নানাহারের দেরী হইলে অনেক সময়ে ব্যস্ত হইয়া বার বার অনুরোধ করিতেন। বিছানায় মলমূত্র ত্যাগ করিয়া ফেলিলে অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইয়া পড়িতেন। বাবা সময় সময় বলিতেন তুমি যে এরূপ কর হরিপ্রভার ত বড় কষ্ট হয়। তাহাতে বড়ই লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইয়া কষ্ট বোধ করিতেন। হায়! এত কষ্ট পাইয়াও আমাদের প্রতি এত স্নেহ!

বাবা যখন জিজ্ঞাসা করিতেন মৃত্যুতে ভয় হয় কি? তাহাতে বলিতেন না কিছুই ভয় হয় না সেইত শান্তির স্থান, পৃথিবী অসার। কিছু বলিবার আছে কিনা জিজ্ঞাসা করাতে বলিতেন কি বলিব বলিবার কিছুই নাই। কাহাকেও দেখিতে ইচ্ছা হয় কিনা জানিতে চাওয়াতে বলিতেন দেখিয়া কি হবে। মার কিছুই আকাঙ্ক্ষা ছিল না।

মা স্বভাবতঃ কয়েকটি গুণে বিভূষিত ছিলেন। সরলতা ও স্পষ্টবাদিতা মার অত্যন্ত অধিক ছিল। সরল ছিলেন বলিয়া যখন যাহা দেখিতেন অমনি বলিয়া ফেলিতেন। এই জন্য অনেকের কাছে লাঞ্ছিত হইতেন ও অনেকে তাঁহাকে মুখরা ভাবিতেন। বিলাসিতা মার নিকট বিষতুল্য বোধ হইত। যৌবনের প্রারম্ভে অলঙ্কার বেশভূষা সব ত্যাগ করেন। কখন মোটা বস্ত্র ভিন্ন ভাল কাপড় পরিধান করিতেন না। আমার মাতুল মহাশয়ের বাড়ী হইতে যদি কখনও কোন ভাল কাপড় পাইতেন তাহা আমাকে কিংবা আশ্রমস্থ বালিকাদিগকে পরিধান করিতে দেখিয়া সুখী হইতেন। কয়েক মাস পূর্ব্বে বাবা যখন কলিকাতায় গিয়াছিলেন তখন মা আমাদের জন্য কয়েকখানা ভাল কাপড় আনিতে বলেন। তৎসঙ্গে আশ্রমস্থ তাঁহার অতি স্নেহের কন্যাটীর জন্য একখানি কাপড় আনিতে অনুরোধ করেন। এই সঙ্গে মার জন্য যে একখানা কাপড় আনেন, গত পূজার সময় আমরা যখন সানড়ার মাতুলালয়ে গিয়াছিলাম, মা এক দিন তাহা পরিধান করিয়া দিদিমা ও আর আর সকলকে দেখাইয়া বলিলেন, "তোমার জামতা আমাকে এই কাপড়খানি দিয়াছেন।" মা আর এই কাপড় পরিধান করেন নাই, আমরা পরিতে বলিলে পরি-

তেন না। কোথায়ও যাতায়াত কালে মোটা কাপড় পরিয়া যাইতেন।

যদি কখন কাহাকেও বিলাসিতা করিতে দেখিতেন অমনি শাসন করিতেন। এই জন্য মা অনেক সময়ে কঠোর প্রকৃতি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

মার ভালবাসা, স্নেহ, ভক্তি অকৃত্রিম ছিল। আমাদের যে বেশী রকম আদর করা তাহা ছিল না। কিন্তু আমাদের আহার বিহার সুস্থতা ও অসুস্থতার প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। বাবার শরীর অসুস্থ বলিয়া স্বহস্তে গম ভাঙ্গিয়া ময়দা প্রস্তুত করিয়া কত যত্নের সহিত রুটী করিয়া দিতেন।

ঋণকে মা বড় ভয় করিতেন। আশ্রমের এতগুলি বালিকা ও আমাদের লইয়া অল্প আয়ে কিরূপ সুশৃঙ্খলতার সহিত চালাইতেন ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। স্বহস্তে কোদাল ও খুরপি লইয়া এখান হইতে ওখান হইতে অন্বেষণ করিয়া কত শাক সবজী বপন করিতেন।

রাজভক্তি মার অতি মাত্রায় ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে যখন অনেকে কেবল পরনিন্দা পরচর্চ্চা করিয়া এবং স্বদেশের উন্নতির জন্য কিছু না করিয়া কেবল বক্তৃতা করিয়াই ধন্য হইতেন। তখন মা বলিতেন, "ফষ্টি রেখে কাজ কর। সাহেবী বিলাতী ফ্যাসন ছাড় পরে বক্তৃতা কোরো।" মা এই সময়ে এক খানি সামান্য জোলাদের মোটা কাপড় পরিধান করিয়া আনন্দিত থাকিতেন।

বাবা যখন সময় সময় অন্যত্র যাইতেন মা আশ্রমস্থ বালিকাদের লইয়া একাকী নানা অসুবিধা সত্ত্বেও সুশৃঙ্খলতা-সহকারে সকলকে পালন করিতেন। প্রতিদিন প্রাতঃকালে বালিকাদের ও আমাদের লইয়া ঈশ্বরসমীপে প্রার্থনা করিতেন।

মা সকল কার্য্য অত্যন্ত ক্ষিপ্রকারিতা সহকারে করিতেন। অনেক সময়ে আমরা দশ জনেও যাহা করিতে পারিতাম না, মা এক মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহা করিয়া ফেলিতেন। শিল্পকার্য্যও মা কিছু জানিতেন। নিজের বুদ্ধিতে ছোট ছোট ছেলেদের ফ্রক্, লাল টুপি প্রভৃতি বুনিয়া দিতেন। সকল কাজই অত্যন্ত তাড়াতাড়ি করিতে পারিতেন।

পবিত্রতা ও সচ্চরিত্রতার প্রতি মার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। আশ্রমস্থ অবিবাহিতা বালিকা ও একটি অল্পবয়স্কা বিধবা কন্যাকে বিশেষ যত্নসহকারে পালন করিতেন। প্রায়ই বলিতেন, "আমার বিধবা কন্যাটীকে যদি শেষ পর্য্যন্ত যত্নের সহিত রক্ষা করিতে পারি তবেই আমার শান্তি।" তাহাকে আর আর সকলকে লইয়া কত সময়ে প্রার্থনাদি করিতেন। যদি কখনও কোনরূপ ত্রুটি বা চালচলনে ব্যতিক্রম দেখিতেন অমনি শাসন করিতেন ও সাবধানে রাখিতেন।

এইরূপে দীন জননী মা মার ক্ষুদ্র জীবন দ্বারা এই সংসারে চুপে চুপে কত কাজ করিলেন। জগৎকে দেখাইলেন একটি ক্ষুদ্র প্রাণী দ্বারা সংসারের কত বৃহৎ কাজ সংসাধিত হইতে পারে। আমরাও যাহাতে মার এই সদ্দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া নীরবে আমাদের ক্ষুদ্র জীবনের কার্য্য সমাধা করিয়া যাইতে পারি দয়াময়ী মা আমাদিগকে সেই শুভাশীর্ব্বাদ করুন।

ভিক্টোরিয়ামহিলাবিদ্যালয়।

ফেনিলনের জীবন *।

গতবারে মেডাম গায়নের জীবনী বলিতে তার মধ্যে এক জায়গায় ফেনিলনের নাম করা হইয়াছিল। মেডাম গায়নের সময়ই ফরাসী দেশে ফেনিলন ও বোথা আরও কয়েকজন লোক জন্মেন, যাঁদের নাম আজ পর্যান্ত তাঁহাদের প্রতিভার জন্য, সাধুতার জন্য, ধর্ম্মের জন্য প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। ইহাঁদিগকে মধ্যে ফেনিলন বিশেষরূপে বিখ্যাত। সেণ্ট ফ্রান্সেসও ফরাসী দেশের সাধু। ফরাসী দেশের সাধুদের জীবন আলোচনা করিলে, মনে হয় এদের অন্য দেশের সাধুর সঙ্গে মিল আছে। ইহাঁদের আমাদের সাধু বলিয়া বলিতে ইচ্ছা করে। যদিও এদের পোষাক পরিচ্ছদ আলাদা, সময় আলাদা, জল, হাওয়া, আচার ব্যবহার, রাজ্য, রাজা সব বিষয়ে ইহাঁদের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ আছে, তবুও ভিতরে একটা মিল আছে। প্রথমে যেমন সীতার ও অগাথার কেমন কেমন একটা মিল ছিল, দেখান হয়েছে। সীতার যেমন অগ্নি-পরীক্ষায় আপনার সতীত্ব দেখান, অগাথা ভয়ানক পরীক্ষায় পড়িয়া ভগবানের উপর বিশ্বাসের প্রমাণ দিয়া যান। আজ কাল যদিও অগাথার মত পরীক্ষায় কাহাকেও পড়িতে হয় না। মেডাম গায়নের ভগবানে প্রেম যে খাটি ছিল, কল্পনা নয়, তাহাও তিনি পরীক্ষায় প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। বারে বারে পরীক্ষায় পড়েছেন। কিন্তু সব তাতেই তিনি পাস হয়েছেন। তার পর যে দৃষ্টান্ত ইহাঁরা রাখিয়া যান, তাহা ১০।৫০ জন লোক অনুসরণ করেন। ইহারা যে কোন মণ্ডলী স্থাপন করিয়াছেন, তাহা শোনা যায় না। কিন্তু যে জীবন দেখাইয়া যান, তার আদর্শে অনেকে জীবন গঠন করে। সীতার কথা বলিতে বলিতে এরূপ সন্দেহ হইতে পারে যে, ঐতিহাসিক কোন ব্যক্তি নয়, সেণ্ট অগাথা বিষয়ে সেরূপ সন্দেহ করিবার কারণ কম, মেডাম গায়ন আমাদের একেবারে নিকটে, তাঁর বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ খুব কম। আজকে যাঁর কথা বলা হবে, তিনি ৩০০ বৎসর আগে জন্মেন। ইহাঁকে মেডাম গায়নের সমসাময়িক বলা যাইতে পারে। গায়ন ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে জন্মেন, ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে মারা যান। ফেনিলন ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে জন্মেন, ও ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে মারা যান। ফেনিলনের মেডাম গায়নের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল বলে, শেষ জীবনটা খুব পরীক্ষায় পড়িতে হইয়াছিল। মেডাম গায়ন যে বই লেখেন, তাতে যে সব ভাব ছিল তা লোকে গ্রহণ করে নাই। ভুল ভ্রান্তি আছে বলিয়া কেহ তাহা পাঠ করিত না।

ফেনিলন ইনি সেদিনকার লোক, ইহার বিষয়ে আমরা সন্দেহ করিতে পারি না।

---

* ১৯০২ সন ১৮ই মার্চ্চ শ্রীযুক্ত ভাই প্রমথ লাল সেন প্রদত্ত বক্তৃতামূলক।

ইহার লেখা, জীবনী পড়িয়া ও ইহাঁর স্বরচিত জীবনী পড়িয়া আমরা সব জানিতে পারি। বিদেশের লোকে যে সাধু হতে পারে, তা আমাদের মনে হয় না। কোট পেণ্টুলন পরা লোকে যে সাধু ভক্ত হইতে পারেন, তা যেন আমাদের বিশ্বাসই হয় না। ইনি যে রকম লোক, অমি ইহাঁকে ভক্ত শ্রেণীর মধ্যে ধরিতে চাই। দুরকমের সাধু আছেন, এক দল সংসার ছেড়ে বনে গিয়ে বাস করেন বা মরুভূমিতে শেষজীবন সাধন ভজন, সিদ্ধিলাভ করে কাটাইবেন। সহরে আর ফিরিবেন না, হয়ত তাঁরা বিবাহ করেছেন, কিন্তু বৈরাগী হয়ে সংসার ছেড়ে চলে যান। অনেক লোক তাঁদের কাছে উপদেশ নিতে যায় তাঁরা সেইখানে থেকেই উপদেশ দেন। আর এক রকম সন্ন্যাসী আছেন, যাঁরা বিবাহ করেন নি, কিন্তু লোকালয়ে থাকেন। লোক জনের সঙ্গে মেশেন। রাজা রাণী ও অনেক অনেক বড় লোকের সঙ্গে মেশেন, তাঁদের উপদেশ দেন, পরামর্শ দেন। তাঁরাও ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ করেন। দুরকমের দল আছে, ফেনিলন শেষোক্ত দলের। যদিও বিবাহ করেন নাই, তবুও রাজা রাণী সকলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিতেন, অনেক লোককে চিঠি লিখিতেন। ইহার জীবনের প্রভাব রাজা বড় লোক সকলকে অনুভব করিতে হইয়াছিল। এখন দেখা যাক, উনি নিজে প্রথমে কোথায় শিক্ষা পান, পাস করা ছাড়া, আরও বিশেষ শিক্ষা করিতে হয় যাঁরা ধর্ম্মযাজক বা পুরোহিত হন, তাঁদের বিশেষ শিক্ষা পাইতে হয়। এক মণ্ডলীর মধ্যে থাকিয়া সেখানে সাধন ভজন করিতে হয় ও নিয়মে থাকিতে হয়। তার পর অনেক দিন এইরূপ থাকার পর জন কতক বড় বড় লোক মিলে যখন বলিবেন যে উপযুক্ত হইয়াছে তখন পুরোহিত হন, শিক্ষা দেন ও উপদেশ দেন। ফেনিলনকেও এইখানে শিক্ষা করিতে হয়। ছেলেবেলায় একবার তাঁর দূরদেশে প্রচার করিবার ইচ্ছা হয়, অভিভাবকের কাছে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তিনি শরীর দুর্ব্বল বলিয়া যাইতে বারণ করিলেন। ১৫।১৬ বৎসর বয়সে, এমন বক্তৃতা দিতে পারিতেন যে সকলে মোহিত হইয়া যাইতেন। বক্তৃতা দিবার তাঁহার একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা ছিল। তার পর সেণ্ট ক্রিসারে থাকিয়া বিশেষ শিক্ষা লাভ করেন। সেখানে সামান্য সামান্য কাজ করিতে হয়, ছুতোরের কাজ রোগীর সেবা গরিবের সেবা ইত্যাদি সামান্য কাজে নিযুক্ত থাকিতে হয়। ৫।৬ বৎসর এইরূপ ভাবে থাকেন। ইহার পর অভিভাবকেরা যখন সন্তুষ্ট হন, এবং বলেন যে এত দিন সেবা করিয়াছ, বেশ উপযুক্ত হইয়াছ। তবে পুরোহিত বলে গণ্য হন। এখানে থাকার সময় তাঁর কতকগুলি গুণ প্রকাশ পায়। অনেক লোকের সঙ্গে থাকিতে হইত, তাঁরা সকলে খুব ভাল বাসিতেন। ছোট ছোট কাজ করিতে গিয়াই বিনয় ধৈর্য্য সকল প্রকাশ পায়, কারণ সেইখানেই মানুষ বেশী বিরক্ত হয়। বিনয় না থাকিলে ও সমস্ত কাজ করা যায় না। চতুর্দ্দশ লুই তখন ফ্রান্সের রাজা ছিলেন। রাজার কাছেও ক্রমে তাঁর সুখ্যাতি গিয়া পৌছায়। রাজা তখন ফেনিলনের সঙ্গে

আলাপ করিলেন, এবং দেখিলেন যে খুব উচুঁদরের লোক। রাজা বলেন, আমার নাতির জন্য একজন গুরু দরকার যিনি সব বিষয়ে শিক্ষা দেবেন। রাজার ছেলের ও গুরু ছিল। ফেনিলনকে গুরুপদ গ্রহণ করিতে বলেন, রাজা অন্য লোকের নিকট এ বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁরাও বলিলেন, ফেনিলনের মত উপযুক্ত লোক আর নাই। তখন তিনি রাজার নাতিকে পড়াইতে লাগিলেন। এই কাজে তিনি অনেক দিন থাকেন। এই কাজ পাইবার পর চারিদিক হইতে ভাল ভাল চিঠি পাইতে লাগিলেন। তার বন্ধু বান্ধব সকলে তাঁর এই উন্নতিতে খুব আনন্দ করিয়া ও তাঁর মত লোক এই কাজের উপযুক্ত এই-রূপ প্রশংসা করিয়া লেখেন। ডুসেওয়ে ঐরূপ প্রশংসা করিয়া লেখেন। কিন্তু তাঁর গুরু, ত্রুমসন যে চিঠি লেখেন তাহা অন্য রকমের অন্য লোকের মত প্রশংসা করে লেখেন নাই, তিনি সাবধান করিয়া দিয়াছেন। তিনি এইরূপ লেখেন,—তুমি এই পদ গ্রহণ করেছ সুখের বিষয়, তোমার মত উপযুক্ত লোকও আর নাই, কিন্তু তবু বলছি সাবধান থাক্‌বে। তোমার অনেক স্বাভাবিক গুণ থাকিলেও আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। তুমি আমার কথাগুলি ভাল ভাবে নিও, এবং তোমার সম্বন্ধে এরূপ কথা বলা আমার উচিত নয়, কারণ তুমি খুব সাধু উচ্চ চরিত্রের লোক, তবুও আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। রাজার কাছে কাজ নেওয়ার অনেক ঝঞ্চাট আছে। প্রায় লোকে মন্দ হয়ে যায়। ধর্ম্ম কর্ম্ম ভাল করে করিতে পারে না, হয় নিজের কর্ত্তব্য ভাল করে করিতে পারে না, কিম্বা রাজার কাজ ভাল করে করে না, এবং নিজের মণ্ডলীর মধ্যে যে তাহার কাজ তাহা উত্তমরূপে করে না। ক্রমে মনে একটা অহঙ্কার আসে, গরিবদের উপর ঘৃণা হয়। কিন্তু ফেনিলন এ সব কথা ভালবাবেই লইলেন, উপদেষ্টার উপদেশ মতই কাজ করিলেন। ক্রমে বুঝিতে পারিলেন এতে বিপদ আছে। এবং গুরু যে লেখেন এ কাজে ঝঞ্চাট আছে তাহাও খুব বুঝিতে পারেন। সেই ছেলেকে এক দিন কোন ছাই কাজ করাতে ধমক দেন, সে মুখে মুখে উত্তর দেয়। কিন্তু তিনি আর কিছু না বলে চুপ করে রইলেন, ভোর বেলা তার শোবার ঘরে গেলেন। ঠিক যখন সে ঘুম থেকে উঠেছে, উনি গম্ভীর ভাবে গিয়া ওর ঘরে দাঁড়ালেন। অন্য দিন হাঁসিতে হাঁসিতে যাইতেন। বলিলেন দেখ তোমার প্রতি আমার কিছু বলিবার আছে, তুমি যে আমার চেয়ে নিজেকে বড় মনে করছ সেটা ভুল, তাহা দূর করিয়া দাও। রাজার ছেলে তোমার গৌরব করিবার কিছু নাই, ভগবান তোমাকে রাজকুমার করে জন্ম দিয়াছেন। যদি মনে কর আমি ত চাকরী করছি তুমি আমার কথা শুনবে না, যা ইচ্ছা তাই করিতে পার। তবে আমি রাজাকে বলিব আপনার নাতির জন্য আর এক জন গুরু দেখুন, আমি আর থাকিতে পারিব না। রাজাকে গিয়া এই কথা বলিলেন আপনি অন্য গুরু দেখুন। রাজার নাতি অদ্ভুত রকমের ছিল, খুব বুদ্ধি ছিল, লেখা-পড়া করিত, কিন্তু ভয়ানক দুর্দ্দান্ত ছিল ও অহঙ্কার ছিল। এই রকম ছেলেকে তিনি

পড়াতেন।৮ ইহার পর কিন্তু সেই ছেলের ভারি অনুতাপ হয়, রাজা রাণী সকলে এসেও খুব বলিতে লাগিলেন, আপনি ছাড়্‌লে হবে না। তখন কি করেন, আবার সেই কাজ নিলেন। ইহার পর থেকে তার খুব বিনয় হল, ধর্ম্ম ভাব দেখা গেল, খুব ভাল হল। ফেনিলনের জীবনের দৃষ্টান্ত ইহার ভিতরে খুব কাজ করিয়াছে। বক্তৃতা দিতেন লোকে খুব সুখ্যাতি করিত, তাতেও তাঁর মাথা টলে নি। রাজা খুব প্রশংসা করিতেন, তাতেও তাঁর মাথা টলে নি। ইহার পর তাঁকে আর্চ বিশপ করে দেওয়া হয়। এখানকার বিষপ দের ৭০০০।৮০০০ টাকা মাইনে। তিনি যত টাকা পাইতেন সব দিয়ে দিতেন। কিন্তু তখন বিশপ বা আজকালকার চেয়ে অনেক কম পাইতেন, কিন্তু যাহা পাইতেন সব বিলিয়ে নিজের কিছু থাকিত না, এমন কি বাসন কাপড় সব দিয়ে দিতেন। কখনও কোন বন্ধু গেলাস কি প্লেট দিতেন, তবে কাজ চলিত। মাইনে আসিতে দেরী হলে, কেহ বলিল সব লোকজন ছাড়িয়ে দেও। তিনি বলিলেন, আমি নিজে রুটী খেয়ে থাকিতে পারি, কিন্তু চাকরদের ছাড়িয়ে দিতে পারি না। রাজা রাণী জানিতে পারিলেই অভাব মোচন করিতেন, কিন্তু কাহাকেও কিছু জানিতে দিতেন না। কেহ অত খোঁজ করিত না, টাকাকড়ি তিনি কিরকম করে খরচ করিতেন। ভিতরে খুব গরিবের ভাব ছিল। ম্যাডাম গ্যায়নের পক্ষ নিয়ে তাঁকে অনেক পরীক্ষায় পড়িতে হয়। প্রথমে যখন ফেনিলন ম্যাডাম গ্যায়নের কথা শুনেন, তখন তার সন্দেহ হয়, এ আবার কি রকম। কিন্তু যখন আলাপ করলেন, তখন মনের ভাব বদলে গেল। ম্যাডাম গ্যায়নের বই ভাল করে পড়লেন। বলিলেন এত ভাল বই, এতেত কিছু মন্দ নাই। ডুসওয়ে তাঁর বন্ধু ছিলেন, তিনি বলিলেন এ ভয়ানক বই, ইহাতে যেমত আছে তাহা প্রচার হলে সর্ব্বনাশ হবে। ইহা লইয়া ফেনিলনের সঙ্গে তাঁর বিরোধ হয়। যদিও বন্ধুতা ছিল, তবুও এই বিরোধ শেষকালে এতদূর গড়ায় যে পড়লে আশ্চর্য্য হতে হয়। রাজা রাণী সকলের কাছে ফেনিলনের নামে লাগলেন কেবল চেষ্টা করিতে গেলেন কিসে উহাঁকে তাড়াইতে পারেন। পোপকে লেখেন এ বই সব ভুল ইহা সকলে পড়লে অনিষ্ট হবে। আপনি রুল প্রচার করে দিন, এ বই কেহ পড়িতে পাইবে না। ইনি আর কোন পদ নিয়ে কাজ করিতে পারিবেন না। একলা যা করেন করুন। ম্যাডাম গ্যাওন পোষকতা করিতে গিয়া, নিজের খুব মুস্কিল হল। রাজারাণী যাঁরা বন্ধু ছিলেন, তাঁরা সব শত্রু হয়ে উঠলেন। রাজা পোপের কাছে গেলেন, গিয়ে ফেনিলনের বই যে ভয়ানক তাই বলিলেন এবং বলিলেন, আপনি উহাঁর বিরুদ্ধে এখনই রুল প্রচারিত করি দিন। পোপ বলিলেন আমি এত শীঘ্র কিছু করিতে পারি না পাঁচ জন কার-ডিনাল মিলে বিবেচনা করিতে হইবে। পোপ কিন্তু ফেনিলনের সঙ্গে আলাপ করে খুব সুখী হন ও ভাল ভাব হয়। এই রাজার কথা শুনিয়াও হঠাৎ একটা কিছু

করিলেন না। পোপ যখন ফেনিলনসম্বন্ধে কথা তুলিলেন, তখন মত ভেদ হইল। ডুসওয়ের চেষ্টা কিসে রাজা রাণীরও চেষ্টা কিসে কি করে ফেনিলনকে তাড়াইতেও অপমান করিতে পারেন। পোপ রাজার কথামত কাজ করলেন বলে, তাঁহাদের দুজনে ঝগড়া হল। রাজা বলিলেন,আমার কথা শুনিতেই হইবে ফেনিলনকে তাড়াইয়া দাও, আমি অত যুক্তি চাহি না, এই সব বলে ভয় দেখালেন। রাজা যে ফেনিলনের বিরুদ্ধে লাগেন, তাহা অন্য লোকের মন্ত্রণায় তার নিজের অতটা রাগ হয়নি, তখনকার পোপের যদিও খুব শক্তি ছিল, তবু রাজাদের ভয় করে চলিতে হইত। পোপ তখন কি করবেন কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া অবশেষে বলিলেন, আচ্ছা আমি রুল লিখে দিচ্ছি, কিন্তু অত শক্ত শক্ত কথা লিখতে পারব না। রাজা ইহাতে খুব চটে গেলেন। বলিলেন, আমি যা বলি ঠিক তাই করিতে হইবে। পোপ কি করবেন কিছুই ঠিক পান না। এদিকে তিনি ফেনিলনকে খুব ভক্তি করিতেন, ওদের কথায় সায় দিয়ে রুল লিখে দিলেন। ফেনিলন যখন মন্দিরে উপদেশ দিতে যাচ্ছিলেন তখন একজন দূত গিয়া তাঁকে এই খবর দিল। খবরটা পেয়ে মনে হল, এই বিষয়ে উপদেশ দি। বিনীত ভাবে রাজার ও পোপের আজ্ঞা গ্রহণ করিলেন, অর্থাৎ কাজ ছেড়ে দিলেন না। মন্দিরে উপদেশ দিতে দিতে বলিলেন আমার আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না, কেবল তাঁর ইচ্ছা পালন করা, আমাকে অপমানিত করা আমার বই পুড়িয়ে ফেলা, আমার তাড়িত হওয়া তাই যদি তাঁর ইচ্ছা হয় তাই পূর্ণ হোক। এমনি ভাবে বলিলেন, সকলে কাঁদিতে লাগিলেন, ও চমৎকৃত হইয়া রহিলেন। কিন্তু তাঁর শত্রুরা ইহাতেও সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি তাঁহাদের চিঠি লিখিলেন, তাঁর যা ইচ্ছা তাই হবে, আমি তোমাদের আজ্ঞা পালনে বাধ্য. কিন্তু তাই বলে, আমি মনে করি না আমি যা লিখেছি তা ভুল। চিঠিতে খুব ভালবাসার ভাবই ছিল, রোষের ভাব ছিল না। বিনীত ভাবে শত্রুদের আজ্ঞা বহন করিলেন, তাঁদের কোন অপকার করিতে চেষ্টা করিলেন না। পোপ রুল প্রচার করে ভয়ানক অশান্তিতে দিন কাটাইতে লাগিলেন। ডুসাওয়ে যিনি ফেনিলনের বন্ধু ছিলেন, এবং যখন ভয়ানক শত্রু তখনও তাঁর সম্বন্ধে মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল না। একজন লোক এসে তাঁর কাছে ডুসওয়ের নিন্দা করিতে ছিলেন, কিন্তু তিনি বলিলেন, তাঁর নিন্দা করিও না, এরকম লোক কোথায় পাইবে? সে লোক একথা শুনে অবাক্, যে যিনি এত সর্ব্বনাশ করিলেন তার সম্বন্ধে এত ভাল ভাব। ফেনিলন এখন নির্জ্জনে বাস করিতে লাগিলেন, সেখানে চাষা, ছোট লোকদের সঙ্গে মিশিতে লাগিলেন। তাদের সঙ্গে গল্প করিতেন, তারা খুব ভালবাসিত।

তিনি বড়লোকের মেয়েদের উপদেশ দিয়ে চিঠি লিখিতেন। ইংরাজিতে তার অনুবাদ আছে, তাহা হইতে আপনাদের কিছু কিছু পড়িয়া শুনাইতেছি। চিঠিগুলি

অতি সুন্দর। নানা লোকের নানা রকমের রোগ হয় তাহা দেখাইয়াছেন। উনি যাদের চিঠি লিখিতেন তারা প্রায়ই বড় মানুষের মেয়ে গরিবের মেয়ে নয়। একটী মেয়ে চিঠি লিখেছেন যে তাঁরা কোন একটা কথা শুনে মন খারাপ হয়েছে তার উত্তরে লিখছেন যে, একটা গুজব শুনে তাই নিয়ে তোমার ঘুম হল না। (এ দেশেও যেমন পরনিন্দাই কেবল মেয়েদের কথা, সে দেশেও ঠিক সেই রকম তাঁদের অনেক সময় পরনিন্দাতে করে কাটে।) একটা গুজব শুনে তোমার মনে এত কষ্ট হল, তাত ঠিক নয় এরকম কেন হয় একটু ভেবে দেখ। আমাদের মনে হয় না যে পৃথিবীর মধ্যে ভাল লোক আছে, কিন্তু বাস্তবিক অনেক লোক আছেন যাঁরা যথার্থই ভাল। নিজে মন্দ লোক হলে, অন্যকেও মন্দ মনে হয়। যারা ভাল লোক তাঁদেরও পতন হইতে পারে, কারণ সকল মানুষই অল্প অধিক দুর্ব্বল। যদি একথা তোমার মনে থাকে তবে অন্যের সম্বন্ধে তোমাকে আশ্চর্য্য হইতে হবে না। এই মেয়েটী আর একবার লিখছেন যে, আমি যেখানে আছি যে অবস্থায় সর্ব্বদা লোক জনের সঙ্গে মেশা খাওয়ান, গান বাজনা করতে হয় এ অবস্থায় কি ধর্ম্ম হইতে পারে। ফেনিলন তার উত্তর দিচ্ছেন, এই যে অনেক সময় মনে হয় যে জায়গায় যে অবস্থায় আছি এখানে ধর্ম্ম সুবিধাজনক নয় বয়স বেশী হইলে অন্য অবস্থায় পড়িলে ধর্ম্ম হইবে ইহা অত্যন্ত ভুল। তোমার পক্ষে যে সব কর্ত্তব্য আছে এসব ছেড়ে দিয়ে অন্য কাজ করে ধর্ম্ম হবে, তা নয়। আমাদের মুক্তি এখানেই, যে অবস্থায় আছি সেই খানে আমি পুরোহিত, আমার কাজ এখানে আমার পরিত্রাণ ইহাতে হইবে। তুমি রাজার মেয়ে তোমার অনেক রকম সুবিধা আছে, তাহার সদ্ব্যবহারে তোমার মুক্তি। মনে রাখবে ভগবান প্রত্যেক মুহূর্ত্তে আমাদের জন্য কর্ত্তব্য ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন। এই যে সময় পাচ্ছি, এমন সুযোগ আর পাব না, এখন আমার যা কর্ত্তব্য তাহা করি। তাই বলছি যে, যেখানে আছি, সেই খানে বসেই ধর্ম্ম হয়। আমোদ প্রমোদ করা উচিত, তাতে যে অপকার হয় তা নয়, তবে যদি আমোদ করিতে গিয়ে তাঁকে ভুলে যাও তবেই অপকার। তুমি রাজার মেয়ে তোমাকে আমোদ প্রমোদ করিতেই হইবে, সে সব ছাড়িতে পার না, তুমিত সন্ন্যাসী নও যে এসব ছেড়ে অন্য জায়গায় যাবে। সেইখানে থেকেই তোমার কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে। লোক জনের সঙ্গে মেশামেশী, খাওয়ান দাওয়ান এসব করিতে হইবে, কিন্তু তার ভিতর নিজেকে সামলাতে হবে, সেই টাই ধর্ম্ম। যদি এসব কাজ করিতে গিয়া উপাসনা স্মরণ ভুলে যাও তবে অপকার হবে, সেইটাই ধর্ম্ম।

ক্রমশঃ।

মূল্যপ্রাপ্তি।

৯ম বৎসর।

শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষুদারাম বসু,

১০ম বৎসর।

শ্রীযুক্ত ক্রোধেশচন্দ্র সেন,	টিবক	
শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার চৌধুরী,	বগুড়া	
শ্রীযুক্ত ক্ষুদীরাম বসু		

১১শ বৎসর।

শ্রীমতী সুদক্ষিণা সেন,	ভবানীপুর	
শ্রীমতী সুরবালা সেন,	লাম্‌ডিন	২৲
„ কুমুদিনী সেন,	কলিকাতা	২৲
„ হেমকুসুম মল্লিক,	বাঁকিপুর	২৲
„ সতী দেবী,	ছাপরা	২৲
„ কিরণশশী দাস,	কলিকাতা	২৲
„ প্রসন্নতারা গুপ্ত,	বালিগঞ্জ	২৲
শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র ঘটক,	পাথরাইল	২৲
„ বৈদ্যনাথ কর্ম্মকার,	ময়মনসিংহ	২৲
„ কালিকাদাস দত্ত রায় বাহাদুর,	কুচবিহার	২৲
„ যাদবলাল সেন,	কুচবিহার	২৲
„ দেওয়ান জগন্নাথ রাও,	বোধ	২৲
„ গগণশচন্দ্র সেন,	জামালপুর	২৲
„ জগচ্চন্দ্র রায়,	মুনসীগঞ্জ	২৲
„ ক্রোধেশচন্দ্র সেন,	টিয়ক	২৲
„ দামোদর পাল,	বাঁকিপুর	২৲
„ শশিভূষণ সেন,	ঢাকা	২৲
„ পূর্ণচন্দ্র মজুমদার,	মুর্শিদাবাদ	১৲
„ রায় রাধাবল্লভ চৌধুরী,	সেরপুর	৭৲

১২শ বৎসর।

শ্রীমতী চপলাসুন্দরী মজুমদার,	কালীঘাট	
„ কিরণকুমারী মিত্র,	কলিকাতা	২৲
„ কুসুমকুমারী ঘোষ,	কলিকাতা	২৲
„ আশালতা গুপ্ত,	চট্টগ্রাম	২৲
„ চারুবালা দেবী,	রেঙ্গুণ	২৲
„ এস্ মুখোপাধ্যায়,	মেওালয়	২৲
শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বসু,	বাখিল	২৲
„ পূর্ণচন্দ্র মজুমদার,	মুর্শিদাবাদ	১৲
„ ক্রোধেশচন্দ্র সেন,	টিয়ক	

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১২শ ভাগ] চৈত্র ১৩১৩; এপ্রিল ১৯০৭। [৯ম সংখ্যা।

স্ত্রীনীতিসার

পত্নীর পতির প্রতি গুরুতর কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব। অনেক পত্নী ভোগবিলাসে রত থাকিয়া তাহা বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা স্বামীর সঙ্গে শারীরিক সম্বন্ধ—বাহ্যিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দায়িত্বশূন্য চঞ্চলভাবে জীবনযাপন করেন। স্বামী শরীর নয়, তিনি শরীরস্থ আত্মা। সচরাচর পত্নী তাঁহার শরীরের প্রতি আসক্ত হইয়া থাকেন, কেবল শরীরের সেবা শুশ্রূষা করেন, আত্মার প্রতি তাঁহার লক্ষ্য বড়ই কম। ইহা অতিশয় দুঃখের বিষয়।

সুপত্নী পতির শরীর অপেক্ষা তাঁহার আত্মাকে অধিকতর প্রেম করেন, পতির আত্মাই প্রকৃত পতি বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন, পতির শারীরিক রোগে তিনি যত দূর ব্যস্ত হন, তাঁহার আধ্যাত্মিক রোগ পাপ ও দুর্ম্মতি দেখিলে তদপেক্ষা অধিক ব্যাকুল হন। তিনি স্বামীর সঙ্গে সৎ-প্রসঙ্গ সমালোচনা এবং উপাসনা ও প্রার্থনাদি করিয়া তাঁহার ধর্ম্ম ভাবকে সমুন্নত করিয়া থাকেন। তিনি স্বামীর ধর্ম্মপথের সহায় হইয়া প্রকৃত সহধর্ম্মিণী হন; স্বামীর সঙ্গে তাঁহার অনন্তকালের সম্বন্ধ এরূপ বিশ্বাস করেন, দুই দিনের শারীরিক সম্বন্ধ মনে করেন না। তিনি স্বামীর দেহকে সর্ব্বস্ব করিয়া সুখী হইতে পারেন না। দেহের সঙ্গে যোগ অনিত্য পাশব যোগ, নিত্য পবিত্র যোগ নহে।

পত্নীগণ, তোমরা স্ব স্ব স্বামীর আত্মাকে স্বীয় আত্মাতে বরণ কর, তাঁহার আত্মাতে দেবত্ব দর্শন কর, সেই দেবত্ব যাহাতে দিন দিন অধিকতর প্রস্ফুটিত হয়, তাঁহার সঙ্গে উপাসনা প্রার্থনাদিযোগে তৎপ্রতি যত্ন কর। দেবপ্রসাদে তোমার যত্ন অচিরে সফল হইবে। কখনও নিরাশ হইও না, স্বামীর প্রতি প্রকৃত কর্ত্তব্য পালন করিয়া সুনীতির সুদৃষ্টান্ত প্রদর্শন কর।

কোন্ স্ত্রী সহধর্ম্মিণী।

প্রথমতঃ স্ত্রী কন্যারূপে মাতৃগর্ভ হইতে হন, পিতা মাতা কর্ত্তৃক শৈশবে ও বাল্য জীবনে সস্নেহে সর্ব্বপ্রযত্নে লালিত পালিত হইয়া থাকেন। তিনি পিতা মাতাকে ভক্তি করেন, তাঁহাদের অনুগত ও বাধ্য হইয়া চলেন। কন্যা বাল্যজীবনে ক্রীড়াগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া পুতুল খেলা করেন ও পুতুলের বিবাহ দেন, ক্রীড়াচ্ছলে শাক পাতা ধূলা ইত্যাদিযোগে অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করেন, এবং নিজের ক্রীড়ার সঙ্গিনীদিগকে তাহা ভোজন করিবার জন্য পরিবেশন করেন; ভাই ভগিনী থাকিলে সখ্যভাবে তাহাদের সঙ্গে নানা প্রকার আমোদ করিয়া থাকেন। হিন্দু বালিকা ভাইফোঁটার দিনে ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিয়া ভাইয়ের প্রতি ভগিনীর আদর ও ভালবাসা প্রকাশ করেন।

বালিকা পিতৃগৃহে পিতা মাতার যত্নে রক্ষিত ও প্রতিপালিত হইয়া উপযুক্ত বা অনুপযুক্ত বয়সে পাত্রস্থা হইয়া থাকেন। তখন তিনি গৃহিণী হন, খেলার ঘর ছাড়িয়া আসল ঘর লাভ করেন; প্রকৃত রন্ধন পরিবেশনে ব্যস্ত হইয়া পড়েন, পতিকে ও পতির আত্মীয় কুটুম্বদিগকে সাদরে ভোজন করান, পতিসেবাতে প্রবৃত্ত থাকেন। পিতৃগৃহে থাকিয়া তিনি কন্যারূপে পিতাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন, পিতার বাধ্য থাকিতেন, এক্ষণ পতিকে আপনার অভিভাবক রক্ষক ও চিরজীবনের আশ্রয় জানিয়া কন্যাভাবে ভক্তিশ্রদ্ধা করেন ও তাঁহার বাধ্য হইয়া চলেন।

বিবাহিতা হইয়া পত্নী নানা প্রকার ভাবসূত্রে পতির সঙ্গে সম্বদ্ধ হন। সেবা শুশ্রূষাতে পতির প্রতি তাঁহার মাতৃভাব ও মাতৃস্নেহ প্রকাশ পায়। মা যেমন কোন সুখাদ্য সামগ্রী পাইলে আপনি না খাইয়া স্নেহপূর্ব্বক সাদরে সন্তানকে খাওয়ান, পত্নীও সেইরূপ সস্নেহে পতিকে তাঁহার প্রিয় সামগ্রী ভোজন করাইয়া থাকেন, নিকটে বসিয়া "ইটি খাও, ওটি খাও" বলিয়া আদরপূর্ব্বক খাওয়ান। শাক্তভাবাপন্না স্ত্রী শাক্তভাবাপন্ন স্বামীকে "আরও খাও আরও খাও" বলিয়া সযত্নে মাংস ও ডিম খাওয়াইয়া থাকেন। তিনি স্বামীর দেহের জন্য নিয়ত ব্যস্ত, তাঁহার সংস্কার যে, নিত্য মাংসাদি না খাইলে স্বামীর দেহ রক্ষা হয় না, মস্তিষ্ক পরিষ্কার থাকে না। সাত্ত্বিক ভাবাপন্না পতিব্রতা পতিকে যত্নপূর্ব্বক সাত্ত্বিক ভোজন করাইয়া থাকেন। যে সমস্ত শুদ্ধ সাত্ত্বিক দ্রব্য ভোজনে পতির চিত্ত শুদ্ধ ও দেহ বিশুদ্ধ থাকে, তাঁহার সাত্ত্বিক ভাব বৃদ্ধি পায়, তিনি সেই সকল দ্রব্য স্বামীকে ভোজন করাইতে সমধিক যত্নবতী হন, বিশুদ্ধ সুগন্ধ পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী সেই পতিব্রতা রমণীর নিকটে প্রিয়, তিনি স্বামীকেও তাহা খাওয়াইতে ভাল বাসেন। কেন না স্বামীর দেহ অপেক্ষা আত্মা তাঁহার নিকটে সমধিক আদরের বস্তু, যে সকল দ্রব্য ভোজনে আধ্যাত্মিক ক্ষতি ও অবনতি হয়, এবং ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা হইয়া থাকে, তিনি তাহা নিজেও

খান না, স্বামীকেও খাইতে দেন না। দুগ্ধ, ঘৃত, মাখন ও বিশেষ বিশেষ ডাইল ও তরকারীভক্ষণে শারীরিক ও মানসিক সমধিক উপকার হয়, তিনি এরূপ বিশ্বাস করেন। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর মাতৃস্নেহ দেখিয়া আমরা অনেক সময় আনন্দিত হইয়াছি। সন্তানের পীড়া হইলে মা যেমন আপনাকে ভুলিয়া গিয়া তাহার সেবা শুশ্রূষা করেন, স্ত্রীও সেরূপ মাতৃবৎ সস্নেহে রুগ্ন স্বামীর সেবা শুশ্রূষা করিয়া থাকেন। তাহার জন্য স্ত্রীর কত ভাবনা চিন্তা ও কত ব্যাকুলতা প্রকাশ পায়।

পতির সঙ্গে পত্নীর যেমন কন্যাভাব ও মাতৃভাব স্থাপিত হয় তাঁহার ভগিনীভাবও প্রকাশ পায়। এক ভাবে পতি পত্নীর ভ্রাতা। ঈশ্বর পিতা, সাধারণ মনুষ্য তাঁহার পুত্র কন্যা হইলে স্ত্রী পুরুষমাত্রই পরস্পর ভ্রাতা ভগিনী। ধর্ম্মবিশ্বাসী লোকের সম্বন্ধে ইহা অতি উচ্চ পবিত্র সম্বন্ধ। এ তদনুসারে পতি পত্নীর ভ্রাতা। পিতৃগৃহে যেমন তিনি ভ্রাতার সঙ্গে ভগিনীভাবে ঘনিষ্ঠরূপে মিলিত হইয়াছিলেন, পতিগৃহেও তদ্রূপ পতির সঙ্গে তাঁহার ভগিনী-ভাব পরিস্ফুট হওয়ার বিশেষ সুযোগ বিদ্যমান।

পত্নী পতির সখী, পতির সঙ্গে তাঁহার সখ্যভাব প্রবল হওয়াই স্বাভাবিক। ব্রাহ্ম বিবাহের সময় বর এবং কন্যা এরূপ মন্ত্র উচ্চারণ করেন, "আমি যেন তোমার সখা বা (সখী) হই, তুমি যেন আমার সখা বা (সখী) হও, আমাদের সখ্য যেন কখনও ভঙ্গ না হয়।" পত্নী পরিণীতা হইয়া পতির সঙ্গে চিরসখ্যবন্ধনে সম্বদ্ধ হন; সাংসারিক সকল কার্য্যে তাঁহাকে সৎপরামর্শ দান করেন, সম্পদে বিপদে সুখে দুঃখে তাঁহার প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকেন। সকল অবস্থায় তিনি তাঁহার চিরহিতৈষিণী সঙ্গিনীরূপে স্থিতি করেন।

উপরি উক্ত রূপে পত্নী পতির প্রতি নানা আকারে নানা ভাবে প্রেম প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু সেই সকল প্রেম বিশুদ্ধ না হইতে পারে। ঈশ্বরের সঙ্গে পবিত্র প্রেম যোগ ব্যতীত দাম্পত্য প্রেম বিশুদ্ধ হয় না। অধিকাংশ দাম্পত্য প্রেম সাংসারিক বা শারীরিক স্বার্থসম্বন্ধে জড়িত, তাহাকে মায়া বা মোহ বলে। যে স্ত্রী ও স্বামী পরস্পরের দেহেতে বদ্ধ, ভোগ সুখের জন্য পরস্পরকে প্রেম করেন, তাঁহাদের প্রকৃত বিবাহ হয় নাই, আত্মায় আত্মায় যোগ হয় নাই, তাঁহারা পরস্পরের শরীরকে বিবাহ করিয়া ইন্দ্রিয়রাজ্যে বাস করিতেছেন বলা যায়, তাঁহাদের এক জনের দেহেরপতন হইলে অন্যজন সেই স্থানে আর একটি নূতন দেহ গ্রহণ করেন, অন্য একটি দেহকে বিবাহ করিয়া আমোদ আহ্লাদ করেন, এই পরিণাম হয়। এইরূপ স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী ও স্বামীকে সহধর্ম্মী বলা যায় না। সহধর্ম্মিণী স্ত্রী স্বামীর ধর্ম্মপথে সহায় হন, তিনি স্বামীর শরীর অপেক্ষা সর্ব্বদা আত্মাকে অধিকতর প্রীতি করেন। স্বামী বলিতে স্বামীর শরীর নয়, শরীরস্থ আত্মা। তিনি সেই আত্মার সঙ্গে মিলিত হইয়া উপাসনা বন্দনা ধর্ম্মালোচনা শাস্ত্রালোচনা

সংক্রেয়াদিযোগে স্বর্গাভিমুখে অগ্রসর হন, অপ্রয়োজনীয় বিষয়প্রসঙ্গে,শারীরিক প্রসঙ্গে,পরচর্চ্চায় ও পরনিন্দাতে সময় যাপন করিতে কুণ্ঠিত হইয়া থাকেন। স্বামীর আধ্যাত্মিক দোষ দুর্গতি, ঈশ্বর-বৈমুখ্য ও ধর্ম্মে অবহেলা দেখিলে তিনি মর্ম্মাহত হন। সাধ্বী সহধর্ম্মিণী সাংসারিক বুদ্ধি চতুরতার উপর নির্ভর করেন না, অন্তরস্থ আলোকে চলেন। সরল প্রার্থনা তাঁহার জীবনের সম্বল হয়। তিনি জীবনের সমুদায় কার্য্য ঈশ্বরে উৎসর্গ করেন। যে স্ত্রীর প্রাণগত যত্ন চেষ্টায় স্বামীর ধর্ম্মোন্নতি হয়, তিনি ভগবানের চরণাশ্রয় প্রাপ্ত হন, সেই স্ত্রীই প্রকৃত সহধর্ম্মিণী। যে স্বামীকে ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত করিয়া নিজের প্রতি আসক্ত করিয়া তোলে, নানা প্রকার পার্থিব ভোগ সুখে রত করে, তাহাকে কি সহধর্ম্মিণী বলা যায়? কিন্তু সংসারে এরূপ স্ত্রীই অধিক।

আমাদের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত প্রকাশ চন্দ্র রায় বিগত ১লা চৈত্রের ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকায় নিজের ভ্রমণ ও সেবা বৃত্তান্তে দুঃখ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন যে, অনেক ব্রাহ্ম পরিবার আছে তাহাতে ব্রহ্মোপাসনা নাই। বড় দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়। তাঁহার যত্ন চেষ্টায় শিলচর নগরস্থ কতিপয় ব্রাহ্ম প্রত্যহ সস্ত্রীক উপাসনা করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। চিরজীবন এই প্রতিজ্ঞাপালনে তাঁহারা দৃঢ়ব্রত থাকিলে অতিশয় আনন্দের বিষয় হইবে। বাস্তবিক অনেক ব্রাহ্মপরিবারে দেখা যায় যে, ব্রহ্মোপাসনা নাই, ভগবানে আদর নাই, কেবল সংসারাধিপত্য, ভোগবিলাস, দেহপূজা এবং নানা প্রকার অপব্যয়।

যে স্ত্রী নানা উপায়ে স্বামীর দেব ভাবকে প্রস্ফুটিত এবং নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি ও সাংসারিক ভাব গুলিকে সংযত করেন, তিনি ধন্যা, তিনি যথার্থ সহধর্ম্মিণী। নববিধানবিশ্বাসী আমাদের বন্ধু শ্রীযুক্ত রাধানাথ ঘোষ মহাশয় টাঙ্গাইল নগরে ওকালতী কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তাঁহার সাধ্বী সহধর্ম্মিণী বিদ্যুল্লতা দেবী অনেক বৎসর হইল স্বর্গগতা হইয়াছেন। তিনি স্বামীকে উপাসনাদিতে উপেক্ষা করিয়া অর্থোপার্জ্জনে ব্যস্ত দেখিলে অত্যন্ত ব্যথিত হইতেন, এবং অশ্রুবর্ষণ করিতেন। এক দিন রাধানাথ বাবু বিষয় কার্য্যের অনুরোধে সময় না পাওয়াতে উপাসনার প্রধান অঙ্গ আরাধনা খর্ব্ব করিয়াছিলেন। সেই দিন দেবী বিদ্যুল্লতার মনে অতিশয় ক্লেশ হইয়াছিল, তিনি রাত্রিতে পল্যঙ্কে শয়ন না করিয়া বিমর্ষ অন্তরে ভূতলে শয়ন করেন। রাধানাথ বাবু মাটীর উপর শয়ন করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলেন, "তুমি প্রাণের উপজীবিকা উপাসনাকে অঙ্গহীন করিলে কেন? আজ আমার অন্তরে আর কিছুতেই সুখ শান্তি নাই।" বিদ্যুল্লতার অর্থপিপাসা ছিল না, সাংসারিক ভোগ সুখে কিছুমাত্র স্পৃহা ছিল না। কয়েকটী পুত্র কন্যা ও দাস দাসী ছিল। তিনি প্রাত্যহিক রন্ধনাদি সমুদায় কার্য্য স্বয়ং করিতেন। সকলকে এমন কি দাস দাসীকে পর্য্যন্ত খাওয়াইয়া

অপরাহ্নে নিজে ভোজন করিতেন। তাঁহার দয়া স্নেহ অসাধারণ ছিল। তাঁহার গৃহে বিড়াল কুকুর পর্য্যন্ত অভুক্ত থাকিত না, ক্ষুধার্ত্ত দীন দুঃখী আসিয়া কখনও বঞ্চিত হইত না। পল্লীবাসী সকলে তাঁহাকে মা বলিয়া ভক্তি করিত। তিনি যে লেখা পড়া অধিক জানিতেন তাহা নহে, উচ্চ গুণ সকল তাঁহার স্বাভাবিক ছিল, ধর্ম্মবিশ্বাসী স্বামীর সাহায্যে তাহা প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছিল। ইঁহাকেই বলে গৃহলক্ষ্মী সতী সাধ্বী সহধর্ম্মিণী।

টাঙ্গাইলের অন্তর্গত বেড়াবোচিনা পল্লীবাসিনী হরিভক্তিপরায়ণা স্বর্গগতা হিন্দু মহিলা পরমা সাধ্বী গান্ধর্ব্বী দেবীর প্রসঙ্গ মহিলাতে অনেক বার হইয়াছে। তিনি বিবাহিতা হইয়াই শাক্তভাবাপন্ন পতির মনে ভক্তিরস সঞ্চার করেন, পরিবারটিকে ভক্তিরসার্দ্র করিয়া তোলেন। নাম জপ শাস্ত্র পাঠ পরসেবা আতিথ্যসৎকারাদি গান্ধর্ব্বী দেবীর জীবনের প্রিয় কার্য্য ছিল। তিনি সৎপ্রসঙ্গ হরিগুণপ্রসঙ্গ ব্যতীত গ্রাম্য কথা, অনর্থ কথা বলিতেন না। তাঁহার দুই পুত্র বিদ্যমান। হরিভক্তিরূপ আলোক তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের অন্তরে নাই বলিয়া তিনি একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকটে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই পুত্রই পিঙ্গনা মোন্সেফী চৌকিতে ওকালতী করিতেছিলেন, তিনি একজন প্রধান উকিল হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহার প্রচুর অর্থাগম হইতেছিল। কিন্তু যখন তিনি বিবেকের অনুমোদনমতে ওকালতী কার্য্য করিতে বাধা পাইলেন, তখনই সেই বিস্তৃত আয়ের ওকালতী ছাড়িয়া দিলেন, লোন আফিসে পঞ্চাশ টাকা বেতনের কার্য্য গ্রহণ করিলেন, সেই সামান্য আয়ে এক্ষণ বিস্তৃত পরিবার কষ্টে প্রতিপালন করিতেছেন। ইহা কি সামান্য ধর্ম্মবলের কার্য্য? গান্ধর্ব্বী দেবীর কনিষ্ঠ পুত্র নববিধান প্রচারে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। ইহা সেই পুণ্যবতী জননীর ধর্ম্মজীবনের ফল ব্যতীত আর কি বলা যায়? ইনি প্রথম জীবনে প্রকৃত সহধর্ম্মিণী হইয়া স্বামীর জীবন পরিবর্ত্তনের কারণ হন। পরে ইঁহার পবিত্র জীবনের ছায়া পড়িয়া সন্তানের জীবনকে পরিবর্ত্তিত করিয়া তোলে। যে স্ত্রী স্বামীর ধর্ম্মপথে সহায়, যিনি স্বামীর সঙ্গে আত্মার আত্মায় মিলিত হইয়া ধর্ম্মাচরণপূর্ব্বক স্বর্গ লোকের যাত্রিক হইয়াছেন, তাঁহাকেই সহধর্ম্মিণী বলা যায়, অন্যকে নহে।

বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রে আর দুই প্রকার স্ত্রীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা; স্ত্রী চোর ও স্ত্রী শত্রু। যে স্ত্রী স্বামীর ধর্ম্মবল হরণ করিয়া তাহাকে ভোগাসক্ত সংসারী করে, এরূপ স্ত্রীকে চোর বলা যাইতে পারে। যে স্ত্রী স্বামীর ধর্ম্মপথের অন্তরায় তাহাকে শত্রু বলা যায়।

সাধ্বী কুমারী আগাথা।

১৬০০ বৎসর পূর্ব্বে সিসিলি দ্বীপে সমুদ্রের পূর্ব্বোপকূলে কেটেনিয়া নগরে কলোমানামক প্রসিদ্ধ উচ্চ বংশে আগাথা নামে অপ্সরার ন্যায় পরমা সুন্দরী এক কুমারী ছিলেন। তাঁহার চিত্তের প্রফুল্ল-

তায় স্বয়ং পবিত্রতা বিরাজ করিত। ভগবান্ কত উৎকৃষ্ট সামগ্রী সৃষ্টি করিতে পারেন তাহা প্রদর্শন করার জন্যই যেন তাঁহাকে সৃজন করিয়াছিলেন। তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী পিতার একমাত্র সন্তান ছিলেন; সুতরাং পিতা মাতার নয়নের পুত্তলী ছিলেন। সেণ্ট মেরিয়া রটাণ্ডা নামক খ্রীষ্টধর্ম্মমন্দিরে একজন ধার্ম্মিকা রমণী দ্বারা খ্রীষ্টধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব তাঁহার হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। তিনি অনেক সময় সেই মন্দিরে নির্জ্জনে ধ্যান প্রার্থনায় অতিবাহিত করিতেন, এবং সেই সময় তাঁহার নয়ন হইতে অজস্র প্রেমাশ্রুধারা প্রবাহিত হইত। তাঁহার নিকটে পৃথিবীর প্রলোভনের কোন আকর্ষণই ছিল না। তিনি সর্ব্বক্ষণ পিতা মাতার সঙ্গে থাকিতেন, এবং পিতামাতার ভালবাসায় তাঁহার চিত্ত এত মুগ্ধ থাকিত যে, চিত্তবিনোদনের জন্য বাহিরের অন্য কাহারও সঙ্গ তাঁহার প্রয়োজন বোধ হইত না। ১৫ বৎসর বয়স অতিক্রম হইতে না হইতে তাঁহার পিতামাতার বিয়োগ হয়। তাহাতে তিনি অত্যুৎকৃষ্ট বৃহৎ প্রাসাদ, স্বর্ণরৌপ্যময় বহু মূল্যবান্ তৈজসপত্র, উৎকৃষ্ট মণিমুক্তা এবং ধনপূর্ণ বহুবিধ ধনাধারের অধিকারিণী হইলেন। এই সমস্ত ঐশ্বর্য্য অবলোকন করিলেই তাঁহার মনে পিতামাতার স্মৃতি জাগরূক হইয়া তাঁহাকে শোকাকুল করিত। সুতরাং প্রাসাদের বড় বড় প্রকোষ্ঠগুলি পরিত্যাগ করিয়া তাহার এক প্রান্তস্থিত নির্জ্জন ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে তিনি বাস করিতে লাগিলেন। আগাথা স্বীয় অতুল ঐশ্বর্য্য ধর্ম্মার্থে ও অন্যান্য জনহিতকর কার্য্যে বিতরণের সুব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। যৌবনে পদার্পণ করিলে তাঁহার রূপে আকৃষ্ট হইয়া বহু সম্ভ্রান্ত ধনী এবং সম্মানিত যুবক তাঁহার পাণিপীড়নার্থী হইলে তিনি কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিতে পারিলেন না, তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও নিজের ধর্ম্মবিশ্বাসে একমতাবলম্বী পাইলেন না। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, যাঁহার সঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়া স্বর্গের দিকে ক্রমে অগ্রসর হইতে পারিবেন এমন যুবক ব্যতীত অন্য কাহাকেও বিবাহ করিবেন না।

দীন দরিদ্রের সেবাতে আগাথা এত দূর মগ্ন থাকিতেন, সর্ব্বদা তাঁহার প্রতি অত্যাচার এবং প্রাণ সংহারের আয়োজন হইতেছে দেখিয়া তিনি তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপও করেন নাই। ২৫২ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ ডেসিনিয়স কর্ত্তৃক কুইন্টিনিয়াস Quintianios নামক এক জন নীচ কুলোদ্ভব ব্যক্তি সিসিলির শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া কেটেনিয়াতে প্রেরিত হয়। অপকর্ম্মের দ্বারাই এই লোকটি উচ্চ পদারূঢ় হইয়াছিল। লোকটির বর্ণ লোহিত, এবং প্রকৃতি এত নিষ্ঠুর ছিল যে, তাহার চক্ষুর তীব্র দৃষ্টি যাহার উপর পড়িত তাহার মজ্জা পর্য্যন্ত বিদ্ধ হইয়া যাইত। সকলেই তাহার নিকটস্থ হইতে ভয় করিত। কেটেনিয়াতে আগমনাবধি সেই পিতৃ মাতৃহীনা অনাথা আগাথার প্রশংসা কুইন্টিনিয়াসের কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল, এবং তাঁহাকে

দর্শন করিবার জন্য তাহার উৎসুক্য জন্মিল। অবশেষে এমন একদিন উপস্থিত হইল যেদিন আগাথার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার অনুপম রূপে সেই কঠোর প্রকৃতি লোকটি বিমুগ্ধ হইয়া গেল, এবং সেই ভামিনীর প্রতি একান্ত অনুরাগী হইল। অচিরে বিবাহের প্রস্তাব করিয়া কুইণ্টিনিয়াস তাহার প্রিয়বন্ধু সিলিনিয়াসকে পাঠাইল, এবং বলিয়া দিল যে, তুমি আমার হইয়া এই কথাগুলি বলিও ;—"আমি তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাসি, এবং তাঁহাকে সম্মান এবং শ্রদ্ধা করি। যদি তিনি আমার পত্নী হইতে সম্মত হন তবে সমস্ত সিসিলি দ্বীপ তাঁহার অধীন হইবে, তাঁহার সামান্য ইচ্ছাও সিসিলবাসীদের অবশ্য প্রতিপাল্য বিধি হইবে, এবং একজন শাসনকর্ত্তার পত্নীর উপযোগী সর্ব্ববিধ ভোগ বিলাস তাঁহার হইবে।"

আগাথা বলিলেন যে,"একজন বিধর্ম্মী যদি স্বয়ং সম্রাট্ও হয়েন তথাপি তাঁহাকে বিবাহ করিয়া স্বীয় প্রভু পরমেশ্বরের নিকট অবিশ্বাসিনী হইতে পারিব না।" সিলিনিয়াসের নিকট এইরূপ প্রত্যাখ্যান সংবাদ পাইয়া শাসনকর্ত্তা ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া বলিল ;—"এই সৌন্দর্য্যগর্ব্বিতার এত দূর স্পর্দ্ধা যে, আমাকে অবজ্ঞা করিতে সাহস করে? আমি তাহাকে কাঁদাইয়া আমার পাদমূলে নিপতিত করিব, এবং তাহার খ্রীষ্ট ধর্ম্মের গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া আমার ক্ষমতাধীনে আনিব।"

কুইণ্টিনিয়াসের পত্নী হইতে অস্বীকার করার পরিণাম বুঝিতে পারিয়া আগাথা কেটেনিয়া নগরের নিকটবর্ত্তী গেলামের্ণা নামক ক্ষুদ্র কৃষকপল্লীতে পলায়ন করিয়া যাইয়া প্রচ্ছন্নভাবে রহিলেন। ২৫২ খৃঃ অব্দের ১৫শে ডিসেম্বর প্রাতে বাতায়ন উদ্‌ঘাটন করিয়া প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিতে করিতে যখন তিনি বিভুর ধ্যানেতে নিমগ্ন ছিলেন সেই সময় অশ্বের পদধ্বনি, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনানি শব্দ এবং অপরিচিত লোকের কর্কশ কণ্ঠধ্বনি ও আপন পরিচারিকাদিগের রোদনধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। অবিচলিতচিত্তে পরিচারিকাদিগকে প্রশ্ন করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে না জানিতে কুইণ্টিনিয়াসের প্রেরিত সৈন্যদল তাঁহার নিভৃত স্থানে তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতে উপস্থিত হইল। বিশ্বাসঘাতকেরা তাঁহার এই গুপ্ত নিভৃত স্থান প্রকাশ করিয়াছিল। সৈনিকেরা রুক্ষ স্বরে আগাথাকে আত্মসমর্পণ করিয়া বন্দী হইতে বলিল। আগাথা বলিলেন,—"একজন অরক্ষিতা বালিকাকে বন্দী করিতে এত গুলি সশস্ত্র সৈনিকের প্রেরণ করা তোমাদের প্রভুর কোন প্রয়োজন ছিল না। আমি তোমাদের সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত।"

যখন তাঁহার প্রস্থানের আয়োজন হইতেছিল তিনি সেই সময় নির্জ্জনে জানু পাতিয়া প্রার্থনা করিলেন,—"তুমি জান আমি তোমাতে নির্ভর স্থাপন করিয়াছি। যে অত্যাচারীর ক্রোধ উদ্দীপন করিয়াছি

তাহার অত্যাচার বহন করিতে আমার সহায় হও—তুমি আমার চিত্তের দুর্ব্বলতা জান, আমি নিজে কিছুই করিতে পারি না। কিন্তু তুমি, হে আমার ঈশ্বর; আমার পবিত্রতা রক্ষা করিও, এবং আশীর্ব্বাদ কর যেন আমার শত্রু আমার উপর জয়লাভ করিয়া বলিতে না পারে যে, যে ঈশ্বরের গৌরব সে করিয়াছিল সেই ঈশ্বর কোথায়? আমি যে তোমার বলিস্বরূপ আত্মদান করিতেছি, তাহার প্রতিভূস্বরূপ আমার এই অশ্রুজল গ্রহণ কর; তুমিই একমাত্র প্রভু তোমারই গৌরব।" যখন প্রার্থনান্তে সৈন্যদের সঙ্গে দৃঢ় পাদবিক্ষেপে তিনি চলিতে লাগিলেন, তখন বদনে ঐশ্বরিকশক্তি দীপ্তি পাইতে লাগিল।

যখন সেই নির্দ্দোষ সুন্দরী যুবতী স্বীয় জন্মস্থান কেটেনিয়া নগরে প্রত্যাবর্ত্তিত হইলেন, তখন নগরময় মহাকোলাহল উত্থিত হইল। আগাথার প্রতি কুইণ্টিনিয়াস কিরূপ ব্যবহার করে তাহা দেখিবার জন্য রাজপথ জনতায় পূর্ণ হইল।

আগাথার প্রতি কুইণ্টিনিয়াসের অনুরাগ তখনও জাগরূক ছিল। সুতরাং এফ্রোডিসিয়া নাম্নী একটি ভদ্র পরিবারের চরিত্রহীনা নারীর নিকট আগাথাকে রাখিয়া দিল, এবং ৩০ দিনের মধ্যে যদি কোন উপায়ে কুইণ্টিনিয়াসকে বিবাহ করিতে আগাথার প্রবৃত্তি জন্মাইতে পারে তবে কুইণ্টিনিয়াস সেই দুশ্চরিত্র নারীকে প্রচুর পুরস্কার দান করিবে, এরূপ প্রতিশ্রুত হইল। এফ্রোডিসিয়া আদর অভ্যর্থনাসহ আগাথাকে স্বীয় আবাসে গ্রহণ করিয়া নানারূপ স্তোভবাক্যে এবং প্রলোভনে তাঁহার চিত্ত কুইণ্টিনিয়াসের প্রতি অনুরাগিণী করিতে যত্ন করিল। অনুনয় বিনয় নিষ্ফল হইলে নানারূপ ভয় বিভীষিকা প্রদর্শনপূর্ব্বক এফ্রোডিসিয়া বলিল,—"তুমি জানিও, তোমার এই স্বেচ্ছা প্রণোদিত আপত্তি যদি তুমি কিছুতেই পরিত্যাগ না কর, তবে তোমার পরিণাম মৃত্যুদণ্ড।"

আগাথা বলিলেন,—"আমার আশা ভরসা ঈশ্বরেতে। তাঁহার সহায়তায় আমি সর্ব্ববিধ যন্ত্রণা অতিক্রম করিতে সক্ষম হইব, এবং মৃত্যুকেও জয় করিব। তোমার বাক্য আমাকে বিচলিত করিতে পারিবে না। আমার আত্মা সুদৃঢ় প্রস্তরের উপর অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরে স্থাপিত, কোন পরিবর্ত্তনশীল বালুকার উপর নয়।" নির্দ্দিষ্ট ৩০ দিনের পর কুইণ্টিনিয়াসের নিকট সংবাদ গেল যে, কিছুতেই আগাথার মন পরিবর্ত্তিত হইল না।

নিরাশ প্রেম এখন তীব্র ঘৃণাতে পরিণত হইল। কুইণ্টিনিয়াস বলিল,—"নিশ্চয়ই এই নারী মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিবে।" আগাথা তাহার নিকটে আনীত হইলে কুইণ্টিনিয়াস একটি ছোরা হস্তে রুক্ষ দৃষ্টিতে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুই কে?" "কোথায় জন্ম?" এবং "তোর ধর্ম্ম কি?"

আগাথা বলিলেন,—"আমি স্বাধীন হইয়া জন্মিয়াছি, আমি যে সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভবা তাহা সকলেই জানে। আমার ধর্ম্ম যীশুতে বিশ্বাস।"

কুণ্টিনিয়াস বলিল,—"সম্রাটের আদেশ যে যাহারা খ্রীষ্টিয়ানদের ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে তাহারা মৃত্যুদণ্ডার্হ। এরূপ উচ্চকুলসম্ভূতা হইয়া নীচ জীবন যাপন করিতে তোমার লজ্জা হয় না কি?"

আগাথা বলিলেন,—"কি! যীশুর ভৃত্য বলিয়া পরিচিত হইতে লজ্জা? লজ্জা ত নয়ই, বরং সামান্য পরিচারিকার ন্যায় প্রভুর সেবা করিতে পারিলে নিজকে বর্ণনাতীত সম্মানিত এবং ধন্য মনে করি।"

কুণ্টিনিয়াস ক্রোধান্বিত হইয়া বলিল,—"রে পাপীয়সি! ধর্ম্মের গ্লানি করিতে বিরত হও। মহান্ জুপিটারের এবং অলিম্পিসের এবং অন্যান্য নিম্নদেশের দেবতার পূজা কর, নচেৎ প্রাণ-দণ্ডই তোমার নির্ব্বুদ্ধিতার পুরস্কার হইবে। সম্রাটের বদলে আমি তোকে আজ্ঞা করিতেছি, তুই দেবতাদের বেদীর সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের ক্রোধ শান্তি কর্।"

যুবতী পরিষ্কার ভাষায় তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন,—"সত্য, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর যিনি সকলের শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে ব্যতীত অন্য দেবতার পূজা করিব না। আমি একমাত্র খ্রীষ্টের, আমার আত্মা তাঁহাতেই আনন্দলাভ করে।" শত শত বর্ষ অতিক্রম করিয়া এই বিশ্বাসপরিচয়ের প্রতিধ্বনি কেমন গম্ভীরভাবে আমাদের কর্ণে এখনও প্রবেশ লাভ করিতেছে। এই সামান্য কয়টি শব্দ উচ্চারণে সেই খ্রীষ্টিয়ান কুমারী স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিষম যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুমুখে পরিত্রাতার সাক্ষ্যদানে আপনাকে অর্পণ করিলেন। ক্রমশঃ

আমাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত।

বর্ম্মদেশ।

গতবারের মহিলাতে জয়পুর নগরের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে। আমরা জয়পুর হইতে আগ্রাতে গিয়াছিলাম। বহুকাল পূর্ব্বে একবার আগ্রা ও মথুরা বৃন্দাবনাদিতীর্থে যাওয়া হইয়াছিল, এবং আগ্রার তাজমহল ইত্যাদির বিবরণ পত্রিকাবিশেষে প্রকাশ করা গিয়াছিল। এবার আর তাহার উল্লেখ করা গেল না। সম্প্রতি বর্ম্মদেশ ভ্রমণ করিয়া আসা গিয়াছে। সেই দেশের বৃত্তান্ত লেখা যাইতেছে। পাঠিকাদের নিকটে তথাকার অনেক বিষয় নূতন বোধ হইবে।

বিগত ২৪শে পৌষ আমরা কলিকাতা হইতে মালদহনামক অর্ণবপোতারোহণে বর্ম্মদেশে যাত্রা করিয়াছিলাম। সে দেশে বাস করেন এমন একটী স্নেহের কন্যার আগ্রহ যত্ন ও অর্থসাহায্যে আমাদিগকে সে দেশে যাইতে হইয়াছিল। সুখস্বচ্ছন্দে আমাদের গমনাগমন হয় এই উদ্দেশ্যে তিনি শতাধিক টাকা অকাতরে ব্যয় করিয়াছেন। উপর বর্ম্মার অন্তর্গত পীনমানা নগরে তাঁহার গৃহে সাদর আতিথ্য গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে মাসাধিক কাল যাপন করিতে হইয়াছিল। তৎপর আমরা বর্ম্মার প্রাচীন রাজধানী মেণ্ডালয় নগরে ও টাঙ্গু নগর ইত্যাদিতে গিয়াছিলাম,

এবং বর্ত্তমান রাজধানী রেঙ্গুণ নগরে সপ্তাহ কাল স্থিতি করিয়াছিলাম।

কলিকাতা হইতে রেঙ্গুণে পঁহুছিতে ৬০ মাইল ভাগীরথী-বক্ষ, ৯০০ শত মাইল সমুদ্র এবং ২১ মাইল রেঙ্গুণ নদী অতিক্রম করিতে হয়, আমরা তিন দিবসান্তে ২৭শে পৌষ মধ্যাহ্নে রেঙ্গুণ নগরে উপনীত হইয়াছিলাম। সেই দিনই সায়ংকালের ট্রেণে পীনমানা নগরে যাত্রা করা যায়। আমরা পরদিন প্রত্যূষে উক্ত নগরে উপস্থিত হইয়াছিলাম। পূর্ব্বোল্লিখিত কন্যা ও তাঁহার স্বামী পীনমানার উকিল শ্রীমান্ বসন্তকুমার হালদার কিয়দ্দিনের জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সহযাত্রী হইয়া আমরা পীনমানাতে গিয়াছিলাম। কন্যার পিতৃদেব শ্রীযুক্ত ডাক্তার কুড়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও আমাদের সঙ্গে গিয়াছিলেন। তিনি ২।৩ দিন পরে পীনমানা হইতে স্থানান্তরে যাইয়া বাস করেন। উক্ত নগরের পশ্চিম প্রান্তে একটি পর্ব্বতমূলে দারুময় দ্বিতল গৃহে বসন্তকুমার স্থিতি করেন। সেই বাসগৃহের সম্মুখ ভাগে একটি নাতি বৃহৎ ঝিল। স্থানটি তরুলতাসমাচ্ছন্ন রমণীয়। তথায় নগরের জনতা ও কোলাহল নাই, ইতস্ততঃ বৌদ্ধধর্ম্মযাজক ফুঙ্গিদিগের আশ্রম বিদ্যমান। সূর্য্যাস্ত ও সূর্য্যোদয়সময়ে প্রতিদিন বিহার করিয়া আমরা ঝিল প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক বিশেষ আরাম পাইয়াছি। সেই স্থান বৃক্ষলতাসমাকীর্ণ পার্ব্বত্য ভূমি হইলেও বিহঙ্গকুলের শ্রুতিমধুর কূজন প্রায় কখনও শুনিতে পাওয়া যায় না। সেখানে কেবল দিবা ভাগে কাকের কর্কশ শব্দ শুনা গিয়াছে, এবং দিবা রাত্রি ঘণ্টায় ঘণ্টায় গৃহপালিত কুক্কুটের সমুচ্চ ধ্বনি, সময়ে সময়ে গৃহ-প্রাঙ্গণস্থ রাজহংসদিগের কাঁত কাঁত বিকট শব্দ কর্ণ যুগলকে আহত করিয়াছে ও সুনিদ্রার বিঘ্ন জন্মাইয়াছে। সে দেশের কাক বঙ্গদেশের কাকের অনুরূপ নহে, আকৃতিতে কিঞ্চিৎ ভিন্নতা আছে, শব্দেও ভিন্নত বিদ্যমান, বর্ম্মদেশের কাকের শব্দ বড়ই বিরক্তিজনক। তথায় দাঁড়কাক নাই, শৃগাল নাই।

আমরা বসন্তকুমারের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া প্রায় দেড় মাস কাল স্থিতি করিয়াছিলাম। গৃহকর্ত্রী অতিশয় আদর যত্ন করিয়া আমাদিগকে খাওয়াইতেন। তিনি মাতৃস্থানীয়া হইয়াছিলেন, প্রতিদিন চারি বার চারি বাটী খাঁটি দুগ্ধ পানে আমাদিগকে বাধ্য করিয়াছিলেন, আমরা কাচ থাকায় অগত্যা তাঁহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম। এক এক দিন ভোজ্যাদির ঘটা দেখিয়া মন শ্রান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িত। মাতাজীর মনস্তুষ্টির জন্য কিছু না কিছু খাইতে বাধ্য হওয়া গিয়াছে। কন্তু আকণ্ঠ পূরিয়া খাইয়াও আমরা তাঁহার মনস্তুষ্টি সাধন করিতে পারি নাই। তিনি কিছুই খাওয়া হইল না বলিতেন। গৃহকর্ত্রী প্রাতঃকালে কুটন কুটিবার সময় বলিতেন, "বলুন, কি খাইতে ভাল বাসেন।" আমরা সরল ভাবে মনের কথা খুলিয়া বলিতাম, শিম ভাতে দাও, বেগুণ পুড়িতে দাও, ডাইলের বড়া কর, এসকল ভাল

বাসি। তাহা শুনিয়া তাঁহার মন উঠিত না, তিনি বলিতেন, "ওকি হইল! "সে সকলত হইত, তাহার সঙ্গে নানা ব্যঞ্জনের ঘটাও হইত। এত খাইয়াও স্থানের গুণে অজীর্ণ দোষে কষ্ট পাওয়া যায় নাই। গৃহের পার্শ্বস্থ ঝিলটি আমাদের হজমী গুলি ছিল। প্রতিদিন প্রাতঃসন্ধ্যা দুইবার করিয়া যে ঝিল প্রদক্ষিণ করা হইত, তাহা ভুক্ত সামগ্রীর জীর্ণ করার পক্ষে অনুকূল হইয়াছিল। দুই বেলা দুই বার করিয়া ঝিল প্রদক্ষিণ করায় প্রায় এক ক্রোশ পথ ভ্রমণ করা হইত। গৃহকর্ত্রী ক্ষুধাগ্নি সমধিক উদ্দীপন করার উদ্দেশ্যে পরে প্রত্যহ আমাদিগকে salt সেবনও করাইয়াছেন। প্রচুর ভোজনে মাংস বৃদ্ধি হওয়ায় দেহটা কত দূর ভারি হইয়াছে ওজন করিলে বুঝা যাইতে পারিত। কিন্তু সেদেশের অনেকে ৭১।৭২ বৎসর বয়সের এই বৃদ্ধ পুরুষকে দেখিয়া ৫০। ৫৫ বৎসরের যুবা মনে করিয়াছেন। এরূপ বয়স কমিয়া যাওয়া আহারের গুণেই বলিতে হইবে।

পীনমানা হইতে আমরা পুরাতন বৌদ্ধ কীর্ত্তি ইত্যাদি দর্শন করিবার জন্য বিগত ১১ই ফাল্গুন প্রাচীন রাজধানী মেণ্ডালয় নগরে গিয়াছিলাম। তদ্বিষয় পরে বলা যাইবে। প্রথমতঃ বর্ম্মরাজ্যের পূর্ব্বাপর ঐতিহাসিক বিবরণ পরে তদ্দেশীয় মহিলাদের বিবরণ অবশেষে সে দেশের বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবস্থা এবং ধর্ম্মযাজক প্রভৃতির বৃত্তান্ত সঙ্ক্ষেপে লিখিব মনস্থ করা গিয়াছে, তৎসঙ্গে আবশ্যক মতে ছবিও দেওয়া যাইবে। সেই সকল বৃত্তান্ত ক্রমশঃ অনেকগুলি মহিলার স্থান অধিকার করিবে।

বর্ম্মদেশের বিস্তৃতি ১,৭১,৪৩০ বর্গ মাইল, ১৯০১ সালে লোকসংখ্যা হইয়াছে ১,০৪,৯০৬২৪। আমাদের অধিষ্ঠানভূমি বঙ্গদেশের পূর্ব্ব দক্ষিণ প্রান্তে পূর্ব্বোপদ্বীপ; এই পূর্ব্বোপদ্বীপ পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। যথা,—বর্ম্ম, শেয়াম, লেয়ম, আনাম, মলয়। তন্মধ্যে বর্ম্ম রাজ্যের আয়তন অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে আরাকাণ ও তানেসেরিয়ম প্রদেশ ইংরাজাধিকারভুক্ত হয়। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে রেঙ্গুণ অধিকার হইলে, সমুদায় নিম্ন বর্ম্মা বৃটিশ রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। ১৮৮৫ সালে তদানীন্তন বর্ম্ম রাজ্যাধিপতি মহারাজ থিবো ইংরাজ রাজকর্ত্তৃক বন্দী হন, তখন সমস্ত বর্ম্মদেশ ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত হয়।

১৬১২ খ্রীঃ ইংরাজ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি রেঙ্গুণের নিকটবর্ত্তী সিরিয়মে, প্রোমে এবং দূরস্থ আবাতে বাণিজ্য কুঠী নির্ম্মাণ করিয়া বাণিজ্য আরম্ভ করেন। ১৬৫০ খ্রীঃ সমস্ত ইয়ুরোপীয় লোক বর্ম্মদেশ হইতে তাড়িত হন। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে পুনর্ব্বার ইয়ুরোপীয়গণ তথায় বাণিজ্য-কুঠী নির্ম্মাণ করেন। এই সময় হইতে আরাকাণ ও তেনাসিরণ অধিকার করার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইংরাজেরা প্রায় সমস্ত সময় বাণিজ্য কার্য্যে রত ছিলেন।

রেঙ্গুন বর্ম্মদেশের রাজধানী, উহা রেঙ্গুন নদীর বামতটে প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব্বে এই নগর একটি পল্লীর ন্যায় ক্ষুদ্র ছিল। ১৪১৩ খ্রীঃ বর্ম্মিজগণ এই স্থান অধিকার

করে, তখন তৈলঙ্গ জাতি এস্থানে প্রধান হইয়া উঠিয়াছিল। তৈলঙ্গদিগের সঙ্গে বার্ম্মিজদিগের অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটিয়াছিল, নগরটি পর্য্যায়ক্রমে উক্ত দুই জাতির হস্তগত ছিল। পরিশেষে ১৭৬৩ খ্রীঃ রাজা অলম্প্রা বার্ম্মিজদিগের জন্য সম্পূর্ণ রূপে নগরটি অধিকার করিয়া তাহাকে ইয়ঙ্গুন নামে অভিহিত করেন। ইয়ুরোপীয়েরা ইয়ঙ্গুনের পরিবর্ত্তে রেঙ্গুণ নাম প্রদান করিয়াছেন। প্রথমতঃ এই নগর ১৮২৪ হইতে ১৮২৭ সন পর্য্যন্ত ব্রিটিশ অধিকারে থাকে। ১৮২৭ সনে পুনর্ব্বার বর্ম্মরাজের অধিকারে আইসে। ১৮৫২ খ্রীঃ ইংরাজেরা পুনর্ব্বার রেঙ্গুণ অধিকার করেন, তদবধি উহা ব্রিটিশ অধিকার ভুক্ত হইয়া আছে।

রেঙ্গুণ হইতে পূর্ব্ব রাজধানী মেণ্ডালয় ৩৮৬ মাইল দূরে, ঐরাবতী নদীর তীরে প্রতিষ্ঠিত। রাজা মিণ্ডন প্রাচীন রাজধানী অমরাপুর পরিত্যাগ করিয়া ১৮৫৬ খ্রীষ্টঃ বিস্তীর্ণ মাণ্ডালয় নগর ফরাসিস ইঞ্জিনিয়ারের সাহায্যে স্থাপন করিয়াছিলেন।

বর্ম্মদেশ ৮টী কমিশনরের বিভাগে বিভক্ত। যথা—মোসঙ্গ, মিকটিলা, পেগু, মগমু, আরাকাণ, মাণ্ডালয়, ঐরাবতী, তেনেসিরম। পেগুবিভাগে—রেঙ্গুণ, ঐরাবতী বিভাগে—বেসিন, তেনেসিরিম, মৌল্‌মিন, অন্যান্য বিভাগের নামানুসারে কমিশনরের হেড্‌ কোয়ার্টারের নাম।

মেণ্ডালয় হইতে ৪২মাইল দূরে মগমুয়ো পর্ব্বত, উহা ৩০০০ফিট উচ্চ। এই পর্ব্বতে বর্ম্মার লেপ্টনাণ্ট গভর্ণরের গ্রীষ্মাবাস। পর্ব্বতের মূলপর্য্যন্ত ১৩ মাইল সমতল ভূমিতে রেলওয়ে বিস্তৃত, তৎপর ক্রমশঃ পর্ব্বতোপরি বক্র গতিতে রেলওয়ে সমুত্থিত হইয়াছে।

রেলওয়ে বিস্তার হওয়ার পূর্ব্বে এদেশীয় যাত্রিকগণ রেঙ্গুণে পঁহুছিয়া ঐরাবতী নদীতে বাষ্পীয় পোত বা নৌকারোহণে দূরতর মাণ্ডালয় প্রভৃতি স্থানে যাইতেন। বর্ম্মদেশের প্রধান নদী ঐরাবতী, উহা রেঙ্গুণ নগরের অদূরে বঙ্গোপসাগরকে আলিঙ্গন করিয়াছে। এই নদীর তীরবর্ত্তী আবা, অমরাপুর সেগায়াং প্রভৃতি স্থানে বহু প্রাচীন ভগ্নাবশেষ ও বৌদ্ধ কীর্ত্তি বিদ্যমান, তাহা দর্শনযোগ্য।

বর্ম্মদেশে রেলওয়ের ইতিহাস।

বর্ম্মদেশের ১৮৬৯ সনে রেঙ্গুণ এবং ঐরাবতী ডেলীষ্টেট রেলওয়ে নামে রেলওয়ে প্রথম খোলা হয়। সেই সনে রেঙ্গুণ হইতে প্রোম পর্য্যন্ত একটী লাইন জরিপ হইয়া যায়। ১৮৭৪ সনে রাস্তার কার্য্য আরম্ভ হইয়া ১৮৭৭ সনে সম্পূর্ণ ১৬১ মাইল এই রেলপথে লোকের যাতায়াত হয়। রেঙ্গুণ হইতে উত্তর পূর্ব্বমুখী একটি ১৬৬ মাইল লাইন সিটাঙ্গ উপত্যকা মধ্য দিয়া টঙ্গু পর্য্যন্ত নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়া ১৮৮৫ সনের ১লা জুলাই তারিখে শেষ হয়। পেগু পর্য্যন্ত ৪৬ মাইল লাইন ১৮৮৪ সনের ২৭ ফেব্রুয়ারী খোলা হয়, এবং পাইউনজা পর্য্যন্ত ৮৮ মাইল লাইন ১৮৮৪ সনের ১লা আগষ্ট তারিখে খোলা হয়। তাহাতে ধান চাউলের রপ্তানি কার্য্য অতিমাত্রায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ১৮৮৫ সনে

অপার বর্ম্মদেশ অধিকার করার পর টঙ্গু হইতে মাণ্ডালয় পর্য্যন্ত রেল বিস্তারের প্রয়োজন হয়, এবং মাণ্ডালয় পর্য্যন্ত লাইন ১৮৮৯ সনের ১লা মার্চ্চ খোলা হয়। ১৮৯০ সনের জানুয়ারী মাসে উপত্যকা রেলওয়ে বিস্তার হয়। মাণ্ডালয়ের ১২ মাইল দূরে একটি জংসং, তথা হইতে ৩৩২ মাইল এই লাইন বিস্তৃত হয়। এইরূপে ক্রমে ১৯০৩ সনের মে মাস পর্য্যন্ত সেদেশে ১৩৫৩ মাইল রেলওয়ে বিস্তৃত হইয়াছে। আরও অনেক ছোট ছোট লাইন খোলার প্রস্তাব আছে। ঐরাবতী নদীর উপর বৃহৎ সাঁকো হওয়ার প্রস্তাব চলিতেছে।

কল্যাণীয়া হামিদা দেবী।

আমরা অতিশয় শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, কল্যাণীয়া হামিদা পৃথিবীতে নাই। তিনি ২৩ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইতেই আত্মীয় স্বজনকে শোকসন্তপ্ত করিয়া দিব্যধামে চলিয়া গিয়াছেন। হামিদা বাঁকীপুর নগরস্থ প্রেমাস্পদ ডাক্তার শ্রীযুক্ত পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রাণাধিক জ্যেষ্ঠা কন্যা, উক্ত নগরের বি, এন্ কলেজের প্রিন্সিপাল কল্যাণভাজন শ্রীমান্ দেবেন্দ্রনাথ সেনের প্রিয়তমা পত্নী ছিলেন। তিনি দুই বৎসরমাত্র বৈবাহিক জীবন যাপন করিয়াছিলেন। অকালে একটি মৃত সন্তান প্রসব করাতে তাঁহার শরীর একান্ত ভগ্ন ও রুগ্ন হইয়া পড়ে। তিনি কয়েক মাস শয্যাগত থাকিয়া অত্যন্ত রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন, সুচিকিৎসার জন্য হাবড়াতে আনীত হইয়াছিলেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীমান্ করুণাকুমার চট্টোপাধ্যায় হাবড়ার দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার প্রাপ্ত হইয়া আছেন, তাঁহারই বিশেষ তত্ত্বাবধানে থাকিয়া কয়েক মাস অনেক সুবিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা হামিদা চিকিৎসিত হন, পিতা মাতা কনিষ্ঠা ভগিনী নিকটে থাকিয়া সর্ব্বদা সযত্নে সেবা শুশ্রূষা করেন। এক এক বার তাঁহার জীবনসংশয় হইয়াছিল, কিন্তু পরিশেষে তিনি কিছু সুস্থ ও সবল হন। হাবড়া হইতে তাঁহাকে পুনর্ব্বার বাঁকিপুরে লইয়া যাওয়া হয়, তথায় তিনি অল্প দিন পরে তনুত্যাগ করেন।

দেবী হামিদা স্বর্গগত নববিধান প্রেরিত ভক্তিভাজন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের অতিশয় স্নেহ ও আদরের পাত্রী ছিলেন। মজুমদার মহাশয়ই তাঁহাকে হামিদা নাম প্রদান করিয়াছিলেন *। হামিদা নানা স্বর্গীয় গুণে ভূষিতা হইয়া সকলের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি অতিশয় শান্ত সুশীল মধুরপ্রকৃতি কন্যা ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ ভক্তি বিনয় চরিত্রের সৌন্দর্য্য অসাধারণ ছিল। তাঁহার প্রিয়দর্শন মুখমণ্ডলে পবিত্রতার লাবণ্য দীপ্তি পাইত। তিনি আপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য, সুকোমল ভাব ও পুণ্য প্রভায় সকলের স্নেহ ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেন। বিগত ৬ই চৈত্র বাঁকিপুরে উক্ত স্বর্গগতা কন্যার পারলৌকিক ক্রিয়া

* হামিদা আরব্য শব্দ, অর্থ প্রশংসিতা।

সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রাদ্ধ ক্রিয়াসম্পাদন-জন্য নববিধান প্রচারক ভাই প্রমথলাল সেন তথায় গিয়াছিলেন।

হামিদা দেবী বাঁকিপুরস্থ নীতিবিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদিগের শিক্ষা দানের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত বিদ্যালয় তাঁহা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শুনিয়াছি তিনি অসুস্থ শরীরেও সেই কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি একটি অনাথ বালকের প্রতিপালনের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, মাতৃনির্ব্বিশেষে তাহাকে পরম যত্নে লালন পালন করিয়াছেন। এক সময়ে সেই বালকটির রক্তামাশয় হইয়াছিল, তিনি অবিরক্ত চিত্তে তাহার ময়লা পরিষ্কার করিয়াছেন।

স্নেহের হামিদা স্কুল কলেজে অধিক দিন লেখাপড়া শিক্ষা করেন নাই, পিতৃগৃহে উপযুক্ত শিক্ষকদিগের দ্বারা রীতিমত বাঙ্গলা ও ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষকদিগের মধ্যে অন্যতর শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু গৌরীপ্রসাদ মজুমদার। গৌরীপ্রসাদ মজুমদার যে নিজের শোকোচ্ছ্বাস লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা নিম্ন ভাগে প্রকাশিত হইল। প্রিয় হামিদার রচনা নৈপুণ্য অসামান্য ছিল, তাঁহার রচনার সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যে সকলের মন আকৃষ্ট হইয়াছে। তিনি স্বীয় প্রবন্ধাদিতে অতিশয় চিন্তাশীলতা ও অভিজ্ঞতার পরিচয় দান করিয়াছেন। হামিদা বাঁকিপুরস্থ অঘোর সমিতিতে পঠিত নিজের একটি প্রবন্ধ এক সময় মহিলাতে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহার রচিত দুই একটি অপর প্রবন্ধও মহিলাতে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল। সাহিত্যসেবিকা সুকবি মোসলমান কন্যা Mrs Hosan তাঁহার একটি প্রবন্ধপাঠে মুগ্ধ হইয়া হামিদা তাঁহার একজন মোসলমান ভগিনী ভাবিয়া আমাদের নিকটে পত্র লিখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার ভ্রম সংশোধন করিয়া লিখিয়াছিলাম যে, তিনি মোসলমান কন্যা নহেন, ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব ব্রাহ্মের কন্যা। তাহাতে উক্ত মোসলমান কন্যাটী লিখিয়া ছিলেন, যাহা হউক, তিনি ব্রাহ্ম সমাজের কন্যা হইলেও আমার বিশেষ আদরের পাত্রী। বাস্তবিক হামিদা একটী বালিকা হইলেও সুপ্রবীণার ন্যায় প্রবন্ধাদি লিখিতেন।

উপাসনাশীলতা ভগবদ্ভক্তি ও সাধুভক্তির জন্য দেবী হামিদা সকলের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। ধর্ম্মভাবে তিনি রমণীকুলের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। হামিদা পিতৃগৃহে অবস্থান কালে প্রাত্যহিক পারিবারিক উপাসনার সময় জনক জননীর প্রার্থনা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। বিবাহিতা হইলে পর একদিন আমরা বাঁকিপুরস্থ তাঁহার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম, উপাসনা হইয়াছিল। আমরা কলিকাতায় প্রত্যাগত হইলে পর মা হামিদা সেই উপাসনাতে যে উপকৃত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন মধুর ভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। স্নেহের হামিদা মিতভাষিণী ছিলেন, তাঁহার কোন বাহিক আড়ম্বর ছিল না, তিনি বিলাস

বাসনার ধার ধারিতেন না। এরূপ সদ্‌গুণালঙ্কৃতা প্রিয়তমা কন্যাকে হারাইয়া নববিধানমণ্ডলী ক্ষতিগ্রস্ত। স্বামী সেই পত্নীরত্ন হইতে, পিতামাতা সেই কন্যারত্ন হইতে বঞ্চিত হইয়া গভীর শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন। ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হয়। তিনি তাঁহাকে এই মর্ত্তাধাম হইতে লইয়া গিয়া অমরধামে দেবীমণ্ডলীর মধ্যে স্থান দান করিলেন। হামিদা শান্ত প্রফুল্ল অন্তরে "শান্তিদায়িনী মা শান্তি দাও" বলিতে বলিতে দিব্যধামে প্রস্থান করিয়াছিলেন।

দেবী হামিদা আমাদিগকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন তন্মধ্য হইতে তিন খানা ক্ষুদ্র পত্র, ভাই প্রমথ লালের নিকটে লিখিত পত্র সকল হইতে দুই খানি পত্র এবং তাঁহার দিদীমাকে (স্বর্গগতমজুমদার মহাশয়ের ধর্ম্মপত্নীকে) মজুমদার মহাশয়ের স্বর্গগমনের পর যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন তন্মধ্য হইতে কয়েক খানা পত্র নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল *। পত্র সকল পড়িলে পাঠিকাগণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন যে, তাঁহার কিরূপ অটল ধর্ম্ম বিশ্বাস ও ধর্ম্ম ভাব এবং স্বর্গগত মজুমদার মহাশয়ের প্রতি কিরূপ অচলাভক্তি ছিল।

* দেবী হামিদার পিতা মাতা স্বর্গগত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে পিতা এবং তাঁহার ধর্ম্মপত্নীকে মাতা বলেন। তাঁহারা দুই জনে তাঁহাদের ধর্ম্মপিতা ও ধর্ম্মমাতা হইয়াছিলেন। হামিদা তাঁহাদিগকে দাদা মহাশয় ও দিদীমা বলিয়া সর্ব্বদা ভক্তি করিতেন।

আমাদের নিকটে লিখিত পত্র।

বাঁকিপুর।

৩রা ডিসেম্বর ১৯০৫,

শ্রীচরণকমলেষু

ভক্তির সহিত প্রণাম করি। আপনার স্নেহপূর্ণ চিঠী খানি পাইয়া বড়ই তৃপ্তি লাভ করিলাম। আমার অসুস্থতার সংবাদে আপনি ব্যস্ত হইয়াছেন ইহা আমার বড়ই সৌভাগ্য। এখন আমি ভাল আছি আপনাদের আশীর্ব্বাদে। আশা করি আপনার শরীর ভাল আছে।

আমার এই সামান্য লেখার জন্য এত সুখ্যাতি কেন? আমি ছেলে বেলা হইতে নিজের মনে যে বিষয়টা বেশী তোলপাড় হ'ত তাহা লইয়া কিছু লিখিতাম। কাহাকেও কখনও দেখাইতাম না, এ সকল লেখা অনেক আমার নিকট আছে; কিন্তু কখন কোন কাগজ পত্রে দিতে সাহস হইত না। আপনি কি প্রবন্ধটি কিছু সংশোধন করিয়া লইয়াছেন?

Mrs. Hosainকে আমি চিনি, তাঁহাকে আমি দেখিয়াছি, কথাবার্ত্তা অনেক তাঁর সহিত হইয়াছে, কিন্তু নাম পরিচয় তিনি হয়ত আমার জানেন না। Mr. Hosain এর সহিত বাবার যথেষ্ট জানা শোনা আছে। তিনি Mrs. Hosain এর জীবনের কত কথা আমাদের নিকট গল্প করিয়াছেন। মেয়েটি সত্যই বড় ভাল। ইচ্ছা হয় তাঁহার দ্বারা মোসলমান নারীগণের কিছু উন্নতির পথ খুলিয়া যায়।

এখানকার সকল সংবাদ মঙ্গল।

আশা করি প্রচারাশ্রমের সকলে ভাল আছেন।

আপনারা সকলে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম-গ্রহণ করুন।

স্নেহাকাঙ্ক্ষিণী
হামিদা

বাঁকিপুর
১৯শে জুন ১৯০৬।
শ্রীশ্রীচরণকমলেষু।

আমার সভক্তি প্রণাম গ্রহণ করিবেন। আপনার স্নেহোপহার ও সুন্দর চিঠি পাইয়া বড় আনন্দ লাভ করিলাম। এই সকল অযাচিত দানের জন্য ভগবানের চরণে প্রাণ বার বার কৃতজ্ঞ হইতেছে।

আমি এ পর্য্যন্ত আপনাদের 'ধর্ম্মতত্ত্ব' বা 'মহিলা' কিছুরই গ্রাহিকা নহি। যে কাগজে অন্ততঃ লেখাটি প্রকাশ হইবে যদি অনুগ্রহ করিয়া সে সংখ্যাটি আমার নিকট পাঠান, বড়ই উপকৃত হইব। অধিক সাধ্য না থাকিলেও ধর্ম্মাত্মাদিগের সেবায় জীবনের কোন অংশ যদি ব্যয় করিতে পারি কৃতার্থ হইব।

গত কল্য মোহিত বাবুর স্বর্গারোহণে বিশেষ ভাবে শ্রদ্ধা সম্মানের সহিত উপাসনা হইয়াছে।

আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন। আপনাদের সকলের চরণে ভক্তির সহিত প্রণাম করি।

স্নেহের হামিদা।

বাঁকিপুর
১২ই জুন ১৯০৬।
শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু।

কত দিন আপনার হাতের লেখা পাই নাই। আমি কত দিন হইতে ভাবি আপনি কি একখানি সুন্দর বই লিখিয়াছেন, সেখানি আনাইব,তাহাও হইয়া উঠে নাই। গরমে আমার শরীর বড় কাতর থাকে ; তাই নিয়মিতরূপে কোন কাজই করিতে পারি না। এই মাঘ মাসে ব্রাহ্মিকা উৎসবের সময় শ্রদ্ধেয় দাদামহাশয়কে স্মরণ করিয়া এই প্রবন্ধটি কলিকাতাতেই লিখিয়াছিলাম। এ পর্য্যন্ত কাগজে দিবার কোন প্রয়াস পাই নাই। কেবল আপনার আগ্রহপূর্ণ কথাতে না পাঠাইয়া পারিলাম না। অশাকরি যাহা কিছু ভুল ত্রুটি আছে সংশোধন করিয়া লইবেন, এবং মাঝে মাঝে স্নেহপূর্ণ পত্র লিখিয়া কৃতার্থ করিবেন। আশা করি আপনার শরীর ভাল আছে, এবং ও বাটীর সকল সংবাদ মঙ্গল।

মোহিত বাবুর অকস্মাৎ পরলোকগমন সংবাদ শুনিয়া আমরা মর্ম্মান্তিক আঘাত পাইয়াছি। আপনি আমাদের সভক্তি প্রণাম গ্রহণ করুন,এবং সকলকে দিবেন ; আমাদের সকল সংবাদ মঙ্গল।

আপনাদের স্নেহের
হামিদা।

শ্রীমান্ প্রমথলাল সেনের নিকটে লিখিত পত্র।

বাঁকিপুর
২৪শে নবেম্বর ১৯০৪,

শ্রীচরণেষু

আমাদের এই সামান্য লেখার জন্য আপনাকে এত খুসী হ'তে দেখে আমাদের মনে কত উৎসাহ ও কৃতজ্ঞতা আসে, কি করে জানাই। তবে আজ আপনিও আমাদের শ্রদ্ধাপূর্ণ ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

সকাল সন্ধ্যে প্রার্থনা করি। যখন আরও অনেক ছেলে মানুষ ছিলাম তখন থেকেই প্রার্থনা কর্ত্তে শিখেছিলাম। কে শিখিয়েছিলেন জানি না। কিন্তু এটা বল্‌তে পারি এত ছোট বয়স থেকে হয়তো কেউ এত রকমের কষ্টের স্বাদ পায় না। এত রকমের দায়িত্ব এসে মাথায় কারো পড়ে না। তা এসকলের জন্যে আমি দুঃখিত নই। আর এও বিশ্বাস করি না যে, আমি সে সমস্ত রোগ, শোক, যন্ত্রণা উত্তীর্ণ হ'য়েছি। কিন্তু এটা ঠিক, আমি এই সব দুঃখ কষ্টের ভেতর যাঁর পরিচয় পেলাম, যাঁকে ডাক্‌তে শিখলাম, অন্য উপায়ে তা হ'ত কিনা জানি না। পিতা মাতার এত আদর যত্নের ভেতর থেকেও, ভাই বোনের এত স্নেহ ও সহানুভূতি পেয়েও কেন এ অভাব ও অসহায়তা অন্তরকে আচ্ছন্ন করে? তখন যেন কিছুই ভাল লাগে না, এ সময়ে প্রার্থনা খুব সরল ও একান্ত হয়; নির্জ্জনতা পাইলেই মনে প্রার্থনার কথা উঠে। তখন অনেক সময় চেঁচিয়ে প্রার্থনা করি। কিন্তু নির্জ্জনতা ও একলা না হ'লে যেন মুখ ফোটে না। ভয়ানক নিরাশা ও অন্ধকারের ভেতর প্রার্থনা করে কত শান্তি পেয়েছি। কত অমীমাংসিত বিষয় সিদ্ধান্ত হ'য়ে গেল। এ সকল সময়ে প্রার্থনা করা ছাড়া আর কারো সঙ্গে কখনও এ সব কষ্টের কথা বলিতে পারি না। আর সব সময়ে পেয়েছি কিনা জানিনে, কিন্তু অনেক সময়ের কথা লিখে রাখতে চেষ্টা করি। আগে প্রায় প্রতিদিনই নিয়মিত দৈনিক লিখতাম। এখন অসুস্থতার জন্য নিয়মিত হয় না। আগেকার এ সমস্ত লেখা পড়্‌তে ভাল লাগে। আপনার চিঠির কথাগুলি যেন ঠিক আমার মনের মত। সবই যেন আমার মনের কথা।

আপনাদের স্নেহের বোন
হামিদা

বাঁকিপুর
২৬শে নবেম্বর ১৯০৪।

শ্রীচরণেষু।

আপনার ছেলেবেলায় Diary লেখার কথা শুনে আনন্দ হ'ল। আপনার এত রকমের Diary আমার পড়্‌তে ইচ্ছে করে। আমারও অনেক দিনের নানা রকম লেখা কত খাতা আছে। কিন্তু আপনার চাইতে খুব সম্ভব অনেক কম। খুব ছোট বেলায় Sunday Schoolএ যখন যেতাম তখন রোজ যা কিছু দোষ, অন্যায় বল্‌তাম কি কর্‌তাম সব লেখা থাকত। যাঁরা সে খাতা দেখতেন কত বিচার কর্‌তেন। এ গেল এক সময়ের কথা। বড় হয়ে আর Sunday Schoolএ

যাইনি। "স্ত্রী চরিত্র সংগঠন" প'ড়ে খুব উপকার হয়েছিল। রোজ খানিকটা করে পড়্‌তাম। তার ভেতর "সার কথা" বলে যেগুলি লেখা আছে, জীবনের সঙ্গে সেগুলি মেলাতাম; আর সন্ধ্যা বেলায়—পার্‌তাম কি না সে বিষয় খাতায় লেখা থাক্‌ত। আগে এম্‌নি Routineএর সঙ্গে মিলিয়ে চল্‌তে পার্‌তাম মনে কর্‌লেও সুখ হয়। এখন আর ততটা পারিনে। এ গেল ৫। ৬ বছরকার আগের কথা, তখন স্কুলে পড়্‌তাম। তারপরে আমার জীবনে এম্‌নি সব পরিবর্ত্তন এলো যে, সব ভেঙ্গে চুরে আমার সব বদ্‌লে গেল। যাঁরা আমাকে ছেলে বেলা থেকে জানেন তাঁরা সব দেখেছেন। এই পরিবর্ত্তনের পর থেকে আমার অনেক লাভ হ'ল, আবার কত জিনিষ চির জীবনের জন্য হারালাম। এই সব বিশেষ সময়ের কথা আমার কাছে লেখা আছে; আর আর বিশেষ বিশেষ দিনের প্রার্থনাও লেখা আছে, কিন্তু প্রতিদিনের নাই। এখনও তাই লিখি। একখানা খাতায় প্রার্থনা, অন্য খানায় জীবনের বিশেষ মুহূর্ত্ত যা আসে তার কথা। আজ প্রায় ৩॥ টার সময় উঠেছি; তখন উঠে বর্ত্তমান সময়ের কিছু বিশেষ কথা লিখে রাখ্‌লাম, এখনকার দিনগুলি কেমন কাট্‌চে সেই বিষয়। তখন ফুটফুটে চাঁদের আলো, পৃথিবী নিস্তব্ধ ও আকাশ শান্ত গম্ভীর, কোথাও একটি জীব জন্তুর শব্দ নাই। আমার তখন Wordsworth এর একটি ছোট কবিতার কথা মনে পড়্‌ছিল আপনি হয়ত জানেন। "“It is a beauteous evening calm and free; The holy time is quiet as a nun. Breathless with adoration.”

“Listen the mighty Being is awake
And doth with his eternal motion make
A sound like thunder everlastingly."

এই নিস্তব্ধতার ভেতর কার যেন মহা শব্দ ও শক্তি। মনের অদম্য অভাব যার, অস্ফুট বেদনা এত বিষাদ আনে তা আর কিছুই নয় অনন্তের সম্ভাষণের জন্য। চাঁদের স্নিগ্ধ তরল আলোতে সমস্ত প্রকৃতি স্নাত হ'য়েছিল; আমি অনন্তের সম্ভোগ পাচ্ছিলাম, সত্যই এখানে কত সুখ। আমাদের আত্মা ও হৃদয় সংসারে বাধা পায় বলে তারা এ আনন্দ সম্ভোগ হ'তে বঞ্চিত হয়।

আপনাদের স্নেহের
হামিদা

দিদীমার নিকট লিখিত পত্র।

বাঁকিপুর।

২৭শে নবেম্বর ১৯০৫

শ্রীচরণকমলেষু

দিদিমা আপনার চিঠি পড়ে যেন প্রাণ গলে যায়। আপনার কষ্ট দেখিতে প্রাণ বিদীর্ণ হয়। সেই দেবাত্মা, যাঁহার পরিচয় পাইয়া শত কষ্ট কত যন্ত্রণা ভুলিয়াছিলেন, আপনি তাঁহাতেই শান্তি লাভ করুন, তাঁহার মধ্যে ডুবিয়া সে প্রিয়তমের দর্শন লাভ করিবেন। একথা সত্য;

যখন সমাহিত শুদ্ধমনে পবিত্রাত্মার চিন্তায় ডুবিয়া যাই, এ শরীরের কথা, এ অলীক সংসারের কথা ভুলিয়া যাই। তিনি সেই চিন্ময় জগতে গিয়াছেন, সে জীর্ণ তনু আর নাই, সে কষ্ট যাতনা আর নাই, জ্যোতির্ম্ময় চেহারা আরও সুন্দর, আরও আনন্দে ভরপুর হইয়াছে। যখন এ সংসারের ভাবনা চিন্তা মায়া মোহ আমাদিগকে প্রলোভিত প্রতারিত না করিতে পারে, কোন উত্তেজনা স্পর্শ করিতে না পারে, সেই চিন্ময় ব্রহ্মরূপ আমাদের হৃদয় মনকে আচ্ছন্ন করে, আমাদের চিন্তা আর সীমাবদ্ধ থাকে না, এ সীমাবদ্ধ জীর্ণ দেহের বন্ধন মনে থাকে না। আমরাও অনন্তের স্পর্শ পাই ; স্বর্গবাসী দেব দেবীর পরিচয় পাই, ইহা ভিন্ন আর কাহাকে স্বর্গসুখ বলিব ? আপনার প্রিয়তম সেই দেশ অন্বেষণ করিতে আদেশ করিতেছেন, সেখানে তিনি আমাদের দুরবস্থা কখনই ভুলেন নাই ; চলুন আমরা সেখানে গিয়া আশ্বাস ও সান্ত্বনা পাইব। শেষ রাত্রের অন্ধকারে তাঁহার নিদ্রা হইত না। তিনি প্রভাতের আলোকের অপেক্ষায় ব্যাকুল হইতেন। আমরাও প্রতিদিন সেই সময় নিদ্রা ত্যাগ করিয়া পরব্রহ্মের চিন্তায়, পরম পিতার অন্বেষণে রাত্রি শেষ করিব। আমি আজ ২।৩ দিন হইতে শেষ রাত্রে ৩।৩॥ টার সময় সচ্চিন্তায়, প্রার্থনায় ধর্ম্ম পুস্তক পাঠে কাটাইতেছি, ইহাতে বড় আরাম। আপনি এ আদর্শ দেখাইলে আমরা পরম কৃতার্থ হইব। দিদি মা, নিজের মনের কথা মনের সাধ বলিলাম, কিছু মনে করিবেন না। আমার ভক্তি পূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

আপনাদের আদরের
কন্যা

Exhibition Road
24—12—05.

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু।

দিদিমা, কত দিন আপনার হাতের লেখা পাই নাই। আজকের দিনে কি আপনি দূরে থাকিবেন। আজ আপনি দূরে থাকিলেও দূরে নহেন। আজ তিনি নিকটে অতি নিকটে। তাঁর প্রিয় বাঁকিপুর, তাঁর প্রিয় ও প্রিয়তমাকে ছাড়িয়া আজ তাঁর সে উচ্ছ্বাস ও আনন্দ সে প্রার্থনা সে উপাসনা অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না। তিনি কত বার বলিয়াছেন তোমাদের অতি নিকটে আমি থাকিব। দিদিমা, আজকের দিনে আমরা তাঁহার মধুর সহবাস ও উপাসনা সম্ভোগ করি। প্রিয় দিদিমা, আমার ভক্তি ও ভালবাসা গ্রহণ করুন *।

আপনাদের হামিদা।

বাঁকিপুর।
৩রা মার্চ্চ ১৯০৬,

শ্রীচরণকমলেষু

দিদিমা, আজ সেই পরলোকবাসী দেবর্ষির উজ্জ্বল পবিত্র মূর্ত্তি প্রাণে জাগিতেছে। তিনি কি আজও আমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন ? আমার জন্য তাঁর যে ব্যাকুল সহানুভূতি তাহা আর কোথায়

* ...র জন্মদিনে এই পত্র লিখিত হইয়াছিল।

পাইব? সে চক্ষের জল কেন পড়িত? গত বৎসরেও তাঁর কত আশীর্ব্বাদ কত আদর যত্ন পাইয়াছি, আজ সর্ব্বাগ্রে তাঁর সেই অপার্থিব ভালবাসা মনে হইতেছে। ভক্তিভরে তাঁহার চরণে প্রণাম করি। যেন তাঁর ইচ্ছা পালন করিতে তাঁহাকে সুখী করিতে এ জীবন মন দিতে পারি, আপনি আমাকে সেই আশীর্ব্বাদ করুন। জীবনের নূতন বৎসরে নূতন চরিত্রের জন্য তাঁর শ্রীপাদপদ্মে ভিক্ষা চাহিতেছি। আপনি আমার ভক্তি পূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন *।

আপনার আদরের
হামিদা

পত্রাংশ।

বাঁকিপুর
২১শে মার্চ্চ, ১৯০৬।

কত বার আপনার শুষ্ক মুখ খানি দেখতে পাচ্ছিলাম। কে একটু খাবার এগিয়ে দিল; কে একটু কাছে বসল? ভগবান; তাঁর স্নেহ আদর দেখতে পেলে সবই পৃথিবীর তুচ্ছ বোধ হয়। তিনিই আপনার সাথী, তিনিই আপনার সঙ্গী। তাঁর সঙ্গ অনুভূতিতে সেই অদৃশ্য দিব্যধামবাসী দেবাত্মার সঙ্গ অনুভব করিবেন। মানুষ যখন শরীরের ভার, জীবনের ভার, সংসারের ভার ভুলে যেতে পারে, সেই দিব্যদশায় অন্তরের গভীরতম স্থানে সেই দেবাত্মা, পুণ্যাত্মাদিগের সহবাস সুখ সম্ভোগ হয়। তাঁহাদের বিচরণের স্থান মানবের পবিত্র অন্তরতম স্থল। গভীর চিন্তায়, গভীর সরল ব্যাকুলতায় প্রার্থনা উপাসনায় কত সান্ত্বনা কে তা জানেনা।

* নিজের জন্মদিনে এই পত্র লিখিত হইয়াছিল।

Howrah.
General Hospital
7—4—07.

কল্যাণীয়া শ্রীমতী সুজাতা দেবীর পত্র আমাদের নিকটে লিখিত।

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু।

আপনার ভালবাসা এবং সহানুভূতিপূর্ণ পত্র আমি যথাসময়ে বাঁকিপুরেই পাইয়াছি। উপযুক্ত সময়ে তাহার উত্তর দিতে না পারায় ক্ষমা চাহিতেছি। আমাদের অবস্থাত সকলি বুঝিতেছেন। আপনাদের মত দুঃখের দুঃখী আর কে হইতে পারিবেন। একমাত্র ভগিনী, দিদীকে হারাইয়া কাহারো সাম্‌নে বাহির হইতে কষ্ট বোধ হয়, কাহারো নিকট পত্র লিখিতেও লজ্জা বোধ হয়। এ যে এক অবস্থা ইহাও ভগবানেরই হাতের দান স্বীকার করি তাই এ অবস্থা হতে উত্তীর্ণ হইতে চাই না। বিধাতার বিধান মাথা অবনত করিয়া গ্রহণ করি। তিনি যে শোকের মধ্যে ফেলে রেখেছেন, এ শোক হতেও মুক্তি পেতে যেন কোন দিন না চাই। এখন এ দুঃখ, কষ্ট, শোক আমার খুব ভাল লাগে, এখন দেখিতেছি বিপদ মানুষকে যত গভীর ও উচ্চ জীবনের অধিকারী করে সুখে, সম্পদে থাক্‌লে তা বোধ হয় হয় না।

দিদীর কথা আর কি বল্‌ব। আপনার স্নেহের ও অতি আদরের কন্যা ছিলেন

তিনি। তাঁর উন্নত জীবনের ও তাঁর সদ্ভাব ও সদ্‌গুণ সকলের কথা আপনি ত অনেকই পরিচয় পাইয়াছেন। আপনি তাঁর বয়সের কথা দিদিমার কাছে জানিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁর এই মার্চ্চ মাসেরই ৪ তারিখে জন্মদিন হইয়া গিয়াছিল; আর এই মার্চ্চ মাসেই ১৩ তারিখে, বুধবারে, ১২ মিনিটের সময় তিনি ইহ সংসার ছাড়িয়া আমাদের কাঁদাইয়া পরলোকে চলিয়া গেলেন। এইবার জন্মদিনে তিনি ২৪ বৎসরে পড়িয়াছিলেন মাত্র। আমার ইচ্ছা আছে তাঁর ছোট্ট একটি জীবনী পুস্তক লিখিবার, জানি না কবে তাহা প্রকাশিত করিতে পারিব।

দেবী হামিদা আপন প্রিয়তম স্বামীকে ও অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেনকে এবং আপন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডাক্তার করুণাকুমার চট্টোপাধ্যায়কে অনেকগুলি গম্ভীর ভাব পূর্ণ সুমধুর পত্র লিখিয়াছিলেন সেই সকল পত্র রক্ষিত হইয়াছে। তিনি আলস্যে বসিয়া বা কাহারও সঙ্গে গল্প করিয়া কালযাপন করিতেন না, অন্য কাজ না থাকিলে নানা বিষয়ে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। তাঁহার রচিত অনেকগুলি প্রবন্ধ অমুদ্রিত অবস্থায় তাঁহার স্নেহের কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী কুমারী সুজাতা দেবী যত্নপূর্ব্বক রাখিয়াছেন। আমরা ক্রমশঃ মহিলাতে সেই সকল পত্র ও প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে যত্ন করিব।

শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ মজুমদার
কর্ত্তৃক লিখিত।

ভগিনী হামিদা আর ইহলোকে নাই। অনেক দিন দুরারোগ্য রোগযন্ত্রণার পর বিগত ১৩ই মার্চ্চ বেলা দ্বাদশ ঘটিকার সময় তপস্বিনী ভগিনী ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। যখন রোগীর রোগ শয্যার চতুর্দ্দিকে শোক-সন্তপ্ত পিতা মাতা, ভাই ভগিনী স্বামী ও আত্মীয় স্বজন বর্ত্তমান, যখন সেই পুণ্যশীলা ভগিনীর স্বর্গীয় জ্যোতিঃপূর্ণ মুখমণ্ডলের উপর সকলের শোকাশ্রুপূর্ণ চক্ষু নিপতিত, যখন তাঁহার ক্রম মন্দীভূত ধমনীর আঘাত নিস্তব্ধ যখন অলক্ষিত ভাবে ভিতর হইতে চিন্ময় পক্ষী উড়িয়া গেল, সে সময়ের সে স্বর্গীয় দৃশ্য কে বর্ণনা করিবে? আর যখন পিতা মাতা স্বামী আত্মীয়বর্গের গম্ভীর প্রার্থনার পর সে অমরধামের মহাযাত্রীর দিব্য দেহ পুষ্পগুচ্ছ ও পুষ্পমালা পরিশোভিত পর্য্যঙ্কে শায়িত হইয়া শ্মশান ক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইল, যখন বন্ধু বান্ধব দিগের আয়াস-রচিত চিতা শয্যোপরি সে দিব্য দেহ ভক্তিমান্ পিতা, স্বামী ও বন্ধু বান্ধবদিগের সমক্ষে পবিত্র অগ্নিশিখায় ভস্মীভূত হইয়া গেল, সে পবিত্র স্বর্গীয় দৃশ্যের চিত্র কে অঙ্কিত করিবে? ভক্তিমান পিতা ও ভক্তিমতী মাতার অত্যন্ত আদরের কন্যা, অত্যন্ত স্নেহশীল ভাই ভগ্নীর অত্যন্ত প্রিয় ভগিনী—ভক্তিমান্ স্বামীর ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী ও চির পূজ্য ভক্তিভাজন স্বর্গগত প্রতাপ চন্দ্রের অত্যন্ত প্রিয় বস্তু আজ আর এখানে নাই। বিশ্বাসী পিতামাতার সুগঠিত ও ভক্ত প্রতাপ চন্দ্রের স্বহস্ত রচিত সে সাধ্বী কন্যার জীবন কি এ ক্ষুদ্র লেখনী বর্ণনা করিতে পারে? বিগত

আট বৎসর হইতে ভগিনী হামিদা আমার নিকট পরিচিতা। আমি যখন প্রথমে বাঁকিপুরে আসিয়াছিলাম ভগিনী হামিদা ও তাঁহার কনিষ্ঠা সুজাতার শিক্ষার ভার আমার উপর আসিয়াছিল। এরূপ সংস্রবে যে আমি ভগিনী হামিদাকে চিনিবার একটা বিশেষ সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম তাহার আর সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষকের প্রতি ছাত্র ও ছাত্রীদিগের ভক্তির ভাব যে অনেক কমিয়া গিয়াছে তাহা কে না স্বীকার করিবে? শৈশবে শিক্ষাগুরুর প্রতি ছাত্রের অচলা ভক্তির যে চিত্র দেখিয়াছিলাম ভগিনী হামিদার ভিতরে সে চিত্রের বিশেষ বিকাশ লক্ষিত হইয়াছিল। তাঁহার সে বিনয়, নম্রতা, ভক্তিপূর্ণ আলাপ—তাঁহার সে অচলা গুরুভক্তি—তাঁহার সে সদা সঙ্কোচ-পূর্ণ সলজ্জ ভাব যে চিরদিন একটা স্বর্গীয় জীবন্ত চিত্ররূপে বিভাসিত হইতে থাকিবে তাহার আর সন্দেহ নাই। বিশ্বাসী পরিবারে সুগঠিতা কন্যা যে পরিবারের অলঙ্কার-স্বরূপা ভগিনী হামিদা তাহা সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। পিতা মাতার প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি, বাধ্যতা ও ভাই ভগ্নীদিগের সঙ্গে তাঁহার অকৃত্রিম সৌহৃদ্য, সমাগত বন্ধুবান্ধবদিগের প্রতি তাঁহার আন্তরিক যত্ন ও শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের অলঙ্কার হইয়াছিল। বিবাহের পর হইতে এই অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার জীবনের পথ যে আরও খুলিয়াছিল। এই অল্প সময়ের মধ্যে যে তিনি অকৃত্রিম ও উচ্চ দাম্পত্য প্রেমের উন্নত আদর্শ দেখাইয়া যাইবেন আমরা তাহা ভাবিতে পারি নাই। পীড়িতাবস্থায় কলিকাতা হইতে ভক্তিমান্ স্বামীকে যে সকল চিঠিপত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার বিবাহে জীবনের উচ্চ বিকাশ ও উচ্চ সম্বন্ধের একটা বিশেষ চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। মেয়েদের চরিত্র গঠন তাঁহার জীবনের একটা উচ্চ লক্ষ্য ছিল। কিছু দিন হইতে এখানে ছোট ছোট মেয়েদের লইয়া প্রতি শনিবারে তাঁহারই আবাসে নৈতিক আলোচনা চালতেছিল। এ নৈতিক আলোচনায় ভগিনী হামিদার উৎসাহ, উদ্যম ও ব্যাকুলতা যে মেয়েদের নিকট একটা উচ্চ আদর্শ দান ধরিয়াছে তাহার আর সন্দেহ নাই। গরিবদিগের প্রতি সহানুভূতি যে তাঁহার ভিতরে অত্যন্ত প্রবল ছিল তাহার আর সন্দেহ নাই। বাঁকিপুরে অঘোর পরিবারে একটী গরিবের মেয়ে ২।৩ মাস হইতে সঙ্কটাপন্নরূপে পীড়িতা ছিলেন। ভগিনী হামিদা তাঁহার মৃত্যুর দুই দিন পূর্ব্বে অঘোর কামিনীর পরিবারের সেই গরিব পীড়িতা মেয়েটীর পথ্যের জন্য কোন বন্ধুর হস্তে প্রয়োজনাস্বরূপ দান করিয়া গিয়াছেন। ভগিনী হামিদার জন্য আজ ভগিনীসমাজ সন্তপ্ত, আজ সে স্নেহের ও আমাদের আদরের বস্তুকে কি বলিয়া সম্বোধন করিব, জানি না। ভগিনী এখন বড়। এখন তাঁহার স্থান সেই চিন্ময় প্রদেশে যেখানে তাঁহার ভক্তিভাজন দাদামহাশয় প্রতাপচন্দ্র ধ্যানে মগ্ন। যে দিন ভগিনী ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন—যে দিন তাঁহার সে দিব্যদেহের ভস্মাবশেষ দেখিয়া শ্মশান ঘাট হইতে ফিরিয়া আসিলাম সে দিবস সন্ধ্যা সমাগমে যে ভাব ও উচ্ছাস হৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়াছিল—সে দিন তাঁহার পবিত্র স্মৃতি স্মরণ করিয়া যে পদ্য ও ইংরাজিতে কয়েক পংক্তি লিখিয়াছিলাম তাহাও আজ মহিলাতে পত্রস্থ করিবার জন্য প্রেরণ করিতেছি:—

কে তুমি বল না মুখে নাই সাড়া ?
কে তুমি নীরবে দিব্য কান্তি ভরা ?
কে তুমি বল না চলেছ কোথায় ?
দেখেছি সুন্দর চম্পক, মল্লিকা
তড়াগসলিলে কমলকলিকা,
দেখেছি অরুণ সাগরবেলায়
কিরণের ছটা প্রভাত সন্ধ্যায়,
অনিত্য এ সব অনিত্য সকলি,
যায় আসে যেন ছায়ার পুতলি,
কিন্তু অই জ্যোতিঃ প্রশান্ত মূরতি
অই দিব্য কান্তি স্বর্গের বিভূতি
এহেন নিষ্প্রভ জীবন্ত প্রভায়
বিতরিবে জ্যোতিঃ জগৎ জনায়।
যাও তুমি আজ যোগিনীর বেশে
যাও তুমি আজ প্রতাপ যে দেশে
যাও তাঁর কাছে হাতে গড়া যাঁর
বিশুদ্ধ জীবন চরিত্র তোমার।
যাও তুমি তথা যথা দেবগণ
করিছে প্রতীক্ষা তব আগমন,
যাও তুমি আজ অমর প্রদেশে
যোগধামে যাও যোগিনীর বেশে।
ভক্তিমান্ পিতা তপস্বিনী মাতা
ভক্তিমান্ স্বামী ভগিনী 'সুজাতা'
ভক্তিমান্ ভ্রাতা আত্মীয় স্বজন
শোক অশ্রুসিক্ত সবার নয়ন,
কিন্তু তব স্মৃতি চরিত্র তোমার
তব প্রেম, পুণ্য গৌরব সবার
তোমার সে স্মৃতি ভক্ত পরিবারে
তোমার সে চিত্র ভক্তের অন্তরে
আদর্শ চরিত্র "হামিদা" তোমার
চির দিন রবে জগতে বিস্তার।

The sweet thing of the sweet home has passed away! Nursed in the memory of faith—moulded by the most potent hand of the Invisible Omnipotent and trained in the—school of the venerable patriarch the Rev. Mr. Mozoomder the young plant of hope—the youug part-ner of the young husband—the sweet darling of the dear parents and the most affectionate sister of the sisterly camp has gone to the region whence she will not return again. The storm has passed and the young ivy has fallen! Where is she now? Living with her dear Dada Mohashoy she is in peace and in the mansion of blessedness praying with him incessantly. As a pattern of affectionate daughterhood—of sweet sisterhood and of loving wifehood, the young ivy has passed in glory and in glory will ever live to spread the living foliages of her life.

"আর্য্যনারী সমাজের উৎসব বিবরণ।"

একটী কন্যা কর্তৃক লিখিত।

আর্য্যনারী সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবের দিন, নবদেবালয়ে পুষ্প-চন্দ্রাতপে বেষ্টিত, পুষ্পাকীর্ণ বেদীর চতুর্দ্দিকে যখন ব্রহ্মকন্যাগণ ব্রহ্মোপাসনায় নিমগ্ন থাকেন, তখনকার দৃশ্য স্বর্গীয় ও অতি অপূর্ব্ব।

আর্য্যনারী সমাজের উদ্দেশ্য কি? পুরাকালের সীতা, দময়ন্তী, সতী সাবিত্রী প্রভৃতি পুণ্যবতী আর্য্যরমণীগণের জীবন আদর্শ করিয়া, তাঁহাদের চরিত্র অনুসরণ করিয়া চলাই ইহার বিশেষ উদ্দেশ্য। ত্যাগস্বীকার, সহিষ্ণুতা, লজ্জাশীলতা, ধৈর্য্য, নম্রতা, বিনয়, আর্য্যনারীর ভূষণ। মহিলাগণ যদি আধুনিক, বিদেশীয় পাশ্চাত্য সভ্যতার, কু-রীতি নীতির অনুকরণে প্রয়াসী না হইয়া, প্রাচীন আর্য্য নারীগণের সুন্দর জীবনের অনুসরণে

যত্নবতী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন, তবে সমাজের মঙ্গল, ও আরও উন্নতিসাধন হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। নতুবা কেবল পার্থিব ভোগবিলাসে আসক্ত হইয়া জন্মদাতা জগৎ পিতাকে ভুলিয়া, মায়ামোহে আচ্ছন্ন থাকিলে দুর্লভ নারী-জীবনের অপব্যবহার করা হয়।

আর্য্যনারী সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবের দিন কুচবেহারের মহারাণী, অতি সুন্দর উচ্চ ভাবে এবং উপদেশপূর্ণ উপাসনা করেন; তাহাতে প্রত্যেক মহিলা বিশেষ উপকার লাভ করিলেন। তাঁহার প্রবল ধর্ম্মনিষ্ঠা, সত্যানুরাগ, পরমেশ্বরে অচলা ভক্তি, আমাদের প্রতি জনের অনুকরণীয়। তাঁহার উপাসনার কিয়দংশ নিম্নে দেওয়া গেল ;—

"মা! এ ক্ষুদ্র জীবন যেন তোমার সত্যের মহিমা চিরকাল ঘোষণা করে। অবিশ্বাস, বা অল্প বিশ্বাস একেবারে দূর করে, সম্পূর্ণ বিশ্বাস, ভক্তি, প্রেম, আর্য্য নারীদের দাও। চরিত্র, জীবন যথার্থ আর্য্য নারী নামের উপযুক্ত কর। নববিধানের যে সত্য ভক্ত ব্রহ্মানন্দ শিখিয়ে গিয়েছেন, আর্য্য নারীদের চরিত্রে প্রতি দিনের জীবনের কার্য্যে সেই সত্যের গৌরব মহিমা যেন ঘোষিত হয়। আজ আর্য্যনারী সমাজের বিশেষ দিনে আমরা সকলে দেবালয়ে মিলিত হইয়াছি। কি সুন্দর দৃশ্য। আজ আমাদের মা, আরও সুন্দর রূপে সেজে, দেবালয় আলো করে আমাদের নিয়ে বসেছেন। আমরা আর্য্য নারীগণ তাঁর সতী সাধ্বী কন্যার মত, তাঁকে আশে পাশে ঘিরে তাঁর পূজা করি। আমরা যেন মা, চিরদিন তোমার রাঙ্গা চরণ ধ'রে থাকতে পারি। পাপী তোমাকে এসে মা বলে ডাকলে সব দুঃখ, পাপ দূর হয়। দয়াময়ী মা, স্নেহময়ী মা, দুঃখী পাপীর প্রতি তোমার এত করুণা! তোমার অনন্ত স্রোতে অতি ক্ষুদ্র প্রাণ ভেসে যাক্। তুমি অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, তোমার দ্বিতীয় নাই। ক্রমশঃ

সংবাদ।

আমরা অতিশয় দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, গাজীপুরস্থ রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র রায়ের পত্নী উমাশশী রায় সম্প্রতি লক্ষ্ণৌ নগরে প্লেগে আক্রান্ত হইয়া পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি অতি সদ্গুণালঙ্কৃতা কবিত্বশক্তিসম্পন্না ধর্ম্মানুরাগিণী মহিলা ছিলেন। মহিলা তাঁহার নিকটে ঋণী। তিনি সময়ে সময়ে কবিতাহারে মহিলাকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। কিয়ৎকাল হইল আচার্য্যমাতার বিষয়ে একটী ভাবপূর্ণ কবিতা এবং এক জন নববিধান প্রেরিতের আলেখ্যদর্শনে হৃদয়ে উচ্ছ্বাস বিষয়ে অন্য একটি সুললিত কবিতা মহিলাতে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা পড়িয়া সকলের মনে বিশেষ আনন্দ হইয়াছিল। স্বর্গীয় উমাশশী রায় মহাত্মা পওহারী বাবার জীবনচরিত পুস্তিকাকারে লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার বয়ঃক্রম ন্যূনাধিক পঞ্চাশ বৎসর হইয়াছিল। তিনি অমরধামে শান্তিলাভ করুন।

বিগত ১২ই চৈত্র ভিক্টোরিয়া মহিলা বিদ্যালয়ে "বর্ম্মদেশ ও তদ্দেশীয় নারী" বিষয়ে এবং ২২শে চৈত্র বর্ম্মদেশের "বৌদ্ধ ধর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছে। বর্ম্মদেশের রমণীদিগের কতকগুলি ছবি এবং তাহাদের শিল্প ও তাহাদের ব্যবহার্য্য দ্রব্যজাত এবং বস্ত্রাদি অপিচ বৌদ্ধ ধর্ম্মাচার্য্য ফুঙ্গিদিগের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার ছবি ও তাঁহাদের বৈরাগ্য বস্ত্র এবং ভিক্ষাপাত্রাদি এবং বুদ্ধ ধর্ম্মমন্দির পেগোডা এবং ফুঙ্গিদিগের আশ্রমের ছবি ইত্যাদি প্রদর্শন করা হইয়াছে। মহিলারা তাহা দেখিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছেন।

ভিক্টোরিয়ামহিলাবিদ্যালয়।

ফেনিলনের জীবন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

যদি এসব কাজ করিতে গিয়া উপাসনা স্মরণ ভুলে যাও তবে অপকার হচ্ছে বুঝবে। যে বিশেষ কাজ সাধনের জন্য তোমাকে দেওয়া হইয়াছে, তাহা যদি কর তবে ভাল। তবে তোমার কর্ম্ম, রোজকার জীবন, তোমায় মুক্তি দিবে। আমাদেরও অনেক সময় মনে হয় ইহাতে কি ধর্ম্ম হতে পারে। যে যে অবস্থায় থাকুক না কেন, তার জন্য প্রতি মুহূর্ত্তে কর্ত্তব্য আছে। এরূপ মনে করা ভুল, যে একাজ ছাড়িয়া অন্য জায়গায় গিয়ে অন্য কাজ করিলে আমার ভাল হইবে। রোজকার কর্ত্তব্য ছাড়িয়া দিয়া অন্য পাঁচটা কাজ করিতে যাই ইহা ভুল। রোজকার কাজ নিয়ম নিষ্ঠায় করিলে ধর্ম্মভাব হয়, চরিত্র শুদ্ধ হয়। আর এক জায়গায় উপদেশ দিচ্ছেন—তুমি যে অবস্থায় আছ তাহাতে অনেক বিপদ, পাঁচ জনের সঙ্গের কথা বলিতে গিয়া মনে অহঙ্কার হয় আমার কত বিদ্যা বুদ্ধি আছে, এবং তোমার মনে এই অহঙ্কার এসেছে বলে তুমি, দুঃখিত হয়েছ এবং মনে করেছ আর লোকের সঙ্গে মিশব না, এটা কিন্তু নয় ঐখানে গিয়ে ঐ অবস্থায় পড়িয়া মনকে জয় করিতে হইবে, তাহাই ধর্ম্ম। ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত নয়। ইহাতে বোঝা যাবে তোমার ভিতর ধর্ম্মভাব আছে কিনা। এই কথাটা তিনি সকলকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে যেখানে আছে সেইখানেই ধর্ম্ম। ফেনি-লনের চিঠিতে এই কয়েকটী ভাব দেখা যায় যে কাজ করবে নিষ্ঠার সঙ্গে করবে সকল অবস্থায় বিনীত থাকবে ও সংযত থাকবে। বর্ণার বিষয় উদাহরণ দিয়াছেন, বর্ণার খুব সাধু ছিলেন। একদিন বর্ণার উপদেশ দিচ্ছেন এমন সময় মনে হল, আমিত বেশ উপদেশ দিচ্ছি, তৎক্ষণাৎ আমার মনে হল কি ভয়ানক মনে অহঙ্কার এল, তা হলে আর আমি উপদেশ দিব না। শেষকালে মনে হল, না এটাও শয়তানের কথা, এই কাজ করতে হবে, অথচ স্থির শুদ্ধ সংযত থাকিতে হইবে। এই গল্পটী বলিলেন—অতএব ভাবিও না নির্জ্জনে গেলে ধর্ম্ম হবে। যদি এমন হয় যে পাঁচ জনের সঙ্গে মেলামেশা করিতে গিয়া তোমার মনে অহঙ্কার অভিমান রাগ আসে তবুও ইহা ছেড়ে দিতে পার না। জেনো যে এ দোষ গুলি তোমার মধ্যে আছে। অনেকের যে মনে হয় আমি ভাল হয়েছি আমার কোন দোষ নাই এ জ্ঞান ভুল। তুমি যাহা করিবে বলে ঠিক করিয়াছিলে, অথচ করিতে পারিতেছনা সেই জন্য তাহা ছাড়িতে পার না। এইরূপে যত বুঝবে তুমি পার না তত বিনয় নির্ভর আসবে। আমাদের নিজেদের পাপের প্রতি

একটা মায়া আছে, মায়াটা লুকিয়ে থাকে. সেটা বড অপকার করে। আমরা বড় ওজর করি, ওটা করিতে পারব না, ওটা করিতে পারিব না। ওজর করার ভাব আর কিছুই নয় একটা মায়া। নিজেকে নির্য্যাতন করিবার ভাব নাই, নিজের প্রতি কেমন একটা কোমলতা মায়া আছে। একজনের খুব অবিশ্বাস হয়েছে বলছেন, অবিশ্বাস করো না, জানোত তিনি অনন্ত করুণাময়, তিনি জানেন তুমি কতটা বইতে পার, যা তুমি পার না, এমন কাজ কখনও তোমায় দেবেন না। সময় কি করে কাটান উচিত সে বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন। এই রকম যে যে বিষয় বলিয়াছে তাহাকে সেই বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন।

আমোদ করিবে, অথচ নিজেকে সামলাবে। বড়মানুষদের সঙ্গে মিশবে ও সেই খানেই জীবন গঠন করিতে হইবে। আর সমস্ত চিঠির মধ্যে simplicity আছে, মনের একটা হালকা ভাব আছে। ইহাঁর জীবনের শেষ কালের অবস্থা পড়িলে প্রহ্লাদের কথা মনে হয়। দিন যায় রাত যায় পোপ কি বলেন, তাহা জানিবার জন্য মন ব্যস্ত। কিন্তু সেই অবস্থায় কত নির্ভর কত ভালবাসা। তোমরা আমাকে যা বলছ তাই আমার কর্ত্তব্য। কিন্তু পাছে আমার দোষের জন্য প্রকাণ্ড মণ্ডলীর নামে অপবাদ হয় বন্ধুদের নিন্দা হয় তা আমি সহ্য করিতে পারি না। ঠিক যেমন প্রহ্লাদ বলেছিলেন দয়াময় নামে দোষ দিও না। এই খানটা ঠিক প্রহ্লাদের কথা মনে পড়ে।

মহিলার নিয়মাবলী।

মহিলা পত্রিকার ডাকমাশুলসহ বার্ষিক মূল্য ২৲ মাত্র। গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ মহিলার মূল্য ও অর্থসম্বন্ধীয় পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের, নামে এবং প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকটে ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট কলিকাতা এই ঠিকানায় পাঠাইবেন। প্রাপ্ত প্রবন্ধাদি উপযুক্ত হইলে শীঘ্র হউক বা বিলম্বে হউক প্রকাশিত হইবে।. কাহারও প্রবন্ধ ফেরত দেওয়া যাইবে না।

অনেক মহিলা পত্রিকা বৎসরাধিক কাল গ্রহণ করিয়া মূল্য দান করেন না' বড় দুঃখের বিষয়। যাঁহারা মূল্যদানে অসমর্থ তাঁহারা যেন অবিলম্বে পত্রিকা ফেরত পাঠাইয়া দেন, অথবা আমাদিগকে তাহা পাঠাইতে নিষেধ লেখেন। তাহা হইলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইব না। পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়া প্রাপ্য মূল্য না পাইলে অনেক সময়ে আমরা সেই মূল্যের জন্য ভি, পিতে মহিলা পাঠাইয়া থাকি।

মূল্যপ্রাপ্তি।

৯ম বৎসর।

শ্রীযুক্ত বাবু তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়,	কৃষ্ণনগর	১৲
শ্রীমতী কাদম্বিনী বিশাল,	ময়ূরভঞ্জ	১৲

১০ম বৎসর।

শ্রীযুক্ত তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়,	কৃষ্ণনগর	২৲
শ্রীমতী কাদম্বিনী বিশাল,	ময়ূরভঞ্জ	১৲

১১শ বৎসর।

শ্রীযুক্ত তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়,	কৃষ্ণনগর	২৲
শ্রীমতী বিনোদিনী গুপ্ত,	কুড়িগ্রাম	১৲
শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী চৌধুরাণী,	সেরপুর	১৲

১২শ বৎসর।

শ্রীমতী চপলাসুন্দরী দত্ত,	কৃষ্ণনগর	২৲
" ভূপেশনন্দিনী সেন,	মুঙ্গের	২৲
" সরলাবালা দত্ত,	কুমিল্লা	১৲
শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর সরকার,	ভাগলপুর	২৲
শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী চৌধুরাণী,	সেরপুর	২৲
শ্রীযুক্ত চন্দ্রেশ্বর গুপ্ত,	হবিগঞ্জ	২৲
" মহীন্দ্রনাথ সেন,	ডিব্রুগড়	২৲

মাসিক পত্রিকা
"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ

১২শ ভাগ] বৈশাখ ১৩১৪ ; মে ১৯০৭ । [১০ম সংখ্যা ।

স্ত্রীনীতিসার।

বিবাহিতা নারীর স্বামিসম্বন্ধীয় নীতি গুরুতর ও অতিশয় দায়িত্বপূর্ণ। তিনি যেন দুর্ব্বলপ্রকৃতি স্বামীকে বাহ্যিক আকর্ষণে ছলকৌশলে ঈশ্বর-বিচ্যুত করিয়া নিজের প্রতি আসক্ত করিয়া না তোলেন। এ বিষয়ে তিনি সাবধান হইবেন। স্ত্রী সুচতুরা সংসারাসক্তা হইলে তাহা দ্বারা ভগবদ্ভক্ত স্বামীরও পতন হয়। সতী নারী নিজের সতীত্ববলে স্বামীকে আকর্ষণ করিয়া স্বর্গাভিমুখে লইয়া যান। ঘোরতর সংসারী ভোগাসক্ত স্বামী তাঁহাদ্বারা ভগবদ্ভক্ত হইয়া উঠে। স্ত্রীর সাংসারিক সুখবিলাসে বিরাগ ঈশ্বরে অনুরাগ দেখিলে স্বামী যথেচ্ছভাবে জীবনযাপন করিতে সাহস পান না।

তোমার জীবন অসংযত, তুমি বাসনা কামনার অধীন, রিপুদমনে অসমর্থ হইলে তুমি বিপথগামী স্বামীকে কেমন করিয়া ধর্ম্মপথে আনয়ন করিবে? তুমি স্বামীর সঙ্গে পরনিন্দা ও পরচর্চ্চা এবং সাংসারিক সুখভোগের আলোচনা না করিয়া ধর্ম্মচর্চ্চা ও সৎপ্রসঙ্গ করিও।

তুমি স্বামীর সঙ্গে দেহসজ্জার জন্য উচ্চ মূল্যের বস্ত্রালঙ্কারাদির কথা বার্ত্তা না বলিয়া পুণ্য প্রেম ও বৈরাগ্যের কথা বলিও, তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া উপাসনা প্রার্থনা করিও। তাহা হইলে পরস্পরের মধ্যে পবিত্র সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে, কোন রূপে আর পশুভাব থাকিবে না; অন্তরে দেব ভাবের অভ্যুদয় হইবে; ভগবানের চরণতলে তোমরা দুই জনে একাত্মা হইয়া নির্ম্মল সুখ সম্ভোগ করিতে পারিবে। তুমি অনিত্য শরীরের জন্য ব্যস্ত না হইয়া নিত্য আত্মার কল্যাণের জন্য ব্যস্ত হও। তুমি সর্ব্বদা সূক্ষ্ম আত্মদৃষ্টি রাখিবে। তোমাদের দুই জনের উত্থান না পতন হইতেছে, নিত্য পরীক্ষা করিয়া দেখিবে।

কল্যাণপ্রসূ নারীগণ।

নারী কেবল মনুষ্য সন্তানের প্রসূতি নহেন, জগতের নানাবিধ কল্যাণকর ভাব ও অনুষ্ঠানও তাঁহা হইতে প্রসূত হইয়াছে। আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে নারীজাতির হীনাবস্থার মধ্যে এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে প্রভূত কল্যাণ হওয়ার সম্ভাবনা। নারীর মহত্ত্ব ও গৌরব স্মরণ করিয়া যেমন একদিকে পুরুষগণ নারীদিগকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতে শিক্ষা করিবেন, তেমনি অপর দিকে নারীগণও আপনাদের পদগৌরবের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে ও উপযুক্ত রূপে জীবন যাপন করিতে যত্নবতী হইবেন। এই উদ্দেশ্যে মনস্বিনী, উদার হৃদয়া, পরোপকারনিরত এবং গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপিণী কয়েকটী মহিলার সম্বন্ধে আমরা ক্রমে ক্রমে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব।

অনেকে জানেন পৃথিবীর মধ্যে আজকাল আমেরিকা মহাদেশ শিক্ষা সভ্যতা ও বিবিধ উন্নতির সর্ব্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করিবার জন্য দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু এক সময়ে এই মহাদেশ অসভ্য, নরমাংসাহারী মানবের বাসস্থান ছিল, এবং এইরূপ একটি বৃহৎ মহাদেশের অস্তিত্ববিষয়ে সভ্যজগৎ সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও অবিশ্বাসী ছিল। যদিও এই মহাদেশ ইয়ুরোপ অপেক্ষা আয়তনে চতুর্গুণ বৃহৎ, তথাপি ইহার অস্তিত্ববিষয়ে লোকে সন্দিহান ছিল। ইয়ুরোপের পশ্চিমদিকে আটলাণ্টিক মহাসাগর, এই মহাসাগর সাড়ে তিন কোটিবর্গমাইল স্থানে প্রসারিত। এই সুবিস্তীর্ণ জলরাশি অতিক্রম করিয়া উহার অপর পারে স্থলের আবিষ্কার একটি অতি মহদ্ ব্যাপার। সকলে জানেন কলম্বস এই মহাদেশ আবিষ্কার করিয়া মনুষ্যজাতির বাসস্থান প্রসারিত এবং সভ্যতা ও উন্নতির স্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন। কিন্তু অনেকে হয়ত জানেন না যে, এই মহাকার্য্যে নারীশক্তি তাঁহার পৃষ্ঠপোষণ ও উৎসাহবর্দ্ধন না করিলে ইহা কখনও সংসাধিত হইতে পারিত না, সুতরাং আমরা এক্ষণ ইহার একটু সংক্ষেপ আলোচনা করিব।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন স্পেন ও পর্ত্তুগাল দেশ যুক্তভাবে এক সিংহাসনের অধীন ছিল, তখন ফার্ডিনাণ্ড ও ইসাবেলা তথায় রাজা ও রাণী ছিলেন। কলম্বস নৌপরিচালনায় বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, এবং অনেক দিন হইতে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছিলেন যে, আটলাণ্টিক মহাসাগরের পশ্চিমপারে নিশ্চয়ই স্থল রহিয়াছে; কিন্তু তাঁহার কথায় সহানুভূতি করে এবং তাঁহাকে সাহায্য করে, এমন লোক কোথায়? কয়েকখানি জাহাজ ও মাঝিমাল্লা লইয়া এই মহাসাগর বাহিয়া পশ্চিম মুখে যাইবার অভিপ্রায়ে তিনি রাজদ্বারে সাহায্য প্রার্থী হইলেন, কিন্তু নিরুৎসাহ ও প্রত্যাখ্যান ভিন্ন অন্য কোন সাহায্য পাইলেন না। অবশেষে তিনি স্থির করিলেন, রাণী ইসাবেলাকে তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিবেন, এবং তাঁহার সিদ্ধান্তের কারণাদি

বুঝাইয়া বলিবেন। রাণীর নিকট তাঁহার প্রস্তাব উপস্থিত হইলে তিনি সাদরে তাহা গ্রহণ করিলেন, এবং এক দিন তাঁহাকে স্বয়ং উপস্থিত হইবার জন্য সময় নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। এদিকে মন্ত্রিগণ এই প্রস্তাবের বিরোধী, কলম্বসকে কল্পনাপ্রিয় পাগল বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস এবং রাজকোষের বৃথা অর্থব্যয় করিতে তাঁহারা অপ্রস্তুত। নির্দ্দিষ্ট দিবসে ইসাবেলা সিংহাসনে উপবিষ্টা রাজপারিষদ ডনগমিজ ও কলম্বস তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত। কলম্বসের যুক্তি শ্রবণ করিয়া রাণী সাহায্য দানে উদ্যতা, ইহা দেখিয়া গমিজের প্রাণ শুকাইয়া গেল। তিনি রাজ্ঞীকে বিরত করিবার জন্য নানা প্রকার যুক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার যুক্তি কিরূপ অসার এবং নারী হইলেও ইসাবেলার কেমন সূক্ষ্মদর্শন ও বুদ্ধিমত্তা তাহা দেখাইবার জন্য আমরা নিম্নে তাঁহাদের কথোপকথনের সার প্রদান করিলাম।

গমিজ। কলম্বসের মতে যদি পৃথিবীর অপর দিকে স্থলভাগ ও লোকাবাস থাকে, তবে ইহা সহজ বুদ্ধিতে বুঝা যায় যে,আমাদের বিপরীত দিকে তথাকার লোকের মস্তক, আমাদের বাড়ীঘর, গাছপালা যে ভাবে আছে, সেখানে সবই উল্টা ভাবে রহিয়াছে। বাতুল ভিন্ন এমন অবস্থা কে কল্পনা করিতে পারে? পৃথিবী যদি একটি গোলকের ন্যায় হয়, তবে ভূপৃষ্ঠের নীচের ভাগে কেমন করিয়া লোকজন থাকিতে পারে?

কলম্বস। আমরা যে যে প্রাকৃতিক নিয়মে ভূপৃষ্ঠে বাস করিতেছি, আমাদের বিপরীত দিকেও ভূপৃষ্ঠে সেই সকল নিয়ম কার্য্য করিতেছে, এবং তদ্দ্বারা সেই স্থানেও লোকজন বসবাস করিতেছে।

গমিজ। মহারাণি, রাজকার্য্যে পলিতকেশ হইয়াছি, কল্পনাস্বপ্ন দর্শন ইত্যাদি বিষয়ের দ্বারা পরিচালিত ব্যক্তিদের পরামর্শে কার্য্য করিলে রাজ্যের কি কল্যাণ হয়? আপনিত জানেন মহাপ্রতাপান্বিত আপনার রাজ দরবারে সকল রাজ্যের প্রতিনিধি ও দূত সকল রহিয়াছে, কিন্তু যে অপরিজ্ঞাত কাল্পনিক দেশের কথা ইনি বলিতেছেন সে দেশের কোন দূত কি কখনও এদেশে আসিয়াছে, কিংবা কোন সংবাদ প্রেরণ করিয়াছে? এমন একটি দেশ থাকিলে নিশ্চয়ই তথা হইতে কোন না কোন সময়ে দূত আসিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হইত।

ইসাবেলা। গমিজ, তুমি বালকের ন্যায় কথা বলিতেছ। আচ্ছা, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমিত ধর্ম্ম মান, পরলোক মান? বল দেখি পরলোক হইতে কি কখনও কোন লোক আসিয়া সে দেশের অস্তিত্ববিষয়ে আমাদের নিকট সাক্ষ্য দান করিয়াছে? অথচ এই পরলোক যে রহিয়াছে তাহা কি তুমি বিশ্বাস কর না?

গমিজ। হাঁ, করি বটে, কিন্তু সে ভিন্ন কথা। আমরা বৃদ্ধ লোকেরা যে সে কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। রাজকোষে এখন অর্থের অনাটন, এই অবস্থায় আমি জানি মহারাজ কখনও এইরূপ কল্পনার প্রশ্রয় দানে অগ্রসর হইবেন না।

ইসাবেলা। রাজকোষ এই মহদনুষ্ঠানের সাহায্যার্থ উন্মুক্ত না হইলে আমার বহুমূল্য আভরণাদি বিক্রয় করিয়া আমি এই কার্য্যে সাহায্য দান করিব। আমি কলম্বসের সকল যুক্তি সারবান্ মনে ক'র এবং এই কার্য্যে সাহায্য দান গৌরবের ব্যাপার। আমি স্বয়ং সম্পূর্ণ দায়িত্বগ্রহণ করিয়া ইহাকে সাহায্য দান করিব।

কলম্বস। ধন্য মহারাণী ধন্য! আপনার গৌরব শতগুণ বর্দ্ধিত হইবে। আপনি নিশ্চয় জানিবেন আপনার রাজমুকুটে যে মণিমুক্তাদি আভরণ রহিয়াছে, তদপেক্ষাও উজ্জ্বলতর আভরণ আপনার মুকুটের সৌন্দর্য্য ও গৌরববর্দ্ধন করিবে। আমি নূতন দেশ আবিষ্কার করিয়া আপনার পদতলে গৌরবমুকুট উপহারস্বরূপ স্থাপন করিব, ঈশ্বর আমার সহায় হউন।

কলম্বসের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে। রাণী ইসাবেলার নাম এই কল্যাণকর অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত থাকিয়া তাঁহার গৌরব ভবিষ্যদ্বংশের নিকটে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর করিতেছে। যে সকল নারী অসার স্বর্ণাভরণের মমতা পরিত্যাগ করিতে পারেন না, তাঁহারা দেখিবেন এই মনস্বিনী রাজ্ঞী কিরূপ অম্লান বদনে তাঁহার বহুমূল্য আভরণ বিসর্জ্জন দিয়া মহৎ অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষিকা হইলেন। নিঃস্ব কলম্বস ইহার সাহায্য না পাইলে কখনও এই সাহসিকতার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেন না, এবং না জানি কত বৎসর ধরিয়া এই মহাদেশ মানবের অপরিজ্ঞাত ও অসভ্যতার ঘন তিমিরে আবৃত থাকিত। আজ কলম্বসের সহিত একপ্রাণ হইয় সকল সভ্য জগৎ ইসাবেলাকে ধন্য ধন্য বলিতেছে, নারীর গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে।

সাধ্বী কুমারী আগাথা।

২য়।

ধর্ম্মের জন্য প্রাণদান।

সর্ব্বলোক সমক্ষে প্রভু যীশুকে প্রকাশ্যে স্বীকার করামাত্রই শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে কারাগারে প্রেরণ করিলেন। যিনি মহা সম্ভ্রান্ত উচ্চ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া পিতামাতার অতুল স্নেহে আশৈশব সর্ব্বপ্রকার সুখ স্বচ্ছন্দতায় ছিলেন, তিনি আজ সূর্য্যালোক প্রবেশের পথ নাই এমন সঙ্কীর্ণ অন্ধকারময় ভয়াবহ গৃহে অবরুদ্ধ হইলেন। ছাদ হইতে বিন্দু বিন্দু জলপাতের শব্দ ব্যতীত সেই স্থানের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে আর কিছুই ছিল না। যিনি তাঁহার পরিত্রাণের জন্য প্রাণ দিয়াছেন সেই পরিত্রাতার জন্য প্রাণদান করিতেছেন এই চিন্তা তাঁহাকে এই ভয়ঙ্কর অবস্থাতে আনন্দ প্রদান করিল। যীশুর ক্রুসে হত হওয়ার ব্যাপার, তাঁহার হত্যাকারীদের জন্য তাঁহার প্রার্থনা এই সমস্ত চিন্তা করিতে করিতে তিনি যীশুর প্রেম নিজের অন্তরে সংক্রামিত করিলেন। তিনিও তাঁহার অত্যাচারীদিগকে ক্ষমা করিয়া তাহাদের জন্য প্রার্থনা করিতে সুক্ষম হইলেন।

পরদিন কুইটিনিয়াস পুনরায় তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিল। বিচারের গৃহে প্রবেশ করিবার সময় স্বর্গীয় পবিত্রতা তাঁহার

সৌন্দর্য্যকে এত মাধুর্য্যময় করিয়াছিল যে, তদ্দর্শনে কুইন্টিনিয়াসের পূর্ব্বানুরাগ জাগিয়া উঠিল,এবং পুনরায় তাঁহার নিকট সাংসারিক সুখস্বচ্ছন্দতার চাকচিক্যের একটা চিত্তার্ষক চিত্র অঙ্কিত করিয়া তাঁহাকে ধর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক তাহার পত্নী হইতে অনুরোধ করিল।

প্রত্যুত্তরে অতি ধীরভাবে আগাথা জানাইলেন যে, কিছুতেই তিনি যিশুকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না, এবংআরও বলিলেন, "আমি মৃত্যুকে ভয় করি না; আমি কপোতের ন্যায় উড্ডীয়মান হইয়া প্রাণারাম ঈশ্বরের সন্নিধানে শান্তি আরাম লাভের জন্যই লালায়িত।"

শাসনকর্ত্তা ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন, "যখন নিজেই মৃত্যু বাঞ্ছা করিতেছ তবে মর।" এই বলিয়া আদেশ করিল,"এই অভিসপ্ত যাতকারিণীকে লইয়া গিয়া যন্ত্রণা দিয়া মেরে ফেল,সম্রাটের ইচ্ছা পালন কর।" দুরাত্মার অনুচরেরা তাহার ভয়ে এত ভীত ছিল যে, এ নিষ্ঠুর আজ্ঞা অবজ্ঞা করিতে সাহস পাইল না। দুর্ভাগিণী বালিকাকে দণ্ডাগ্রে বেঁধে দড়ী এবং কপি যন্ত্র এরূপ ভাবে কষিতে লাগিল যেন একটা কাপড়ের জাল তাহারা বিস্তৃত করিতেছে। শরীরের প্রত্যেক গ্রন্থির ছিন্নাবস্থায় দারুণ যন্ত্রণামধ্যে তাঁহার মুখ হইতে একটীও যাতনা প্রকাশক ধ্বনি নির্গত হইল না। এতদ্দর্শনে সেই নিষ্ঠুর শাসনকর্ত্তা কোড়া মারিতে আদেশ করিলেন। দর্শকবৃন্দ মধ্য হইতে অসন্তোষ এবং সমবেদনার ধ্বনি অনেক উঠিল,কিন্তু কেহই আগাথার উদ্ধার জন্য একটী অঙ্গুলিও উঠাইতে সাহস করিল না। আগাথার হস্ত পশ্চাদ্ভাগে সৈনিকেরা টেনে তাহাকে নিয়ে নগরের একটি বড় স্কোয়ারের মধ্যস্থ স্তম্ভের সঙ্গে চর্ম্ম দ্বারা বাঁধিয়া ফেলিল। রোমাণদের ভয়ঙ্কর কোড়ার আঘাত তাঁহার বদন হইতে একটীও ক্লেশব্যঞ্জক উক্তি বাহির করিতে পারে নাই। অতঃপর কুইন্টিনিয়াসের আদেশে অগ্নিতে দগ্ধ প্লেট এবং লোহার হুড়কা দ্বারা তাঁহার শরীরের নানা স্থান দগ্ধ করিতে লাগিল। এই সমস্ত সময় উক্ত বালিকার ওষ্ঠ অস্ফুট প্রার্থনা বাক্যে নড়িতে লাগিল। ভগবানের আনন্দে তাঁহার চিত্ত এত বিহ্বল ছিল যে, শরীরের এই সকল যন্ত্রণায় তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারিল না।

একবার রক্তের আস্বাদন পাইলে ভীষণ শার্দ্দুল যেমন অধিকতর রক্ত পিপাসুহয় এই নরশার্দ্দুল কুন্টিনিয়াসও তদ্রূপ অপরাজিত আগাথার উপর আরও নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিয়া তাঁহার স্তনদ্বয় কাটিয়া ফেলিতে আদেশ করিল। এই নিদারুণ আদেশ শ্রবণ করিয়া বালিকা প্রার্থনা করিল "হে প্রভো, আমাকে ইহা বহন করিতে ক্ষমতা দেও।" তৎপর তিনি কুইন্টিনিয়াসের দিকে ফিরিয়া সজল নয়নে বলিলেন, "রে নিষ্ঠুর অত্যাচারিন্ তোমার লজ্জাহয় না যে, তুমি আমার সেই কোমলাঙ্গ কাটিয়া ফেলিতেছ যেরূপ কোমলাঙ্গ দ্বারা তোমার মা শৈশবে তোমায় পালন করিয়াছেন।" এই কাতর নিবেদনের কোন ফল হইল না। নিষ্ঠুর আজ্ঞা প্রতিপালিত হইল।

ক্ষতের যন্ত্রণায় এবং আহার দান ব্যতীত প্রাণ হরণজন্ত পুনরায় তাঁহাকে কারাগারে নিবদ্ধ করিল। কিন্তু এবার কারারক্ষকদের এই শান্ত স্বভাব বালিকার উপর করুণার সঞ্চার হইল। অধ্যক্ষের শাস্তির ভয় না করিয়া তাহারা কারাগারের দ্বার খোলা রাখিল। অনেকে গোপনে যাইয়া সেবশুশ্রূষা করিয়া বালিকাকে সুস্থ করিলে কারারক্ষকেরা তাঁহাকে পলায়ন করিতে নিতান্ত অনুরোধ করিল। কিন্তু আগাথা পলায়ন করিলে কারারক্ষকদের উপর নানা রূপ শাস্তি বিধান হইবে ভাবিয়া এরূপ প্রস্তাবে সম্মতি দান না করিয়া প্রকৃত ধর্ম্ম বিশ্বাসীর ন্তায় বীরত্ব প্রকাশ করিলেন।

চারি দিন পরে যখন কুইণ্টিনিয়াস জানিতে পারিল যে আগাথা আজও জীবিত আছেন, তখন তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তৃতীয় বার কারাগার হইতে আগাথা কুইণ্টিনিয়াসের সম্মুখে আনীত হইলে তিনি আর একবার তাঁহার প্রভুর উপর বিশ্বাস নির্ভর প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন, "খ্রীষ্ট আমার জীবন এবং পরিত্রাতা।" শাসনকর্ত্তা বলিল,"খ্রীষ্ট; এনাম আমাকে ক্রোধে কম্পান্বিত করে।" তৎপর কুইণ্টিনিয়াস তাহার নীচাশয় মন্ত্রীদিগের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল, "এই মায়াবিনী সম্বন্ধে তোমাদের কি মত?" তাহারা বলিল "যে আমাদের দেবতার অবজ্ঞা করে তাহাকে বধ করা উচিত।" তচ্ছ্রবণে দুরাত্মা বলিল, "হাঁ ইহাকে হত্যা করিতে হইবে, দেখি তাহার খ্রীষ্ট তাহাকে এই মৃত্যু দণ্ড হইতে রক্ষা করিতে পারে কি না।"

অগ্নি প্রজ্বলিত হইল। তাহার মধ্যে খাপরা খণ্ড সকল নিক্ষিপ্ত হইল। হস্ত পদ বেঁধে আগাথাকে সেই জ্বলন্ত খাপরা স্তূপ মধ্যে ফেলে তাহার উপর দিয়া টানিয়া আনিতে লাগিল। এসময়ে ঈশ্বরের সাক্ষাদ্দর্শনলাভে তাঁহার চিত্তে এমন এক স্বর্গীয় সহিষ্ণুতা অবতীর্ণ হইল যে, তিনি অনায়াসে এই চরম যন্ত্রণা সহিতে পারিলেন, এবং মুক্তির নিকটবর্ত্তী হইলেন। এই সময়ে হঠাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল, পুনঃ পুনঃ ভূকম্পে অনেক গৃহ ভূমিসাৎ হইল, শাসনকর্ত্তার প্রাসাদের একাংশ পড়িয়া তাহার বন্ধুদ্বয়ের প্রাণনাশ হইল,সমুদ্র জল সরিয়া যাইয়া পুনরায় বেগে ভূকম্পে বিদীর্ণ ভূমির মধ্যে প্রবহমাণ হইতে লাগিল। এই সমস্ত উৎপাত দর্শনে সাধারণ লোকের ধারণা হইল যে আগাথার উপর অত্যাচার জনিত পাপের জন্য ঈশ্বরের শাস্তি নগরের উপর প্রেরিত হইয়াছে। তাহারা শাসনকর্ত্তাকে সংহার করিতে ধাবিত হইল। উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করিবার জন্য শাসনকর্ত্তা আগাথাকে জ্বলন্ত খাপরার উপর দিয়া টানিয়া নেওয়ার অত্যাচার হইতে মুক্ত করিতে আদেশ করিল বটে, কিন্তু জনতা তাহাতে শান্ত হইল না। কুইণ্টিনিয়াস প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া হিমটো নদী তটে উপস্থিত হইল; পারের নৌকায় উঠিয়া নদীর অপর পারে যাইতেছিল নৌকাস্থিত দুইটী ঘোটকের পদাঘাতে নদীর স্রোতে পড়িয়া

অদৃশ্য হইল। এদিকে আগাথাকে কুইন্টিনিয়াসের আদেশের পূর্ব্বেই বিশ্রাম করিতে দেওয়া হইয়াছিল। আগাথা তখনও জীবিত ছিলেন, জানু পাতিয়া প্রার্থনা করিলেন "হে আমার প্রেমময় ঈশ্বর, তুমি আমাকে ছেলেবেলা হইতে রক্ষা করিয়াছ। তুমি আমার নেতা আমার প্রভু, তুমি আমার নিকট হইতে সাংসারাসক্ত হরণ করিয়াছ, এবং দৃঢ়তাসহ সকল যন্ত্রণা সহ্য করিতে বল দান করিয়াছ, এখন আমার আত্মাকে শরীরের বন্ধন হইতে মুক্তি দান কর। আমি বিনীত ভাবে মিনতি করিতেছি যেন আমি তোমার নিকট উড়ে যাইতে পারি। হে ঈশ্বর, নিজগুণের অনুরোধে আমার প্রতি দয়া কর, তোমার শ্রীমুখ দেখিতে অধিকার দাও, তুমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট পবিত্র প্রভুর, আমার আত্মাকে গ্রহণ কর।" এই প্রার্থনা শেষ হইতে না হইতে তিনি ঈশ্বরের ক্রোড়ে শিশুর ন্যায় নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

কুইন্টিনিয়াসের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হইলে খ্রীষ্টিয়ানদের আনন্দ হইল এবং তাহারা সম্রাটের কঠোর শাসন বিধির ভয় আর করিল না। অবিলম্বে কারাগারে প্রবেশ করিয়া আগাথার প্রতি সম্মান ও ভক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল। আগাথার ছিন্ন দেহ সুসজ্জিত করিল এবং সুগন্ধি দ্রব্য বিলেপন করিয়া প্রকাণ্ড রাজপথ দিয়া সমারোহসহকারে লইয়া গিয়া খ্রীষ্টির উপাসনা মন্দিরের প্রাঙ্গণে সমাধি দিল। সেই উপাসনার মন্দির আগাথার সমাধি ক্ষেত্র বলিয়া খ্রীষ্টসম্প্রদায়ের নিকটে পবিত্র তীর্থে পরিণত হইল। অদ্যাপি শত শত লোক তথায় তীর্থ যাত্রা করিয়া থাকে।

হিন্দু তপস্বিনী মাতাজী মহারাণী।

কলিকাতা নগরীর মহাকালী পাঠশালার সংস্থাপয়িত্রী পরম শ্রদ্ধেয়া মাতাজী মহারাণী তপস্বিনী গত ৭ই বৈশাখ কাশীধামে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে তাঁহার দেহ দগ্ধ না করিয়া গঙ্গা জলে ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে! মাতাজীর মৃত্যুতে ভারত একটী অতি প্রসিদ্ধ নারী-রত্ন হারাইলেন। তিনি বৈরাগ্য ব্রত অবলম্বন করিয়া শুদ্ধ চা এবং দুগ্ধপানে জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। গিরিগুহায় তপশ্চরণে জীবন অতিবাহিত না করিয়া তিনি ভারতের হিন্দুরমণী কুলের শিক্ষাদানে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। মাতাজী দাক্ষিণাত্যের আর্কটের রাজবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, পিতা মাতার নিকটে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া সংস্কৃতে প্রগাঢ় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। রন্ধন, চিত্রবিদ্যা, এবং ঘোটকারোহণে তাঁহার বিলক্ষণ নিপুণতা ছিল। তাঁহার মত উত্তম রন্ধন করিতে অতি অল্প নারীই পারেন। তিনি তপস্বিনীর জীবন অবলম্বন করিয়া ভারতের নানা তীর্থ দর্শনের পর কলিকাতায় উপনীত হন। কলিকাতায় হিন্দু ভদ্র লোকগণ তাঁহাকে

নারী-শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে তিনি পুরীতীর্থ দর্শনানন্তর মহাকালীপাঠশালা কলিকাতায় স্থাপন করেন। এই পাঠশালার অন্তর্গত ১৬টী শাখা নানা স্থানে স্থাপিত আছে। সর্ব্বশুদ্ধ ৬০০ বালিকা শিক্ষা লাভ করিতেছে। যাঁহারা ধর্ম্মার্থ প্রাণ দান করেন, তাঁহারা অনায়াসে নানা সৎকার্য্য দেবানুগ্রহে সম্পাদন করেন। মাতাজী মহারাণী তপস্বিনীর মত ভারতে আরও অনেক বিদুষী তপস্বিনী ভগবানে প্রাণ সমর্পণ করিয়া তপস্যায় কিংবা পরসেবায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। ধর্ম্মই নারীকে স্বাধীন করে। ধর্ম্মের নিকট অবরোধ প্রথা দাঁড়ায় না। ধর্ম্মপ্রাণা নারীদের যে স্বাধীনতা লাভ হয় তাহাই প্রকৃত স্বাধীনতা। কাহাকেও সেই স্বাধীনতা দিতে হয় নাই। হিন্দুপরিবারে অবরুদ্ধ রমণীরা ধর্ম্মার্থ কলিকাতার প্রকাশ্য পথে হাটিয়া গিয়া গঙ্গা স্নান করেন, নানা তীর্থ দর্শন করেন। এইরূপে ধর্ম্মপ্রাণতামূলক, জীব সেবামূলক যাঁহার মুক্ত ভাবে বিচরণকারী যাঁহার জীবন তাঁহার দ্বারা নারীজাতি উন্নত হয়। তিনি উন্নতলক্ষ্যে পদচারণ করিয়া থাকেন। কিন্তু ভোগবিলাস লক্ষ্য করিয়া এইস্বর্গীয় অধিকার ব্যবহার করিলে নারী সমাজের গতি স্বর্গবিমুখতা লাভ করে, এবং তদ্দ্বারা ভাবী অকল্যাণ হয়। নারীরাই ভাবী নরবংশ ও নারী বংশের উচ্চতা এবং উৎকৃষ্টতার মূল। ভরসা করি নারী সমাজ মাতাজীর ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং নিঃস্বার্থ পরসেবায় আত্মোৎসর্গের অনুকরণ করিয়া আদর্শ নারী চরিত্র রাখিয়া যাইতে যত্ন করিবেন।

আমাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত।

বর্ম্মদেশ।

৩য়।

(মেণ্ডালয় নগর)

পীনমানাতে মাসাধিক কাল যাপন হইল। এক্ষণ আমরা বর্ম্মরাজ্যের প্রাচীন রাজধানী মেণ্ডালয় নগরে গমনে উদ্যোগী হইলাম। সেই নগরে আমাদের কোন পরিচিত লোক ছিল না, আমরা কাহার আবাসে যাইয়া অবস্থান করিব তাহা আমাদের ভাবনার বিষয় হইয়াছিল। এতদূরে আসিয়া প্রসিদ্ধ মেণ্ডালয় নগর ও তথাকার প্রাচীন বৌদ্ধকীর্ত্তি সকল দর্শন না করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতে মন কিছুতেই প্রস্তুত হইল না। প্রথমতঃ আমরা গৃহকর্ত্রীর নিকটে তথায় যাওয়ার প্রস্তাব উপস্থিত করি। সে বিষয়ে চিন্তা ও আলোচনার পর গৃহকর্ত্রী তথাকার প্রধান উকীল শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আবাসে আতিথ্য গ্রহণ করিতে আমাদিগকে পরামর্শ দান করিলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্নীর সঙ্গে তাঁহার আলাপ পরিচয় ছিল। তিনি মিসেস মুখর্যীকে আমাদের যাওয়ার বিষয়ে পত্র লিখিলেন। মিসেস মুখর্যী পত্রোত্তরে এরূপ ভাব ব্যক্ত করিলেন যে, আমরা মেণ্ডালয়ে তাঁহাদের গৃহে উপস্থিত হইলে তাঁহারা অতিশয় আনন্দিত হইবেন, আমাদের সম্বন্ধে কোনরূপ অযত্ন হইবে না।

তথাকার দর্শনীয় বিষয় সকল যত্নপূর্ব্বক আমাদিগকে প্রদর্শন করিবেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও গৃহস্বামী শ্রীমন্ বসন্তকুমার হালদারকে পত্র লিখিয়া এরূপ ভাব ব্যক্ত করেন যে, আমরা যাইয়া তাঁহার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলে তিনি আহ্লাদিত হইবেন, আমরা কোন্ দিন কোন্ ট্রেণে যাইব পূর্ব্বেই তারযোগে যেন তিনি জ্ঞাপন করেন। আমরা ২৩শে ফেব্রুয়ারী (১১ই ফাল্গুন) প্রতুষে ৫টার ট্রেণে মেণ্ডালয়ে যাত্রা করিব, এরূপ স্থির করি। দুই দিবস পূর্ব্বে তারে মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে সংবাদ দেওয়া যায়।

আমরা উপরি উক্ত দিবস সকালে ৫টার ট্রেণে যাত্রা করিয়া অপরাহ্ণ ৩টার সময় মেণ্ডালয় নগরে উপনীত হই। উপর বর্ম্মের কিয়দ্দুর পথ অতিক্রম করিলে ইতস্ততঃ দূরেওনিকটে উচ্চপার্ব্বত্য ভূমিতে ও সমতল ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র বৃহৎ শত শত পেগোডা (বুদ্ধমন্দির) নয়ন গোচর হইতেছিল। মনে হইতেছিল যেন পেগোডার অরণ্যে প্রবেশ করা গেল। পেগোডা গুলির আকার দেবালয়াদিতে বাদ্যের জন্য ব্যবহৃত ঘণ্টা-সদৃশ। সকল পেগোডার ভিতরে যে বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে তাহা নয়,অনেক পেগোডা শূন্যগর্ভ। নিম্ন বর্ম্মে প্রায় পেগোডাই দারুময়, উপর বর্ম্মে অনেক পেগোডা ইষ্টকনির্ম্মিত দৃষ্ট হইল। বিশেষ বিশেষ পেগোডাতে অনুপম কারুকার্য্য। মেণ্ডালয় নগরের অদূরে দুই তিনটি ষ্টেশনের পার্শ্বে কয়েকটি বৃহৎ পেগোডা সুবর্ণমণ্ডিত লক্ষিত হইয়াছে। যেমন পেগোডা তদ্রূপ বড় বড় ফুঙ্গি চাঙ অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্ম্মযাজকদিগের দারুময় আশ্রমগৃহ ইতস্ততঃ বিদ্যমান। এসকল কীর্ত্তিস্থাপনে বর্ম্মদেশের সম্পন্ন বৌদ্ধগণ মুক্তহস্ত। বঙ্গদেশে ব্রাহ্ম বাবুরা গলদ্‌ঘর্ম্ম শরীরে দশবৎসর স্থানে স্থানে ভিক্ষা করিয়াও অর্থাভাবে নগরে একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মমন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ করিতে পারেন না। এস্থানে এরূপ নয়।

উপর বর্ম্মের অনেক স্থানে লৌহ বর্ম্মের উভয় পার্শ্বে সুদূর ব্যাপী নিবিড় কদলী কানন দেখিতে পাওয়া গেল। কদলী উত্তম রূপ পরিপুষ্ট না হইতেই কাঁদি সকল কাটিয়া মাল গাড়ীতে পুঞ্জ পুঞ্জ বোঝাই করিয়া চালান করা হয়, তজ্জন্য উত্তম জাতীয় কদলি ফল গুলিও তাদৃশ সুরস হয় না।

আমরা বেলা ৩টার সময় মেণ্ডালয় ষ্টেশনে উপনীত হইয়া Mrs Mukherjee প্রেরিত ভৃত্যকে প্রাপ্ত হই। সে আমাদের পরিচয় পাইয়া বলিল, "আপনাকে লইয়া যাইবার জন্য মেম সাহেব আমাকে পাঠাইয়াছেন, সাহেব জঙ্গলে গিয়াছেন। কাল বিকালে আসিবেন।" এদেশে সহরের বাহির স্থানকে সচরাচর জঙ্গল বলে। আমরা ষ্টেশন হইতে অশ্ব শকটারোহণে প্রেরিত ভৃত্যের সঙ্গে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আলয়ে উপস্থিত হই। গৃহকর্ত্রী আমাদের অবস্থিতিস্থান ও ভোজনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমরা স্নান ভোজন ও কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলে পর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা

তথাকার সরকারী উকিল শ্রীযুক্ত বাবু শিশিরকুমার মুখোপাধ্যায় আসিয়া বলেন আমার সঙ্গে চলুন, কেল্লা প্রদর্শন করিব। আমরা তখন তাঁহার সঙ্গে কেল্লা দর্শন করিতে যাই।

মেণ্ডালয় নগরের রাজবর্ত্ম সকল অতিশয় চৌড়া, সরল রেখার ন্যায় সোজা। রাস্তার উভয় পার্শ্বে পাকা কোঠা ঘর ও কাঠের ঘর সকল শ্রেণীবদ্ধ। নগর জনাকীর্ণ, কিন্তু এবারকার প্লেগে জনসংখ্যার কিছু হ্রাস হইয়াছে। নগরে বাঙ্গালী ভদ্রলোক অল্পই আছে। রাজ্যচ্যুত রাজা থিবোর পিতা মহারাজ মিঙ্গো কর্ত্তৃক মেণ্ডালয় নগর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা ভাবিয়াছিলাম যখন বর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক এ নগর স্থাপিত তখন সে দেশের সাধারণ নগরের ন্যায় রাস্তা সকল সঙ্কীর্ণ এবং ইতস্ততঃ আঁকা বাঁকা কুচগলি অনেক থাকিবে। আমরা তাহা না দেখিয়া বরং তদ্বিপরীত প্রশস্ত সরল রাস্তা সকল দেখিয়া বিস্মিত হই। পরে শ্রুত হইল যে, মহারাজ মিঙ্গো একজন ফরাসী ইঞ্জিনিয়ারের plan মতে নগরেররাস্তা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

কেল্লা দিল্লী আগ্রা প্রভৃতি নগরের কেল্লার ন্যায় নহে। পরিখাপরিবেষ্টিত দৈর্ঘ্যে চতুর্দ্দিকে সমপরিমাণ চতুষ্কোণ সমতল ক্ষেত্রবিশেষ সাধারণতঃ কেল্লা নামে পরিচিত। কেল্লার এক এক পার্শ্বের দৈর্ঘ্য দেড় মাইল। সমগ্র কেল্লা প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে ৬ মাইল পথ চলিতে হয়। চারি দিকে পরিখার উপর চারিটি প্রশস্ত সেতু স্থাপিত। সেতু যোগে পরিখা পার হইতে হয়। বোধ হয় ফরাসিস ইঞ্জিনিয়ারের plan মতেই উক্ত দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছে। সেই দুর্গের ভিতরে কয়েকটি ইয়ুরোপীয় বৃহৎ কামান রক্ষিত। সেই সমতল ক্ষেত্রের এক পার্শ্বে রাজবাড়ী, তাহার বাহিরে ইতস্ততঃ গবর্ণমেণ্ট প্রধান কার্য্যালয় সকল, ইয়ুরোপীয় বড় বড় আফিসরদিগের বাসগৃহ, সেনানিবেশ, ক্রীড়াভূমি রমণীয় উদ্যান ইত্যাদি বিদ্যমান। রাজপ্রতিনিধি লর্ড ডফারিনের শাসনকালে ১৮৮৫ সালের ৩০শে নবেম্বর বর্ম্মরাজ থিবো বন্দী হইয়াছিলেন। তিনি এক্ষণ মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত রত্নগিরি পর্ব্বতে রাজ্ঞী সহ বন্দিভাবে স্থিতি করিতেছেন। কতকগুলি ব্যবসায়ী ইংরাজ রাজবিধিকে অগ্রাহ্য করিয়া বর্ম্মরাজের অধিকারভুক্ত অনেক গুলি মূল্যবান্ সেগুন কাষ্ঠ কর্ত্তন করিয়াছিল, শ্রুত হইল তাহাতে বর্ম্মরাজ থিবো উক্ত ইংরাজদিগকে লক্ষাধিক টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেন, একজন ইংরাজও নাকি সেই গোলযোগে হত হয়। তজ্জন্য থিবো রাজ্যচ্যুত হন। যুদ্ধাদি বিশেষ কিছুই হয় নাই। জলপথে বাষ্পীয় পোতারোহণে, কিয়দ্দূর স্থলপথে অল্পসংখ্যক ইংরাজ সৈন্য মেণ্ডালয় উপস্থিত হয়। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে থিবোর ভ্রাতা কোন কারণে থিবোর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার রাজ্য ছাড়িয়া চন্দন নগরে যাইয়া বাস করিয়াছিলেন, তিনি ইংরাজদিগের সহিত মিলিত হইয়া মেণ্ডালয়ে আগমন করেন। তাঁহারই চক্রান্তে

থিবো সহজে বন্দী হন। রাজবাটীর বহির্দ্দেশে সম্ভ্রান্ত অভ্যাগতদিগের অভ্যর্থনার জন্য একটি দারুময় সুন্দর গৃহ আছে, ভ্রাতা আসিতেছেন,ভ্রাতাকে সাদর সম্ভাষণ করিবার উদ্দেশ্যে রাজা থিবো রাজ্ঞী ও রাজ্ঞীর মাতাসহ সেই অভ্যর্থনাগৃহে যাইয়া ভ্রাতার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তদবস্থায় তিনি ধরা পড়েন। আমরা যাইয়া প্রথমতঃ সেই গৃহ দর্শন করিয়াছিলাম। দ্বারের পার্শ্বে লিখিত আছে যে, ১৮৮৫ সালে ৩০শে নবেম্বর মহারাজ থিবো ও রাজমহিষী এবং রাজ্ঞীর জননীসহ এই স্থানে বন্দী হইয়াছিলেন। তথা হইতে আমরা রাজবাড়ী দর্শন করিতে যাই। তখন সন্ধ্যা ৬টা বাজিয়া ছিল, ফটক বন্ধ হইয়াছিল। আমরা সেদিন রাজভবনে প্রবেশ করিতে না পারিয়া গৃহে ফিরিয়া আইসি।

পরদিন রবিবার মধ্যাহ্নে শিশির বাবু আমাদিগকে Municipal Market প্রদর্শন করিবার জন্য লইয়া যান। আমরা সেই বাজারের পারিপাট্য ও শৃঙ্খলা দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলাম। সে দেশীয় নবযুবতীগণ বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া দোকান পশার খুলিয়া প্রফুল্ল বদনে বসিয়া আছেন দৃষ্ট হইল। তাঁহারা প্রায়ই নানা প্রকার শিল্প দ্রব্য ও মূল্যবান্ পট্ট বস্ত্রাদির ব্যবসায় করিয়া থাকেন। শ্রুত হইল এরূপ অনেক যুবতী আছেন যে,লক্ষ দেড় লক্ষ টাকার ব্যবসায় বাণিজ্য চালাইতেছেন। চীন জাপান এবং বম্বে মাদ্রাজ সিন্ধু পঞ্জাব কচ্ছ গুজরাট এবং বাঙ্গলা প্রভৃতি দেশের লোক ব্যবসায় বাণিজ্য ও অন্যান্য কার্য্যোপলক্ষে মেণ্ডালয়ে স্থিতি করিতেছে। বর্ম্মদেশের সকল নগরেই নানা দেশের লোক দেখিতে পাওয়া যায়, বঙ্গ দেশের নগর সকলে সেরূপ দৃষ্ট হয় না। বর্ম্মদেশে মাদ্রাজী লোকই অধিক, সাধারণতঃ তাহারা মুটে মজুরের কাজ করে। বর্ম্মদেশীয় নরনারী অন্য দেশীয় সামান্য লোকদিগকে "কালা আদমি" বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকে। তাহারা প্রায় অন্য দেশীয় লোকের চাকুরী করে না।

সে দিন সায়ংকালে মুখর্য্যি সাহেব মফস্বল হইতে জলপথে ষ্টিমারারোহণে মেণ্ডালয়ে প্রত্যাগমন করেন। তিনি গৃহে প্রত্যাগত হইয়াই উপরের ঘরে আমাদিগকে ডাকিয়া পাঠান। আমরা পূর্ব্বে লোক মুখে শুনিয়া ছিলাম, তাঁহার বড়ই সাহেবী মেজাজ, বাবু বলিলে তিনি অতিশয় অসন্তুষ্ট হন। আমরা আদব কায়দায় ত্রুটিতে বা কোনরূপ অপ্রীতিভাজন হই, ইহা ভাবিয়া কিছু শঙ্কিত ছিলাম। কিন্তু দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ পরিচয় হইলে পর সেই আশঙ্কা কিছুই রহিল না। আমরা দেখিলাম বর্ম্মদেশীয় লুঙ্গি তাঁহার পরিধানে, সাহেবী পরিচ্ছদ তখন ছিল না। তিনি একজন বি এল্ উপাধি প্রাপ্ত উচ্চ শ্রেণীর উকিল, পূর্ব্বে কলিকাতার আলিপুরে ওকালতী করিয়াছিলেন, এবং কিছুকাল বিলাতে ছিলেন। গৃহস্বামী সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক,কলিকাতাস্থ প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত বাবু নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র। আমরা তাঁহাকে বলিলাম,

লোকে বলে আপনাকে বাবু বলিলে আপনি বড় চটেন। তিনি বলিলেন "হাঁ সত্য, এদেশে গোওয়ালা নাপিত ধোপি প্রভৃতিকে বাবু বলে, বাবু সম্বোধন প্রাপ্ত হইয়া আমি সেই সকল লোকের শ্রেণীভুক্ত হইতে অপ্রস্তুত।" আমরা তাঁহার চাল চলনে সাহেবিয়ানা কিছুই দেখিলাম না। সাহেবগণ মদ্য মাংসপ্রিয়, মদ্য মাংসের সঙ্গে তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই। এমন কি তিনি চা-পানেও আসক্ত নহেন। বিলাতেও তিনি মাংস ভোজন করেন নাই। মুখোর্ষি সাহেব স্বল্পাহারী, অনেক দিন কিছু না খাইয়াই কোর্টে চলিয়া যান, কোর্ট হইতে প্রত্যাগত হইয়া অপরাহ্নে মাধ্যাহ্নিক ভোজন করেন। কোন কোন দিন একবারমাত্র মধ্য রাত্রিতে তাঁহার ভোজন হয়। সাহেবেরা ছোট বড় রকমের খানা রোজ ৪।৫ বার খান, মুখোর্ষি সাহেব অনেক দিন আহারই করেন না। মফঃসল হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দুই দিবস অনাহারের পর সেই দিন রাত্রিতে ভোজন করিয়াছিলেন। এমন অবস্থায় তাঁহাকে কেমন করিয়া সাহেব বলা যায়। কিন্তু তিনি সাহেবদিগের ন্যায় কতকগুলি কুকুর পুষিয়া থাকেন। ইতিপূর্ব্বে ১৭টি কুকুর ছিল, ৬টি পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছে, ১১টি বিদ্যমান। কুকুর গুলির সেবাতে প্রতি মাসে ৬০৲ ব্যয় হয়। দুইটি কুকুরকে গৃহকর্ত্তার পল্যাঙ্কে গদির উপর শয়ান দৃষ্ট হইয়াছিল। ইহাতে কিন্তু চূড়ান্ত সাহেবিয়ানা প্রকাশ পাইতেছে। এরূপ কুকুর প্রতিপালনের কারণ সাহেবিয়ানা না হইয়া অন্যতর কারণ হইতে পারে। অনেক অপত্য বিহীন গৃহী ও গৃহিণীকে দেখা যায় যে, প্রচুর অর্থব্যয়ে কতকগুলি পশু পক্ষী সযত্নে লালন পালন করিয়া অপত্য-স্নেহের চরিতার্থতা সাধন করেন। মুখার্ষি সাহেব সন্তান মুখ অবলোকন করেন নাই, হইতে পারে তজ্জন্য কুকুর গুলিকে সন্তান-স্থানীয় করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু ইহাতে কেবল দুধের তৃষ্ণা ঘোলে মিটানের ন্যায় হইয়া থাকে, অসার মমতা মোহে বদ্ধ হইয়া পড়িতে হয়। বিধাতা সন্তান দান করেন ভাল, না দিলেও ভাল। তিনি যে বিধি করেন তাহাই মঙ্গল বিধি। সন্তান জন্মিলে পিতা মাতার যে কত দায়িত্ববৃদ্ধি হয়, তাঁহাদিগকে কত দুঃখ বিপদ্ পরীক্ষায় জড়িত হইতে হয়, ইহা কে ভাবে? হিন্দুসমাজের অনেক নিঃসন্তান পিতামাতা পরেরপুত্রকে নিজের পুত্র বলিয়া প্রতিপালন করেন। সেইরূপ পোষ্যপুত্রদ্বারা মা বাপ সুখী হইয়াছেন বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। অনেক মূর্ত্তিমান পোষ্যপুত্র কুসংসর্গদোষে কুচরিত্র হইয়া পিতা মাতাকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে, তাহাদিগকে দুঃখের সাগরে ভাসাইয়াছে। বিলাতে পোষ্যপুত্র রাখার নিয়ম নাই, কোটি টাকার সম্পত্তি থাকিলেও তাহা ভোগ করিবার জন্য কেহ পোষ্যপুত্র রাখে না। তথাকার নিঃসন্তান ধনী লোকেরা শেষ জীবনে স্বকীয় সমুদায় সম্পত্তি ধর্ম্মপ্রচারে বা শিক্ষাবিভাগে কিংবা দাতব্য বিভাগে দান করিয়া চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি স্থাপন করেন, তাহাতে লোকের অশেষ উপকার

হয়। আমাদের পীনমানার মা নিঃসন্তান, তবে তাঁহার স্নেহভাজন পুত্র কন্যাস্থানীয় কুকুরের সংখ্যা কম, পাখী অনেক অধিক এবং নানা প্রকার। পক্ষিশ্রেণীর লালন পালনে তিনি হিন্দুওয়ানী ও মোসলমানী ভাবের সম্মিলন সাধন করিয়া উদারতার পরিচয় দান করিতেছেন।

আমরা মুখর্যি সাহেবের মিষ্ট ব্যবহার ও সৌজন্য ভদ্রতায় অতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছি। আমরা জানি সর্ব্বদা সাহেবী পোষাক পরিয়া থাকিলে বাঙ্গালীর মেজাজ কিছু গরম হয়, অনেকটা সাহেবী মেজাজ হইয়া উঠে, বাঙ্গালীত্বের হ্রাস হয়, স্বদেশীয় স্বগণাদির সম্বন্ধে ভিন্নতার রেখা প্রকাশ পায়। আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন দীর্ঘকাল বিলাতে বাস করিয়া এক দিনও ইংলিশ পোষাক পরিধান করেন নাই। তিনি চোগা চাপকান পরিয়া বড় বড় সভাতে বক্তৃতা করিয়াছেন, ইংলণ্ডেশ্বরীর সঙ্গে ও বড় বড় লর্ডদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া নিরামিষভোজন করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার নিন্দা হয় নাই, বরং শ্রদ্ধা ও সম্মান বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, তাঁহার সদাচরণ ও সুদৃষ্টান্ত তাঁহার অতিশয় আপনার লোকেরাও গ্রহণ করিতেছেন না। বাঙ্গালীর সাহেবীয়ানার বিরুদ্ধে কেশবচন্দ্র অনেক বলিয়াছেন ও লিখিয়াছেন। সে কথা কে শুনে, কে পড়ে? সাহেবীয়ানাতে অনেকের এরূপ ঝোঁক যে, তাঁহারা বিলাতের মাটী চরণে স্পর্শ না করিয়াই স্বদেশে থাকিয়া পাকা সাহেব হন।

মুখর্যি সাহেব বিলাত হইতে প্রত্যাগত, জাতিভেদ মানেন না, সুতরাং জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতার চিহ্ন উপবীত স্কন্ধে ধারণ করেন না। কিন্তু তাঁহার আত্মীয় স্বজনেরা তাঁহাকে যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়া কপট ব্রাহ্মণ সাজিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়াছেন। মুখর্যি সাহেব হিন্দুওয়ানী মানেন না সত্য, কিন্তু কোন বিশেষ ধর্ম্মে বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করিয়া যে, কোন রূপ সাধন ভজন করেন, এরূপ বুঝা গেল না।

পরদিন ১৩ই ফাল্গুন সোমবার পূর্ব্বাহ্নে শিশির বাবু প্রায় এক ক্রোশ অন্তর নগরপ্রান্তে আমাদিগকে ফয়াজী (সুবিশাল বুদ্ধ মূর্ত্তি) প্রদর্শন করিবার জন্য লইয়া যান। কিয়দ্দূর পথ অশ্বশকটে কিয়দ্দূর Electric Tramএ যাওয়া যায়। মেগুলয়ের ট্রামগাড়ী গুলি বেশ সুন্দর। ভাড়াও অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু এখানকার ট্রাম কার্টের ন্যায় প্রথম শ্রেণী দ্বিতীয় শ্রেণী নাই। ফয়াজীর বিশাল দেহ, উর্দ্ধ নয়নে তাঁহার মুখমণ্ডল দর্শন করিতে হয়। তখন কতকগুলি লোক মঞ্চোপরি আরোহণ করিয়া ফয়াজীর মুখমণ্ডল সুবর্ণ মণ্ডিত করিতেছিল। মহামুনি বুদ্ধ ভারতবর্ষের লোক ছিলেন, কিন্তু বর্ম্মদেশীয় লোকেরা তাহাদের মুখমণ্ডলের ন্যায় বুদ্ধমূর্ত্তির মুখমণ্ডলের গঠন দান করিয়া থাকে। যিনি যত বৃহদাকার বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপন করিতে পারেন তাঁহার তত অধিক পুণ্য হয়, সে দেশীয় লোকের এ প্রকার বিশ্বাস। এজন্য বর্ম্মদেশের স্থানে স্থানে অস্বাভাবিক বিরাট

বুদ্ধমূর্ত্তি সকল বুদ্ধভক্তগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে। আমাদের দেশে বুধগয়ার বুদ্ধমূর্ত্তি, চট্টগ্রাম জিলার পাহাড়তলীর মহামুনিনামক বুদ্ধমূর্ত্তিও সামান্ত বৃহদাকার নহে। মেণ্ডালয়ের সুবিশাল ফয়াজী পূর্ব্বে আরাকানে স্থাপিত ছিল, বর্ম্মরাজ তথা হইতে আনয়ন করিয়া মেণ্ডালয়ে স্থাপন করিয়াছেন। সিংহল দ্বীপে কাণ্ডি নগরে একটি কুম্ভীরের বৃহদ্ দন্ত বুদ্ধদেবের দন্ত বলিয়া মন্দিরে পূজিত হইতেছে। মেণ্ডালয়ে উক্ত মন্দিরের চারি দিকে এক একটি সুবিশাল বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত। ভক্তগণ সে সকলের সম্মুখে ইতস্ততঃ আলো জ্বালাইয়া মন্ত্র পাঠ করিতেছেন দৃষ্ট হইল। আমরাও আলোদান করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছিলাম। মন্দিরে যাইবার পথের উভয় পার্শ্বে সারি সারি দোকান পশার। আমরা একটি দোকান হইতে দুইটি চুরুট মাত্র ক্রয় করিয়াছিলাম। এক একটি চুরুট দৈর্ঘ্যে এক ফুট হইতে পারে, তাহার স্থূলতাও তদনুরূপ। উহা সে দেশের স্বদেশী সামগ্রী, স্ত্রী পুরুষ সকলে নিত্য ব্যবহার করে। আমরা আমাদের দেশের স্বদেশী ভাইভগিনীদিগকে তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য ক্রয় করিয়াছিলাম।

গৃহে প্রত্যাগত হইয়া মাধ্যাহ্নিক ভোজন করা গেল। আজ মুখর্যি সাহেবের শয়নাগারে ভোজনের আসন স্থাপিত হইয়াছিল। মুখর্জী মহাশয় অনাবৃত মেজেতে বসিয়া আমাদের সঙ্গে নিরামিষ ভোজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। গৃহে তাঁহার রন্ধনের জন্য মোসলমান বা মান্দ্রাজী ববুর্চ্চী নিযুক্ত নয়, ব্রাহ্মণ পাচক নিযুক্ত, ভোজনের সময় তাঁহার যোগে গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় হইল। আমরা তাঁহাকে ২১ খানা স্বরচিত পুস্তক উপহার দিয়াছিলাম, তিনিও সে দেশীয় শিল্পদ্রব্যবিশেষ আমাদিগকে উপহার দিয়াছিলেন। সেই সময় সেই স্থানে কচি আমের আকার মেরিয়ম নামক এক প্রকার ক্ষুদ্র ফল পাওয়া যায়। এদেশে কখনও সেই ফল দৃষ্ট হয় নাই। উহার অতিশয় অম্লস্বাদ। আমরা তাহার অম্বল খাইয়া কচি আমের অম্বল মনে করিয়াছিলাম। তখন পীনমানাতে কচি আম অপ্রাপ্য ছিল। আমরা বাজার হইতে তাহার কিছু খরিদ করিয়া আনাইয়া দিতে বলিয়াছিলাম। গৃহকর্ত্রী আমরা যে ঠকিয়াছি বুঝিতে পারিয়া হাসিলেন, কচি আম তখনও মেণ্ডালয়ে দুষ্প্রাপ্য ছিল। তিনি পুঞ্জ পরিমাণ মেরিয়ম পীনমানাতে লইয়া যাইবার জন্য আমাদিগকে উপহার দিলেন। সে দিন গৃহকর্ত্রী অনুগ্রহ করিয়া অগ্রিম মূল্য দানে মহিলাপত্রিকার গ্রাহিকা হইলেন।

অপরাহ্ণ ৪ টার সময় রাজপ্রাসাদ দর্শন করার জন্য পুনর্ব্বার শিশির বাবুর সঙ্গে যাওয়া যায়। আমরা রাজবাড়ীর দ্বারে যাইয়া শুনিতে পাই যে, ইংলণ্ডেশ্বরীর পুত্র ডিয়ুক অব্ কনট ৪॥ টার সময় Palace দর্শন করিবার জন্য আসিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি ও তাঁহার সঙ্গে কতিপয় সাহেব বিবী রাজ বাটীতে যাইয়া প্রবেশ করিলেন। রাজ্ঞী-পুত্র সমস্ত দর্শন করিয়া প্রায় ৬টার সময় বাহির হইয়া

গেলেন। আমরা ভাবিয়া ছিলাম, আজও আমাদিগকে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হইল। Palaceএর তত্ত্বাবধানে একজন বাঙ্গালী বাবু আছেন, শিশির বাবুর অনুরোধে তিনি আমাদিগকে ভিতরে লইয়া সমস্ত দেখাইলেন। রাজবাড়ীর অন্তর্গত অনেকগুলি বড়বড় ঘর বিদ্যমান। সমুদায় দারুময়, তাহার অধিকাংশ অপূর্ব্ব কারুকার্য্যযুক্ত, কাঠের প্রাচীর ও স্তম্ভশ্রেণীতে উৎকীর্ণ সূক্ষ্ম পুষ্পলতার ভিতরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরকলা ও কাচখণ্ড সকল ঝলমল করিতেছে দৃষ্ট হইল। তিনটি গৃহে তিনটি রাজসিংহাসন স্থাপিত ছিল, সে সকল সিংহাসন স্থানান্তরিত হইয়াছে। শ্রুত হইল সিংহাসন নানা মণি মুক্তা খচিত ছিল। প্রধান সিংহাসন যে গৃহে স্থাপিত ছিল, সেই গৃহের সৌন্দর্য্য হৃদয় হরণ করে। কার্য্যালয় শয়নাগার নাট্যশালা ইত্যাদি অনেক ঘর বিদ্যমান, সকলই দারুনির্ম্মিত সুন্দর। কতকগুলি গৃহ ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে। রাজবাড়ীর এক প্রান্তে একটি দারুময় বিশাল টাওয়ার আকাশে মস্তক উত্তোলন করিয়া আছে। সম্প্রতি তাহার জীর্ণ সংস্কার হইয়াছে। শ্রুত হইল,তাহাতে গবর্ণমেণ্টের ৭৫ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া গিয়েছে। কেল্লার ভিতরেই বৃহৎ জেইল খানা। মেণ্ডালয় ও টাঙ্গু নগরের জেইল খানাতে কাঠ বাঁশ ও বেতের দ্বারা অতি সুন্দর সূক্ষ্ম কারুকার্য্য যুক্ত টেবিল চেয়ার ইত্যাদি প্রস্তুত হয়,এবং সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। মেণ্ডালয়ের কুষ্ঠাশ্রম বৃহদ্ ব্যাপার। তাহা দেখিবার সুযোগ হয় নাই।

Palace দর্শন করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইয়াই ভোজনান্তে রাত্রি সাড়ে আটটার ট্রেণে আমরা পীনমানাতে ফিরিয়া যাইবার জন্য উদ্যত হই। প্রথমে এরূপ ইচ্ছা ছিল যে, মেণ্ডালয়ের অনতি দূর আবা অমরাপুর সেগায়াং প্রভৃতি স্থানে যাইয়া সেই সকল স্থানের প্রাচীন হর্ম্ম্যের ভগ্নাবশেষ ও বৌদ্ধকীর্ত্তি সকল দর্শন করিব। সঙ্গে গমন করে সেরূপ উপযুক্ত প্রদর্শক তথায় পাওয়া গেল না। শিশির বাবু একজন উকিল নিরন্তর কার্য্যে ব্যস্ত, তখন তাঁহার সহধর্ম্মিণী উৎকট রোগে আক্রান্ত ছিলেন, সেই অবস্থায় তিনি সঙ্গে যাইবেন,এরূপ আশা করা যায় না। আমরা বর্ম্ম দেশীয় ভাষায় কথা কহিতে অক্ষম। আমাদের পক্ষে সেইভাষা অবোধ্য। একা গেলে ভাষাজ্ঞানের অভাবে নানা অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। সে দেশে হিন্দী উর্দ্দু কিংবা বাঙ্গলা ভাষা প্রায় কেহই বুঝে না। শিশির বাবু বলিলেন,সেই সকল স্থানে গেলে বড় পরিশ্রান্ত হইতে হইবে। অনেক পথ হাটিয়া যাইতে হইবে, এবং পাহাড়েও চড়িতে হইবে। এসকল কথা শুনিয়া নিরুৎসাহ হওয়া যায়। শিশির বাবু, নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বে যে দুই বেলা আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া নগরের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে যাইয়া দর্শনীয় বিষয় সকল প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহ বলিতে হইবে, তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকটে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আমাদের ইতস্ততঃ গমনের জন্য মুৎর্ষি সাহেব অনুগ্রহ

করিয়া নিজের গাড়ী নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। ভোজনান্তে ষ্টেশনে যাত্রা করা যায়। মুখর্জি সাহেবের আদেশে তাঁহার একজন ভৃত্য সঙ্গে চলিয়াছিল। গৃহকর্ত্রী ডাকিয়া বলেন, কেবল ভৃত্য সঙ্গে গেলে চলিবে না, ছোট বাবুকে সঙ্গে যাইতে হইবে। তিনি নিজে ষ্টেশনে যাইয়া টিকিট খরিদ করিয়া যেন বাবুকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া আইসেন। পূর্ব্বাপরিচিত অতিথির প্রতি গৃহস্বামী ও গৃহকর্ত্রীর এরূপ দয়া স্নেহ কৃতজ্ঞতার সহিত চির স্মরণীয়। ছোট বাবু সপরিবারে অন্য পল্লীতে বাস করেন, সেখান হইতে তিনি আমাদের সঙ্গে ষ্টেশনে যাইয়া আমাদিগকে গাড়ীতে উঠাইয়া বিদায় হইয়া চলিয়া যান। সে দেশে প্রথম,দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণী ব্যতীত মধ্যম শ্রেণীর গাড়ী নাই। রিটারণ টিকিট পাওয়া যায় না। তৃতীয় শ্রেণীতে বাঙ্গালী ভদ্রলোকের চলা দুষ্কর। সেই শ্রেণীর গাড়ীতে স্ত্রী লোকের অতিশয় ভিড় হয়, বঙ্গ দেশের ন্যায় এ দেশে স্ত্রী লোকের জন্য স্বতন্ত্র গাড়ী নাই। আমাদিগকে সর্ব্বত্র দ্বিতীয় শ্রেণীতে চলিতে হইয়াছে। আমরা পরদিন প্রত্যুষে পীনমানাতে প্রত্যাগত হই।

আর্য্যনারীসমাজের উৎসব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

তুমি পিতা, মাতা,পতি,বন্ধু, ধন ধান্য দাতা ইত্যাদি কোটী ২ রূপ ধরে আর্য্যনারীকে দিবা নিশি অভয় দিতেছ। আবার সকলকে ফেলে, যখন আত্মা অমরধামে চলে যাবে, তখন স্থান দিবে। জগৎ সংসারে, ইহ পরকালে তোমার অভয়পদ একমাত্র ভরসা। চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, নদ নদী, তোমারি স্তব স্তুতি করিতেছ। সংসারে, তুমি লক্ষ্মী সরস্বতীরূপে বিরাজ করিতেছ। হে প্রেমসিন্ধু দেবতা! তোমার করুণা, স্নেহ দয়া যদি অনন্ত না হইত,তবে কি আজ তোমার চরণে আমরা আসিয়া বসিতে সাহস করিতাম? তোমার কি রাগ নাই, বকিতে জান না? কেবল দিতে জান, তাই বুঝি, পাপীর এত আশা, পাপীর প্রতি এত দয়া! তোমার চেয়ে তোমার দয়া বড়! ধন্য তোমার দয়া, পাপীকে ঘৃণা করে না।

দুর্ব্বল মোহাচ্ছন্ন নারীর জীবনে অনন্ত তোমার দয়া। তোমার করুণা নিয়ত আমাদের উপর বর্ষণ হচ্ছে। হে পুণ্যময়! কজন তোমার ঘরে প্রবেশ করিতে সাহস পায়? তারা ভাবে, সিংহাসনের চারিধারে ঘুরে ফিরে চলে যাবে, কিন্তু তোমার পুণ্যের তেজে তাদের পাপ ভস্ম হয়ে গেল। পাপ নিয়ে এসেছিল, কিন্তু কেমন সুন্দর হ'য়ে গেল। সংসারই কেবল প্রতিকূল হয়ে দাঁড়ায়। তোমার পুণ্যের কণা মাত্র আমাদের দাও; তবে আর্য্যনারী নামের উপযুক্ত হব। আর্য্যনারী জীবনের সব মলা ধুয়ে পবিত্র হোক্। তুমিই শুদ্ধ. নিষ্কলঙ্ক দেবতা। হে অদ্বিতীয় রাজা ভ্রান্তমন তোমায় ছেড়ে সুখী হতে চায়। সকল আনন্দ, সুখ, তোমার অনন্তধামে। যে তোমার চরণে স্থান

পেয়েছে সে জানে সুখ কি। পৃথিবীর সুখ, সম্পদ, ঐশ্বর্য্যে মন যেন না মজে। ভক্ত বলে গিয়েছেন, সীতা যখন অশোক বনে ছিলেন, তখন তাঁর সৌন্দর্য্য আরও বেশী ছিল। সংসারে থেকে যাঁরা তপোবন-বাসিনী হন, তাঁরা আরও ভাল। আমাদের নববৃন্দাবনবাসীনী কর। জীবন দেখে যেন সকলে বলে এঁরা ধন্য! পৃথিবীর কিছুই সঙ্গে যাবে না, একা এসেছি, একাই যেতে হবে। তুমি অনন্তকালের সাথী, এক সূর্য্য যেমন শত শত জীবকে জীবন দান ক'চ্ছে সেইরূপ সকল নারীকে কুসংস্কার, অবিশ্বাস, মোহ হইতে উদ্ধার করিয়া নবজীবন দাও।

হে ভক্তজননি! আমাদের আর্য্যনারী সমাজের অধিষ্ঠাত্রী দেবি, তুমি উপস্থিত থাকিয়া উপাসনা প্রার্থনা শ্রবণ করিলে। হে উৎসবের রাণী! আজ বড় সুন্দর পোষাকে এসেছ। একা, যখন দেখা দাও, বড় সুন্দর, কিন্তু একত্র সকলের কাছে আরো সুন্দর আবির্ভাব। তোমার ব্রহ্মানন্দকে যে নবসুধা পান করাবার জন্য পাঠিয়ে দিলে, সেই সুধা বিশেষ ভাবে পান করে আমরা পবিত্র ও শুদ্ধ হই। তুমি আজ আমাদের আশীর্ব্বাদ কর। কত লোক এখান থেকে চলে যাচ্ছে, কত আসন শূন্য হ'চ্ছে, কিন্তু আমাদের প্রাণে প্রাণে যোগ, সকলে অনন্ত কাল তোমার ভিতর থাকিব। স্নেহময়ী জননীর সুমধুর কণ্ঠরব এখনও কাণে বাজিতেছে, তাঁর আত্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে আজ প্রার্থনা করি। তোমার ইচ্ছা, তোমার ভক্তের ইচ্ছা এ জীবনে পূর্ণ করি, এই ভিক্ষা। ক্ষুদ্র তোমার মণ্ডলী, অতি দীন; তুমি এত সুন্দর, আমাদের কি সুন্দর ক'রবে না? আজ সকলকে সাজাবে বলে এসেছ; খুব ভাল করে সাজাও। পুরাতন জীবন চাই না; সংসারের মলিনতা নিয়ে ফিরবো না। আমরা তোমার সব আর্য্যনারী আজ একত্র হয়েছি। আমাদের তোমার দাসীরূপে মনোনীত করে এখানে এনেছ। প্রাণপণে তোমার সেবা করিয়া যেন যথার্থ দাসী নামের উপযুক্ত হইতে পারি। কত দেবালয়ে, কত ঘরে তোমার পূজা হ'চ্ছে। আমরা আজ হৃদয়ের ভক্তি প্রেম ফুলে তোমার পূজা করি। যে মালী, বহু কষ্ট ও শ্রম-লব্ধ ফুল তোমার চরণে এনে দিতে পারে, তার কি সৌভাগ্য? সে ফুল ত কখন শুকাইবে না।

হে আনন্দময়ী মা! সবে সুখী হতে চায়। ভ্রান্তমন, মনে ভাবে তোমায় ছেড়ে সুখী হবে। সকল সুখ, আনন্দ তোমার অমরধামে। যে তোমার অভয় চরণে স্থান পেয়েছে, সে জানে প্রকৃত সুখ কি। যে তোমায় ছেড়ে সংসারে সুখী হ'তে চায়, সে বারে বারে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এসে তোমার চরণে পড়ে, তবে যথার্থ সুখ পায়।

আর্য্যনারী সমাজে আজ আনন্দের রোল উঠেছে। দুঃখ, নিরানন্দ, শোক বিলাপ ফেলে দাও। এক মনে, এক সুরে আনন্দময়ীর গান করি। তুমি অনন্ত সুখের ভাণ্ডার। তোমাকে ডেকে পরিত্রাণ পাব। কটী ভাই বোনে, এখন নববিধান-মণ্ডলীর সকলে যেন ভক্তের মনোবাঞ্ছা

পূর্ণ করিতে পারি। ভক্তের জয় তোমা ছাড়া হবে না, নববিধান ছাড়া হবে না। আর্য্যনারী পদ্মপাতার জলের মত সংসারে নির্লিপ্ত থেকে মার কাজ করিবে। জয় জয় দয়াময়ী ভক্তজননীর জয়। বীরদল বৃদ্ধি কর। হে ভক্ত বীরপ্রসবিনী, সকলকে আশীর্ব্বাদ কর। সকলে মিলিয়া আজ বিশেষ দিনে তোমাকে বার বার নমস্কার করি।

পরম ভক্তিভাজন আচার্য্যমাতার প্রার্থনা :—ঠাকুর, আর কি বলবো। উপাসনা করতে জানি না। আমি জানতাম কেবল কেশবচন্দ্রকে, তিনি আমাকে তোমায় জানতে শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। ক্ষুদ্র বীজ বপন করিয়া তাহাতে জল সেচন করিতে করিতে ক্রমে পাতা, শিকড় ফুল ফল হয়, তোমার ভক্ত যে নব বিধান বীজ বপন করে গিয়েছেন, সেই বৃক্ষের ফলের মধু সকলকে আস্বাদন করাও। সকলকে এক পরিবার কর। হে পতিতপাবন! দরশন দাও। আমি এই বেদীতে কেশবচন্দ্রকে দেখছি। হে জগৎপতি,জগৎপিতা, জগন্মাতা! আমি কেশবের কন্যা সকলের (আর্য্যনারীদের) মুখের হরিনাম শুনতে এসেছি। হরি বল মন, তুমি এক দেবতা। কেউ কালী, কেউ দুর্গা বলে তোমায় ডাকে। কিন্তু এক সকল ধর্ম্মের মূল সার তুমি। তুমি নিরাকার, মানুষ বুঝে না, তাই কালী, দুর্গার ভিতর দিয়ে তোমায় ডাকে।

ভগবানের চরণে পড়ে আজ আমরা সবাই এক হই। মনের শান্তি যেন থাকে। অশান্তি যেন না আসে। আমি ভগবানের চরণে প'ড়ে রয়েছি, তাঁর যা ইচ্ছা ক'রবেন। কত দিন আর আমায় এখানে ফেলে রাখবে ঠাকুর? রাখতে হয় রাখ, আর নিয়ে যেতে হয় নিয়ে যাও, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক্। বাবা কেশব চন্দ্র, তাঁর নিরাকার রাজ্যে পাপী দুঃখিনী মাকে নিয়ে যাও; তুমি ভিন্ন আমায় কে রক্ষা ক'রবে? বুকটা ফেটে যাচ্ছে। ভক্তি বিশ্বাস দাও। হে দুর্গে, দুর্গতি হরণ কর। আমার চুলের মুটি ধ'রে নিরাকারে ফেলে দাও। তা হলে মুক্তি পাব। মা আমায় রক্ষা কর। ভক্তি বিনা মুক্তি নাই ভক্তি দাও। তুমি কি নববিধানের হরি? না, সব জগৎ পরিবারের হরি, আর্য্যনারী সমাজের হরি। কেশব বলেছিলেন,গোলাপ সুন্দরী সকল মেয়েদের জড় করে একটা সভা করবেন। আজ সেই আর্য্যনারী সভায় তাঁকে দেখছি, মার পূজা কচ্ছি। আজ বিশেষ দিনে মা আমাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ কর ও পাপ হ'তে উদ্ধার কর।

স্নেহ।

মহিলার রচনা।

নিবেদন। *

ক্ষুদ্র বীজ কঠিন মৃত্তিকা ভেদ করিয়া অঙ্কুরিত হইয়া উপরে উঠে, তাহার শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া পুষ্প ফল বিতরণ করিয়া জগতের শোভা বর্দ্ধন করে, কঠিন

* একটী উৎকলকন্যা কর্ত্তৃক বিগত মহামহিলাসমিতিতে পঠিত বক্তৃতার মর্ম্মানুসারে পরে লিখিত।

মৃত্তিকা তাহাকে বাধা দিতে পারে না। প্রকৃতিরাজ্যের নিয়মে ঐ মৃত্তিকাই বীজের উৎপাদিকা শক্তির সাহায্য করে। সেইরূপ অন্ধকারের ভিতর আলোক, মৃত্যুর ভিতর জীবন, বিপদের ভিতর সম্পদ, বিপ্লবের ভিতর অভ্যুদয়, জড় জগতে ও অধ্যাত্ম জগতে লুক্কায়িত ভাবে রহিয়াছে, তাই রাত্রির পর প্রভাত হয়, মৃত্যুর পর পরলোক বিশ্বাস করি, ক্রন্দনের পর হাস্য আসে। তাই শুনিয়াছি, ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের পর ফ্রান্স কত উর্দ্ধে উঠিয়াছিল। তাই আমরাও দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করিব যে, ভারতজননীর দুর্দ্দিন আসিয়াছিল মহাশুভ দিন আসিবে বলিয়া, কেহ বাধা দিতে পারিবে না, ইহা অবশ্যম্ভাবী। আমরা দেখিয়া যাইতে না পারি জগৎ এক দিন দেখিবে।

উৎকলের একজন শ্রেষ্ঠ কবি প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে একখানি উড়িয়া সাহিত্য পুস্তকে রাণী দুর্গাবতীর কথা লিখিতে গিয়া লিখিয়াছেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় নারীগণের দুর্দ্দশা অবলোকন করিয়া কে বিশ্বাস করিবে যে, এই হতভাগ্য দেশ এক সময়ে সমরবিলাসিনী মনস্বিনী, বীরবালাদিগের বিলাস-ক্ষেত্র ছিল? কিন্তু মুসলমান ইতিহাস বজ্র নির্ঘোষে সেই বীরেন্দ্রবরণীয়া নারীগণের কীর্ত্তি গান করিতেছে।

আজ ভারতে নারীজাতির সে সৌভাগ্য, সে স্বাধীনতা, সে শুভদিন নাই, একথা সত্য, আজ অতীতের সেই গৌরব কাহিনী স্মরণ করিয়া আমাদের প্রাণ পুলকে নাচিয়া উঠিতেছে শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে, মানি সত্য, তবু বলিব যে, বিশ বৎসর পূর্ব্বে ভারতে নারীজাতির যে অবস্থা ছিল, আজ নারীজাতির সে অবস্থা নাই। এক সময়ে দুর্দ্দিন আসিয়াছিল, এক সময়ে ভারতে বিপ্লব ঘটিয়াছিল, কিন্তু তাহার পর নব অভ্যুদয়ের ভিতর হইতে এক মহাশক্তি ধীরে ধীরে বিকশিত হইতেছে, ধীরে ধীরে আমাদের প্রাণে নব শক্তির সঞ্চার করিতেছে, ধীরে ধীরে আমাদের হৃদয়ে নব আশা প্রেরণ করিতেছে, ইহার গতি কে রোধ করিবে? এ গতি রোধ করিতে কত বাধা, কত বিঘ্ন আসিয়াছে, কিন্তু বাধা দিতে পারে নাই।

স্বর্গগতা মহারাণী দেবী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে যখন ভারতে নারীজাতির উন্নতির জন্য স্ত্রীশিক্ষার কথা উত্থাপিত হয়, যখন স্ত্রীশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হয়, তখন সেই দ্বার অবরোধ করিতে কত চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু কেহ তাহা রোধ করিতে সমর্থ হয় নাই, যাহারা রোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহারাই পথ উন্মুক্ত করিয়া দিল। ধীরে ধীরে বিকাশোন্মুখ অঙ্কুরের মত এক মহাশক্তি আমাদের ভিতর বিকশিত হইতেছে, কেহ তাহার গতি রোধ করিতে পারিবে না।

বিধাতার কৃপায়, ইংরেজ রাজত্বে ভারতে নারীজাতির পক্ষে শুভদিন আসিয়াছে, তাহার চিহ্ন আজ এই মহামহিলা-সমিতি। আশা করি একথা আমরা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব।

মাননীয়া ভগিনীগণের সকলেই জানেন

এখনও ভারতে নারীজাতির সম্যক্ দুরবস্থা দূর হয় নাই, এখনও ভারতের বহু অংশ অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন। যাঁরা জ্ঞানালোকে জ্ঞানের মাধুর্য্য উপলব্ধি করিয়াছেন, যাঁরা জ্ঞানালোকে কত সুখ, কত শান্তি, কত আনন্দ, কত অমৃত সম্ভোগ করিয়াছেন, তাঁরাই অনুভব করিতে পারিবেন, কুসংস্কার ও অজ্ঞানতার ঘনান্ধকারে আবৃত জীবনে কত দুঃখ, কত দুরবস্থা।

শিক্ষিত নারীজাতির মধ্যে এখন এমন কেহই নাই, যাঁরা বর্ত্তমান যুগে বলিতে পারেন, নারী শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন নাই। ভারত যে একদিন ঘোর দুর্দ্দশায় পতিত হইয়াছিল, তাহা কেবল নারীজাতির অনুন্নতিতে। ভারত কেন সমস্ত পৃথিবী স্বীকার করিবে যে, সুকন্যা, সুপত্নী, সুমাতার অভাবে দেশ কত দূর দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে পারে, এবং সেই অভাব পূর্ণ হইলে দেশের কত দূর উন্নতি বিধান হয়। তাহা আর এস্থলে আমার মত সামান্য স্ত্রীলোককে বুঝাইয়া দিতে হইবে না, তাহা পৃথিবীর কতক অংশে দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারি।

এত দিন ভারতের নারীজাতির উন্নতিকল্পে বহু সহৃদয় পুরুষ সচেষ্ট হইয়া নারীজাতির মহোপকার সাধন করিয়াছেন, তাঁরা চিরদিন নারীজাতির নিকট হইতে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ লাভ করিবেন। শিশু যখন চলিতে প্রথম চেষ্টা করে তখন একজনকে তার হাত ধরিতে হয়, কিন্তু তার পর সে যখন চলিতে সমর্থ হয়, তখন সাহায্যের প্রয়োজন হয় না, কেবল তাহা নহে, সে কত শিশুকে সাহায্য করে। তদ্রূপ বর্ত্তমান যুগে ভারতে সেই সময় আসিয়াছে যে, নারীজাতির উন্নতি কল্পে নারীর সাহায্য বিশেষ ভাবে প্রয়োজন হইয়াছে। যত দিন না ভারতের উন্নতিকল্পে ভারতের নারীজাতির প্রাণ জাগিয়া উঠিবে না, তত দিন ভারতের উন্নতি-আংশিক ভাবে চলিবে। একদিন যে কবি গান করিয়াছিলেন "না জাগিলে সব ভারত ললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না।" ইহা কবির কল্পনা নহে, ইহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

ইয়ুরোপ এখন কেন এত উন্নত? তা আমরা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইতেছি। সেই সুদূর ইংলণ্ড হইতে ইয়োরোপীয় মহিলাগণ কত কষ্ট স্বীকার করিয়া জ্ঞান ও ধর্ম্মবিতরণের জন্য বিদেশে গিয়াছেন। এমন কি কেহ কেহ চিরদিনের মত ধর্ম্মের জন্য বিদেশকে প্রাণ দান করিয়াছেন। ভারতীয় রমণীদিগের পক্ষে ইয়োরোপীয় মহিলাগণের মত কার্য্য করিবার সুবিধা না থাকিলেও, ভারতের প্রত্যেক বিভাগে, ভারতের শিক্ষিতা নারীগণ দেশের দুর্দ্দশা ও তন্নিবন্ধন নারীজাতির দুর্দ্দশা অবলোকন করিয়া কার্য্যক্ষেত্র বিস্তার না করিলে, আমাদের দেশেরও দুর্দ্দিন দূর হইবে না, নারীজাতির সম্যক্ উন্নতি বিধান হইবে না।

আমার মত দীন অকিঞ্চনকে আর বুঝাইয়া দিতে হইবে না যে, মানবজীবন এবং মানবসমাজের উন্নতির মূল জ্ঞান ও

ধর্ম্ম। বর্ত্তমান যুগে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সকলেই প্রায় স্বীকার করেন জ্ঞান ও ধর্ম্ম দুইয়ের সামঞ্জস্য এত অধিক যে একের অভাবে অন্যটির সম্পূর্ণ বিকাশ অসম্ভব। জ্ঞানহীন ধর্ম্ম,কিংবা ধর্ম্মহীন জ্ঞান জগতের কোন কার্য্যে লাগিতে পারে না; সুতরাং ভারতের শিক্ষিতা নারীসমাজ ভারতের ঘরে ঘরে ভারতরমণীর হৃদয়ে হৃদয়ে জ্ঞান ও ধর্ম্মের বীজ বিতরণ করিতে না পারিলে ভারতের উন্নতির পথ সম্যগ্রূপে উন্মুক্ত হইতে পারে না। আমি উৎকলবাসিনী, উৎকল আমার জন্মস্থান, এবং আমি জন্ম হইতে এ পর্য্যন্ত উৎকলে বাস করিতেছি। তাই আজ বঙ্গীয় ও অন্যান্য ভারতীয় ভগিনীগণের সাক্ষাতে উৎকলের নারীজাতির সম্বন্ধে কিছু বলিব।

বঙ্গদেশের অতি নিকটে উৎকল থাকিয়াও শিক্ষাসম্বন্ধে বঙ্গের নিকট হইতে উৎকল বহু দূরে পড়িয়া রহিয়াছে। এখনও উৎকলের নারীগণের হৃদয় বহু কুসংস্কারে আবদ্ধ। এখনও অনেকে স্বামীর সহিত বিদেশে যাইয়া বাস করিতে কুণ্ঠিত। এখনও বসন্ত ও কলেরাকে দেব দেবীর আবির্ভূতি বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন। সে যাহা হউক এ বিষয়ে আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

আশা করি এই মহামহিলাসমিতি দ্বারা ভারতের নারীজাতির উন্নতি সাধিত হইবে; এবং মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতার কৃপায় ভারতজননীর মুখ উজ্জ্বল হইবে।

সংবাদ।

বিগত ২রা বৈশাখ সোমবার ভিক্টোরিয়া মহিলা বিদ্যালয়ের অন্তর্গত বালিকা পাঠশালার ছাত্রীদিগকে পুরস্কার বিতরণ করা হইয়াছে। ভূতপূর্ব্ব সেসন জজ শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ সেন মহাশয় ন্যূনাধিক ৭০জন ছাত্রীকে পারিতোষিক দান করিয়াছেন। কতিপয় ছাত্রী সঙ্গীত,রন্ধন ও সিলাই কাজের জন্য বিশেষ পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে। পারিতোষিক বিতরণের সভায় অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত মহিলা ও পুরুষ উপস্থিত ছিলেন। প্রথমতঃ নববিধান মণ্ডলীর সঙ্গীত প্রচারক ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল-প্রার্থনা করিয়া নারীজাতির জ্ঞানোন্নতি বিষয়ে কিছু বলেন। পরে কতিপয় ছাত্রী সম্মিলিত ভাবে সঙ্গীত এবং নীতি বাক্যাবলী আবৃত্তি এবং পরস্পর প্রশ্নোত্তর ভাবে কথোপকথন করে। পরে সম্পাদক ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী বার্ষিক কার্য্য বিবরণ পাঠ করেন। পুস্তক ও ছবি এবং নানা প্রকার ক্রীড়ার সামগ্রী পুরস্কার দেওয়া হইলে পর শ্রীযুক্ত ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ রায় এবং ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী উপদেশসূচক কিছু বলেন। অবশেষে সভাপতি নিজের মন্তব্য ব্যক্ত করেন। সভাপতি এই বিদ্যালয়ে সাধারণ বালকদিগের শিক্ষাপ্রণালীর অনুরূপ যে কোমলমতি বালিকাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয় না, শিক্ষাদানে ভিন্নতা রক্ষা করা হইয়াছে, নারী প্রকৃতি অনুসারে শিক্ষা দেওয়া হয়, তজ্জন্য আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

মহিলার দ্বাদশ বৎসরের দশম মাস

অতীত হইল। গ্রাহক গ্রাহিকাদিগের নিকটে সানুনয় প্রার্থনা যে, তাঁহারা অনুগ্রহ-পূর্ব্বক যেন বর্ত্তমান বৎসরের মূল্য অবিলম্বে পাঠাইয়া আমাদিগকে উপকৃত করেন। বহু গ্রাহক ও গ্রাহিকার নিকটে পূর্ব্ব বৎসরের মূল্য প্রাপ্য। আমরা মূল্য পাঠাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়া তাঁহাদের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি।

কিছুদিন হইল কলিকাতাস্থ বাবু রঞ্জিতচন্দ্র লাহিড়ীর দ্বিতীয় পত্নীর এবং তাঁহার ভ্রাতৃ বধূর একযোগে ফটোগ্রাফ তাঁহাদের আত্মীয় বাবু ননীগোপাল চাকি তুলিয়াছিলেন। তিনি প্রায় দুই মা সকাল Negative খানা রাখিয়া দিয়াছিলেন, পরে তাহা Develop করিতে যাইয়া দেখেন যে, সেই দুই ছবির মধ্যস্থলে আর একটি স্ত্রীলোকের চেহারা রহিয়াছে, তৃতীয় ছবির পরিধানে উত্তম পরিচ্ছদ এবং গলদেশে হার ঝুলান আছে, এবং উক্ত ছবির উভয় হস্ত পূর্ব্বোক্ত দুই ছবির স্কন্ধদেশের দিকে প্রসারিত। উহা একটি আবরণ ভেদ করিয়া কিছু অস্পষ্ট রূপে প্রকাশ পাইতেছে। ননীগোপাল তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হন। রঞ্জিতচন্দ্র বলেন, তাঁহার পরলোকপ্রাপ্ত পূর্ব্ব স্ত্রীর আকৃতির সঙ্গে এই ছবির সাদৃশ্য আছে। সেই ফটো আমরা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া লোকে সেই ফটোগ্রাফ অধিক মূল্যে ক্রয় করিতেছে। এই প্রেতাত্মার ছবির রহস্য বড় বড় বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরাও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

"পাশ্চাত্য দুর্নীতির অনুকরণ প্রবন্ধ এবং লাহিরিয়া সরাইয়ের একটী কন্যা কর্ত্তৃক প্রেরিত বালক বালিকাদিগের নীতিসমিতির আলোচিত বিষয়, আরও কয়েকটী মহিলার পত্র ও প্রবন্ধ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। মহিলার ক্ষুদ্র কলেবর, গত চৈত্র মাসে প্রকাশযোগ্য অনেকগুলি প্রবন্ধ ও মহিলার রচনা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছিল, স্থানাভাবে প্রকাশ করিতে পারা যায় নাই। দুই তিনটি লেখা কিছু কিছু করিয়া ক্রমশঃ আকারে প্রকাশ করা গিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধাদি এবার আমরা স্থানের সঙ্কীর্ণতাবশতঃ প্রকাশ করিতে অক্ষম হইয়াছি। আগামী বারে কিছু কিছু প্রকাশ করিতে যত্ন করা যাইবে। সমিতির বিবরণ অতিশয় দীর্ঘ। তাহার প্রকাশযোগ্য বিশেষ বিশেষ অংশ প্রকাশিত হইতে পারে। ইহা মনে করা উচিত। যে, মহিলা সাধারণ ভাবে নারীজাতির জ্ঞান ধর্ম্ম নীতির উন্নতিসাধনের জন্য যত্ন করিয়া থাকেন। ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রের ন্যায় বিশেষ ভাবে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার ও নববিধান প্রচার মহিলার লক্ষ্য নহে। নীতিসমিতির বিবরণের অন্তর্গত প্রার্থনাদি মহিলাতে প্রকাশ করার স্থান হইয়া উঠিবে না। মহিলারা সামান্য বিষয়ে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠান। আমরা অনেক সময় সমগ্র ভাবে তাহা প্রকাশ করিতে অক্ষম হই।

ময়মনসিংহ জিলার কিশোরগঞ্জ সব্-ডিভিশনে এক সময়ে এক মজার মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল। এক মোসলমান স্ত্রী তত্রত্য সব্‌ডিভিশনল আফিসর বাবুর নিকটে এইরূপ অভিযোগ উপস্থিত করে যে তাহার স্বামী তাহার স্তনের দুগ্ধ সমুদয় চুষিয়া খায়, দুগ্ধ পান করিতে না পারিয়া তাহার কোলের ছেলে মারা যাইতেছে। স্বামী বলে, "আমি আফিং খাই, দুধ না খাইলে আমার প্রাণ বাঁচে না। এখানে

দুধ বড় আক্রা, আমি গরিব মানুষ, খরিদ করিয়া দুধ খাইতে পারি না।"

দুঃখকাহিনী।

ময়মনসিংহ জিলার জামালপুর সব-ডিভিশনে স্বদেশী আন্দোলনের বিষময় ফল উপস্থিত। হিন্দুরা গবর্ণমেণ্টের বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের রাজ পুরুষদিগের বিরুদ্ধে অনেক কাল তীব্রভাবে রসনা ও লেখনী চালনা করিয়া অজস্র নিন্দা ও কটূক্তি বর্ষণ করিয়াছিলেন। এক্ষণ তথাকার নিম্ন শ্রেণীর মোসলমানগণ গভর্ণমেণ্টের পক্ষাবলম্বনে হিন্দুদিগের উপর ভীষণ অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। উক্ত জামালপুর অঞ্চলের সাধারণ মোসলমানগণ লেখনী নয়, যষ্টি ধারণ করিয়াছে। তাহারা হিন্দুদিগের ঘর বাড়ী লুণ্ঠন করিতেছে, তাহাদের ঠাকুর দেবতা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। হিন্দু রমণীদিগের মান সম্ভ্রম ও সতীত্ব রক্ষা পাওয়া দুষ্কর হইয়াছে। অনেক নির্দ্দোষ ভদ্রলোক উৎপীড়িত হইয়া সপরিবারে স্থানান্তরে পলায়ন করিয়াছেন। সেই সবডিভিশনের অনতিদূরে বাস করেন এমন একজন হিন্দু জমীদার আমাদিগকে লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, মোসলমানদিগের দাঙ্গা হাঙ্গামার ব্যাপারে আমরা সর্ব্বদা ভীত আছি। ঢাকা নগরের এবং পূর্ব্ববঙ্গের অন্য অনেক স্থানের হিন্দুগণের মনে আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণতো আর ফুলার সাহেব ছোট লাট নহেন যে, তাঁহার চক্রান্তে এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। এক্ষণ জামালপুরের সব ডিভিশনাল আফিসার একজন ইংরাজ। সংবাদপত্রে এরূপ প্রকাশিত যে, তিনি দাঙ্গা হাঙ্গামাকারী মোসলমান দিগকে শাসন করিতেছেন না, বরং প্রশ্রয় দিতেছেন। নিজের প্রতি মোসলমানদিগের অত্যাচারভয়ে হউক, বা পক্ষপাতবশতঃ হউক দুরন্ত মোসলমান দিগকে সাহেব উপযুক্ত শাসন করিতেছেন না, সন্দেহ নাই। চিরকাল হইতে গবর্ণমেণ্ট মোসলমান জাতিকে ভয় করিয়া চলেন, কলিকাতাতে টালার মোসলমান দিগের দাঙ্গা হাঙ্গামার ব্যাপারে উহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সে দিন কাবোলী মোসলমানগণ মহানগরীর বক্ষঃস্থলে কতকগুলি পুলিশ কর্ম্মচারীকে অপমান করিল ও তাহাদের প্রতি ভীষণ অত্যাচার করিল, গবর্ণমেণ্ট তাহাতে কোন উচ্চ বাচ্য করিলেন না। কোনরূপে গোলযোগ মিটাইয়া দিলেন। রাজ্যে ঘোরতর বিপ্লব ও অশান্তি হইবে ভয়ে গবর্ণমেণ্ট অত্যাচারী দুর্দ্দান্ত মোসলমান দিগকে শাস্তিদানে কতক ভয় করিয়া থাকেন। পূর্ব্ববঙ্গ মোসলমান প্রধান স্থান; সেখানে হিন্দুগণ দুর্ব্বল, মোসলমানই প্রবল। তথাকার ইংরাজ হাকিমগণ গবর্ণমেণ্টের প্রতি ও ইংরাজ জাতির প্রতি হিন্দুদিগের তীব্র আক্রমণজন্য হিন্দুদিগের প্রতি অতিশয় বিরক্ত ও অপ্রসন্ন। বিচার সাহেবদিগেরই হস্তে। হিন্দু ও মোসলমানের ভ্রাতৃভাবের পরিচয় এই আরম্ভ হইয়াছে। পরিণামে আরও কত কি হইবে বলা যায় না। দুর্নিবার গুণ্ডা লাঠিয়াল মোসলমানগণ কলমের আঁচড় বা বক্তৃতা বুঝে না, লাঠীর গুতোই বুঝে।

গুণ্ডা মোসলমানেরা ময়মনসিংহের কোন কোন ভদ্রলোকের বাড়ী আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব পূর্ব্বেই জানিতে পাইয়া কয়েক জন গোরখা সিপাহী ও পুলিশ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন,দুষ্ট লোকেরা ভয় পাইয়া আর কিছু করিতে পারে নাই। সম্প্রতি ময়মনসিংহে দুষ্ট দমনের জন্য ২৫ জন গোরখা সিপাহী প্রেরিত হইয়াছে। বিপদভঞ্জন হরি বিবাদ বিদ্বেষ নিবারণ করিয়া প্রজাকুলের মধ্যে শান্তি স্থাপন করুন।

অতিশয় দুঃখের বিষয় এই যে সম্প্রতি লাহোর চিফকোর্টের উকিল তত্রত্য আর্য্য সমাজের গণ্যমান্য সভ্য স্বদেশহিতৈষী ও বদান্য শ্রীযুক্ত লাজপদ রায় রাজবিদ্রোহিতার প্রতিপোষকতার অপরাধজন্য বন্দী হইয়া স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন। তিনি বর্ম্মদেশের মেণ্ডালয় নগরের দুর্গে স্বদেশ ও স্বগণ হইতে বিচ্যুত হইয়া বন্দিভাবে চিরজীবন যাপন করিবেন। পঞ্জাবের অন্য এক জন প্রধান ব্যক্তি রাজবিদ্রোহিতাবিষয়ে লাজপদ রায়ের সহযোগী বলিয়া বিচারাধীন আছেন। বাঙ্গলা দেশে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ভয়ানক বাড়াবাড়ি হইয়া গিয়াছে, গবর্ণমেণ্ট উপেক্ষা ও ক্ষমা করিয়াছেন। মহামান্য লাজপদ রায়ের এরূপ গুরুতর শাস্তি সহজ কারণে হইয়াছে সম্ভব নহে। রাজার দোষ না প্রজার দোষ,এক পক্ষের সংবাদপত্র পড়িয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। ভূয়োদর্শনে আমাদের প্রতীতি হইয়াছে যে, সংবাদপত্রের সকল কথা পক্ষপাতশূন্য সমূলক নহে।

রাউলপিণ্ডি নগরের কতকগুলি লোক গবর্ণমেণ্টের বিশেষ আজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও আন্দোলন করিবার জন্য দলবদ্ধ হইয়াছিল, নিষেধ না মানিয়াও আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইতেছিল। সকলকে তোপে উড়াইয়া দেওয়ার ভয় প্রদর্শন করাতে তাহারা নগর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহাদের নেতা নিরুদ্দেশ হইয়াছে।

স্বদেশী অত্যাচারের জন্য কিশোরগঞ্জ সবডিভিশনের দুইটি ছাত্র তত্রত্য সবডিভিশনাল আফিসর বাবুর বিচারে কারারুদ্ধ হইয়াছে।

সম্প্রতি ভারতগবর্ণমেণ্ট হইতে এরূপ আদেশ প্রচার হইয়াছে যে, পঞ্জাব ও পূর্ব্ববঙ্গ এবং আসামের বিশেষ বিশেষ স্থানে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতীত রাজনৈতিক আন্দোলোনের জন্য সভা হইতে পারিবে না।

রাজাজ্ঞার বিরুদ্ধে জোরজবরদস্তি করা এবং রাজার বা রাজপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে কটূক্তি ও নিন্দা করা স্বদেশী ভাব নয়,সম্পূর্ণ বিদেশী। রাজভক্তি হিন্দুজাতির চিরন্তন স্বদেশী ভাব। স্বদেশী প্রচারক ভ্রাতৃগণ বিশেষ অধিকার লাভের জন্য রাজার নিকটে যথাবিধি আবেদন করিতে পারেন। জোর জুলুম করা মহাপাপ। তাহার ফল ভোগিতেই হইবে।

খ্যাতনামা স্বদেশী বক্তা শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় মান্দ্রাজ হইতে প্রত্যাগত হইয়া পত্রিকাবিশেষে লিখিয়াছেন যে, এক্ষণ আর তিনি রাজনৈতিক আন্দোলন করিবেন না।

ভিক্টোরিয়ামহিলাবিদ্যালয়।

ইচ্ছাশক্তি *।

সেদিন আপনাদিগকে বস্তুবিজ্ঞানের বিষয় বলিয়াছি। আজ ইচ্ছাশক্তির বিষয় কিছু বলিব।

কোন বিষয় জানিতে হইলে তিনটী শক্তির দরকার। প্রথমতঃ ইন্দ্রিয় অনুভব। কিন্তু যদি মানুষকে ইন্দ্রিয় অনুভব দ্বারাই বাহিরের সমুদয় বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে হইত পশু অপেক্ষা মানুষের কিছু বিশেষত্ব থাকিত না। দ্বিতীয়তঃ মানুষকে জগতের বিষয় জানিবার জন্য স্মৃতির দরকার। স্মৃতির চেয়ে আর একটী গুণ বুদ্ধি। মনো· বিজ্ঞান পড়িবার উদ্দেশ্য আত্মজ্ঞানলাভের জন্য। ইচ্ছা সকলেরই আছে, এবং সকলেই উহা ব্যবহার করেন। ইচ্ছা কি জিনিষ? ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি দুটী কি জিনিষ এবং দুটীতে কত প্রভেদ জানা উচিত। প্রবৃত্তি চঞ্চল, সব সময় প্রবৃত্তি এক রকম থাকে না। সকাল হইতে রাত্রিপর্য্যন্ত দিনের মধ্যে কতবার উহার পরিবর্ত্তন হয়। ধর্ম্ম জানি, কিন্তু প্রবৃত্তি নাই। মনে ইচ্ছা আছে, প্রবৃত্তি নাই। অনেক সময় ক্ষুধার সময় আহারে প্রবৃত্তি নাই, কিন্তু কর্ত্তব্যবোধে ইচ্ছা আছে। আবার অনেক সময় ইচ্ছা থাকে না, প্রবৃত্তি থাকে। ইচ্ছা না থাকিলে প্রবৃত্ত হওয়া যায় না।

প্রবৃত্তি ও ইচ্ছা বিভিন্ন পদার্থ। প্রবৃত্তি ভাবমূলক অবস্থাঘটিত। মানুষের শরীরের অবস্থা চঞ্চল, শরীর দুর্ব্বল হইলে ইচ্ছা থাকিলেও প্রবৃত্তি থাকে না। অতএব প্রবৃত্তিও চঞ্চল। দয়া মানুষের একটা প্রবৃত্তি। সব সময় দয়া প্রবৃত্তি স্থির থাকে না। উপাসনা প্রার্থনার সময়ও সব সময় প্রবৃত্তি থাকে না। প্রবৃত্তি না থাকিলে উপাসনা শুষ্ক রসহীন মনে হয়। প্রবৃত্তি যখন ভাবমূলক অবস্থা ঘটিত, তখন ইচ্ছা কি জিনিষ জানা দরকার। অনেক সময় সাধুলোকদের মধ্যেও সৎপ্রবৃত্তি স্থির থাকে না। ইচ্ছা স্থির রাখা যায়। যার যে বিষয়ে ইচ্ছা স্থির থাকে সেই বিষয়ের সেই ইচ্ছা তার নিকটে Compassএর মত। দিগ্দর্শন যন্ত্র থাকিলে ঝড়ের সময়ও জাহাজ যেরূপ বাধা বিঘ্ন ঠেলিয়া ঠিক স্থানে যায়, সেই রূপ ইচ্ছা স্থির থাকিলে সমুদায় বাধা বিঘ্ন ঠেলিয়া অতি গুরুতর কর্ত্তব্য সম্পন্ন করা যায়। এবিষয়ে এখানে একটা গল্প আছে। কলম্বস যখন আমেরিকা আবিষ্কার করিতে যান তখন অন্যান্য লোকেরা তাঁর কথায় তত বিশ্বাস করে নাই। তারা সমুদ্রকে বড় ভয় করিত। তাদের সংস্কার ছিল পশ্চিম দিকে গেলে সমুদ্র হইতে একটা কাল হাতী উঠিয়া সমুদয় জাহাজকে ডুবাইয়া ফেলিবে

---

* ১৯০৩ সালের ১৩ই জানুয়ারি তারিখে স্বর্গগত মোহিতচন্দ্র সেন যে বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন, তন্মূলক।

কিংবা কোন একটা সাপ জাহাজকে গিলিয়া ফেলিবে। কিন্তু জ্ঞানবান লোকেরা তা মনে করিতেন না। কলম্বসের মনে হয়েছিল যে এই অকূল সমুদ্রের পরপারে দেশ আছে। তিনি খুব উৎসাহী লোক ছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন যদি সেখানে দেশ থাকে তাহা হইলে সেই সকল লোকেদের নিকটে ঈসার পবিত্র ধর্ম্ম প্রচার করিতে হইবে। প্রথমতঃ তিনি পোপের নিকটে গিয়া বলিয়াছিলেন, "আমাকে একখানা জাহাজ দিতে হইবে" কিন্তু তাহা হইয়া উঠে নাই। সৌভাগ্যক্রমে স্পেনের রাণী তিন খানি জাহাজ ও লোকজন দিয়াছিলেন। অর্দ্ধেক পথ গেলে সমুদ্রের মধ্যে ঝড় বৃষ্টি হইতে লাগিল, তারা তাঁকে জলে ফেলে দিতেছিল,এবং বলেছিল,তুমি আমাদিগকে মারিবার জন্য কোথায় লইয়া যাইতেছ? তিনি বলিয়াছিলেন আর এক দিন চল, তারপর যা হয় হইবে। তাঁর প্রবৃত্তি অনেক সময় বিচলিত হইয়াছিল, কিন্তু ইচ্ছা অটল ছিল। কতকগুলি পাতা ভাসিয়া আসিতে ছিল দেখিয়াছিলেন, এবং মনে করিয়াছিলেন অবশ্য দেশ আছে এবং বৃক্ষাদি আছে। আর খানিক পরে একটী স্থলচর ছোট পক্ষী উড়িয়া আসিতে দেখেছিলেন। এই সব দেখিয়া তাদের সাহস বেড়ে গেল, এবং এইরূপে তিনি আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সময় সময় তাঁর মন দুর্ব্বল হত, কিন্তু তিনি কর্ত্তব্যের উপর ইচ্ছা স্থির রাখিয়া ছিলেন। প্রবৃত্তির উপর ইচ্ছা স্থির রাখিতে হইলে জ্ঞানের প্রয়োজন। কর্ত্তব্য কি করিয়া বোঝা যায়। পণ্ডিতেরা তিনটী কথা বলেন। তাঁরা বলেন, শাস্ত্রপাঠ এবং গুরুজনের কথা দ্বারা কর্ত্তব্য স্থির করা যায়। শিশুরা গুরুজনের নিকট হইতে অথবা তাহার ছোট ছোট পুস্তক হইতে তাহারা কর্ত্তব্য বুঝিতে শিখে। বুদ্ধ দেখিলেন বলিদান করিতে শাস্ত্রে বিধি আছে। কিন্তু তাঁহার মনে তাহা ভাল লাগিল না। "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" বুদ্ধ তাঁর অন্তর হইতে এই কথা শুনিয়া ছিলেন। বিবেক হইতে কর্ত্তব্য জানা যায়। কলম্বসের অন্তরে আমেরিকা বাণী উদিত হইয়াছিল। কোন শাস্ত্রে পূর্ব্বে আমেরিকা নাম ছিল না। পরীক্ষা দ্বারা কর্ত্তব্য ঠিক করিতে হয়। ন্যায় বুদ্ধি এবং জ্ঞানের সহিত যা মেলে না তা মিথ্যা। মিথ্যার উন্নত জীবন কিছুই নয়। সত্যই উন্নতি। যে বাণী পালন করিলে মন পবিত্র উন্নত হয় তাহাই বিবেকবাণী। সত্য জিনিষটা ভগবান্ প্রদত্ত। ইচ্ছা ভগবানের সঙ্গে মেলান দরকার। তখন সে জানিতে পারে যে, সে যথার্থ ভাবে সৎপথে চলিতেছে। শিশুকে বাহিরে দেখিয়া সে কত ভাল এবং মন্দ হবে কেউ বলতে পারে না। অতএব শিশু পালন একটী গুরুতর দায়িত্ব মনে করা উচিত। এর ভেতরে কত কিছু প্রচ্ছন্ন ভাবে আছে। ইহুদিগের মধ্যে খৃষ্ট জন্মাবার পূর্ব্বে সংস্কার ছিল যে, যে ছোট শিশুর মধ্যেই একজন হইবে। এবং প্রত্যেককেই ভাল রূপে প্রতিপালন করিতে হইবে। আমাদিগের ভিতরে কি ভাব লুক্কায়িত আছে, ভগবান্ জানেন। কোন মানুষকেই বাহিরে দেখিয়া জানা যায় না, সে ভাল না মন্দ হইবে। ক্রাইষ্টকে

যখন ক্রুশে বিদ্ধ করা হইয়াছিল তিনি বলিয়াছিলেন, "প্রভো, তুমি ইহাদিগকে ক্ষমা কর, ইহারা জানে না ইহারা কি করিতেছে।"

আত্মজ্ঞানের মূলে ইচ্ছা। আমাদিগকে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে ইচ্ছাশক্তির অধীন হইতে হইবে। প্রবৃত্তি ভাবমূলক, ইচ্ছা কর্ত্তব্য লক। কর্ত্তব্য বিবেকের বাণী হইতে বোঝা যায়। দৃঢ়তা না থাকিলে আমরা কিছু করিতে পারি না। ইচ্ছা স্বাধীন, ইহা প্রবৃত্তিকে জয় করিতে পারে। যে নিজে দাঁড়াতে পারে না, চঞ্চল, সে চঞ্চলকে কি করিয়া জয় করিবে? অচঞ্চল চঞ্চলকে জয় করিতে পারে। ইচ্ছা অবস্থার অধীন। অনেক সময় মানুষের ইচ্ছা থাকিলেও ধনাভাবে সব কাজ করিয়া উঠিতে পারে না। সৎকাজ করিতে হইলে অনেক সময় টাকার দরকার। বুদ্ধি থাকিলে অতি অল্প যা কিছু আছে তাহারও সদ্ব্যবহার করা যায়। যদি সে প্রবৃত্তি লইয়া কাজ করে তবে সে খরচে হয়। কৃপণ ও খরচেতে তফাৎ কি? কৃপণ যা পায় সব জমিয়ে রেখে দেয়, কিন্তু খরচে যে, সে পাইলেই খরচ করিয়া ফেলে। যেমন একটা রাস্তায় কতকগুলি সোনার বাক্স আছে। এক দিক্ হইতে কতকগুলি লোক কয়েকটা বাক্স বুকে ঠেলিতে ঠেলিতে লইয়া গেল, এবং আর দিক হইতে কতকগুলি লোক কয়েকটা বাক্স ঠেলিতে ঠেলিতে লইয়া দুজনে এক জায়গায় গিয়া ঝগড়া করিতে আরম্ভ লাগিল। কৃপণ বলে কেন এত খরচ করিতেছ? কর্ত্তব্যহীন লোক এবং কৃপণ উভয়েই সমান। ইচ্ছার স্বকীয় স্বভাব আছে। স্বভাব ইচ্ছার দাস। স্বভাবের উপর ইচ্ছার কর্ত্তৃত্ব আছে। আমরা অনেককে কৃপণ বলিয়া জানি। স্বভাবের বীজ লোকে কতকটা বাপমার নিকট হইতে কতক বাহিরের এবং সমাজ হইতে লাভ করে। স্বভাবকে অন্য রকম করিয়া চালাইলে উহার পরিবর্ত্তন হয়। ইচ্ছা অবস্থা ও স্বভাবের চেয়ে স্বাধীন। কর্ত্তব্যের সহিত ইচ্ছার যোগ আছে। অবস্থার দাস হওয়া ভাল নয়। ইচ্ছা আমার নিজের জিনিষ। পৃথিবীর আর কোন জিনিষই আমার নয়। এই দেহও আমার নয়, চিন্তাভাব আমার নিজের নয়, অন্য লোকের। বিচারের সময় ভগবান আমাকে আমার ইচ্ছাশক্তিকে আমি কোন্ দিকে চালাইয়াছি তাহাই আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন। আমার ইচ্ছাশক্তি আমি যেদিকে ইচ্ছা করি চালাইতে পারি। ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানশক্তি এবং চেষ্টা শক্তিও আমার নিজের হইয়াছে। আমরা শিশুকে যেমন বুদ্ধিমান হইতে ইচ্ছা করি, সেই সদবুদ্ধিবিশিষ্ট হইতে ইচ্ছা করা উচিত। এক গুঁয়েমি সব সময় ভাল নয়। ইহার যথার্থ ইচ্ছা কি দেখিতে হইবে। প্রথম হইতেই শিশুর মনকে ভাল বিষয়ে ভাল কাজে জ্ঞানের সাহায্যে চালাইতে হইবে।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১২শ ভাগ] জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪ ; জুন ১৯০৭। [১১শ সংখ্যা।

স্ত্রীনীতিসার।

পত্নী পতির চিরবাধ্যা ও অনুগতা থাকিবেন, কোন প্রকার অবাধ্যতাচরণ করিয়া পরস্পরের মধ্যে অশান্তি আনয়ন করিবেন না। যখন স্বামী কোন নীতিবিরুদ্ধ কার্য্যে যোগদান করিতে তাঁহাকে বলেন, তখন তিনি তাঁহার আজ্ঞার বশবর্ত্তিনী হইতে পারেন না। তিনি স্বামীর ইচ্ছা ও আদেশ অপেক্ষা নীতিকে অধিক সম্মান করিবেন। নীতি ঈশ্বরের বিধি, ঈশ্বরের বিধি সর্ব্বপ্রযত্নে পালনীয়। ঈশ্বর পতির পতি পরম পতি। স্বামী যদি বলেন, "তুমি অমুক বিষয়ে কিছু অসরল ব্যবহার করিও, অসত্য কথা কহিও, তাহা হইলে লাভ আছে।" কিন্তু অসত্য ও অন্যায়াচরণে অনীতি ও অধর্ম্ম হয়, তিনি পৃথিবীর স্বামীর অনুরোধে স্বর্গস্থ পরম স্বামীর নিষেধ অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। তিনি যে অনীতির কার্য্য করিতে অক্ষম, বিনীত ভাবে স্বামীকে বুঝাইয়া বলিবেন।

পাপাচরণে তুমি স্বামীর বাধ্য না হইলে তিনি যদি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হন ক্ষতি নাই। তুমি সর্ব্বাগ্রে পরম স্বামী পরমেশ্বরের প্রসন্নতা সাধন করিবে। নীতি ঈশ্বরের আদেশ, তাহা বিবেক কর্ণে শুনিতে পাওয়া যায়। নীতিপালনে ঈশ্বরের আদেশ পালন হয়। তাহাতে ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ ও পুণ্য সঞ্চয় হয়। তুমি নীতিপালনে দৃঢ়ব্রত থাকিলে তোমার নিজের কল্যাণ ও স্বামীর আত্মার কল্যাণ হইবে। স্বামী দুর্নীতিপরায়ণ হইলেও তুমি চরিত্রের, সুদৃষ্টান্তে তাঁহাকে নীতিপরায়ণ করিয়া তুলিবে।

তুমি যদি ধর্ম্মকে ও নীতিকে উপেক্ষা করিয়া আশু সুখের জন্য অনীতিপরায়ণ স্বামীর অনুগত হইয়া চল, তাঁহার অনীতির কার্য্যে পোষকতা কর, তাহা হইলে তোমাদের উভয়ের অশেষ অকল্যাণ জানিবে।

বঙ্গমহিলাদের স্বদেশী-প্রিয়তা।

বর্ত্তমান কালে বহু বঙ্গমহিলা স্বদেশী বস্তুজাতের প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছেন। স্বদেশী যাহা কিছু ভাল তৎপ্রতি তাঁহারা অনুরাগ প্রকাশ করেন, তদ্ব্যবহারে অনুরক্ত থাকেন, ইহা একান্ত প্রার্থনীয়। ইহাতে তাঁহাদের জীবনের এবং স্বদেশের কল্যাণ ও উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। স্বদেশপ্রেমের অনুরোধে দেশীয় শিল্প ও পণ্যজাতের উন্নতি সাধনে মহিলাদিগের যত্ন দেখিলে কাহার হৃদয়ে না আনন্দের উদয় হয়। কিন্তু স্বদেশপ্রেমের সঙ্গে অন্য দেশ ও অন্য জাতির প্রতি হিংসা বিদ্বেষ জড়িত হইলে বড় দুঃখের বিষয়। অপিচ স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি অনুরাগবশতঃ দেশীয় ও জাতীয় কুসংস্কার ও অসদাচার সকলকে স্বদেশী জিনিষ বলিয়া আদর করিলে, বিদেশের সুনীতি সদাচারকে বিদেশী ও বিজাতীয় বলিয়া ঘৃণা প্রকাশে বর্জ্জন করিলে, অপর দিকে অন্ধতাবশতঃ বিদেশী অনীতি অনাচারের পক্ষপাতী হইয়া স্বজাতীয় শুদ্ধ সাত্ত্বিক উচ্চ ভাব ও উচ্চ নীতিকে অবহেলা করিয়া চলিলে নিজেদের অবনতি ও অশেষ অকল্যাণ ঘটিবে। কোন্‌টি স্বদেশী কোন্‌টি বিদেশী সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে প্রথমতঃ নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। স্বদেশী যাহা ভাল ও কল্যাণজনক তাহা সাদরে গ্রহণীয়, যাহা মন্দ তাহা পরিত্যাজ্য। বিদেশী যাহা কিছু শরীর মনের পক্ষে উপকারী তাহা সমাদৃত হইবে, বিদেশী বলিয়া তৎপ্রতি অবজ্ঞা করা হইবে না। বিদেশী যাহা এদেশের পক্ষে অস্বাভাবিক ও অনিষ্টজনক তাহা সর্ব্বথা উপেক্ষিত ও পরিত্যক্ত হওয়া প্রার্থনীয়।

ভক্ত কেশবচন্দ্র এরূপ বলিয়াছিলেন, "আমার ইচ্ছা ও আগ্রহ যে, মেয়েরা সায়ংকালে নির্জ্জনে যোগাসনে বসিয়া যোগধ্যানে রত হন, বা দুই চারি জন বন্ধুসহ মিলিত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক হরিপ্রসঙ্গ এবং একতন্ত্রী যোগে হরিগুণকীর্ত্তন করেন; ভারতীয় আর্য্যনারীদিগের ইহাই প্রকৃত ভাব ও প্রকৃত ধর্ম্ম। আর্য্যকুলোদ্ভবা বঙ্গমহিলাগণ সচরাচর তাহা উপেক্ষা করিয়া বাহ্যিক ভাবে চলেন ও পাশ্চাত্য সভ্যতার একান্ত বশবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহারা সায়ং সমিতিতে চা-পান ও আমোদ গল্প করিবার জন্য যোগদান করেন, বড় দুঃখের বিষয়।" আমরা দেখিতেছি, ইংরাজরাজের প্রসাদে দুরারোহ ও দুর্গম উত্তুঙ্গ হিমাচলশৃঙ্গ দার্জ্জিলিং পর্ব্বতের উপর আরোহণ সহজ সাধ্য হওয়াতে অনেক বঙ্গমহিলা—বঙ্গকুলকন্যা ও কুলবধূ কেবল আমোদের জন্য তথায় যাইয়া বাস করেন, সকালে বিকালে আত্মীয় যুবকদিগের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া বেড়ান, কোথাও স্ত্রী পুরুষে একত্র বসিয়া চা পান করেন, আমোদ গল্প করিয়া থাকেন। তাঁহারা পবিত্র যোগভূমি হিমালয়ে স্থিতি করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য কোনরূপ সাধন ভজন করেন না, কেবল বাহ্যিক ভাবে মত্ত হন, শারীরিক ভোগ বিলাসে ব্যস্ত থাকেন। তথায় যুবক যুবতীদের পরস্পর সংমিশ্রণজন্য অনেকের কোর্টশিপ ও বিবাহ সম্বন্ধের ঘটকতাদি হইয়া থাকে। ইহা স্বদেশী ভাব নয়, বিদেশী

বিবিয়ানা। পুরাকালে ধর্ম্মানুরাগিণী সতী সাধ্বী আর্য্যকন্যাগণ ধর্ম্মোন্নতিসাধনোদ্দেশ্যে বহু আয়াসে হিমালয়ে যাইয়া স্থিতি করিতেন। তাঁহারা যোগ ভক্তিসাধনে উন্নত হইতেন, এক্ষণ সেই বংশের কন্যাগণ হিমাচলে যাইয়া অধিকতর সংসারাসক্তা বিলাসিনী হন, ইহা অতি পরিতাপের বিষয়।

এতদ্দেশীয় গৃহিণীদিগের আহারাদিতে বৈরাগ্য,গৃহকর্ম্মে নৈপুণ্য ও পরসেবা স্বদেশী পবিত্র ভাব ছিল; বিলাসভোজনে ও মাংসাদিভোজনে একান্ত বিরাগছিল,যত্নপরিশ্রম সহকারে গৃহকর্ম্ম সম্পাদন ও স্বহস্তে রন্ধন পরিবেশন এবং পরিবারস্থ সকলকে ভোজন করাইয়া সর্ব্বশেষে নিজে ভোজন করা, সর্ব্বপ্রযত্নে স্বামীর শারীরিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণসাধন করা, নিজ গর্ভজাত শিশুকে স্তন্যদানে নিজক্রোড়ে লালন পালন করা, এ সকল স্বদেশী পবিত্র ভাব। গৃহকর্ম্মাদিতে উপেক্ষা, রন্ধন পরিবেশনাদির সঙ্গে কোন রূপ সংস্রব না রাখিয়া পাচক ব্রাহ্মণ বা বাবুর্চি খানসামার হস্তে সম্পূর্ণ রূপে সেই কার্য্য ন্যস্ত রাখা, পুরুষদিগের সঙ্গে বসিয়া এক টেবিলে মাংসাদি ভোজন করা, স্বামীর সঙ্গে ও সন্তানাদির সঙ্গে মিলিত হইয়া সৎপ্রসঙ্গ এবং পূজা উপাসনাদি না করা, নিজগর্ভজাত স্তন্যপায়ী শিশুকে স্তন্যদান এবং লালন পালনের জন্য বেতনদানে স্বদেশী বা বলাতী ধাত্রী নিযুক্ত রাখা, এ সকল কুৎসিত বিদেশী ভাব ও বিদেশী আচার। মেয়েদের চা-পান ও মাংসভক্ষণ, বিবীদের অনুকরণ, কখনও স্বদেশী নয়। রাজভক্তি ও রাজাজ্ঞাপালন,এদেশের চিরন্তন স্বদেশী ভাব। রাজার নিন্দাচর্চ্চা, রাজপ্রতিনিধি ও রাজপুরুষদিগকে অমান্য করা ঘৃণিত বিদেশী ভাব। বিনয় ভক্তি নম্রতা কৃতজ্ঞতা স্বদেশী; বিবাদ বিসংবাদ দ্বেষ হিংসা ঔদ্ধত্য অকৃতজ্ঞতা তোমার স্বদেশী নয়, বিদেশী জানিবে। পরিবারমধ্যে দেবালয় স্থাপন, নিত্য পূজার্চ্চনা উৎকৃষ্টতম স্বদেশী। সমস্ত গৃহে পূজা উপাসনার জন্য একটুক স্থান নাই, গৃহে পূজার্চ্চনা শাস্ত্রপাঠাদি হয় না, পরিবারমধ্যে কেবল আমোদ গল্প ও তাসক্রীড়া, এইরূপ ধর্ম্মহীন নিরীশ্বর পরিবারকে কে স্বদেশী পরিবার বলিবে? মাতঃ, ভগিনি, আমরা জিজ্ঞাসা করি তুমি কিরূপ স্বদেশী। স্বদেশের ধর্ম্ম ও সুনীতি সদাচারকে পদদ্বারা দলন করিয়া কেবল বিলাতী লবণ না খাইলে ও বিলাতী কাপড় না পরিলে স্বদেশী হওয়া যায় না। বিলাতীবর্জ্জন করিতে চাও, ভালই। চিরদিনের অভ্যস্ত বিলাতী কুনীতি সকল, বিলাতী সভ্যতার স্রোতে যে সকল বিকৃত বিলাসিতা আসিয়াছে সে সকল পরিহার কর, তাহা হইলে ঠিক বিলাতী বর্জ্জন হইবে। জ্ঞান সভ্যতায় সমুন্নত বিলাতের লোকের গুণ সকল গ্রহণ করিবে, তাহা হইলে নানা বিষয়ে উন্নত ও উপকৃত হইবে। তজ্জন্য ভগবান্ অনুন্নত ভারতকে বিলাতের পদতলে স্থাপন করিয়াছেন। তোমার আমার কি সাধ্য যে, সেই অধীনতাশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হই। ইহার ভিতরে ভগবানের শুভাভিপ্রায় দর্শন কর, এবং তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ করিতে যত্ন কর। একদিনও বিলাতের সাহায্য

না পাইলে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে না। বিলাতী বর্জ্জনার্থ যদি প্রতিজ্ঞা করিয়া থাক ইংরাজি লেখাপড়া করিও না, রোগ হইলে ইংরাজি ঔষধ সেবনে বিরত থাকিও, রেলগাড়ীতে চড়িও না। কেন না এ সমুদায়ই বিলাতী জিনিষ। এ সকলের সংস্রব পরিত্যাগ করিতে পারিবে কি? না পারিলে "বিলাতী বর্জ্জন, বিলাতী বর্জ্জন" বলিও না। উপকারীর নিকটে উপকার স্বীকার কর, কৃতঘ্নতা মহাপাপ। স্বেচ্ছানুসারে চলিতেছ, না ঈশ্বরেচ্ছাধীন হইয়া চলিতেছ, একবার স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখ।

ভক্ত কেশবচন্দ্র এক জন প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিক লোক ছিলেন। তিনি স্বদেশের নিষ্ঠা সদাচার কিছুই পরিত্যাগ করেন নাই, বিলাতে যাইয়াও সেদেশের লোকের অসার বাহিক অনুকরণে প্রবৃত্ত হন নাই; এ দেশের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও সে দেশের অন্য বড় বড় লোক তাঁহাকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া নিরামিষ ভোজন করাইয়াছেন। তিনি স্বদেশে বহু বৎসর স্বহস্তে রন্ধন ও সর্ব্বদা শুদ্ধ সাত্বিক ভাবে ভোজন করিয়াছেন, নিত্য সাধন ভজনাদি সমস্ত বিষয়ে স্বদেশীয় স্বজাতীয় বিশুদ্ধ প্রণালী, শুদ্ধতা ও সাত্বিকতা রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার রাজভক্তির তুলনা ছিল না, তিনি ইংরাজজাতির সদ্গুণ সকল যেরূপ সাদরে গ্রহণ, দোষ সকল ঘৃণাসহকারে পরিহার করিয়াছিলেন, এরূপ কে করিতে পারিয়াছেন। তুমি সেই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া চল, তাহা হইলে তোমাকে বলিব তুমি প্রকৃত স্বদেশীপ্রিয়। বিলাতী দোষ ও যাহা কিছু মন্দ তাহা বর্জ্জন কর, তোমার এই রূপ বিলাতী বর্জ্জন হউক, বিলাতী যাহা ভাল যাহা সদ্গুণ দ্বেষ হিংসায় বশবর্ত্তিনী হইয়া সে সকল বর্জ্জন করিলে তোমার দুঃখ দুর্ভাগ্যের সীমা থাকিবে না। জানিও প্রেম ও উদারতা স্বদেশী ভাব। সকল দেশ সকল জাতিকে গ্রহণ করা এদেশের শাস্ত্র। "অয়ংবন্ধুরয়ং নেতি গণনা লঘুচেতসাম্। উদারচরিতানান্ত বসুধৈব কুটুম্বকম্॥" অর্থাৎ ইনি বন্ধু ইনি শত্রু ইহা ক্ষুদ্র চিত্তলোকের গণনা, উদারচরিত্রের পক্ষে সমস্ত পৃথিবীর লোকই আত্মীয়। অতএব তোমরা বিলাতকে পর ভাবিতে পার না। বিলাতের কথা দূরে থাকুক কোন দেশ কোন জাতিকে পর ভাবিবার অধিকার নাই।

স্ত্রীলোকের সীমা অতিক্রম।

জনসমাজে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই একটা নৈতিক সীমা আছে। এই নৈতিক সীমা অতিক্রম করিলে উভয়েরই যে পদস্খলন অনিবার্য্য,তাহার আর সন্দেহ নাই। প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রে উভয়েরই প্রকৃতিবিহিত শাস্ত্রীয় মত শাস্ত্রকারগণ কর্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বর্ত্তমানেও ব্রাহ্মসমাজের নেতা আচার্য্য কেশবচন্দ্র এ সম্বন্ধে একটা বিশেষ সীমা বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু হায়! পাশ্চাত্য পুরুষ ও নারীপ্রকৃতির অনুকরণ করিতে গিয়া যে, আধুনিক

অপরিণামদর্শী হঠকারিতাপ্রিয় ব্রাহ্ম যুবক যুবতীগণ যে একটা সর্ব্বনাশের সূত্রপাত করিতেছেন, ভবিষ্যৎ তাহা সপ্রমাণ করিয়া দিবে। কেশবচন্দ্র মানবচরিত্র ও দেশকাল পাত্রের অবস্থা ও গতি বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি তাই স্ত্রী ও পুরুষের অস্বাভাবিক ও অসতর্ক চাল চলনসম্বন্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই কার্য্য, শিক্ষা ও চাল চলনের যে বিশেষ বিশেষ সীমা, বিশেষ বিশেষ কার্য্য ক্ষেত্র (sphere of works) আছে, কেশব চন্দ্র তাহা জীবনে ও শিক্ষায় বর্ত্তমান বংশকে শিখাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু হায়! বর্ত্তমানে ব্রাহ্মসমাজের বিভাগ ও প্রকোষ্ঠ বিশেষ হইতে স্ত্রী ও পুরুষের "সমান অধিকার" বলিয়া একটা ধূয়া উঠিয়াছে। হঠকারিতাপ্রিয় যুবক যুবতীদিগের মধ্যে সম অধিকারের তরঙ্গ যে কোন্ সীমায় উপস্থিত হইবে তাহা ভাবিয়া হৃৎকম্প উপস্থিত হইতেছে। কিছু দিন পূর্ব্বে একবার মহিলাতে যুবক যুবতীদিগের অযথা মিশ্রণ ও অব্যাহত নির্জ্জন ও সজন আলাপের দূষণীয়তা আলোচিত হইয়াছে, কিন্তু সেই তীব্র প্রতিবাদে সেই তরঙ্গাবেগ যে মন্দীভূত হইয়াছে তাহা নহে, বরং সেই তরঙ্গ আরও ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। ধর্ম্মজীবনে সম অধিকার এক, আর পাশ্চাত্যানুকরণে সম অধিকার আর এক স্বতন্ত্র বস্তু। মহাদেব ও পার্ব্বতী হিমালয়ে যুগল সাধন করিয়াছিলেন, রাজর্ষি রাম ও আদর্শ সতী সীতা সম অধিকার লাভ করিয়া উচ্চ দাম্পত্য ও উচ্চ একাত্মতা সাধন করিয়াছিলেন। হায়! এখন সে উচ্চ সম অধিকার কোথায়। যুবক যুবতীগণ অব্যাহত মিশ্রণ, অব্যাহত আলাপ অব্যাহত স্বাধীন বিচরণ করিয়া পাশ্চাত্য অনুকরণের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে পারিলেই সম অধিকার সাধনব্রতের উদ্‌যাপন উপলব্ধি করেন। স্ত্রী পুরুষের মিশ্রণের সীমা আছে, স্ত্রী পুরুষের শিক্ষার সীমা আছে, এবং স্ত্রী পুরুষের নির্দ্দিষ্ট স্থান (Province) আছে। সাধারণ প্রাণিবিশেষের মধ্যেও এ সম্বন্ধে বিশেষত্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে। এ বিশেষত্ব বিশেষ রূপে বুঝিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে, যে শিক্ষার প্রভাবে পুরুষ জাতি উন্নত হইতেছে, সে শিক্ষার প্রভাবে নারীজাতির শারীরিক ও মানসিক অবনতি হইবে। বর্ত্তমান ইউনিভার্সিটী-শিক্ষার প্রভাবে আজ আমাদিগের পরিবারে কত যুবতীর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছে, কত জনের চক্ষুর দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে, কত জন অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছেন। গৃহকার্য্য ইহাদিগের নিকট অত্যন্ত নিন্দনীয় হইয়া পড়িয়াছে। আচার্য্য কেশবচন্দ্র স্ত্রীশিক্ষার যে আদর্শ পথ দেখাইয়া গিয়াছিলেন তাহা কয়জন অনুকরণ করিতেছেন? স্ত্রীজাতি আদর্শ ভগিনী, আদর্শ মাতা ও আদর্শ পত্নী হইবেন, কেশবচন্দ্র এই উচ্চ শিক্ষা দান করিয়া গিয়াছেন। হায়! বর্ত্তমান মহিলাগণ এই রেখা অতিক্রম করিয়া কত দূর চলিতে বসিয়াছেন তাহা এখন ভাবিবার বিষয় হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় আর ইহাদিগের কুলাইতেছে না। বিলাতে গিয়া অধ্যয়ন করিবার জন্য কতকগুলি মহিলা বড় ব্যস্ত

হইয়া পড়িয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করি ভারতবর্ষে কি ইহাদের শিখিবার কিছু নাই ? আমার মনে আছে যে, এক সময়ে আমাদের পরম ভক্তিভাজন স্বর্গগত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কোন যুবক ব্রাহ্মের বিদ্যা শিক্ষার্থ ইংলণ্ড গমনের কথা লইয়া বলিয়াছিলেন যে, "আমি আমাদের যুবকদিগকে ইংলণ্ড গমন করিতে বলি না।" আজ সেই প্রলোভন পূর্ণ ইংলণ্ড ভূমিতে গমন করিবার জন্য মহিলাগণও ব্যস্ত। পিতা মাতার তত্বাবধানে থাকিয়াও কন্যা দিগের অসতর্ক পাদবিক্ষেপ বিপদের কারণ হইয়া উঠিতেছে, আর বিশেষ অভিভাবক-শূন্য অরক্ষিতাবস্থায় যুবতী কেন যুবক দিগেরও ইংলণ্ডে গমন যে, কত বিপজ্জনক তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। শ্রদ্ধেয় প্রতাপ বাবু ৩।৪ বার ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ ও পৃথিবী বেষ্টন করিয়া আসিয়াছেন সেই পাশ্চাত্য জনসমাজ ও পাশ্চাত্য আচার ব্যবহার ও পাশ্চাত্য রীতি নীতিবিষয়ে প্রতাপচন্দ্রের উপদেশও উপেক্ষিত হইতে চলিল। অধিকদূর যাইতে হইবে না গৃহের বাহিরে রেলপথে ও অপরাপর স্থানবিশেষে অরক্ষিতাবস্থায় নারীদিগের প্রতি যে কি অত্যাচার সংঘটিত হইতেছে, হে স্বাধীনতাপ্রিয় ব্রাহ্মগণ তাহা কি তোমরা দেখিতেছ না ? অসতর্কতা আমাদিগের পরিবারেও কত কলঙ্ক আনিয়াছে, তাহা কি তোমরা জান না ? যদি সম অধিকার স্বীকার করিতে হয় তবে তাহা উচ্চ ধর্ম্মজীবনে স্বীকার কর। সম অধিকারের অর্থ পাশ্চাত্য অনুকরণ নহে, সম অধিকারের অর্থ অব্যাহত ও অযথা মিশ্রণ, অযথা আলাপ ও অসতর্ক বিচরণ নহে। ইহার অর্থ অত্যন্ত উচ্চ ও স্বর্গীয়। তাই বলিতেছি সতর্কতার সময় আসিয়াছে। অসতর্কতা পরিবারে কলঙ্ক আনয়ন করিবে। আমি যে এত কথা বলিয়া আসিলাম ইহাতে ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ নাই, পরিবারের হিতসাধনই এক-মাত্র স্বার্থ। G.P.M.

আমাদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

বর্ম্মদেশ।

৪র্থ।

বর্ম্মদেশীয় রমণী ও বিবিধ বিষয়।

আমরা মেগুালয় নগর হইতে গত ১৪ই ফাল্গুন সোমবার প্রত্যূষে পীনমানাতে প্রত্যাগত হই। পীনমানা নগরে তত্রত্য উকিল শ্রীমান্ বসন্তকুমার হালদারের সাদর আতিথ্য গ্রহণে আমরা অনেক দিন যাপন করিয়াছি, সেই সপ্তাহেই পীনমানা পরিত্যাগ করিয়া টাঙ্গু নগরে যাইব, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। আমরা পীনমানার পথে ঘাটে হাটে বাজারে শত শত বর্ম্মদেশীয় রমণী দেখিয়াছি। বসন্তকুমার তথাকার বড় উকীল, প্রত্যহ অনেক নারী মওক্কেলরূপে মোকদ্দমার অবস্থা বর্ণন ও তাঁহার উপদেশ এবং পরামর্শ গ্রহণজন্য তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইতেন ; গৃহকর্ত্রী সে দেশীয় ভাষায় অনর্গল কথোপকথন করিতে পারেন, সে জন্য সে দেশীয় অনেক ভদ্র বংশীয় নারী তাঁহার নিকটে যাইয়া নানা বিষয়ে গল্প

করিতেন। আমরা এই সুযোগে তাঁহাদের আকার প্রকার ভাবগতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, এবং গৃহিণীর মুখে তাঁহাদের আচার ব্যবহারাদিবিষয়ে অনেক কথা শুনিয়াছি। তাঁহাদের বিজাতীয় স্বাধীনতার কথা গত ফাল্গুন মাসে বিবৃত হইয়াছে। এবার বর্ম্মদেশীয় রমণীদের আকৃতি প্রকৃতি আচার ব্যবহার ইত্যাদি কিরূপ বলা যাইতেছে ;—

বর্ম্মদেশের রমণীগণ সাধারণতঃ গৌর-কান্তি, মধ্যমাকার, তাহাদের ললাট দেশ ও নাসিকা ঈষন্নিম্ন মুখমণ্ডল মণ্ডলাকার ও প্রফুল্ল, চিকুরপুঞ্জ ঘন কৃষ্ণবর্ণ। তাহারা মস্তকের মধ্যস্থলে কবরী বন্ধন করে, অনেকে উদ্যানজাত সদ্যপ্রস্ফুটিত কুসুমে বা কৃত্রিম পুষ্পে কবরীর শোভা বর্দ্ধন করিয়া থাকে। একান্ত স্থূলাঙ্গী বা ক্ষীণাঙ্গী, নিতান্ত খর্ব্বাঙ্গী বা দীর্ঘাঙ্গী নারী সেদেশে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না, অনেক যুবতী পরম রূপবতী। তাহারা "লুঙ্গী" বা "লুঙ্গী" নামক পরিচ্ছদ পরিধান করে, উহা তকিয়ার খোলের ন্যায় সিলাই করা, স্থূল রঙ্গিণ বস্ত্রে প্রস্তুত হয়। তদ্দ্বারা কটীদেশ হইতে পাদমূল পর্য্যন্ত উত্তমরূপে আচ্ছাদিত থাকে। তাহাদের বক্ষঃস্থল গলদেশ হইতে কোমর পর্য্যন্ত ইঙ্গিনামক পরিচ্ছদে আবৃত হয়, ইঙ্গি সচরাচর উৎকৃষ্ট সাদা কাপড়ে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঢিলা জ্যেকেটের সঙ্গে ইঙ্গিনের কতকটা সাদৃশ্য আছে। দৈর্ঘ্যে ৪। ৫ হস্ত, পরিসরে প্রায় দেড় হস্ত পরিমিত সুচিক্কণ পট্টবস্ত্র তাহারা গলদেশের উভয় পার্শ্ব দিয়া উত্তরীয় বস্ত্ররূপে বক্ষঃস্থলে ঝুলাইয়া থাকে। উহাকে "পোওয়া" বলে। পুরুষেরা উক্ত "পোওয়া" ক্ষুদ্র উষ্ণীষাকারে মস্তকে বন্ধন করে। মেয়েরা সর্ব্বদা মস্তক অনাবৃত রাখে। ধনসম্পন্ন মহিলারা রেশমী কাপড়ের ইঞ্জি ও লুঙ্গি পরিধানকরিয়া থাকেন। সে দেশের রমণীগণ সাধারণতঃ এই ত্রিবস্ত্রমাত্র ব্যবহার করে, নিম্ন শ্রেণীর শ্রমজীবী স্ত্রীলোকেরা পোওয়া প্রায় ব্যবহার করে না, তাহারা কোনরূপ অলঙ্কার পরে না। সম্পত্তীশালী পরিবারের যুবতীগণ কর্ণযুগলে হীরার অলঙ্কার, হস্তে সোণার চুড়ীমাত্র পরিয়া থাকে। অলঙ্কার পরিধানে তাহাদের কোন আড়ম্বর নাই। রূপবতী যুবতীরা শুভ্র চূর্ণ (পাউডার) বিশেষে কপোল যুগল রঞ্জিত করিয়া থাকে। প্রায় কোন রমণী শূন্য পদে চলে না, তাহারা ফানা নামক এক প্রকার সুকোমল চটীজুতা ব্যবহার করে। অনেক ফানা উৎকৃষ্ট মথমলে জড়িত হয়। আতপতাপ ও বর্ষার জল নিবারণজন্য মোমজামের বিচিত্র আতপত্র সর্ব্বদা তাহাদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়। প্রায় এক ফুট লম্বা মোটা মোটা ভয়ঙ্কর চুরুট তাহাদের হস্তে বিধৃত, বা মুখে সংলগ্ন সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়। ভদ্র মহিলাদের মধ্যে প্রায় সকলেই অল্পাধিক লেখা পড়া জানেন। তদ্দেশীয় লোকের মধ্যে উচ্চজাতি ও নীচজাতি বলিয়া জাতিভেদ নাই। সকলেই এক জাতি। উচ্ছিষ্ট জ্ঞান ও অন্নবিচার নাই।

বর্ম্মদেশের রমণীগণ কেবল গৃহকর্ম্ম নয়, হাট বাজার ব্যবসায় বাণিজ্যাদি সমুদয়

কার্য্য করে, সর্ব্বদা কাজকর্ম্মে ব্যস্ত থাকে। তাহারা রাজপথ দিয়া চলিবার সময় উভয় বাহু ঝুলাইয়া সবেগে চলিয়া থাকে। তাহাদের স্ত্রী পুরুষের uniform dress (একবিধ পরিচ্ছদ)। বাঙ্গালী জাতির ন্যায় তাহাদের নানা প্রকার পরিচ্ছদ নাই। কলিকাতার রাজপথে দৃষ্টি করিয়া যেমন দেখাযায় কোন বাঙ্গালী যুবা হ্যাট কোট পরিয়া সাহেব সাজিয়া সবেগে চলিয়াছেন, কাহারও পরিধানে পেণ্টুলন চাপকান টুপি, কেহ বা কালাপেড়ে সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিয়া স্কন্ধদেশে মিহি চাদর স্থাপন করিয়া আদুল গায়ে ছুটিয়াছেন, কাহারও কাহারও হাঁটুর উপরে কাপড় ও কোমরে চাদর জড়ান, সকলেই কোঁচা কচ্ছধারী, সকলের মস্তক নগ্ন, বক্ষঃস্থল অনাবৃত। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন বিচিত্র বেশের বাঙ্গালী পুরুষ রাস্তায় ছুটাছুটি করিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক মেয়ের বক্ষঃস্থল কামিজে আবৃত, অনেকের কামিজ নাই, পরিধেয় বস্ত্রাঞ্চলে বুক ঢাকা, কাহারও মস্তক বস্ত্রাচ্ছাদিত, কাহারও বা মস্তক মুক্ত, এদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ বিভিন্ন বেশ বর্ম্ম দেশের স্ত্রী পুরুষদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। জানানার জন্য ভদ্র বাঙ্গালী মেয়েরা রাস্তায় বড় বাহির হন না।

সেদেশের পুরুষগুলি প্রায়ই অলস অকর্ম্মণ্য নেশাখোর,তাহাদিগকে স্ত্রীর ধামা ধরা বলা যায়। এদেশে যেমন স্বামী অন্ন বস্ত্রাদি দানে স্ত্রীকে প্রতিপালন করে, সে দেশে তদ্বিপরীত, অনেক স্ত্রী অর্থোপার্জ্জন করিয়া স্বামীকে প্রতিপালন করিয়া থাকে। যাহাকে বিবাহ করিলে অর্থোপার্জ্জন করিয়া চিরকাল সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিতে পারিবে এইরূপ বিবেচনা করিয়া অনেক পুরুষ বিবাহের জন্য স্ত্রী মনোনীত করে। ভদ্র ঘরের অনেক মেয়ে দোকান পশার চালাইয়া বেশ দুই টাকা উপার্জ্জন করেন। অন্ন বস্ত্রাদি যোগাইয়া সুখ স্বচ্ছন্দে প্রতিপালন করিতে হইবে ভয়ে অনেক রমণী স্বদেশীয় অকর্ম্মণ্য পুরুষদিগকে পতিত্বে বরণ করিতে প্রস্তুত নয়। তাহারা সাহেবদিগকে বা অন্য বিদেশীয় পুরুষদিগকে বিবাহ করে। বর্ম্মদেশে অনেক উচ্চ পদস্থ ইংরাজের গৃহে সে দেশীয় স্ত্রী দেখিতে পাওয়া যায়। বহুকাল হইতে বর্ম্মদেশীয় নারীদের বিদেশীয় পুরুষদিগের সঙ্গে যোগ হইতেছে, এবং তাহাদের গর্ভে সন্তান জন্মিতেছে, এইরূপে বর্ম্মদেশে এক প্রকার মিশ্র জাতির উৎপত্তি হইতেছে। নিম্ন বর্ণেই এই প্রকার সঙ্কর বিবাহ অধিক হয়। মনে হয় কালে বর্ম্মদেশে এই সূত্রে খাঁটি বার্ম্মিজ জাতি বিলুপ্ত হইবে।

বর্ম্মদেশীয় স্ত্রীলোকেরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, তাহারা ঘর বাড়ী পরিষ্কার রাখে। প্রায় সকলেই দারু-নির্ম্মিত গৃহে বাস করে। ঘরের মেজে ভূমির সঙ্গে সংলগ্ন থাকে না। ২।৩ হাত উচ্চ খুঁটির উপর গৃহের পত্তন হইয়া থাকে। গৃহ দ্বিতল ত্রিতলও হয়, অনেক গৃহের কাঠের উপর নানা কারুকার্য্য হইয়া থাকে। রমণীগণ প্রত্যুষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াই রন্ধন করেন। প্রাতঃকালে ও

বিকালে সকলের পূর্ণ ভোজন হয়। আমাদের ন্যায় তাহাদের মাধ্যাহ্নিক ভোজন পূর্ণ ভোজন নয়, রাত্রিতে ভোজন করার নিয়ম নাই। তবে দিবাভাগে তাহারা পুনঃ পুনঃ অনেক বার কিছু কিছু আহার করে; অনেক প্রকার কচি পাতা কাঁচাই ভক্ষণ করে, ভাতের সঙ্গেও তাহা খায়। বাঙ্গালীর ন্যায় অন্নই তাহাদের প্রধান খাদ্য। তাহারা ডাইল বা তরকারির ডালনা ইত্যাদি পছন্দ করে না। সকলেই অতিশয় মৎস্য-মাংসপ্রিয়। গো বরাহ ছাগ মেষ হংস কুক্কুটাদি সকল প্রকার পশু পক্ষীর মাংস তাহাদের মুখে সুখাদ্য। মৃত ঘোটকাদির মাংসভক্ষণেও তাহাদের অরুচি নাই। তাহাদের পক্ষে পৃথিবীতে অখাদ্য কিছুই নাই, এক প্রকার বলা যায়। শুটকি মাছ, লোণা মাছ ও পচা মাছ তাহাদের অতি প্রিয় সামগ্রী। চূণো মাছ পচাইয়া নপ্পি নামক তাহাদের অতি উপাদেয় অন্নোপকরণ প্রস্তুত হয়। নপ্পি প্রস্তুতির প্রণালী এই ;—ক্ষুদ্র মৎস্যপুঞ্জ লবণ-মিশ্রিত করিয়া ঢেঁকিতে কুটিয়া লইতে হয়, পরে বড় বড় হাঁড়ীর মধ্যে তাহা রাখিয়া পচান হইয়া থাকে। পচিলে উহার এরূপ তীব্র দুর্গন্ধ হয় যে, নিকটে যাইতেও আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া থাকে। ইহাই নপ্পি। কিছুদিনের মধ্যে নপ্পিতে রাশি রাশি পোকা জন্মে। এই নপ্পি না হইলে বর্ম্মবাসী স্ত্রী পুরুষের খাওয়াই হয় না। তাহারা সর্ষপ তৈল ব্যবহার করে না; সর্ষপ তৈলের যোগে ব্যঞ্জনাদি দুর্গন্ধ ও অখাদ্য হয় বলে। ঘৃত দুগ্ধাদি গব্যদ্রব্য তাহাদের অখাদ্য। তাহারা ঘৃতের পরিবর্ত্তে ব্যঞ্জনাদিতে কিছু কিছু নপ্পি ব্যবহার করে। সেদেশী রমণীদিগের আহার এরূপ জঘন্য, কিন্তু তাহাদের হস্তে প্রস্তুত বিশেষ বিশেষ শিল্প দ্রব্য বিস্ময়জনক। পাঠিকা, তুমি তাহা দেখিলে হয়তো চমকৃত হইয়া বলিবে এই কারুকার্য্যযুক্ত অতি সূক্ষ্ম সুন্দর জিনিষ বুঝি পরির হাতে তৈয়ার হইয়াছে! বর্ম্মদেশে নপ্পির লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসায় বাণিজ্য চলিয়াছে। রেঙ্গুণে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হইলে পর নপ্পির দুর্গন্ধে প্লেগ বৃদ্ধি হইতেছে ভাবিয়া গবর্ণমেণ্ট নপ্পির গুদাম সকল বন্ধ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। সে দেশীয় সমুদায় স্ত্রী পুরুষ তাহাতে বিষম আপত্তি উপস্থিত করিয়া এরূপ আবেদন করে যে, নপ্পি চিরকাল এদেশীয় লোকের আহারে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে, পূর্ব্বে কখনও প্লেগ হয় নাই। প্লেগ অন্য কারণে হইতেছে। নপ্পি না হইলে আমাদের আহার এক প্রকার বন্ধ হইবে। নপ্পির ক্রয় বিক্রয় যেন বন্ধ না হয়। পরে গবর্ণমেণ্ট সেই আদেশ রহিত করিতে বাধ্য হন।

সভ্য সাহেব বিবীদিগের অনেক প্রকার খানার দুর্গন্ধে ভূত পলায়ন করে। বাঙ্গালী সাহেব ও বাঙ্গালী মেম সাহেবগণ তাহার স্বাদগ্রহণের জন্য লালায়িত। তবে বর্ম্ম দেশীয় লোকদিগের প্রিয় খাদ্য নপ্পির তত নিন্দা কেমন করিয়া হইতে পারে? একদা আমরা বঙ্গোপসাগরের বক্ষঃস্থিত কুতবদিয়া দ্বীপে গিয়াছিলাম। সে স্থানে জেলেরা সাগরতীরে খোলা মাঠে রাশি রাশি চূণো চিঙ্গড়ী মাছ ও লৈটা মাছ রৌদ্রে শুকাইয়া

থাকে। এক দিন বেড়াইতে বেড়াইতে উহার নিকটে যাইয়া আমাদিগকে দুর্গন্ধে নাক টিপিয়া দৌড়িয়া পলায়ন করিতে হইয়াছিল। শ্রুত হইল সেই সকল মাছ নপ্পি প্রস্তুত করার জন্য পুঞ্জে পুঞ্জে বর্ম্মদেশে চালান হয়। পূর্ব্ব বঙ্গের নানা স্থানে নৌকা ও মালগাড়ীযোগে শুট্‌কি (শুষ্ক) মাছ চালান হইয়া থাকে। দুর্গন্ধের জন্য সেই সকল নৌকা ও গাড়ীর নিকটবর্ত্তী হওয়া আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য।

বর্ম্মদেশীয় গৃহিণীদিগের রন্ধন প্রণালী আমরা এবার পাঠিকাদিগকে উপহার দিতে পারিলাম না, অন্য সময়ে চেষ্টা করিতে পারি। পাঠিকাগণ উক্ত প্রণালীমতে ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া স্বাদ গ্রহণ করিয়া দেখিবেন। তাহাদের ব্যঞ্জনে প্রচুর লশূন পলাণ্ডুর যোগ হয়,এবং বিশেষ ভাবে নপ্পির প্রয়োগ হইয়া থাকে। নপ্পির বর্ণনা পাঠ করিয়া অনেক পাঠিকার মনে হয় তো ঘৃণার উদ্রেক হইবে এবং তাঁহারা বর্ম্মদেশীয় রমণী দিগকে অসভ্য জঘন্য পিশাচী বলিয়া গাল দিবেন। কিন্তু একবার তাঁহারা ভাবিয়া দেখুন দেখি, পূর্ব্ববঙ্গনিবাসী স্ত্রী পুরুষ কিরূপ দুর্গন্ধ শুট্‌কি মৎস্য সাদরে ভক্ষণ করেন। সে দেশে শুষ্ক মৎস্যকে শুট্‌কি বা শোড়া মাছ বলে। চট্টগ্রামের লোকেরা তাহাদের প্রিয় খাদ্য শুষ্ক লৈটা মাছকে লৈটাহুংনি বলেন। লৈটা মাছ একটু পচিলেই নাসিকা-বিনিঃসৃত শুভ্র শ্লেষ্মা-পুঞ্জের ন্যায় লক্ষিত হয়, তাহার অসহ্য তীব্র দুর্গন্ধ। লৈটাহুংনি যে বাজারে বিক্রয় হয়, দুর্গন্ধে তাহার পাশ দিয়াও আমরা যাইতে পারি না। সেই লৈটাহুংনি চট্টগ্রামনিবাসী স্ত্রীলোকদিগের অতি উপাদেয় খাদ্য। পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র বর্ষাকালে প্রচুর পরিমাণে দুর্গন্ধ শুট্‌কি মাছের আমদানি হয়। সে দেশের লোকেরা পলাণ্ডু লশুন সংযুক্ত শুট্‌কি মাছের ডালনা আদরপূর্ব্বক ভক্ষণ করে। তবে ভদ্রশ্রেণীর অল্প লোকেই তাহা খান। আমাদের এক জন মৎস্যমাংসপ্রিয় হাকিম আত্মীয় আছেন, তিনি এক মাত্র শুটকি মাছের ডালনার সাহায্যে একটি থালাপূর্ণ ভাত খাইতে পারেন। শুট্‌কি মাছের ডালনা যোগে ভোজনের সময় ২।১ জন বন্ধুকে আদর পূর্ব্বক সঙ্গে বসাইয়া তিনি সেই উপাদেয় সামগ্রী ভোজন করেন।

পূর্ব্ববঙ্গে টেঙ্গরা পুঁটী ইত্যাদি ছোট মৎস্যে যে শুট্‌কি প্রস্তুত হয় তাহাকে চেপা শুট্‌কি বলে; উহার দুর্গন্ধে আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। সেই চেপা শুট্‌কি তথাকার নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের প্রিয় খাদ্য। সে দেশের পল্লীগ্রামবিশেষে একটী স্ত্রীলোক ছিলেন, হাটে বা বাজারে কোন লোক যাইতেছে দেখিলে, তিনি তাহাকে অনুরোধ করিতেন,"ওগো আমার লাগি দুই পয়সার কুইয়া মাছ এনগো।" পচা দুর্গন্ধ মাছকে সে দেশের লোকেরা "কুইয়া" মাছ বলে। তিনি কুইয়া মাছের বড় ভক্ত ছিলেন। এক এক দেশের লোকের পচা সড়া দুর্গন্ধ মৎস্য মাংস খাওয়ায় বিশেষ প্রবৃত্তি। ইহাকে পৈশাচিক প্রবৃত্তি বলা যায়। সুখের বিষয় পশ্চিমবঙ্গের মেয়েরা দুর্গন্ধ শুট্‌কি মাছ ভাল বাসেন না,

এদেশের হাট বাজারে শুট্‌কি বিক্রয় হয় না। এদেশীয় মহিলারা শুট্‌কি মাছ ভক্ষণ করেন না সত্য, কিন্তু তাঁহাদের আহারে একটি জঘন্য অসভ্যাচার হইয়া থাকে। তাঁহারা লাউ কাঁকড়ার ডালনার বড় ভক্ত। শুনিয়াছি অনেকে অবস্থা বিশেষে গুগ্‌লি পোকাও খান। কাঁকড়া বহুপদবিশিষ্ট বিকটাকার জলচর কীট-বিশেষ। বিবাহের গাহলুদের দিন মহিলা-ভোজে কাঁকড়ার ঝোল বা লাউকাঁকড়ার ডালনা না হইলে উৎকৃষ্ট ভোজনই হয় না। একদা পশ্চিমাঞ্চলে নগরবিশেষে একটি সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী ব্রাহ্মপরিবারে কন্যার বিবাহ হয়, কন্যাকর্ত্রীর ফরমাইস মতে কলিকাতা হইতে একজন ব্রাহ্মবন্ধু পুঞ্জ পরিমাণে বড় বড় কর্কট প্যাক করিয়া তথায় পাঠাইয়া দেন। সেগুলি পথেই মরিয়া পচিয়া ভয়ানক দুর্গন্ধ বিস্তার করে। এই দুর্গন্ধ পচা কাঁকড়ার দ্বারা লাউ কাঁকড়ার ডালনা প্রস্তুত হইয়া গাহলুদের দিনে মহিলা ভোজনে ব্যবহৃত হইয়াছিল। এরূপ আহার কি সভ্যতানুমোদিত। ক্ষমা করিবেন, পশ্চিম বঙ্গের মেয়েদের পক্ষে এই প্রকার কুলীর-ভক্ষণ গৌরবের বিষয় নহে। "জীবে দয়া নামে ভক্তি কর জীবনের সার ওরে মন আমার।" কাঁকড়াগুলিকে এই প্রকার নিষ্ঠুর ভাবে যন্ত্রণা দানে বধ করিয়া ভক্ষণ করাতে কি ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাদিগের জীবনে উক্ত ব্রহ্মসঙ্গীতোক্ত জীবে দয়ার সার্থকতা হয়? না সেই পচা কাঁকড়াগুলি খাইয়া পবিত্র ভাবের পরিচয় হইয়াছে? কলিকাতার এক জন মেছনী কাঁকড়ার বড় ঠেঙ্গগুলি ছিঁড়িয়াছিল বলিয়া জীবের প্রতি নিষ্ঠুরতানিবারিণী সভা হইতে তাহার অর্থ দণ্ড হইয়াছিল।

প্রসঙ্গক্রমে আমরা বর্ম্মদেশ ছাড়িয়া অনেক দূরে চলিয়া আসিয়াছি; পুনর্ব্বার সেদেশে গমন করিতেছি। বৌদ্ধ ধর্ম্মে জীব হত্যা নিষিদ্ধ। কিন্তু অপর লোকে পশু পক্ষী মারিলে সে সকলের মাংসভক্ষণে বর্ম্মদেশীয় বৌদ্ধদিগের আপত্তি নাই। তাহাতে জীবহত্যাপাপের ভাগী হইতে হয় তাহারা এরূপ মনে করে না। বহু জালজীবী বৌদ্ধ আছে। তাহারা মাছ ধরিয়া বিক্রয় করে। তাহাদের হস্তে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সহস্র সহস্র মৎস্যের মৃত্যু হয়, বোধ করি তাহারা মাছকে জীবের মধ্যে গণ্য করে না। বর্ম্মদেশীয় স্ত্রীপুরুষ অতিশয় তাম্বুলপ্রিয়, সর্ব্বদা পান খায়, পান সাজাইয়া খায় না; যখন উহা চর্ব্বণ করিতে হইবে তখন তাহার সঙ্গে গুবাক চূর্ণযুক্ত করিয়া মুখে অর্পণ করে। তাহারা পানের সঙ্গে তামাকু পাতা খাইয়া থাকে, অন্য মসলা ব্যবহার করে না। শ্রুত হইয়াছি, পুরুষেরা মদ্যপান করে, কিন্তু মাতাল কখনও দেখা যায় নাই। গৃহে অতিথি অভ্যাগত উপস্থিত হইলে, গৃহিণীগণ অতিথির প্রতি আদর সমাদর ও প্রীতিসদ্ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। তাঁহাদের আতিথ্য সৎকার প্রশংসনীয়। কিন্তু কোন বাঙ্গালী বাবু অতিথি হইয়া তাহাদের গৃহে স্থিতি করিবেন সাধ্য কি? তাঁহাকে নপ্পির দুর্গন্ধে ত্রাহি ২ করিয়া ছুটিয়া পলাইতে হইবে। তাহাদের বাস গৃহে ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠ

অধিক নাই। একটা হলে ভিন্ন২ মসারি টাঙ্গাইয়া তাহার ভিতরে পরিবারস্থ এক এক দম্পতী রাত্রি যাপন করে, সেই মশারিই ভিন্ন ভিন্ন কুঠরীর কার্য্যনির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

একদা আমাদের পীনমানার মায়ের নিকটে দুইটী বর্ম্মদেশীয় যুবতী বসিয়া অবিশ্রান্ত কথা বার্ত্তা কহে ও হাসা করে। তাহারা চলিয়া গেলে পর আমরা গৃহকর্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ইহারা এত কথা কি বলিল, এবং এত হাসিল কেন? তিনি বলিলেন,"আমি যে, তাহাদের ভাষায় অনর্গল কথা কহিয়া থাকি ইহা দেখিয়া তাদিগের বড় আনন্দ হইয়াছে, তাই তারা হাসিতে হাসিতে বলিয়াছে,"তুমি আমাদের দেশী হইয়াছ, আমাদের গুরু ফুঙ্গিকে ভক্তি করিও, আমাদের ঠাকুর ফয়াকে পূজা দিও।" তিনি বলিলেন, "এদেশের মেয়েরা বড় সরল ও প্রফুল্ল সর্ব্বদা হাসা করে।" কিন্তু সাধারণতঃ বর্ম্ম দেশীয় মেয়েদের ক্রোধ অত্যন্ত প্রবল, স্বামী অন্যায়াচরণ করিলে অনেকে হঠাৎ রেগে তাহার পিটে জুতা পিটিয়া থাকে. ক্রোধ বশতঃ স্বামীকে পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। আমাদের দেশে কন্যাদায়গ্রস্ত কন্যাকর্ত্তা যেমন ২। ৪ হাজার টাকা বরদক্ষিণাদানে স্বীয় ক্ষুদ্র বালিকাকে বিবাহ দিয়া কোনরূপে দায়মুক্ত হন,এখানে সেরূপ কন্যাদায়গ্রস্ত কন্যাকর্ত্তা দেখিতে পাওয়া যায় না। সেদেশের কন্যা স্বাধীন ভাবে স্বয়ং স্বামী মনোনীত করে, স্বামীর উপর তাহার পূর্ণ প্রভুত্ব। পীনমানাতে আমাদের প্রতিবেশী একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের চাকর বাজার করিতে যাইয়া একটী দোকানদার মেয়ের সঙ্গে পয়সা লইয়া গোলযোগ করিয়া ছিল। মেয়েটী পায়ের ফানা (চটিজুতা বিশেষ) খুলিয়া তাহাকে এমন মার মরিয়াছিল যে, উহা চির জীবন তাহার স্মরণে থাকিবে।

পীনমানা বর্ম্মরাজের রাজত্বকালে একটি ডিষ্ট্রিক্ট ছিল, ইহাকে অপার বর্ম্মার সীমান্ত নগর বলা যায়। ব্রীটিশ শাসনাবধি ইহা সবডিভিশনে পরিণত, ইমেদিন নগর ডিষ্ট্রিক্ট হইয়াছে। পীনমানাতে ২০। ২৫ হাজার লোকের বাস। এস্থানে বঙ্গদেশের ন্যায় সর্ব্ববিধ ফল তরকারি পাওয়া যায়। কেবল পটল দুষ্প্রাপ্য। এস্থানের কলা উৎকৃষ্ট, নগরের ইতস্ততঃ শত শত নারীকেল বৃক্ষ। বড় বড় ডাব পাওয়া যায়. কিন্তু এক একটি ডাবের মূল্য সাত আট পয়সা। বৈশাখ মাসেই আম পাকে, প্রায় বৈশাখ মাসেই তাহা নিঃশেষিত হয়। এস্থানে উৎকৃষ্ট আনারস পাওয়া যায়।

নগর প্রান্তে ফয়া-চাওঁয়ের পার্শ্বে সপ্তাহ ব্যাপিয়া প্রতি মাঘ মাসে বৃহৎ মেলা হয়। মেণ্ডালয় হইতেও যুবতীরা আসিয়া এই মেলাতে দোকানপশার খুলিয়া থাকে। মেলার সময় আমরা তথায় উপস্থিত ছিলাম, দুইদিন মেলা দেখিতে যাওয়া হইয়াছিল, এক দিন মেয়েরাও গিয়াছিলেন। আমরা সেই মেলা হইতে দুই জোড়া ফানা এবং সে দেশের মেয়েদের ব্যবহার্য্য মোমজামার একটি সুন্দর ছত্র খরিদ করিয়া আনিয়াছিলাম। মেলার কয়েক দিন দিবা রাত্রি সে দেশীয়

নাট্যাভিনয় হইয়াছিল; একদিন ৩।৪ মিনিট তাহা দর্শন করা গিয়াছিল। পূর্ণিমা দিবস মেলা সমাপ্ত হয়, সেই দিন অপরাহ্নে দুই জন ফুঙ্গির মৃতদেহ মহাসমারোহে মেলাক্ষেত্রে পোড়ান হইয়াছিল। সাধারণ বৌদ্ধদিগের মৃতদেহ মৃত্তিকানিম্নে প্রোথিত করা হয়, কিন্তু ধর্ম্মযাজক ফুঙ্গিদিগের শব পোড়ান হইয়া থাকে। উক্ত দুইটি শব দুইটি কফিনে পূরিয়া বৎসরাবধি গৃহে রাখা হইয়াছিল। সেই মাঘমাসের পূর্ণিমারূপ বিশেষ তিথিতে সকলে মিলিয়া মহা ঘটা করিয়া তাহা পোড়াইয়া ফেলেন। আমরা পোড়াইবার সময় উপস্থিত ছিলাম। কাগজ ও বাখারিযোগে দুইটি উচ্চ গৃহ নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। সেই দুই গৃহের ভিতরে উক্ত দুইটি কফিন স্থাপন করিয়া অনল-সংযোগে গৃহ দুইটি ভস্মীভূত করা হয়, সেই সঙ্গে কফিন সহ ফুঙ্গির দেহও দগ্ধ হয়। মেলার সপ্তাহে প্রায় প্রতিদিন অপরাহ্নে নগর প্রান্তস্থিত ঝিলের তীরে ঘোড় দৌড় হইয়াছিল। বর্ম্মদেশের টাটু মাহবেগগামী দৃঢ় খর্ব্বকায়। এখানকার অশ্বারোহিগণও প্রসিদ্ধ। অশ্ব চালকগণ আপন আপন নৈপুণ্যানুসারে পুরস্কার পাইয়াছিল।

যে সকল অবস্থাপন্ন নগরবাসীর গৃহ পথপ্রান্তে, তাহাদের গৃহের সম্মুখভাগে পথিকদিগের তৃষ্ণানিবৃত্তির জন্য জলছত্র স্থাপিত,অনেক স্থানে বিদেশী পথিকদিগের রাত্রিযাপনজন্য পান্থনিবাস বিদ্যমান। বর্ম্মদেশীয় বৌদ্ধদের ইহাতে অতিশয় দয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। দেশীয় রাজার রাজত্বকালে প্রজাদের স্বাধীনতা ছিল না, সর্ব্বত্র দস্যুভয় ছিল। ব্রীটিশ শাসনে তাহারা পরমসুখে আছে, তাহাদের অবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছে।

আমাদের অবস্থিতিকালে পীনমানাতে প্লেগের প্রাদুর্ভাব ছিল। প্রত্যহ অপরাহ্নে ২।৩টী বৌদ্ধের মৃত দেহের অন্তেষ্টিক্রিয়ার প্রোসেশন আমাদের বাসগৃহের পার্শ্ব দিয়া গোরস্থানাভিমুখে চলিয়া যাইত। ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধদিগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার প্রোসেশনে স্ত্রীপুরুষের বিলক্ষণ আনন্দের ঘটা হয়, নৃত্য ও বাদ্যাদি হইয়া থাকে;—আমাদের দেশের বিবাহাদি ব্যাপারের উৎসবের ন্যায় উৎসব হয়। উহা বড় কৌতূহলজনক ব্যাপার। পরে তদ্বিবরণ বিস্তারিতরূপে বিবৃত হইতে পারে।

পীনমানাতে এক দিন দুই দিন নয়, এক মাসেরও অধিক কাল আমাদের স্থিতি হইল। ১৭ই ফাল্গুন বেলা ২টার ট্রেণে টাঙ্গুনগরে যাত্রা করা যায়। কিছুদিন হইতে সমবিশ্বাসী ধর্ম্মবন্ধু শ্রীযুক্ত ডাক্তার নকুড়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় টাঙ্গুনগরে স্বীয় উকীল পুত্র শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বাস করিতেছেন, তিনি আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

পীনমানাসম্পর্কীয় বিশেষ বিশেষ বিষয়ে স্মৃতি আমার হৃদয়ে অঙ্কিত আছে *। আমি প্রতিদিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া প্রফুল্লান্তরে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে

---

* এক্ষণ সম্পাদকীয় "আমরা ও আমাদের" এই বহুবচনের প্রয়োগ পরিত্যাগ করিয়া ব্যক্তিগত এক বচনে আত্মপরিচয় দানে বাধ্য হওয়া গেল।

গৃহের পার্শ্বস্থ তড়াগের তীরে যাইতাম, মন্দ মন্দ স্নিগ্ধ প্রাতঃসমীরণ সেবন করিতে করিতে দুইবার তড়াগ প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতাম। তাহাতে আমার শরীর মনে শক্তি ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হইত। প্রভাকরের করজাল উত্তপ্ত হইয়া না উঠিতেই—উন্নত পাদপশ্রেণীর মস্তক আতপতপ্ত না হইতেই আমি গৃহে ফিরিয়া আসিয়াতাম। অপরাহ্লে দিনমণির অস্তগমনের প্রাক্কালে তদ্রূপ তড়াগ প্রদক্ষিণে প্রবৃত্ত হওয়া যাইত। আমি রজনীমুখে গৃহে প্রত্যাগত হইতাম। উদয়োন্মুখ ও অস্তগমনোদ্যত বিভাবসুর উত্তাপবিহীন লোহিত কিরণচ্ছটায় পূর্ব্ব ও পশ্চিম গগন এবং অদূরস্থ অনুন্নত শৈলশ্রেণী যে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিত, মহামহিমার্ণব পরম শিল্পী বিশ্বরাজ গগন প্রান্তস্থ বারিদপটে শ্বেত পীত লোহিতাদি নানা বর্ণে যে কত বিচিত্র চিত্র রচনা করিতেন, মেঘপুঞ্জের পরস্পর সংযোগ ও বিয়োগ দ্বারা যে কত অদ্ভুত শিল্পচাতুর্য্য প্রকাশ করিতেন, বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে দর্শন করিয়া আমার হৃদয় মন পুলকিত ও মুগ্ধ হইত। অনেক দিন নিশীথ কালে যখন সকল জীব নিদ্রাভিভূত হইয়া অচেতন হইত, তখন আমি চুপি চুপি শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উক্ত হ্রদের অভিমুখীন উপরের খোলা বারাণ্ডায় প্রমুক্ত আকাশের নিম্নে যাইয়া আসনে কিয়ৎক্ষণ বসিতাম, হ্রদটি অণ্ডাকার, উহা স্বচ্ছ প্রসন্ন সলিলে পূর্ণ। কোন রাত্রিতে সহাস্ত সমুজ্জ্বল চন্দ্রমার বিমল চন্দ্রিকাজাল তড়াগের কাচস্বচ্ছ জলরাশিতে যেন স্বর্ণরেণুপুঞ্জ ছড়াইয়া রাখিয়াছে, অদূরবর্ত্তী উপশৈল ও তরুরাজি জ্যোৎস্নাধবলিত হইয়া যেন হাসিতেছে, আমি রজনীর নিস্তব্ধতার মধ্যে বসিয়া এই অনুপম শোভা দর্শন করিতাম। সেই সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া আর এক প্রচ্ছন্ন পুরুষের অপার সৌন্দর্য্যচ্ছটা প্রকাশিত হইয়া প্রাণকে হরণ করিত। সেই অদৃশ্য হস্তের বিচিত্র রচনার মধ্যে, সেই নিস্তব্ধ নিশীথের শশিতারকাবিমণ্ডিত নীলাকাশের নিম্নে বসিলে জগদ্‌গুরু আদি কবির, কত কবিত্ব কত সুন্দর রচনা, কত সুমধুর ভাব প্রকাশিত হইয়া ভাবুককে মুগ্ধ করে। এই নিশীথকালীন প্রকৃতির নিস্তব্ধতার ভিতরে অন্তরে এরূপ অশব্দ মধুর বাণী শুনা যাইত "আমি তোমার স্নেহময়ী মা, তোমার নিকটে আছি।" আমি এক এক দিন নিশীথ কালে তড়াগাভিমুখীন পশ্চিম বারাণ্ডায় যাইয়া দেখি চারি দিক্ ঘন তমসাচ্ছন্ন, প্রকৃতিবধূ তিমিরবসনে অবগুণ্ঠিত, তরুলতা তড়াগ, উপশৈল ও উপত্যকাভূমি সকলই যেন শোকের কালবসন পরিয়া রহিয়াছে। সেই নিস্তব্ধতা ও গাম্ভীর্য্যের ভিতরে কে যেন অন্তর মধ্যে গম্ভীর স্বরে "আমি আছি" বলিতেন। আমি অনন্তের স্পর্শ প্রাণে অনুভব করিয়া স্তম্ভিত হইতাম। পীনমানার এই সুন্দর গম্ভীর ছবি আমার অন্তরে অঙ্কিত আছে। সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর আর একটি ছবি এই;—উহা, নব আকারে সজ্জিত ক্ষুদ্র পারিবারিক উপাসনাকুটীর। আমি মহিলার অন্যতর সংখ্যায়, এখানকার পারিবারিক ভোজের কথা বলিয়াছি। কিন্তু

উক্ত কুটীরে দুই বেলা যে পারিবারিক ভজন হইত তাহা বলি নাই। ভগবানের প্রাতঃকালীন অর্চ্চনায় গৃহিণী—আমার আদরের মা যোগদান করিতেন, কোন কোন দিন মধুর সঙ্গীত শুনাইতেন। সায়ংকালে তাঁহারই সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা শাস্ত্র পাঠ ও সঙ্গীত হইত। গৃহকর্ত্তা বড় উকীল, অর্থোপার্জ্জনে দিবারাত্রি ব্যস্ত, অমূল্য পরমার্থসাধনের ব্যাপারে তাঁহার যোগ ও সহানুভূতি কদাচিৎ পাওয়া যাইত। সেই কুটীরে যে নিত্য ভজন অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ভোজন হইয়াছে, উহার সুন্দর ছবি আমি অন্তরে স্মৃতি-তুলিকায় আঁকিয়া রাখিয়াছি। আমি আর পীনমানাতে ইহজীবনে যাইব তাহার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এই দুইটি স্বর্গের ছবি আমার অন্তরে আঁকা থাকিবে, মনে হয় তাহা সংজে পুঁছিয়া যাইবে না। ধর্ম্মপিপাসা ও উপাসনানুরাগবৃদ্ধির সঙ্গে আমার মায়ের ধীরতা, স্থিরতা আত্মসংযম ও অন্তর্দৃষ্টি বৃদ্ধি হইতেছে, তিনি গৃহলক্ষ্মী হইয়া ধর্ম্মজীবনের জ্যোতিতে অপর সকলকে পরম জননীর পদতলে আকর্ষণ করিতেছেন, আমি দূরদেশ হইতে ইহা শুনিতে পাইলে কৃতার্থ হইব। তিনি যে বিপুল অর্থ ব্যয়ে সুদূর বর্ম্মদেশে লইয়া গিয়া প্রাণপণ যত্নে আমার সেবা করিয়াছেন, তাহা সার্থক হইল আমি মনে করিব। মঙ্গলময়ী বিশ্বজননী তাঁহাদের দুই জনকে আশীর্ব্বাদ করুন। আমি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, পীনমানার মায়ের সাহায্যে আমি সে দেশীয় নর নারীর ধর্ম্ম, সামাজিক ও পারিবারিক বিষয়ে অনেক তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছি।

প্রাপ্ত।

পাশ্চাত্য দুর্নীতির অনুকরণ।

বিগত ফাল্গুন মাসের ভারতমহিলাতে প্রকাশিত নুরজাহানশীর্ষক প্রবন্ধে আকবরের অন্তঃপুরেতে "পর্ব্ব উপলক্ষে" সেলিম ও নিহর-উল্ নিশার মিলন ও প্রেমোচ্ছ্বাসের যেরূপ বর্ণন করা হইয়াছে উহা হিন্দু সমাজের চক্ষে সম্পূর্ণ দুর্নীতিজনক, পরিণীত দম্পতী ব্যতীত অপর যুবক যুবতীদিগের মধ্যে ওরূপ আচরণ কেবল রীতিনীতি বিরুদ্ধ নহে, পরন্তু মহাপাপ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। যে জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রে নিঃসম্পর্কীয় নরনারী পরস্পরকে স্পর্শ করা এমন কি বয়োঃজ্যেষ্ঠাকে প্রণাম করিতে হইলেও পুরুষের পক্ষে তাঁহার পাদস্পর্শ করা পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ, তাহার নিকটে চুম্বনাদি ব্যবহার ভীষণ দুরাচার ও মহাপাপ রূপে পরিগণিত। পৃথিবীর সভ্য অসভ্য সকল জাতীয় নরনারীর মধ্যেই নারীজাতির সম্বন্ধে নীতির অপব্যবহার যে ঘোরতর পাপ বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে, তাহার যথেষ্ট কারণ বর্ত্তমান। অধুনাতন ভারতবাসী হিন্দুদিগের মধ্যে বিশেষতঃ কতকগুলি কৃতবিদ্য বঙ্গবাসীর মধ্যে পাশ্চাত্য আচার ব্যবহারের অনুকরণ এতই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে, তাঁহারা ভালমন্দ বিচারশূন্য হইয়া অন্ধের ন্যায় পাশ্চাত্য অনীতি দুর্নীতি পর্য্যন্ত পবিত্র আর্য্যকুল-জনসমাজে প্রবর্ত্তিত করিতে সঙ্কুচিত হইতেছেন না। পৃথিবীর সকল সভ্য ও সমুন্নত জাতির সদ্ভাব সদ্গুণ সচ্চরিত্র আদরে গ্রহণীয় বলিয়া তাহাদের দোষ দুর্ব্বলতা দুর্নীতি ও পাপকেও যে

আদরে গ্রহণ করিতে হইবে না, ইহা কোন্ সুবিবেকী ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অস্বীকার করিবেন? আপন পতিত জাতির উদ্ধার ও উন্নতিসঙ্কল্পে সকল সমুন্নত জাতির নিকট হইতে জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্ম্মনীতি, স্বাস্থ্যবিধি প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া আপনারা শৌর্য্য, বীর্য্য, বিক্রম, স্বাধীনতা লাভ করিব, কিন্তু যাহাতে জ্ঞানধর্ম্মের অধঃপতন হয় তাহা কখনই গ্রহণ করিব না। স্বেচ্ছাচার ও নাস্তিকতার প্রভাবে বিদ্যোপার্জ্জন করিয়াও অজ্ঞানতা ও অনীতির অন্ধকারে সোণার ভারত ছারখার হইয়া যাইতেছে। যাহাতে চরিত্রলাভ হয়, সেইরূপ সাহিত্য ও আচার ব্যবহারই এই পতিত আর্য্যসন্তানদিগের এখন নিতান্ত শিক্ষণীয়, পাশ্চাত্য আদিরসের অবতারণার দ্বারা এই সর্ব্বস্বান্ত মৃত জাতিকে দুর্নীতির অন্ধকূপে নিক্ষেপের ব্যবস্থা অতীব ক্ষোভজনক ও কর্ত্তব্যবিমূঢ় কার্য্য। ব্যবহারাদি সম্বন্ধে কখনও ইন্দ্রিয়শৈথিল্য যাহাতে প্রশ্রয় না পায় এরূপ বীরত্ব শিক্ষা দেওয়াই নিতান্ত প্রয়োজন, সেইরূপ সাহিত্যচর্চ্চাই নিতান্ত প্রার্থনীয়, এবং বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন স্বদেশসংস্কারকগণের সেই মহাব্রতই গ্রহণীয়। দুর্ব্বলচিত্ত মনুষ্যসন্তানকে ইন্দ্রিয়শৈথিল্যের রীতি পদ্ধতি উপায় প্রণালী শিখাইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। সহজেই দেশ, দুর্ভাগা বঙ্গদেশ আদিরসবিকার-ঘটিত অভাবনীয় অননুভূতপূর্ব্ব বিচিত্র চিত্রে পূর্ণ হইয়া পড়িতেছে। নারীগণপাঠ্য ও নারী কর্ত্তৃক সম্পাদিত পত্রিকার লেখকদিগের দায়িত্ব অতীব গুরুতর।

যে দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রে জ্ঞাতি গোত্র বা নিকট সম্পর্কের নরনারীর মধ্যে বিবাহ প্রথা নিষিদ্ধ, সেই দেশের বিদ্যাভিমানী সভ্য যুবকদলের মধ্যে কোন্ বিভৎস অশ্রোতব্য ঘটনাই না প্রবেশের পথ পাইতেছে? স্বাধীন খৃষ্টীয় সমাজের মধ্যেও ঘনিষ্ঠ কুল বা সম্পর্কের কথা দূরে থাকুক শ্যালিকা—স্ত্রীর ভগিনীর পাণিগ্রহণ চিরদিন নিষিদ্ধ বলিয়া চলিয়া আসিতেছিল। কেবল মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এবিষয়ের নিতান্ত অস্বাভাবিক শিথিলতা দেখা যায় *। তাঁহারা জ্ঞানাদিচর্চ্চার দ্বারা জাতীয় উন্নতিসাধনকল্পে সম্প্রতি যেরূপ দৃঢ়মনা হইয়াছেন, আশা করা যায়, যে অচিরাৎ তাঁহাদের মধ্যেও একাধিক পত্নীগ্রহণ ও এই অস্বাভাবিক কুপ্রথার প্রশমন হইবে। বৈদিক ও পৌরাণিক শাস্ত্রকারগণ নরনারীর পরস্পর সংস্রবকে বারুদ ও অগ্নির সংযোগের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। অদ্বিতীয় নীতিবীর বুদ্ধদেব, মহর্ষি ঈশা, ভক্ত চৈতন্যদেব ও আধুনিক দেবর্ষি আচার্য্য কেশবচন্দ্র প্রভৃতি মানবচরিত্রবিদ্ ধর্ম্মসংস্কারকগণ নরনারীকে প্রলোভন হইতে দূরে থাকিবার ভূরি উপদেশ দিয়াছেন। আমরাও জনমণ্ডলে কার্য্যতঃ নরনারীর মধ্যে পাশ্চাত্য ঘনিষ্ঠতা প্রথার অজস্র বিষময় ফল প্রত্যক্ষ করিতেছি। সক্রেটিসের ন্যায় মহাদার্শনিক বীর পুরুষকেও নরনারীর ঘনিষ্ঠ সম্মিলনকে বিষম প্রলোভন বলিয়া স্বীকার করিতে

* মোসলমান শাস্ত্রে স্ত্রীর জীবদ্দশায় তাহার ভগিনীকে বিবাহ করার বিধি নাই।

হইয়াছে। তথাচ অগ্নির সঙ্গে ক্রীড়া করিতে আমাদের এত সাহসী হওয়া কি বিবেক ও যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান করিব? বিবাহের পূর্ব্বে মনোনীত দম্পতীদের মধ্যে পরিণীত দম্পতীর ন্যায় আচরণ কি নীতি বা যুক্তিসঙ্গত? বিলাতের যুবক যুবতী দের মধ্যেও কোর্ট্‌শিপের সময় কোন প্রকার অযথা ব্যবহার হইলে এমন কি দীর্ঘকালের কোর্ট্‌শিপ অবধি ভাঙ্গিয়া যায়। কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারে ঐ রূপ একটী ঘটনা হওয়াতে বিবাহের অল্পকাল পূর্ব্বে সম্বন্ধটী ভাঙ্গিয়া গেল। সেই পাত্রকে চরিত্রহীন ও অবিশ্বাসিজ্ঞানে যুবতী সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিলেন, এবং সেই দুর্ঘটনার জন্য ভাঙ্গিতে বাধ্য হইলেন বলিয়া সমস্ত পরিবারটি বিষণ্ণতার ছায়ায় আচ্ছন্ন হইলেন। যাহাদের দৃষ্টান্ত আমরা অনুকরণ করিতে চাহিতেছি তাহাদের সম্ভ্রান্ত পরিবার মধ্যে নীতির বন্ধন কত দূর সুদৃঢ় তাহা আমাদের বিশেষরূপে জানিয়া অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। বিলাতের অনেক স্থানেই কিসিং ও হ্যাণ্ডশেকিং প্রথা পর্য্যন্ত উঠিয়া যাইতেছে, অথচ আমরা তাহাদের দূষণীয় বোধে পরিত্যক্ত প্রলোভনজনক ব্যবহার আমাদের সমাজে প্রবর্ত্তিত করিতে চাহিতেছি! কি ভ্রান্তি! কি অবিমৃষ্যকারিতা! আপন জাতীয় ভাবের মর্য্যাদা রক্ষা করাতেই আমাদের গৌরব, তাহা বিনাশ করিয়া বিপজ্জনক রীত চরিত্রের প্রবর্ত্তনা কি অন্ধ অনুকরণ, অজ্ঞানতা, ভ্রম ও কুরুচি এবং নীচতার পরিচায়ক নহে?

সমাজসংস্কারকগণের বৈদেশিক আচার ব্যবহার প্রবর্ত্তনের প্রয়াসের পূর্ব্বে গভীর চিন্তা দ্বারা বিশেষরূপে বিচার করা আবশ্যক যে, সে রীতি নীতি কত দূর নিরাপদ ও জনসমাজের অবনতিজনক না হইয়া সম্পূর্ণরূপে উন্নতিজনক কি না। এইরূপ শৈথিল্য ভারতবাসীদিগের পবিত্র সমাজে অনেক জঘন্য বিপদ ঘটাইতে আরম্ভ করিয়াছে। স্বসম্পর্কীয়দিগের মধ্যে ও স্বগোত্রে বিবাহ, বিবাহসম্বন্ধনিবন্ধনের পর (বিবাহের পূর্ব্বেই) মনোনীত দম্পতীর এক গৃহে বাস, এমন কি বলিতে হৃৎকম্প হয় এক শয্যায় পর্য্যন্ত শয়নের কথাও শুনা গিয়াছে! কি ভীষণ দুর্নীতি! এই সমুদায় দুর্ঘটনার যাহাতে দূর সম্ভাবনাও না থাকে এরূপ সতর্কতা ও নিষ্ঠার সহিত চলা ও চালানো যে নিতান্ত প্রয়োজন ইহা বলা বাহুল্যমাত্র। সূক্ষ্ম মানবচরিত্র-দর্শী মহাত্মা কেশবচন্দ্র এইরূপ সতর্কতারক্ষার জন্য এ প্রকার বিধি করিয়াছেন যে, দিবালোকে অনবরুদ্ধ প্রকোষ্ঠমধ্যেও কোন নরনারী ক্ষণকালের জন্যও একত্র অবস্থিতি করিবেন না, যে ঘরে একাকী একজন পুরুষ বা মহিলা স্থিতি করিতেছেন সে প্রকোষ্ঠমধ্যে অন্য নারী বা পুরুষ প্রবেশ করিবেন না। হিন্দু বা ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেও অনেক পরিবারে এপ্রকার নিয়ম আছে যে, পুরুষের এমন কি পুরুষ ভৃত্যের হস্ত হইতে হস্ত প্রসারণ করিয়া বাজারের টাকা পয়সা, অথবা শিশু সন্তানকে পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন না, ভূতলে বা শয্যোপরি রাখাইয়া লইয়া থাকেন। যেখানে স্পর্শব্যতিক্রমে নারীজাতির স্বভাবসুলভ লজ্জা ও মর্য্যাদা-

হানির বা চরিত্রবিকারের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা সেখানে একেবারে স্পর্শ না করাই বিধেয়। বাল্যকাল হইতে আমরা কি ভক্তিভাজন গুরুজনের সন্নিকট দিয়া কখনো চলিয়া থাকি? পাছে তাঁহাদের অঙ্গে আমাদের পাদস্পর্শ বা কোনও অঙ্গস্পর্শ হইয়া মর্য্যাদাহানি হয় এজন্য সতর্কতার সহিত কি দূর দিয়া চলিয়া থাকি না? যদি অনিবার্য্য ঘটনাক্রমে উপবিষ্ট ভদ্রগণের মধ্য দিয়া কখনো যাইতে হয় তাহা হইলে উভয় হস্ত প্রসারণ দ্বারা একটি আবরণ প্রস্তুত করিয়া তাহার ভিতর দিয়া কি গমন করি না? বহু সহস্র বর্ষের গবেষণা ও অভিজ্ঞতার দ্বারা নরনারীর লজ্জা ভয় ও মর্য্যাদারক্ষার জন্য আর্য্যজাতির মধ্যে যে সকল পারিবারিক ও সামাজিক আচার ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত আছে বিশেষ বিবেচনা না করিয়া কেবলমাত্র ভাব ও রুচির তরঙ্গে পরিচালিত হইয়া সে সমুদায়কে হঠাৎ অগ্রাহ্য করা চিন্তাশীল ও দায়িত্বজ্ঞান-বিশিষ্ট লোকের কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। এরূপ চিন্তাহীনতার কার্য্য কেবল আপনাকে ও আত্মীয় স্বজনকে নহে কিন্তু বিস্তীর্ণ জনসমাজের অগ্র পশ্চাৎ দৃষ্টিবিহীন সাধারণ জনগণকেও এরূপ নীতি ও চরিত্র হীন করিয়া ফেলিবে যে, বহুশত বর্ষেও তাহার প্রশমন অসম্ভব হইয়া উঠিবে। অনবধানতাবশতঃ পর্ব্বতকক্ষে একবার পদস্খলন হইলে গভীর গহ্বরে অধঃপতিত হইয়া যেমন উদ্ধারের বা জীবনের আশা থাকে না, নীতির সুদৃঢ় বর্ম্মে বিচরণ না করিয়া শিথিল বা স্খলিতপদ হইলে মানুষকে সেইরূপ দুর্নীতি, দুশ্চরিত্র ও পাপের গভীর নরকাবর্ত্তে জীবন হারাইতে হয়।

যুবক যুবতীগণ, এই ঘোর সমাজ বিপ্লব ও আন্দোলনের মধ্যে সাবধান! উচ্চ নীতির সুদৃঢ় দুর্গ অতিক্রম করিয়া একপদও অগ্রসর হইবে না। মহিলা, তুমি মাতৃ জাতীয়া, জনজগতের প্রসূতি! তোমার জাতিগত, স্বভাবগত কোমলতা, লজ্জা, বিনয় ও মর্য্যাদা সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া তুমি সকল প্রকার সমাজসংস্কারে প্রবৃত্ত হইবে। পূর্ণ দুগ্ধকুম্ভে একবিন্দুমাত্র গোচোনাস্পর্শে সমুদায় দুগ্ধের বিকৃতির ন্যায় তোমাদের নিষ্কলঙ্ক দেবচরিত্রে এক বিন্দু কলঙ্ক আরোপিত হইলে মাতৃকুলের বিকারে সমগ্র মানবজাতির অধঃপতন ও ঘোর দুর্দ্দশা উপস্থিত হইবে। যাহারা গৃহের শ্রী, পরিবারে গৃহলক্ষ্মীরূপে সকলকে পালন পোষণ সুখ শান্তিদান করিয়া মর্ত্ত্যে স্বর্গস্থাপন করিবেন, তাঁহাদের প্রাকৃতিক নির্ম্মলতা ও পবিত্রতা সর্ব্বদা সন্দেহের ভূমির অতীত স্থানে অবস্থিতি করিয়া প্রফুল্ল পদ্মের ন্যায়—বিকশিত গোলাবের ন্যায় লাবণ্যযুক্ত সৌন্দর্য্য ও সুগন্ধে সমুদায় পরিবার ও জনসমাজকে মোহিত ও পবিত্রতার পথে আকর্ষণ করিবে। পুণ্যময়ী পবিত্রস্বরূপিণী জগজ্জননীর কন্যা তুমি, তোমাকে মাতৃসৌন্দর্য্য জীবনে প্রদর্শন করিয়া পরিবার ও জনসমাজকে সুশোভিত ও চরিত্রের সুগন্ধে মোহিত করিতে হইবে। সাবধান! স্বর্ণ মৃগীর প্রলোভনে লক্ষ্মণের গণ্ডীকে একপদমাত্রও অতিক্রম

করিলে দুর্দ্দান্ত রাক্ষস রাবণহস্তে অপহৃত ও বন্দী হইয়া ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত করিয়া আপনাদিগকে ও জনমণ্ডলকে বিষম অশান্তিসাগরে নিমগ্ন করিতে হইবে। আর্য্যনারী চির পুরাতন বংশের সন্তান। বংশগত মহত্ব, চরিত্রের পবিত্রতা, স্বাধীনতা ও মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া বিজাতীয় সদ্‌গুণ ও সুচরিত্রে অলঙ্কৃত হইয়া, প্রকৃত স্বজাতীয় গৌরববিস্তারকরতঃ যথার্থ স্বর্গ-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন, ভিন্ন জাতির আচার ব্যবহার হইতে অমৃত-ভাগ মন্থন করিয়া তাহার দ্বারা স্বজাতির রূপলাবণ্য ও শ্রীসৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেন ইহাই ভারতের প্রার্থনা।

আর্য্যসন্তান।

বৈধব্যব্রত গ্রহণ।

(লাহিরিয়াসরাইস্থ নীতি সমিতিতে আলোচিত ও নির্দ্ধারিত।)

বিধি।

শরীর মনে ব্রহ্মচর্য্যপালন।

১। একান্ত মনে ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রহ্ম-দর্শন শ্রবণ সাধন করা।

২। বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করা।

৩। স্বামী-আত্মার সাধুগুণ নির্জ্জনে চিন্তা করা।

৪। নিজসম্বন্ধে স্বামীর প্রকাশিত ইচ্ছা স্মরণ করা, তিনি যাহা ভাল বাসিতেন তাহা করা।

৫। স্বামী-আত্মা নিজ আত্মার মধ্যে বাস করিতেছেন ইহা অনুধ্যান ও সঙ্গ করা, সর্ব্বদা মনে জাগ্রৎ রাখা।

৬। অতি যত্নে সন্তান পালন ও গুরুজনের সেবা করা।

৭। প্রতিদিন রোগী, আতুর, অন্ধ, খঞ্জ প্রভৃতির কোন প্রকারে সেবা স্বহস্তে করা।

৮। সৎসঙ্গ ও সৎপ্রসঙ্গ করা।

৯। প্রতি মঙ্গলবারে (বা স্বামীর স্বর্গারোহণবারে) স্বহস্তে রন্ধন করিয়া হবিষ্যান্ন আহার করা।

১০। বৈরাগ্যসহকারে ব্রহ্মচারিণীর চরিত্র রক্ষা করা।

নিষেধ।

যাহা কিছু নীতি ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ তাহা পরিবর্জ্জন।

১। পরিচ্ছদ-বিলাস ত্যাগ ও সামান্য বস্ত্রাদি পরিধান।

২। মৎস্য মাংস ও ভোজন-বিলাস ত্যাগ।

৩। সদলে পংক্তিভোজন ত্যাগ।

৪। শয্যা-বিলাস ত্যাগ ও সামান্য শয্যায় শয়ন।

৫। বৃথা হাস্য, কৌতুক ও আমোদ পরিহাস ত্যাগ।

৬। বৃথা হাস্যরহস্যকারী দলের মধ্যে না থাকা।

৭। স্বামী যাহাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেন তাহা না করা।

৮। অসৎসঙ্গ পরিহার।

৯। একাকী কোন পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ বা বাস না করা।

১০। সতী পার্ব্বতীর ন্যায়, পতির বিরুদ্ধে কোন ভাব, নিন্দা বা অবমাননার কথা শ্রবণ না করা।

রন্ধন প্রণালী।

রাঙ্গা আলুর পায়স।

(একটী উৎকল কন্যাকর্ত্তৃক লিখিত পূর্ব্ববঙ্গের রন্ধন প্রণালী।)

দুই সের দুধ জ্বালে চড়াইবে। এই দুধ অর্দ্ধেক যখন থাকিবে সেই সময় এক পোয়া (খোসাছাড়ান) রাঙ্গাআলু কুঁচ কুচি করে কুটে তাহাতে দিবে এবং কিয়ৎ-ক্ষণ পরে উপযুক্ত চিনি দিবে। ঘন পায়সের মত হইলে আধ পোয়া নারিকেল কুরা দিবে, এবং ছোট এলাচের গুঁড়া দিয়া নামাইবে।

মোচা পোড়া।

মোচার উপরের কয়েকটি পত্র ও ফুল গুলি ফেলিয়া ভিতরের নরম সাদা অংশ গুলি (তরকারিতে ব্যবহার করিবার মত) কুটিবে। অনন্তর ইহাকে সিদ্ধ করিয়া লইবে। সিদ্ধ হইলে জল উত্তমরূপে নিংড়া-ইয়া লইয়া মোচার পরিমাণের অর্দ্ধেক নারিকেল কুরা, উপযুক্ত লবণ ও সরিষার তৈল, (এক পোয়া মোচায় আধ ছটাক তৈল) একটু সরিষা ও লঙ্কা বাটা দিয়া ভাল করে মেখে কলাপাতার মধ্যে পুরিয়া আগুনে পোড়াইয়া লইবে।

মহিলার রচনা।

সহানুভূতি।

(রমণীর প্রতি রমণী।)

"কেহ নাই ভালবাসিবার"
ও কথা ক'য়োনা সখি, আর।
প্রাণ মোর কেঁদে উঠে
কাছে যেতে চায় ছুটে
মিটাইতে অভাব তোমার।
আয় সখি, আয় কাছে আয়,
বল, ব্যথা কি আছে কোথায় ?
মরম ঢালিয়া দিয়া
জুড়াইতে তোর হিয়া
আমি আজ এসেছি হেথায়।
নারী তরে নারীর হৃদয়
যে প্রেমেতে পরিপূর্ণ হয়,
তার মত নিরমল
কি আছে কোথায় বল ?
স্বর্গ সেথা হয় সমুদয়।
মোর এই বাহুর বন্ধনে
আকুলিত স্নেহের স্পন্দনে
এ বক্ষে ধরিব যবে
ব্যথা আর কোথা রবে ?
ঝরে যাবে ক্রন্দনের সনে।

শ্রীমতী মৃণালিনী সেন।
আলীপুর।

মহিলার পত্রাবলী।

(জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকটে লিখিত স্বর্গগতা হামিদা দেবীর পত্র।)

Jala Bunglow,
Bhagalpore.
28—12—1900.

দাদা,

অনেক দিন হইল তোমাকে পত্র লিখি নাই। কেন যে লিখি নাই তা জানি না। কাল রাত্রে যখন শুইয়াছি মনে মনে কষ্ট হচ্ছিল, আর মনে হলো কাল নিশ্চয় তোমায় চিঠীলিখিব।

দাদা, এই বৎসর চলে যায়, আমাদের এর মধ্যে মাত্র দেড় মাস নিয়মিত পড়া হয়েছে, আর বাকি সমস্ত সময় কেবল

মিথ্যা অপচয় করা হলো। ইহা কি পাপ নয়? আমার ভয়ানক পাপ বলে মনে হয়। মনে মনে ভয়ানক অনুতপ্ত হতে হয়। কথন কথন শরীরের জন্য, কথন লোকের জন্য এই রকম করে কিছু হল না।

আজ ২৮শে, আশা করি তুমি এই বিশেষ দিনের কথা ভোল নি। এই সকল গত ঘটনার বিষয় আমি সর্ব্বদা স্মরণে রাখতে চেষ্টা করি। আমি নির্জ্জনতা বড় ভালবাসি। একলা বসে গত ঘটনার বিষয় ভাবতে যেন মনে বেশ শান্তি পাই। এবার কেবল মনে হচ্ছে এই যে, বিশেষ সময় ইহার সদ্ব্যবহার করছি না। যেন ইহাকে উপযুক্তরূপে উপভোগ করতে পারছি না। তাহার কারণ নির্জ্জনতার অভাব। আমাদের বাড়ী যেন ইহার উপযুক্ত আধার। কাল আমাদের দীক্ষার দিন, তিন বৎসর গত হইল আমরা দীক্ষিত হইয়াছি। কিন্তু আমি কতদূর যে সেই সকল অঙ্গীকার পালন করতে পারছি, জানি না। আমি দীক্ষিত হইবার একেবারে অনুপযুক্ত ছিলাম; এখনও আছি। তোমরা আশীর্ব্বাদ কর যাতে আমি দিন দিন এই সকল পাপ হতে রক্ষা পাই, এবং উন্নতির পথে অগ্রসর হই।

Bhagalpore, 14 1. 1901.

গোলমালে, অনিয়মে, অত্যাচারে আমার শরীর জানইত খারাপ হইয়াছিল, এখন অনেক ভাল। এত যত্ন, সেবা, ভাল বাসার মধ্যে কে প্রতিপালিত হয়? সময়ে সময়ে মনে হয় ইহার মোটেই উপযুক্ত হইলাম না। কবে দয়াময় আমায় সে উপযুক্ততা দেবেন। কত সঙ্কল্প করিলাম, আমার এ দুর্ব্বল অন্তরে কিছুই দৃঢ় হইল না। নব বৎসরের নব শতাব্দীতে চারি দিক হতে কত যে আশীর্ব্বাদ, শুভ ইচ্ছা, সহানুভূতি পাইলাম গণনা নাই। প্রিয়জন, গুরুজন দূরে থাকিয়াও এ গরীব কন্যাকে, বন্ধুকে, ভগিনীকে এই শুভদিনে, বিশেষ দিনে স্মরণ করিয়া স্বর্গের স্নেহোপহার দিয়াছেন, ইচ্ছা হইতেছে, তোমাকে এখনি দেখাই। সেই শতাব্দী ও বৎসরের শেষ ও আরম্ভের সঙ্গমরেখায় অনন্তের পদ প্রান্তে নীরব ও বিস্ময় পূর্ণ হৃদয়ে কত কথাই উদিত হইতেছিল। কত স্নেহপূর্ণ প্রেমমুখ হৃদয়ে আসিয়া বেড়াইতেছিল, কে যেন ধীরে ধীরে আসিয়া অতীতের রুদ্ধ দ্বার খুলে দিতেছিল। মনে হইতেছিল আজ কোথায় তারা? কালের অনন্ত প্রবাহে একটির পর একটি ভাসিয়া গিয়াছে। সকলি শেষ হয়ে গেছে, অনন্তে বিলীন হয়েছে। কেবল মধুর স্মৃতি অন্তরে গাঁথা আছে। প্রার্থনা এই, চিরজীবন যেন এই স্মৃতি ছিন্ন না হয়।

Jala Bunglow, 29th January. 1901.

তোমার বোধ হয় মনে আছে ফাল্গুন মাসে আমার জন্মদিন। গত বৎসর এখানেই আমার জন্মদিন পড়েছিল। আজ ভাবিতেছি এক বৎসর তো পূর্ণ হলো। সেই শুভদিনে আমার জন্য যে সকলে প্রার্থনা করেছিলেন তাহা কি আজ পূর্ণ হইয়াছে? নব জীবন কি লাভ করিয়াছি? যে সকল অঙ্গীকার করেছিলাম সে সকল কি পূর্ণ হইয়াছে? বসন্তের সমাগমে

প্রকৃতি যেমন দিন দিন নিজের পুরাণত্ব ছেড়ে নতুনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, পাখীরা যেমন বসন্তের শুভাগমনের জন্য সঙ্গীতের তান লয় ঠিক্ করে রাখছে, আমিও যেন তেমনি এদের সহিত মিলিয়া প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করি! যখনই আমি ভুলে গিয়ে সংসারে ব্যস্ত থাকি, এদের এ তীক্ষ্ণ কণ্ঠ আমার অন্তরের সকল প্রকার জড়তা দূর করে দিয়া জ্বলন্ত উৎসাহ ও আশাতে পূর্ণ করে দেয়।

Bhagalpore 12th February. 1901.

তুমি কেন মনে করিয়াছ আমরা তাচ্ছিল্য করে তোমার চিঠী লিখি না। ইহাতে মনে বড় কষ্ট হইল। আমার সর্ব্বদাই তোমার কথা মনে হয়, আর তুমি যে এই অনুপযুক্ত অপরাধী বোনকে এত স্নেহ কর, ইহা ভেবে কত যে আনন্দ হয়, কি বলিব।

সকল প্রকার কষ্টই নীরবে বহন করতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু সব সময়ে তা পারি না। দুর্ব্বল মন সব সময়ে বহন করতে পারে না। কত সঙ্কল্প করি পালন করিতে পারি না। যত প্রার্থনা করি তাহা জীবনে পরিণত করতে পারি না। সেই জন্য জীবনে অশান্তি এবং সেই জন্যই পৃথিবী অশান্তিময়। তোমাদের আশীর্ব্বাদে ও প্রার্থনায় এবং ভগবানের সাহায্যে ও সহায়তায় যদি কিছু দূর অগ্রসর হইয়া থাকি। এখনও অনেক বাকি। জানি না এই বিপদ প্রলোভনময় জগতে কিরূপে পথ চিনিয়া চলিতে পারিব।

সংবাদ।

আমরা গত বৈশাখ মাসে লিখিয়াছি যে, ময়মনসিংহের জামালপুর সবডিভিশনে গুণ্ডাশ্রেণীর মোসলমানগণ হিন্দুদিগের প্রতি বিষম অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে, হিন্দু রমণীদিগের মান সম্ভ্রম ও সতীত্বরক্ষা পাওয়া দুষ্কর হইয়াছে। সেই সব ডিভিশনের একজন মাননীয় ভূম্যধিকারী আমাদিগকে লিখিয়াছিলেন যে,মোসলমানদিগের অত্যাচারভয়ে আমরা সর্ব্বদা ভীত ও চিন্তিত আছি। তাহার পর ৩রা জ্যৈষ্ঠ তিনি লিখিয়াছেন, "আমাদের সব ডিভিশনে যেরূপ অমানুষিক ঘটনা ঘটিতেছে তাহা সমস্তই কাগজে দেখিতেছেন, আমার বিস্তারিত লেখা নিষ্প্রয়োজন। ভগবানের কৃপায় সেরপুরে এখনও অশান্তি আসিয়া পড়ে নাই। আশঙ্কা খুব কম। দেওয়ানগঞ্জে ও বক্‌শিগঞ্জে special court বসিয়াছে। ৮ জন অভিযোক্তার ২ বৎসর হইতে ৯মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইয়াছে। আশা করা যায় গোলমাল আর বাড়িবে না। শীঘ্রই কমিয়া যাইবে।" আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে, ময়মনসিংহজিলার অনেক ভদ্র সম্ভ্রান্ত মোসলমান দয়া করিয়া পলায়িত ও উৎপীড়িত বহু হিন্দু পরিবারকে আশ্রয়দানে যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছেন। এরূপও শুনা গিয়াছে যে, হিন্দু পরিবারকে আশ্রয় দান করিতে যাইয়া দুই জন ভদ্র মোসলমান অত্যাচারী গুণ্ডাদের হস্তে মারা গিয়াছেন।

সম্প্রতি পঞ্জাব প্রদেশে গবর্ণমেণ্ট যে

খেলা খেলিয়াছেন তজ্জনিত আতঙ্কে চারিদিক্ অনেক শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। প্রথমে এরূপ খেলা খেলিলে এত নিন্দা কটূক্তি হিংসাদ্বেষ বিবাদবিচ্ছেদ ঘটিত না, এত লেখা লেখি ও বক্তৃতার ছড়াছড়ি হইত না, এবং এত গুলি বাঙ্গালী যুবক ও বালক বয়ে যাইত না। শ্রুত হইল রাজপ্রতিনিধি লর্ড মিণ্টো মহোদয় তিন জন দেশীয় সংবাদপত্র সম্পাদককে গিরফ্তার করিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন। সেই তিনজন কাহারা বিশেষ জানা যায় নাই। এক্ষণও নিন্দা কটূক্তি প্রশমিত করিয়া ভদ্রভাবে চলিলে শাস্তি পাইবার আশঙ্কা নাই। কিন্তু দুই একজন সম্পাদক শুনিয়াছি যেরূপ লেখনী চালনা করিয়া আসিয়াছেন সেইরূপ করিতে থাকিবেন, অপকৃষ্ট ও অভদ্রোচিত বাক্য সংযত করিবেন না, এইরূপ স্থির প্রতিজ্ঞ। বরিশাল নগরে স্বদেশী বক্তা লেয়াকত হোসেন পুস্তিকা বিশেষে কোনরূপ অন্যায় লেখার জন্য ধৃত হইয়া বিচারাধীনে আছেন। গবর্ণমেণ্টের কৃপায় স্বাধীনতা লাভ করিয়া সেই স্বাধীনতার অপব্যবহার করাতে এইরূপ মন্দ ফল ফলিতেছে; অতি দুঃখের বিষয়। বর্ত্তমান রাজপ্রতিনিধি ধীর শান্ত প্রকৃতি পুরুষ, তিনি বৎসরাবধিকাল প্রতীক্ষা করিয়া উপায়ান্তর না দেখিয়া রাজ্যে শান্তি ও কল্যাণস্থাপনজন্য কঠিন শাসনদণ্ড ধারণ করিয়াছেন। পরাধীন দুর্ব্বল লোকের বৃথা গর্ব্ব ও আস্ফালনে কেবল অসারতা প্রকাশ পায়। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশ ও পঞ্জাবের বিশেষ বিশেষ স্থানে রাজনৈতিক বক্তৃতাদানের পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। হিংসা দ্বেষ বিবাদ বিসংবাদ বিসর্জ্জন করিয়া বিলাতের সঙ্গে সদ্ভাবে মিলিত হইয়া সকলে স্বদেশে শিল্পবাণিজ্যাদির উন্নতি সাধন করুন, স্বদেশে নীতি ও ধর্ম্মের উন্নতি এবং শান্তি কল্যাণ বিধান করুন, ইহা একান্ত প্রার্থনীয়।

বিগত ৩২শে জ্যৈষ্ঠ শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা প্রকাশচন্দ্র রায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী সাধ্বী অঘোরকামিনী দেবীর স্বর্গারোহণের ১১শ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। তাহা স্মরণার্থ সেই দিন নববিধান প্রচারাশ্রমে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। দেবী অঘোরকামিনী স্বামিসহ আধ্যাত্মিক যোগ স্থাপন করিয়া প্রতিদিন ধর্ম্মসাধন করিয়াছেন। পরসেবায় ও নারী জাতির কল্যাণ ও উন্নতিসাধনে তাঁহার বিশেষ ব্যাকুলতা ছিল। তিনি সাংসারিক ভোগবিলাসে একান্ত বীতরাগিণী ছিলেন, একদা আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন বলিয়াছিলেন," ধর্ম্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন, এমন একটী নারী পাইলে আমি তাঁহা দ্বারা নারীজাতির কল্যাণার্থ অনেক কাজ করিয়া লইতে পারি।" আচার্য্যের শ্রীমুখাৎ এই কথা শ্রবণ করার পর অঘোরকামিনীর ধর্ম্মানুরাগ বর্দ্ধিত হয়। তিনি ধর্ম্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন। তিনি স্বামীর উপার্জ্জিত অর্থ নানা সৎকার্য্যে ও দয়ার কার্য্যে মুক্ত হস্তে ব্যয় করিতেন।

এই আষাঢ় মাসেই মহিলার ১২শ বৎসর পূর্ণ হইতে চলিল। আমরা গ্রাহক ও গ্রাহিকাদিগের নিকটে সানুনয়ে নিবেদন করিতেছি যে, তাঁহারা বর্ত্তমান বর্ষের

মূল্য ও পূর্ব্ব বাকি অবিলম্বে পাঠাইয়া যেন আমাদিগকে উপকৃত করেন।

আমেরিকার কতকগুলি সভ্যতাভিমানিনী মহিলা এক সভা স্থাপন করিয়া এরূপ প্রতাজ্ঞা করিয়াছে যে, তাহারা বিবাহবন্ধনে সম্বদ্ধ হইয়া চিরজীবন স্বামীর অধীন হইয়া থাকিবে না। বিবাহ করিলেও ২।৪ বৎসরের জন্য বিবাহ করিবে, পরে ইচ্ছা হইলেই বিবাহ বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। আমেরিকার নারীদিগের অদ্ভুত স্বাধীনতা! এরূপ জ্ঞান সভ্যতাকে ধিক্। ইহাদের মনে উদ্বাহ সম্বন্ধীয় পবিত্রতার লেশ নাই, এরূপ বুঝা যায়।

——

প্রেরিত পত্র।

ভক্তিপূর্ণ বিনীত প্রণাম গ্রহণ করুন। বৈশাখ মাসের "মহিলা" পত্রিকায় সংবাদস্তম্ভে অদ্ভুত ফোটো গ্রাফের বিষয় পড়িয়া আমাদের মনে হইল, সম্ভবতঃ এই রূপ ঘটিয়াছে যে, রঞ্জিত বাবুর স্বর্গগতা পত্নীর ছবি হয়তো তাঁহার আত্মীয় ননীগোপাল বাবু তাঁহার জীবদ্দশায় কখনো তুলিয়া থাকিবেন, এবং ঐ প্লেটখানি পরিষ্কার করিবার সময় সেই 'নেগেটিভ্' চেহারাটি ভালরূপে বিলীন হয় নাই, কাচে অস্ফুট রূপে বর্ত্তমান ছিল। তাহা না দেখিয়া তাহারই উপর রঞ্জিত বাবুর বর্ত্তমান পত্নীর ও ভ্রাতৃ বধূর ফোটো তোলা হইয়াছিল। পূর্ব্বেকার ছবি অবশ্যই কাচের ঠিক মধ্যস্থলে ছিল, এবং পরবর্ত্তী ছবি দুটী একযোগে তোলার জন্য উহার দুই পার্শ্বে উঠিয়াছে, এবং পূর্ব্বটী উভয়ের মধ্যস্থলে পড়িয়াছে। তবে ননীবাবু ও রঞ্জিতবাবু যদি নিশ্চয় বলিতে পারেন যে, রঞ্জিত বাবুর পরলোকগতা স্ত্রীর ফটো কখনো তোলেন নাই, তাহা হইলে "প্রেতাত্মার" ছবির বর্ত্তমানতা বিজ্ঞান-বুদ্ধির অতীত একটি রহস্যজনক ব্যাপার বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া এ বিষয়টি আগামী বারের "মহিলায়" প্রকাশ করা নিতান্ত আবশ্যক, না হইলে পাঠিকাগণের মনে একটি ভ্রান্ত কুসংস্কার দৃঢ় নিবদ্ধ হইলে বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা *।

লাহিরিয়া সরাই, ২৩শে মে ১৯০৭
প্রণত
শ্রীযোগপ্রভা মজুমদার।

* বাবু ননীগোপাল চাকী সবজজ বাবু রামগোপাল চাকী মহাশয়ের পুত্র। ননীগোপাল এক জন গ্রেজুয়েট, সম্ভ্রান্ত বিশ্বস্ত লোক। তিনি যখন বলিতেছেন, বাবু রঞ্জিতচন্দ্র লাহিড়ীর পূর্ব্ব পত্নীর ছবি কখনও তোলেন নাই, তখন তাহা বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। বিশেষতঃ যাঁহারা ফটোগ্রাফে ছবি তোলেন তাঁহাদের এক জনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল যে, একটি কাচে এক বারের অধিক নেগেটিভ ছবি হইতে পারে না। এই ছবির রহস্য বুঝিয়া উঠিতে অক্ষম। অনেক সংবাদ পত্রেও এ বিষয়ে আন্দোলন হইয়াছে। কলিকাতায় নয়, পাবনাতে ছবি তোলা হইয়াছিল।—সং

——

ভিক্টোরিয়ামহিলাবিদ্যালয়।

গাছপালার কথা *।

গাছগুলি কি ক'রে খাদ্য সংগ্রহ করে, মোটামুটী ভাবে সেদিন বলেছি। শিকড়ের কাজ মাটী থেকে খাদ্য সংগ্রহ করা। মাটিতে ছাই প্রভৃতি যোগে লবণাক্ত জল থাকে, অবশ্য খুব বেশী পরিমাণে নয়। সেই জল শিকড় দিয়া উঠিয়া পরে শিরায় শিরায় পাতায় পাতায় উঠে। জল থেকে যা পাওয়া যায় তাতে সব জিনিষ পাওয়া যায় না। যে গুলি না পাওয়া যায় সেই গুলি বাতাসে থেকে নিতে হয়। বাতাসে অম্লজান এবং কারবণ গ্যাস আছে। আমরা বায়ু নিঃশ্বাসের সহিত গ্রহণ করি। অম্লজান আমাদের দেহের পক্ষে প্রয়োজন। বাতাস থেকে আমরা অম্লজান গ্রহণ করি, এবং প্রধান রূপে কারবণ বার করে দি। গাছ আবার বাতাস থেকে কারবণই বেছে নেয়। এখন কাণ্ড এবং শাখাপ্রশাখার বিষয় কিছু বলব। কাণ্ডের কাজ হচ্ছে গাছটাকে খাড়া ক'রে রাখা। রসসংগ্রহ করা উহার কাজ নয়। কতকগুলি আবার পরগাছা হয়। যে সকল জীব এবং গাছ অন্যের উপর নির্ভর করে তাহাদিগকে পরান্নভোজী বলা যায়। তারা নিজের জন্য কিছুই করে না। বেশ মজা ক'রে অন্যের উপর দিয়ে চালিয়ে দেয়। মানুষদের ভিতরই যে কেবল পরান্নভোজী আছে তা নয়। ঐ গাছে শিকড়ও থাকে না। লতানে গাছ জড়াইয়া জড়াইয়া অন্য গাছে উঠে, শিকড় শুকিয়ে যায়। ইহার প্রকৃতি এত নীচ যে যার খায় তারই সর্ব্বনাশ করে, এমন ক'রে উহাকে জড়াইয়া ধরে যে, উহা মরিয়া যায়। স্বর্ণলতা মোটা হলদে সুতের ন্যায় গাছটাকে জড়াইয়া ধরে। যেগুলির পাতা আছে সেগুলি পাতা দিয়ে বায়ুথেকে কিয়ৎপরিমাণে খাদ্য সংগ্রহ করে। যে গাছে থাকে, সেই গাছই খাদ্য সংগ্রহ করে। সবুজ পাতা খাদ্য সংগ্রহ করে। শীতকালে খাদ্য সংগ্রহ করে না, পাতা ঝরিয়া যায়। পূর্ব্বের সঞ্চিত খাদ্যই অল্প অল্প ক'রে খরচ করে। শীতের শেষে যখন গাছপালার অঙ্কুর বেরোয়, তখন আবার খাদ্য যোগাড় করে। বিলেতে এক রকম পরগাছা আছে Misleto তার নাম। বড় দিনে তার বড় আদর। তাই দিয়ে বাড়ীঘর সাজায়। পাতাগুলি সবুজ এবং লম্বা সরু সরু। মাঝে সাদা সাদা ফল হয়। Misletoর ছোট ছোট শিকড় আছে। সেগুলি গাছের ডালে পেরেকের মত পুঁতে যায়। গাছের দুরকম শিকড় হয়, কোনটার শিকড় নীচে অনেক দূর যায়, এবং মূল শিকরটাই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আবার কোন কোনটার শিকড় নীচে বেশী দূর না গিয়া চারি দিকে

---

* ১৮ই আগষ্ট, ১৯০৩, মঙ্গলবার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মহালানবীশ প্রদত্ত বক্তৃতামূলক।

ছড়াইয়া পড়ে। এ দুই কারণেই গাছ শক্ত হয়। এই কচুগাছগুলির পাতা ছাতির মত। ইহার উপরে জল পড়িলে গোড়ায় না প'ড়য়া গড়াইয়া চারি দিকে পড়ে। এর শিকড় ছড়ান। শিকড়ের আগাগুলি কচি থাকে, সুতরাং ওতেই জলের দরকার। এই আর এক রকমের গাছ পাতার উপর জল প'ড়লে গড়াইয়া গোড়ার দিকে যায়। মানকচু গাছের মানকচুই শিকড়, তার ডগা চারি দিকে ছড়ায়নি। কতক গুলি কচি পাতা কাগজের ঠোঙ্গার মত মোড়া থাকে, জল পড়লেই গোড়ায় গিয়ে পড়ে। কোন কোন গাছের দু'দিকে দুটো পাতা, আর মাঝখানে জল জমে, তার কারণ উহাদের শত্রু আছে, উপরে উঠে মুকুল নষ্ট করিবে সেই জন্য বিধাতা এই আশ্চর্য্য নিয়ম করেছেন। বীজদলের যে অংশটা আগে বেরিয়ে মাটীর দিকে যায়, সেটা শেকড়। আর তার বিপরীত দিক্‌টা কাণ্ড। উহা ক্রমশঃ বাড়ে।

মুকুল দুরকম। পুষ্পমুকুল ও পত্রমুকুল। সব গাছের ডগাতে মুকুল থাকে। ডগাই বাড়ে, উহা অত্যন্ত কচি। প্রত্যেক গাছেই এমন কি খুব বড় গাছের ডাল ইত্যাদি শক্ত হলেও ডগাটা খুব নরম থাকে। ডগা মানে মুকুল. উহা সহজেই নষ্ট হয়, ভাঙ্গলে বড় হয় না, উহা ঢেকে রাখা দরকার, কচি পাতা দিয়ে প্রায়ই ঢাকা থাকে। এই পাতাগুলি ক্রমে বড় হয়। পত্রমুকুল যে শুধু ডগাতে থাকে তা নয়, যখন বড় হয় তখন দেখা যায় পাতার কোলে কোলে পত্রমুকুল বেরোয়। পত্রমুকুল থেকে আবার ডাল বেরোয়। ছোট বীজ হইতে প্রথম শিকড়, কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পাতা ইত্যাদি হয়। কাণ্ডের দুই রকম কাজ; ১ম কাজ শাখা প্রশাখা বিস্তার ক'রে গাছটাকে খাড়া ক'রে রাখা। পাতা ছিঁড়ে দিলে গাছ মরে যায়, যাহাতে খাদ্যসামগ্রী বৃক্ষ-দেহের চারি দিকে চলাচল কর্‌তে পারে তার উপায় করা। প্রথমে শিকড় রসসংগ্রহ করে, তার পর উহা পাতায় যায়, এবং পাতা থেকে রস এসে মিলিয়া খাদ্য প্রস্তুত হয়।

ঘাসের উপর গামলা চাপা দিলে উহার সবুজ রং থাকে না, হলদে হ'য়ে যায়। তার কারণ আলো অভাবে খাদ্য সংগ্রহ কর্‌তে পারে না, কিন্তু গামলায় একটু ছেঁদা ক'রে দিলে সবগুলাই যেন ঝগড়া ক'রে ঐ দিকে আসতে চেষ্টা করে। যদি একটা ডাল উহার ভিতর দিয়া বাহিরে আসিতে পারে, অন্যগুলার চেয়ে সেটা বেশ ভাল থাকে। পাতার শ্বেতসার হয়, আলো না থাকলে হয় না। পাতার সবুজ রংয়ের কারণ পাতায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য সবুজ দানা আছে। ঐগুলি সূর্য্যরশ্মি হইতে তেজ সংগ্রহ করে। আমাদের যেমন অন্ন পরিপাক হ'য়ে শিরা দিয়ে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে যায়, উহা-দেরও তেমনি। পাতায় শিরা আছে, উহা দ্বারা ঐ রস সর্ব্বত্র গিয়া ছড়াইয়া পড়ে। কাণ্ড না থাকিলে চলে না, ঐখানটা দিয়েই রস পাতায় উঠে।

মূল্যপ্রাপ্তি।

৯ম ও ১০ম বৎসর।

শ্রীমতী শান্তশীলা,	কাঁথি	২৲
„ সুশীলাবালা সিংহ,	দ্বারভাঙ্গা	২৲
শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র শাহা,	কুচবিহার	২৲

১১শ বৎসর।

শ্রীমতী শান্তশীলা,	কাঁথি	২৲
শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র সেন,	বগুরা	২৲
„ নীরদচন্দ্র গুহ,	সুনামগঞ্জ	২৲
„ অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী,	চট্টগ্রাম	
„ নির্ম্মলকুমার সেন,	বহরমপুর	
„ কিরণচন্দ্র ঘোষ,	কলিকাতা	
„ পরেশনাথ চট্টোধাধ্যায়,	বাঁকিপুর	
„ প্রসন্নকুমার মজুমদার,	ঈশ্বরগঞ্জ	
„ তরীন্দ্রমোহন সেন,	সিমলা	২৲

১২শ বৎসর।

শ্রীমতী হৈমবতী দেবী,	ভাগলপুর	২৲
„ পুষ্পমালা দেবী,	রেঙ্গুণ	২৲
„ তরঙ্গিণী দেবী,	কলিকাতা	১।৵০
„ সৌদামিনী দেবী,	নওয়াখালি	২৲
„ ক্ষীরোদাসুন্দরী সেন,	ঢাকা	২৲
„ কুসুমকুমারী রায়,	পিঙ্গনা	২৲
„ মৃণালীনী সেন,	আলীপুর	২৲
„ সরোজকুমারী সেন,	সম্বলপুর	২৲
„ সুরমা দত্ত,	কলিকাতা	২৲
„ মৃণালী দেবী,	শ্রীরামপুর	
„ স্নেহলতা দত্ত,	কলিকাতা	
শ্রীযুক্ত মহারাজা মুনিন্দ্রনাথ নন্দী,	কাশীমবাজার	
„ কিরণচন্দ্র ঘোষ,	কলিকাতা	২৲
„ উমেশচন্দ্র সেন,	বগুরা	২৲
„ নীরদচন্দ্র গুহ,	সুনামগঞ্জ	১৲
„ গোপালচন্দ্র গুহ,	টাঙ্গাইল	
„ কালীমোহন মুখোপাধ্যায়,	লক্ষ্ণৌ	
„ ভুবনমোহন রায়,	লক্ষ্ণৌ	২৲
„ অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী,	চট্টগ্রাম	২৲
„ নির্ম্মলকুমার সেন,	বহরমপুর	২৲
„ বিহারীলাল ঘোষ,	শিবপুর	২৲
„ পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায়,	বাঁকিপুর	২৲
„ যাদবলাল সেন,	কুচবিহার	২৲
„ কেদারনাথ মজুমদার,	কুচবিহার	২৲

১৩শ বৎসর।

শ্রীযুক্ত ইচ্ছাময়ী দাস,	চট্টগ্রাম	২৲
„ আমানতউল্লা চৌধুরী,	বড়মরিচা	২৲
„ তরীন্দ্রমোহন সেন	সিমলা	

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১২শ ভাগ] আষাঢ় ১৩১৪; জুলাই ১৯০৭। [১২শ সংখ্যা।

স্ত্রীনীতিসার।

নব্য গৃহিণী, তুমি গৃহকর্ত্রী, গৃহপরিবারের সমুদায় ব্যবস্থার ভার এক প্রকার তোমার হস্তে ন্যস্ত। তোমার ব্যবস্থা ও পারিবারিক কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া লোকের মনে কি উচ্চভাবের উদয় হয়? তোমার ঘর সংসার দেখিয়া কি লোকে মনে করে যে, এই ঘর ধর্ম্মের ঘর, পুণ্যের সংসার, এখানে ভগবান্ আদৃত ও পূজিত?

আমরা তোমার সমস্ত ঘর খুঁজিয়া কোথাও পূজার স্থান দেখিতে পাইলাম না। Drawing Room, Dining Room, Bath Room ইত্যাদি অনেক Room দেখিলাম, Prayer Room তো দৃষ্ট হইল না। তোমার ড্রয়িংরুমে যাইয়া দেখা গেল, কেবল কুকুর ও ঘোড়ার ছবি এবং নাচের পরিচ্ছদপরা বিবীর ছবি ইতস্ততঃ দেয়ালে টাঙ্গান আছে। ঈশা মুসা চৈতন্য প্রভৃতি সাধু মহাজনদিগের এক খানা ছবিও নাই। যাহা দেখিলে মনে পবিত্র ভাবের উদয় হয়, সেই ছবি তোমার ঘরে নাই কেন? তোমার পারিবারিক পুস্তকালয়ে, কাব্যরসাত্মক গল্পের বই রাশি রাশি রহিয়াছে, "একখানা ধর্ম্মপুস্তক" খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। একজন মহাত্মা বলিয়াছেন উপাসনাগারের পরই স্নানাগারের সম্মান। সেখানে নির্ম্মল জলে স্নান করিলে দেহশুদ্ধির সঙ্গে চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে। হিন্দু খ্রীষ্টান সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্নানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করে। ধর্ম্মসাধনের প্রথমাঙ্গ Baptism ও অভিষেক, স্নানের সময় হিন্দুগণ স্তোত্রাদি পাঠ করেন। এ কি! তোমার স্নানাগার ও শৌচাগার যে এক! ছি! এইরূপ ঘরে কি তুমি স্নান করিয়া আপনাকে শুদ্ধ ও শুচি মনে কর? ভোজনের সময় কি তুমি অন্নদাতা বিধাতাকে স্মরণ করিয়া তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা দান কর? সাধু জীবন লাভের জন্য কি ভোজন কর! তোমার ভোজন দেখিলে তাহার কোন আভাস তো পাওয়া যায় না।

এই অবস্থায় বল, তোমার ঘর সংসারকে ধর্ম্মের ঘর পুণ্যের সংসার, তোমার ঘরে মা লক্ষ্মী বিরাজিত, ভগবান্ সমাদৃত ও পূজিত কেমন করিয়া বলা যায়?

মহিলাদিগের রন্ধন ও ভোজন।

রন্ধন কার্য্য নীচ কার্য্য নয়, ছোট লোকের কাজ নয়। রন্ধন কার্য্য অতি উচ্চ ও পবিত্র কার্য্য। মহাভারত ও রামায়ণাদি পুরাণ পাঠে জানা যায় রাজমহিষী দ্রৌপদী ও সীতাদেবী শ্রদ্ধাপূর্ব্বক স্বহস্তে রন্ধন করিয়া আতিথ্য সৎকার করিয়াছেন, ঋষি মুনিদিগকে ভোজন করাইয়াছেন। অযোধ্যা তীর্থে গমন করিলে তথাকার পাণ্ডারা কোন কোন মন্দিরে সীতাদেবীর রন্ধনের চুল্লী এবং তাঁহার মসলা পেশিবার শিল যাত্রিকদিগকে প্রদর্শন করিয়া থাকে। সেই চুল্লী সীতা দেবীর রন্ধনের চুল্লী ও সেই শিল সীতা দেবীর মসলা পেশিবার শিল সত্য হউক বা না হউক, তিনি যে রাজমহিষী হইয়াও রাঁধিতেন এই সকল নিদর্শন দ্বারা তাহার আভাস পাওয়া যায়। ভারতেশ্বরী স্বর্গগতা ভিক্টোরিয়া দেবী আপন কন্যাদিগকে রন্ধন কার্য্য শিক্ষা দিয়াছেন, উহা নীচ কার্য্য হইলে মহারাজ্ঞী স্বীয় কন্যাদিগকে উহা যত্ন পূর্ব্বক শিক্ষাদান করিতেন না। ইন্দোরের স্বর্গগত মহারাজ টুকাজীরাও হোলকার একদা কলিকাতায় আসিয়া কিছু দিন স্থিতি করিয়াছিলেন। তিনি আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকটে তাঁহার ভক্তিভাজন জননীর স্বহস্ত প্রস্তুত ব্যঞ্জনাদি ভোজন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তদনুসারে আচার্য্যমাতা কয়েক প্রকার ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া মহারাজের নিকটে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। শ্রুত হওয়া গিয়াছে যে, মহারাণী প্রতিদিন মহারাজের জন্য স্বহস্তে রন্ধন করিতেন। পূর্ব্ববঙ্গে অনেক ধনী বড় মানুষের গৃহে প্রাত্যহিক রন্ধনের জন্য বেতনভোগী পাচক নিযুক্ত নাই, গৃহিণী এবং তাহার কন্যা ও বধূগণ স্বয়ং রন্ধন করিয়া পরিবারস্থ সকলের সেবা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বেতনভোগী পাচক পাচিকার হস্তে প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জন নিজেরা খাইয়া তৃপ্তি বোধ করেন না, পতি পুত্র পিতা পিতৃব্য প্রভৃতিকেও তাহা খাওয়াইতে সঙ্কুচিত হন; এই পবিত্র সেবাকার্য্যে নিজেরা উপেক্ষা করিয়া একজন ছোট লোকের হস্তে সেই ভার সমর্পণপূর্ব্বক নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। প্রাচীন শ্রেণীর হিন্দু পরিবারের অনেক মহিলা স্বয়ং রন্ধন করিয়া গৃহাগত অতিথি অভ্যাগতদিগের ভোজন করাইয়া থাকেন। বম্বের মহারাষ্ট্রীয় পরিবারে গৃহিণী ও তাঁহার কন্যাগণ নিজেরা রন্ধন পরিবেশন পূর্ব্বক নিমন্ত্রিত ও অভ্যাগত আত্মীয়জনকে সেবা না করিলে তাঁহারা অপমানিত হইলেন মনে করেন। একদা রাজশাহি জেলায় পুটিয়া গ্রামে আমাদের একজন পরিব্রাজক বন্ধু উপস্থিত হন। তথাকার মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবী তাঁহাকে নিজালয়ে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ভোজ্যজাতের মহাঘটা হইয়াছিল। বন্ধু ভোজন করিতে বসিলে পর একজন ব্রাহ্মণ ২।৩টী ব্যঞ্জন উপস্থিত করিয়া বলিয়াছিল, "মহারাণী নিজহস্তে কুটন কুটিয়া আপনার জন্য ইহা রন্ধন করিয়াছেন।" নিমন্ত্রিত ব্যক্তির প্রতি মহারাণীর কেমন আশ্চর্য্য

ভালবাসা ও আদর! উক্ত মহারাণীর কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী শ্রীসুন্দরী দেবীর স্বামী শ্রীযুক্ত কালীরঞ্জন লাহিড়ী মহাশয়ের সঙ্গে আমাদের আলাপ পরিচয় আছে। শ্রীসুন্দরী দেবী পৈতৃক বিপুল ভূসম্পত্তির স্বত্বাধিকারিণী হইয়া পিত্রালয়ে বাস করিতেছেন, লাহিড়ী মহাশয়ও শ্বশুরালয়ে স্থিতি করেন। আমরা একবার অভ্যাগতরূপে সেই পরিবারে উপস্থিত হইয়াছিলাম। অন্তঃপুরে যাইয়া আমাদিগকে ভোজন করিতে হইয়াছিল। নানাবিধ ব্যঞ্জন ও পিষ্টক মিষ্টান্নাদি ভোজনের জন্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। আমরা তাহা দেখিয়া লাহিড়ী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, এসকল কে প্রস্তুত করিলেন? তিনি বলিলেন, আমার পত্নী শ্রীসুন্দরী দেবী এ সমস্ত রন্ধন ও প্রস্তুত করিয়াছেন। এক্ষণ তিনি অতিশয় স্থূলাঙ্গী হইয়া পড়িয়াছেন, তজ্জন্য সম্মুখে আসিয়া পরিবেশন করিতে লজ্জা বোধ করিলেন। কিন্তু তাঁহার অপ্রাপ্ত বয়স্কা কন্যা কিছু কিছু পরিবেশন করিয়াছিলেন। ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত শেরপুরে আমরা দুই তিন বার ২।১ জন জমীদারের বাড়ীতে অভ্যাগতরূপে উপস্থিত হইয়াছিলাম। একটী জমিদার পরিবারের তরুণবয়স্কা গৃহিণী মায়ের মত আদর ও যত্ন প্রকাশ পূর্ব্বক স্বহস্তে সমুদায় অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া পরিবেশনপূর্ব্বক আমাদিগকে খাওয়াইয়াছিলেন। মুক্তা গাছার একজন বিধবা জমীদার পত্নী একাদশী উপবাসের দিন রাত্রিতে ২৫। ৩০টি নিরামিষ ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া আমাদের নিকটে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার ভ্রাতার সঙ্গে বন্ধুতাসূত্রে বদ্ধ হইয়া তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিলাম। প্রাচীন হিন্দু পরিবারের মহিলারা রন্ধন পরিবেশন করিয়া কোন আত্মীয়কে ভোজন করাইবার সুযোগ পাইলে আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করেন। পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু পরিবারে বিবাহাদি উৎসব উপলক্ষে বড় বড় ভোজে ২।৪ জন মহিলা মিলিত হইয়া রন্ধন করেন, সহজে পাচক ব্রাহ্মণের হস্তে সেই ভার অর্পণ করেন না। কলিকাতার ভদ্রসম্ভ্রান্ত পরি বারে ইহার বিপরীত আচরণ দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। গৃহকর্ত্তা বহির্ভবনে ভোজন করেন, পাচক ব্রাহ্মণ অন্ন ব্যঞ্জন আনিয়া দেয়, স্বামীর কিরূপ ভোজন হইল গৃহিণী তাহার কিছুই অনুসন্ধান লন না; এইরূপও দেখিয়াছি।

মহিলারা ক্ষীণ দুর্ব্বল শরীরে গুরুতর রন্ধনাদির ভার গ্রহণ করিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত হন এবং শরীরকে ব্যাধিগ্রস্ত করেন ইহা আমরা প্রার্থনীয় মনে করি না। শরীর সুস্থ থাকিলে অবস্থা প্রতিকূল না হইলে তাঁহারা অন্ততঃ ২।১টী ব্যঞ্জন কি রন্ধন করিয়া পতি পুত্র এবং পরিবারস্থ অন্য আত্মীয় স্বজনকে খাওয়াইতে পারেন না? তাহাতেও কি ক্লেশ বোধ হয়? ইহা যে অতি পবিত্র সেবা কার্য্য। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এ কার্য্য করিতে পারিলে সেবিকার যে মহাপুণ্য ও আত্মপ্রসাদ লাভ হইয়া থাকে। সেবিত ব্যক্তিও এই সেবাতে পরম সুখী হন। তাঁহারা ব্যঞ্জনাদির আড়ম্বর ও ঘটা করেন, ইহা কিছুতেই প্রার্থনীয় নহে।

ভোজ্যজাত যত দূর সম্ভব সহজ ও সংক্ষিপ্ত হওয়া প্রয়োজন। আমাদের বড় দুঃখ হয় যে, এই স্বদেশী পবিত্র সেবাকার্য্যে অনেক মহিলার অতিশয় উপেক্ষা ও ঔদাসীন্য, তাঁহারা উহা নীচ কার্য্য মনে করিয়া উড়ে ব্রাহ্মণ ও মোসলমান বাবুর্চ্চির হস্তে ন্যস্ত রাখিয়াছেন, বিলাতী রীতিনীতির পক্ষপাতিনী হইয়া এক প্রকার বিকৃত ভাব ধারণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের নিকটে এত টুক আশা করিতে পারি যে, তাঁহারা রন্ধনের তত্ত্বাবধান করিবেন, ভাল পাচক রাঁধিতেছে কিনা তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন এবং সুযোগমতে আত্মীয় স্বজনের জন্য ২। ১টী সামান্য ব্যঞ্জন রন্ধন করিবেন। উত্তম পাচিকা হওয়া গৃহিণীদের বড় প্রশংসার বিষয়, সেবাপরায়ণানারী নারীকুলশ্রেষ্ঠ। বিশ্বজননী সমস্ত নরনারীর সেবা করেন, তিনি আলস্যে বসিয়া দিনযাপন করেন না। প্রত্যহ কোটী কোটী জীবের জন্য তাঁহাকে অন্ন প্রস্তুত করিতে হয়। তোমরা তাঁহার কন্যা হইয়া কি তাঁহার প্রকৃতির কিছুই অনুকরণ করিবে না? এক্ষণ স্কুলের অনেক ছাত্রী রন্ধনপ্রণালী শিক্ষা করে, শুনিয়াছি তাহারা পুরস্কারও পাইয়া থাকে। কিন্তু কাজেতো কিছুই পরিচয় পাইতেছি না। তাহাদের কি কেবল পুস্তকগত বিদ্যাই থাকিবে?

সুখাদ্য পুষ্টিকর সামগ্রী ভোজন করিয়া শারীরিক অভাবপূরণ ও শক্তিসঞ্চারের উদ্দেশ্যে বিধাতা ক্ষুধার সৃষ্টি করিয়াছেন, ক্ষুধা আহারগ্রহণে সকলকে উত্তেজিত ও প্রবর্ত্তিত করে। তিনি দেহধারণ ও দেহের কান্তিপুষ্টিসাধনের উপযোগী পৃথিবীর সর্ব্বত্র নানাবিধ ফল শস্য তরকারি প্রচুর পরিমাণে সৃজন করিয়াছেন। নিষ্ঠুর ভাবে পশু পক্ষ্যাদি জীবের কণ্ঠচ্ছেদন করিয়া তাহাদের মাংস ভোজন না করিলে যে, দেহ রক্ষা হয় না, ইহা কোন যুক্তিযুক্ত কথা নহে। নানা প্রকার ফল শস্য ও অন্য উদ্ভিদ্ পদার্থে এত অধিক পুষ্টিকর সারাংশ আছে যে, সেই সকল উপযুক্ত পরিমাণে আহারের ব্যবস্থা করিলে শরীর রক্ষার জন্য যথেষ্ট উপকরণ লাভ হয়। ভোজনে স্বেচ্ছাচারী হওয়া বিধাতার বিধি নয়, লোভপরবশ হইয়া সেই বিধি লঙ্ঘন করিলে তাহার দণ্ডস্বরূপ নানা ব্যাধির সঞ্চার হয় ও অকালে মৃত্যু ঘটে। শাক তরকারি ডাইল ইত্যাদি শস্য পরিমিত ঘৃত মসলাদিযোগে উত্তমরূপে রন্ধন করিলে সুখাদ্য ও সহজ পাচ্য হয়। তাহা দেহের শক্তি বৃদ্ধি ও শোণিত বৃদ্ধি সাধন করে। অনেক নব্য মহিলা স্বদেশী ভোজনে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া বিলাতী ভোজনে অনুরাগ প্রকাশ করেন। বিবীদিগের ভোজনে মাংসই প্রধানরূপে ব্যবহৃত হয়।

ভোজন সাধারণতঃ ত্রিবিধ;—সাত্ত্বিক ভোজন, রাজসিক ভোজন, তামসিক ভোজন। পশু পক্ষ্যাদির মাংস ভোজন দ্বারা নিজদেহের মাংস বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিষ্ঠুরাচরণে কোন জীব হত্যা না করিয়া শুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাবে জীবন ধারণের জন্য যে পরিমিত ফল মূল শস্যাদি ভোজন হয়, তাহাকে সাত্ত্বিক ভোজন বলে। এইরূপে

ভোজন দেহশুদ্ধি ও চরিত্রশুদ্ধির পক্ষে বিশেষ অনুকূল। এই প্রকার ভোজনে শুদ্ধতা ও মিতচারিতার জন্য নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি ও পশু ভাব সকল সংযত থাকে। সংযমী ধর্ম্ম-সাধকের পক্ষে সাত্বিক ভোজনের বিশেষ প্রয়োজন।

দ্বিতীয় রাজসিক ভোজন; এই দ্বিতীয় শ্রেণীর ভোজনে মহা ঘটা ও আড়ম্বর হয়। ভোজ্যজাতের অধিকাংশই অপরিমিত হইয়া থাকে। মুখপ্রিয় ভাবিয়া নানা প্রকার দুষ্পাচ্য বস্তুর তাহাতে যোগ হয়। বিবাহাদির মহোৎসবের বৃহৎ ফলার ইহার বিশেষ প্রমাণ। তখন এক এক জন ভোক্তার ভোজ্যপাত্রে এক টাকা দেড় টাকার খাদ্য সামগ্রী প্রদত্ত হয়। অনেকে উহার চতুর্থাংশ ও উদরস্থ করিতে পারে না। নানা প্রকার বহু মুল্য মিষ্টান্ন পলান্ন পরমান্ন মৎস্য মাংসের কালিয়া কোর্ম্মা ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে বিলাস ভোজ্যজাত সহ উচ্ছিষ্ট পাত্র আস্তাকুড়ে বিসর্জ্জিত হয়। অনেকে লোভপরবশ হইয়া অতিরিক্ত ভোজ করেন, অজীর্ণাদি দোষে ক্লেশ প্রাপ্ত হন, ভোজনের অব্যবহিত পরেই তাঁহাকে ডাক্তারের ভিজিট যোগাইতে হয়। ইহাকেই বলে রজোগুণ প্রধান রাজসিক ভোজন। এইরূপ ভোজের ব্যাপারে ভোজদাতার গর্ব্ব অভিমান বৃদ্ধি পায়, ভোজনে ভোক্তার মনে গ্লানি শরীর অবসন্ন ও অসুস্থ হয় কাম ক্রোধাদি রিপু প্রবল হইয়া থাকে। রাজা মহারাজ বাদশা ও নবাবদিগের প্রাত্যহিক ভোজন এই রাজসিক ভোজন। একদা আমরা নিজাম হায়দরাবাদে গিয়াছিলাম, সেস্থানে যাইয়া শুনিলাম, তথায় মোসলমান বড় লোকেরা উৎসবাদি উপলক্ষে, কাহাকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া খাওয়াইলে তিনি ছোট লোক বলিয়া নিন্দিত হন। পাকা পোলাও ও কাঁচা পোলাও এবং তাহার বিবিধ উপকরণ ৪০। ৫০ জনের ভোজনের উপযোগী নানা প্রকার বিলাস খাদ্য জাত নিমন্ত্রিত ব্যক্তির বাড়ীতে পাঠাইয়া দিতে হয়, তাহা হইলে মান রক্ষা পায়। আমরা একবার আইন আক্‌বরী গ্রন্থ হইতে বাদশাহী নানাবিধ খিচুড়ি পোলাও ইত্যাদি প্রস্তুতির প্রণালী অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছি। তাহাতে পাঠিকাগণ জানিতে পারিয়াছেন যে, মোসলমান বড় লোকেরা কি ভয়ানক ভোজনবিলাসী ছিলেন। পাঠিকা, তুমি সাত্বিক ভোজনের পক্ষপাতিনী না রাজসিক ভোজন ভালবাস?

তৃতীয় তামসিক ভোজন; তামসিক ভোজনে মনে তমোগুণের বৃদ্ধি হয়। কামক্রোধাদি তমোগুণের অন্তর্গত। তমঃ শব্দের অর্থ অন্ধকার। যাহা ভক্ষণে মন তমসাচ্ছন্ন হয়, আন্তরিক জ্যোতি বিনষ্ট হইয়া থাকে, ধর্ম্মভাব ও দেবভাব স্ফূর্ত্তিহীন হয় তাহাই তামসিক ভোজন। নানা প্রকার পচা মাংস পচা সড়া দুর্গন্ধ দ্রব্য তামসিক ভোজ্যজাতের অন্তর্গত। এইরূপ ভোজনকে রাক্ষসী ভোজন বা পৈশাচিক ভোজন বলা যায়। অনেক স্ত্রীলোক আছেন যে, তাঁহারা এই প্রকার ভোজন ভাল ভাসেন। সাহেব বিবীদিগের ভোজন কতকটা রাক্ষসী ভোজন। অধিক

মাংস ভোজন করেন বলিয়া সাধারণতঃ তাঁহাদের ক্রোধ রিপু বড় প্রবল। তাঁহারা সহজে ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হন, পদাঘাতে পিলে ফাটাইয়া চাকর বেহারাদিগকে যমালয়ে পাঠাইয়া দেন। জাপানের লোকেরা মাংসাশী নহেন, তজ্জন্য তাঁহারা ধীর শান্ত শিষ্ট প্রকৃতি। তাঁহাদের ভোজনে বিলাসাড়ম্বর নাই। তাঁহারা সামান্য মৎস্য মাত্র উপকরণে অন্নভোজন করেন। বর্ম্মদেশীয় লোকের ভোজন পৈশচিক ভোজন। পচা দুর্গন্ধ মৎস্যে তাহাদের প্রিয় খাদ্য নপ্পি প্রস্তুত হয়, তাহারা অধিক পরিমাণে নপ্পি ভোজন করে। বঙ্গদেশের অনেক মহিলা নপ্পির তুল্য দুর্গন্ধ পচা মাছ খাইতে ভাল বাসেন। জিজ্ঞাসা করি পাঠিকা, তামসিক ভোজনে কি তোমার রুচি প্রবৃত্তি অধিক ? তাহা হইলে বড় দুঃখের বিষয়।

উচ্চ মানবজীবন লাভ করিয়া নিজের উদরকে পশুপক্ষ্যাদি নিকৃষ্ট জীবের পচা দুর্গন্ধ মৃত দেহের গোরস্থান করা কি বিড়ম্বনা নয় ? সে সকল ভাগাড়ে নিক্ষেপ করার উপযুক্ত। পরদেহে—পশু পক্ষ্যাদির দেহে ক্ষণকাল জিহ্বার কিঞ্চিৎ তৃপ্তি সাধনজন্য জীবহত্যারূপ নিষ্ঠুর কার্য্যে সহায়তা করিয়া তুমি ভোজনের সময় অন্নদাতা বিধাতাকে কৃতজ্ঞতা দান ও প্রণাম করিতে পার কি ?

আমাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত।

বর্ম্মদেশ।

৫ম।

টাঙ্গু নগরে গমন।

আমরা বিগত ১৭ই ফাল্গুন অপরাহ্ন ২টার ট্রেণে টাঙ্গু নগরে যাত্রা করিয়া ৫টার সময় তথায় পঁহুছিয়াছিলাম। শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ বন্ধু শ্রীযুক্ত ডাক্তার নকুড়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভৃত্যসহ ষ্টেশনে আমাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। আমরা প্লেট ফরমেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হই। পরক্ষণে তাঁহার প্রিয় পুত্র অ্যাডভোকেট শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গেও তথায় সাক্ষাৎ হয়। ষ্টেশনের অদূরে সুরেন্দ্রনাথের আবাস। ডাক্তার বাবুর সঙ্গে শকটারোহণে সেই আবাসে যাওয়া যায়। সুরেন্দ্রনাথ সপরিবারে একটি দ্বিতল ইষ্টকালয়ে বাস করেন।

টাঙ্গুনগর প্রাচীন ও বৃহৎ নগর। নগর বক্ষে কয়েকটি বড় বড় পেগোডা (বুদ্ধমন্দির) বিদ্যমান। যেদিন আমরা সেখানে পঁহুছিয়াছিলাম, তাহার পূর্ব্বদিন তথাকার বৌদ্ধগণ বিশেষ উৎসব করিয়াছিলেন, তাঁহারা চক্রযুক্ত মঞ্চের উপর একটি প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক মহা ঘটা করিয়া রাজ পথ দিয়া নগরের ইতস্ততঃ টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। আমরা পথপ্রান্তে সেই সকল প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলাম; টাঙ্গুর কোন্ কোন পেগোডার শীর্ষভাগ সমুজ্জ্বল সুবর্ণে মণ্ডিত। বর্ম্মদেশে সোণার আকর আছে, কখন কখন ঐরাবতী নদীর সিকতাময় পুলিনে স্বর্ণরেণু বিকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। সুবর্ণ সহজ প্রাপ্য বলিয়া তথাকার বৌদ্ধগণ বুদ্ধমন্দিরকেও সুবর্ণমণ্ডিত করিয়া থাকে। টাঙ্গুনগরে একজন সাহেব বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া পরে ফুঙ্গি হইয়াছিলেন। তিনি লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে তথায় দুইটি পেগোডা নির্ম্মাণ করিয়া পর-

বৌদ্ধ ধর্ম্মযাজক ফুঙ্গী।

লোক গমন করিয়াছেন। সাহেব ফুঙ্গি বা সাহেব বৌদ্ধ বর্ম্মদেশের অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

বুদ্ধদেবের জন্মভূমি, সাধন ও প্রচার ক্ষেত্র আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি ভারতবর্ষ। তিনি ভারতবর্ষীয় মহাতপা পরিব্রাজক আর্য্যপুরুষ ২৫০০ পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি আর্য্যভূমি ভারতের নানা স্থানে সশিষ্য নির্ব্বাণধর্ম্ম প্রচার করিয়া বৃদ্ধ বয়সে জীবনলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। ভারতের সর্ব্বত্র বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার হইয়াছিল, লক্ষ লক্ষ লোক এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। বুদ্ধদেবের তিরোধানের কয়েক শত বৎসর পরে ভারতের সম্রাট্ মহাত্মা অশোক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া নবীন উৎসাহ ও তেজ সহকারে সর্ব্বত্র এই ধর্ম্ম প্রচার এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের মহা মহা কীর্ত্তি সকল স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রথমে বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূল ভারতে দৃঢ় বদ্ধ হইয়াছিল। আজ ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম বিলুপ্ত, এদেশে বৌদ্ধমণ্ডলী নাই বলিলেই হয়।

বুদ্ধ দেব বেদশাস্ত্রের ভ্রান্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তিনি হিন্দু ধর্ম্মবিহিত যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ড মানিতেন না। তজ্জন্য তাঁহার মতাবলম্বী ও অনুগামী বৌদ্ধ সম্প্রদায় হিন্দুদিগের বিশেষ বিদ্বেষভাজন হয়। স্বার্থপর হিন্দু ধর্ম্মযাজকগণ তাঁহাদের সম্বন্ধে ঘোরতর শত্রুতা আরম্ভ করে। তাহাদিগকে ঈশ্বরবিরোধী নাস্তিক বলে, তাহারা বৌদ্ধ ধর্ম্মাশ্রিত নিরীহ লোকদিগকে নিপীড়ন ও হত্যা করিতে থাকে। বৌদ্ধগণ বিধর্ম্মী নাস্তিক, তাহাদের মুখ দর্শনে পাপ, যেস্থানে পাইবে তাহাদিগকে বধ করিবে, তাহাতে কোন পাপ হইবে না। বুদ্ধ মন্দিরে গমন আর শুণ্ডিকালয় গমন তুল্য পাপ, হিন্দুধর্ম্ম যাজকগণ এইরূপ ঘোষণা করে। তাহারা হস্তীর পদতলে পতিত হইয়া বরং প্রাণত্যাগ করিবে, তথাপি বুদ্ধমন্দিরে প্রবেশ করিবে না এরূপ ঘোষণা করিয়াছেন।

হিন্দুদিগের দ্বারা নানা প্রকারে নিপীড়িত হইয়া শত সহস্র নিরীহ নির্দ্দোষ বৌদ্ধ নিহত হন। হিন্দুদিগের নিষ্ঠুরাচরণে ভারতবর্ষে ভগবান্ বুদ্ধ দেবের রাজত্ব বিলুপ্ত হয়। শাস্ত্রে লিখিত আছে;—

"ধর্ম্মপ্রচারক, আপনার দেশ, আপনা গৃহ ও আপনার প্রতিবেশীদিগের নিকটে ব্যতীত অন্য কুত্রাপি শ্রদ্ধা বিবর্জ্জিত হন না।"

পরিশেষে এই সত্য প্রমাণিত হইল। হিন্দুদিগের অত্যাচারে বুদ্ধ দেব সশিষ্য ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন, কিন্তু তিব্বত তাতার চীন জাপান্ বর্ম্মাদেশ শাম সিংহল, প্রভৃতি বড় বড় দেশ ও বড় বড় দ্বীপ উপদ্বীপে তিনি সমাদৃত হইলেন, সেই সকল দেশে তাঁহার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল, সেই মহাস্থানে বৌদ্ধধর্ম্মানল প্রবলভাবে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সেই সকল দেশে শত শত স্বুবর্ণ মণ্ডিত বুদ্ধমন্দির গগনমার্গে মস্তক উত্তোলনপূর্ব্বক জয়স্তম্ভস্বরূপ হইয়া বুদ্ধদেবের রাজত্ব ঘোষণা করিতেছে। শত সহস্র সংসারত্যাগী চির কৌমার্য্যব্রতধারী পুরুষ ধর্ম্মযাজনে জীবন উৎসর্গ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছেন। ভারত-

সম্রাট্ মগধরাজ অশোকের সাম্রাজ্য কালে অশেষকষ্টসহিষ্ণু পরম বৈরাগী জ্বলন্ত উৎসাহানলে প্রদীপ্ত বৌদ্ধপ্রচারকগণ দলে দলে অভ্রভেদী দুর্লঙ্ঘ্য গিরি শিখর উল্লঙ্ঘন, ভীষণতরঙ্গাকুল দুস্তর জলধিবক্ষ অতিক্রম করিয়া, দূরপ্রসারিত নিবিড় অরণ্যানী পার হইয়া সুদূর দেশে এবং দ্বীপ ও উপদ্বীপে, প্রাণপনে শান্তি ও নির্ব্বাণের সুসমাচার প্রচার করিয়াছিলেন। সেই প্রচারের ফলে অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন কোটি কোটি নর নারী বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করে। অশোকরাজের প্রিয়তম পুত্র কুমার মহেন্দ্র রাজধানী পাটলীপুত্র নগর হইতে সদলে সিংহল দ্বীপে যাইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহা কর্ত্তৃক উক্ত দ্বীপের রাজা প্রজাবর্গ সহ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ভগিনী রাজকুমারী দেবী সঙ্ঘমিত্রা কতিপয় পরিব্রাজিকা মহিলা সহ তথায় গিয়াছিলেন। সিংহলের রাজ্ঞী তাঁহার নিকট ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সিংহলের অনুরাধাপুর নগরে তাহার কোন কোন কীর্ত্তি এক্ষণও বিদ্যামান। পৃথিবীতে খ্রীষ্টবাদী সম্প্রদায় ও মোসলমান সম্প্রদায়ের লোক সংখ্যার তুলনায় বৌদ্ধদিগের সংখ্যা অনেক অধিক। বৌদ্ধধর্ম্মের কোনরূপ বাহ্যাকর্ষণ নাই, হৃদয়মুগ্ধকর সঙ্গীতাদি পর্য্যন্ত নাই, কেবল ধ্যান সমাধি আত্মসংযম আধ্যাত্মিক নিয়ম বিধি পালন, সুনীতি ও চরিত্রসাধনই ধর্ম্মসাধনের প্রাণ। এই রূপ আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের ঈদৃশ বিস্তৃত প্রচার বিস্ময়ের ব্যাপার বলিতে হইবে। বোধ করি প্রচারকদিগের উচ্চজীবন, আত্মত্যাগ দয়া প্রেম ও বৈরাগ্য দেখিয়া সকলে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল!

বুদ্ধদেব ভিক্ষু পরিব্রাজক সন্ন্যাসী ছিলেন, দীনতা তাঁহার জীবনের ব্রতছিল। তিনি ভিক্ষান্নে প্রাণ ধারণ করিতেন। বুদ্ধদেব কপিলবস্তু নগরে শাক্য রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, রাজ কুমার ছিলেন, কিন্তু যৌবন কালেই তিনি রাজ্য সম্পদ তুচ্ছ করিয়া নরনারীর পাপ তাপ দুঃখ ক্লেশ নিরসন করিবার জন্য নিজে দুঃখব্রত গ্রহণপূর্ব্বক দীন ভিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট গৃহ ছিল না,তিনি শিষ্যবর্গ সহ বেণুবনে বা আম্রবনে বাস করিতেন, তিনিও তাঁহার অনুগামী পরিব্রাজকগণ চীররসন পরিয়া থাকিতেন। তাঁহাদের শয়নের জন্য সুখশয্যা ছিল না, সাংসারিকতা ও বিলাসিতার সঙ্গে কোন রূপ সম্বন্ধ ছিল না। আজ বর্ম্মদেশে যাইয়া দেখ, বুদ্ধ দেবের প্রতিমূর্ত্তির কত ঐশ্বর্য্য আড়ম্বর; তাঁহার জন্য সুবর্ণমণ্ডিত সুবিশাল মন্দির,সেই মূর্ত্তির কণ্ঠদেশে ও বক্ষঃস্থলে কত মণিমুক্তা ঝল মল করিতেছে। যিনি রাজপ্রাসাদ,রাজবেশে ভূষিত শয্যাদি এবং রাজৈশ্বর্য্য তুচ্ছ করিয়া জীবের পরিত্রাণ ও দুঃখনিবৃত্তির জন্য নিজে দীন দুঃখীর বেশে দেশে দেশে প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছেন, তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যগণ ভক্তির আতিশয্যবশতঃ তাঁহার প্রতিমূর্ত্তিকে রাজবেশে সাজাইয়াছে। মহামুনি শাক্য সিংহের প্রচারিত নির্ব্বাণধর্ম্মের কেমন বাহ্যিক বিকৃত অবস্থা। সেই আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম বিস্রম পৌত্তলিকতার

পরিণত। সাধারণ বৌদ্ধ স্ত্রী পুরুষ ভোগ-বিলাসসাগরে নিত্য নিমগ্ন। তবে বৌদ্ধধর্ম্ম-যাজক ফুঙ্গিদিগের বৈরাগ্য-প্রধান জীবন। তাঁহারা সংসারত্যাগী, চিরকৌমার্য্যব্রতধারী ভিক্ষান্ন ভোজী। তাঁহারা দিবার্দ্ধভাগ ১২টার মধ্যে ভোজন করেন, তৎপর আর ভোজন করেন না, ফুঙ্গিগণ অর্থচিন্তা ও অর্থ স্পর্শ করেন না; নারীজাতির সঙ্গে কোন রূপ সম্পর্ক রাখেন না, শাস্ত্রাধ্যয়ন ও সাধন ভজন করেন। তবে সকলেরই যে উচ্চ জীবন ইহা বলা যায় না। তাঁহারা পীতবর্ণের ত্রিবস্ত্র পরিধান করেন,—কৌপীন বহির্ব্বাস এবং গাত্রাচ্ছাদন। তাঁহাদের বস্ত্রকে কাষায় বস্ত্র বলে। তাঁহাদের মস্তক মুণ্ডিত, তাঁহারা গোঁপ শ্মশ্রু ধারণ করেন না। তাঁহাদের অনেকে ঔষধ পথ্যাদিদানে রোগীদিগের সেবা করিয়া থাকেন। কবিরাজী চিকিৎসার ন্যায় তাঁহাদের চিকিৎসাপ্রণালী, অনেকটা হাতুড়ে বৈদ্যের মত চিকিৎসা। তাঁহারা একাকী বা পাঁচ সাত জন মিলিয়া এক গৃহে বাস করেন। তাঁহাদের বাস-গৃহকে চাঁও বলে। ফুঙ্গিচাঁও সুদৃশ্য এবং সচরাচর দারুনির্ম্মিত হয়। গৃহস্থ বৌদ্ধ-গণ ফুঙ্গিদিগের জন্য বহু অর্থ ব্যয়ে প্রশস্ত স্থানে চাঁও নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের প্রতি গৃহস্থ বৌদ্ধদিগের প্রগাঢ় ভক্তি। ফুঙ্গি দেখিলেই তাহারা ভক্তিপূর্ব্বক মস্তক অবনত করিয়া সেকো (প্রণাম) করে, এবং তাঁহাদিগকে জীবন্ত ভগবান্ বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে। ক্রমে ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকায় ছয় সংখ্যায় বর্ম্মদেশের বৌদ্ধধর্ম্ম ও ফুঙ্গিদিগের বিবরণ প্রকাশ করা গিয়াছে। মহিলাপত্রিকা ধর্ম্মবিষয়ে গভীর আলোচনার উপযুক্ত নহে।

গতবারে বর্ম্মদেশীয় বৌদ্ধ নারীদিগের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, এবার সেদেশের পুরুষদিগের কথা কিছু বলা যাইতেছে। পুরুষদিগের গোঁপ দাড়ী বিরল। তাহাদের মুখমণ্ডলে উহা কম জন্মে। গোঁপ শ্মশ্রু উদ্গত হইলেও প্রায় তাহারা উহা টানিয়া উঠাইয়া ফেলে, ক্ষৌরকারের সঙ্গে বড় সম্বন্ধ রাখে না। পুরুষেরা রঙ্গীণ কাপড়ের কোট ও লুঙ্গি পরে, মস্তকে সুচিক্কণ পট্টবস্ত্র জড়াইয়া থাকে, বাঙ্গালীদিগের ন্যায় নগ্ন মস্তকে থাকে না। তাঁহাদের ভোজ্য পরি-চ্ছদাদি সমুদায় স্বদেশী, বিলাতী ও বিদে-শীয় সঙ্গে তাহাদের প্রায় কোন সম্পর্ক নাই। তাহারা স্বদেশী বড় বড় চুরুটের ধূম পান করে, স্বদেশী ভাষায় পরস্পর কথা কহে, স্বদেশী বই পড়ে। সেদেশে কোথাও স্বদেশী বক্তৃতা ও স্বদেশী সঙ্গত এবং "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় না। সেজন্য অর্থব্যয়ে বেতন দান করিয়া বক্তা ও গায়ক নিযুক্ত করিতে হয় না। বিলাতী ভাষায় বক্তৃতা করিয়া, বিলাতে রচিত ও মুদ্রিত বই পড়িয়া, বিলাতের চিকিৎসায় চিকিৎসিত হইয়া ইংলিশ হোটেলে খানা খাইয়া বিলাতীবর্জ্জনের বক্তৃতা সেখানে হয় না, এ সকল অস্বাভাবিক অবস্থা সে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না। তথাকার লোকেরা নিরেট স্বদেশী। সাধারণতঃ পুরুষগণ অতিশয় নম্র ও বিনীত। পীনমানাতে উকিল বসন্তকুমারের সে দেশীয় একজন

কেরাণী আছে. সেই কেরাণী পঞ্চাশ টাকা বেতন পায়। তাঁহার মত নম্রপ্রকৃতি লোক আমরা কখনও দেখি নাই। বসন্তকুমারের সঙ্গে কথা কহিতে হইলে করজোড়ে অধোমুখে কথা কহে। তাঁহাকে হঠাৎ উপস্থিত দেখিলেই দণ্ডায়মান হয়, তাঁহার সঙ্গে তুল্য আসনে কখনও বসে না, নীচে বসে। বসন্তকুমারকে তক্ষিণ (প্রভু) তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে তক্ষিমা (প্রভুপত্নী) বলিয়া সম্বোধন করে, বিনীতভাবে সর্ব্বদা আজ্ঞার প্রতীক্ষায় থাকে। এরূপ প্রভুভক্তি কি কোন বাঙ্গালীর আছে? বাঙ্গালীরা প্রজা ও ভৃত্য হইলেও নবাবী চালে চলেন, উচ্চ পদস্থ সম্মানিত লোকদিগকে কথায় কথায় গর্ব্বিতভাবে গালি দেন, এবং কুৎসা নিন্দা করিয়া থাকেন।

টাঙ্গুতে শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথের আলয়ে প্রতিদিন সন্ধ্যার পর প্রার্থনা ও সঙ্গীত হয়, গৃহকর্ত্রীও তাহাতে যোগদান করেন। সুরেন্দ্রনাথ হারমনিয়ম যোগে সঙ্গীত করিয়া থাকেন। ডাক্তার নকুড় বাবু জরাপূর্ণ বার্দ্ধক্যে আক্রান্ত, তাঁহার মস্তিষ্ক দুর্ব্বল। দুর্ব্বলতাবশতঃ তিনি পূর্ণ উপাসনা নিজে করিয়া উঠিতে পারেন না। তজ্জন্য তিনি সঙ্গীত প্রার্থনারই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমরা যাইয়া তৎসঙ্গে কিছু শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা এবং সংক্ষিপ্ত আরাধনার যোগ করিয়াছিলাম। পূর্ব্বাহ্ণে ডাক্তার বাবুর সঙ্গে আমাদিগকে পূর্ণ উপাসনা করিতে হইয়াছে। তখন উকিল সুরেন্দ্রনাথ মক্কেলের সঙ্গে বিষয়চর্চ্চা করিতেন, তাঁহার সময় হইয়া উঠিত না। আমাদের একজন ব্রাহ্মবন্ধু গাজীপুরে প্রধান উকিল। লোকে বলে তিনি মক্কেলদিগের প্রতি অত্যাচার করেন, অর্থাৎ তিনি পূর্ব্বাহ্ণে দুই ঘণ্টার অধিক নিজের গৃহে মক্কেলদিগকে থাকিতে দেন না; সাড়ে আট বা ৯টার সময় সপরিবারে উপাসনা করেন; সেই সময় হইতে সমস্ত দিন ও রাত্রি গৃহে বিষয়চর্চ্চা করেন না। কোর্টে যত ক্ষণ থাকেন তত ক্ষণ তাঁহার সঙ্গে বিষয়ের সম্বন্ধ থাকে। তিনি পরিবারমধ্যে ধর্ম্মকে ছোট করিয়া সংসারকে বড় করিতে রাজি নহেন। কোন মোকদ্দমা অসত্য ও অন্যায়ের সঙ্গে যোগ আছে বুঝিতে পারিলে উক্ত উকিল বাবু তাহার সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন না। অথচ তিনি সেখানে সম্ভ্রান্ত বড় উকিল, তাঁহার অতিখ্যাতি ও সম্মান। প্রায় প্রতিমাঘোৎসবেই তিনি সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়া উৎসবে যোগ দিয়া থাকেন। কিন্তু বর্ম্ম দেশের অনেক স্থানে ব্রাহ্ম উকিলদিগকেও দেখা গেল তাঁহারা দিবারাত্রি বিষয়সাগরে নিমগ্ন। অর্থচিন্তা ও অর্থপ্রসঙ্গ ছাড়া ধর্ম্মচিন্তা পূজার্চ্চনাদির সঙ্গে তাঁহাদের বড় সম্পর্ক নাই। তাঁহাদের পরিবারমধ্যে সংসার ও অর্থের আদর, ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের আদর নাই; ধর্ম্ম ছোট সংসার বড়।

টা[illegible] বিবরণ এবার আমরা লিখিয়া শেষ করিতে পারিলাম না। আগামীতে সমাপ্ত করিবার সঙ্কল্প।

কল্যাণপ্রসু নারীগণ।

২য়।

ক্ষুদ্র একটি বীজ হইতে যেমন প্রকাণ্ড

একটি বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া বৃহৎ অরণ্যের সৃষ্টি করিতে দেখা যায়, তদ্রূপ মানব হৃদয় নিহিত সামান্য একটি সাধু ইচ্ছা বা কল্যাণ কামনা হইতে জগতের অশেষবিধ মঙ্গল অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হইয়াছে। আমরা গতবারে দেখিয়াছি নারী... ...কটি সাধু সং...ল্প হইতে কিরূপে নূতন মহাদেশ আমেরিকা আবিষ্কার ব্যাপারের সহায়তা হইয়াছিল, এখন আমরা সেইরূপ আর একটি শুভকামনা হইতে কি প্রকার কল্যাণপ্রসূত হইয়াছে তাহার আলোচনা করিব। হৃদয়ে প্রেম এবং মনে দৃঢ়তা থাকিলে মানুষের কোন কাজই আটকায় না, সময়, অর্থ, লোকবল ইত্যাদির অভাব কিছুই সাধুকার্য্যের ব্যাঘাত ঘটাইতে পারে না। রাজরাণীও যাহা করিতে পারেন গরিবের মেয়েও তাহা পারে। রাজরাণীর কথা আমরা প্রথম প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি আজ একটি গরিবের মেয়ের কথা বলিব।

ইংলণ্ডের উত্তরে স্কটলণ্ড দেশ। তথায় গ্লাসগো নামে একটি নগর ব্যবসা বাণিজ্য ও কলকারখানার জন্য বিখ্যাত। সেই নগরের একটি কারখানায় মেরী ...নক্রাফ নামে একটি গরিবের মেয়ে কাজ করিত। আমাদের দেশে যেমন আজকাল বড় বড় কলকারখানায় হাজার হাজার গরিব পুরুষ, স্ত্রী, যুবক, যুবতী ও বালক বালিকা কাজ করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করে, ঐ সকল দেশেও সেইরূপ করে। মেরী আন্ গরিবের মেয়ে বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয় বহু ধন সম্পদশালীর হৃদয় অপেক্ষাও উচ্চ ও মহৎ, এবং ঈশ্বরভক্তি ও পরোপকার কামনায় পরিপূর্ণ। জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নানা শ্রেণীর স্ত্রীপুরুষের সঙ্গে কঠোর প্রতিযোগিতাতেও তাঁহার নারী সুলভ কোমলতা ও স্নেহ প্রেম প্রাণের মধ্যে সদা বর্ত্তমান। এ চল্লিশ বৎসরেরও পূর্ব্বের কথা, একদিন তাঁহার মনে হইল কারখানায় যে সকল বালক কাজ করে, তাহাদের অধিকাংশ সুশিক্ষার অভাবে মন্দ দিকে যাইতেছে, এবং অল্প বয়সেই নানা পাপে অভ্যস্ত হইতেছে। তিনি স্থির করিলেন ইহাদিগকে সুপথে আনিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন, ইহা স্থির করিয়া অমনি কাজে লাগিয়া গেলেন। কারখানার অধ্যক্ষের অনুমতি লইয়া তথাকার একটি ঘরে রবিবার দিন তিনি কয়েকটি বালককে জড় করিলেন। তাহাদের শরীরে ময়লা, কাপড় জীর্ণশীর্ণ, রবিবারে তামাক খাইয়া ছুটাছুটি ও বিশ্রাম আমোদ আহ্লাদে তাহাদের সময় কাটিত। তিনি বালকদিগকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া লেখাপড়া শিখাইতে লাগিলেন এবং ক্রমে ধর্ম্মভীরু করিয়াও উঠাইলেন। যাহারা পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইত এবং নানা প্রকার দুষ্টামি ও কু অভ্যাসে সময় নষ্ট করিত, তাহারা কিছু দিনের মধ্যে এমনি তাঁহার বাধ্য হইয়া পড়িল যে তাঁহার প্রভাবে তাহারা সকল মন্দ অভ্যাস ছাড়িল, পরিশ্রম সচ্চরিত্রতা এবং আচরণে ইহারা এখন কারখানার দৃষ্টান্ত স্থানীয়। অল্প দিনের মধ্যে মেরী আনের বালকদের সুখ্যাতি সর্ব্বত্র রটিয়া গেল। সহজে কি তাহাদের এরূপ পরি-

বর্ত্তন ঘটিয়াছিল ? তাঁহার স্নেহ-প্রবণ হৃদয় সর্ব্বদা তাহাদের মঙ্গল সাধনে রত থাকিত। তিনি তাহাদের বিষয় কত ভাবিতেন, কত তাহাদিগকে সহানুভূতি ও সাহায্য করিতেন, নিজের কাছে বসাইয়া পড়াইতেন, লেখাইতেন এবং রবিবার ভিন্ন অন্য দিনও সুযোগ পাইলে বাড়ী বাড়ী যাইয়া নানা বিষয়ে সাহায্য করিতেন। অতি প্রত্যুষে কারখানার ভোঁ ভোঁ শব্দে অন্য সকলে জাগিবার পূর্ব্বে তিনি শয্যাত্যাগ করিতেন, সারাদিন অক্লান্ত দেহে পরিশ্রম করিয়া নিজের অন্নসংস্থান করিয়াও যে অল্প সময় অবসর পাইতেন সেই সময় দুঃখী বালকদের সেবা ও সাহায্যে অতিবাহিত করিতেন। ইহাতে তাঁহার কত যে আনন্দ হইত অন্যের পক্ষে তাহা বুঝা দুঃসাধ্য। কত লোকের বিপুল অর্থ রহিয়াছে, সময় আছে, উৎকৃষ্ট শিক্ষা ও সুযোগ আছে, কিন্তু থাকিলে কি হয়, এক হৃদয়ের অভাবে তাঁহারা শতাংশের এক অংশও সময় কি পরের সেবাতে ব্যয় করিয়া থাকেন ? পৃথিবীতে সকল কাজের গোড়াতেই প্রেম থাকা চাই, তাহা না হইলে পরের দুঃখ কে মাথায় বহিতে পারে, পরের জন্য কে আপনার স্বাস্থ্য ও সুখ বিসর্জ্জন দিতে পারে ? মেরী আন্ কারখানার ঘণ্টাধ্বনি শুনিবামাত্র ঠিক সময়ে কাজে উপস্থিত হইতেন এবং শীতে ও অন্ধকার রাত্রি যখন অধিকাংশ লোক সুখে নিদ্রাভিভূত থাকিত তখনও তিনি ইহার উহার বাড়ী যাইয়া সেবাব্রত পালন করিতেন। এইরূপে তিন বৎসর অকাতরে সেবাব্রত পালন করিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইলে তখন তিনি এই গুরুতর কার্য্যভার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু যে বীজ বপন করিয়াছিলেন তাহা অচিরে প্রচুর ফল প্রদান করিল। গ্লাসগো নগরে কিছু দিনের মধ্যেই কারখানার বালকদের ধর্ম্মশিক্ষার জন্য একটি বৃহৎ সমিতি স্থাপিত হইল। ছয় বৎসরের মধ্যে উহাতে ১৪ হাজার বালক বালিকা যোগদান করিয়াছিল, উহাদের শিক্ষার ভার দুই শত ভদ্রলোক গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বালকদের মধ্যে দেড় হাজার 'মনিটার' বা উপশিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিল। সহরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে শাখাসমিতিতে, উপদেশ, বক্তৃতা, ধর্ম্মশিক্ষা, লেখাপড়া ইত্যাদির ব্যবস্থা হইত। সেভিংব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া ইহাদিগকে পরিমিত ব্যয়িতা শিক্ষা দেওয়া হইত, সঙ্গীত বাদ্যযোগে শনিবার রাত্রে তাহাদিগের জন্য পবিত্র আমোদের ব্যবস্থা হইত। গ্রীষ্মকালে বালক বালিকারা তাহাদের দলের অভিভাবকসহ মধ্যে মধ্যে গ্রামে ছুটি ভোগ করিতে যাইত। এই সকল বৃহৎ ব্যাপারে নিযুক্ত কর্ম্মচারিগণ অধিকাংশই ভোলাণ্টিয়ার বা স্বতঃপ্রবৃত্ত লোক, কেবলমাত্র উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষার নিমিত্ত বেতনগ্রাহী শিক্ষক নিযুক্ত হইতেন।

অলস, বিলাসপ্রিয় ও কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন পরিবারের মধ্যে দেখা যায় কি ? সম্পন্ন গৃহস্থের পরিবারে মেয়েরা আপনাদের সাজসজ্জা, আমোদ আহ্লাদ ও একাজ সেকাজ প্রভৃতিতে এমনি মত্ত যে তাঁহাদের সময় কই যে তাঁহারা নিজের কি পরের পরি

বারের দুচারটি ছেলে মেয়েকে লইয়া দুটি ভাল কথা বলেন, ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা দেন? তাঁহাদের শরীরে রোগ আছে, ভোগ বিলাস আছে, হাসি গল্প আছে, পরনিন্দা আছে, ঝগড়া বিবাদ আছে, বাড়ী বাড়ী বেড়ান আছে ইত্যাদি কত শত কাজ আছে, তাঁহাদের অবসর কই যে তাঁহারা গরিব দুঃখীর কি নিজের ছেলেপিলের বিষয় ভাবেন বা তাহাদের জন্য কিছু করেন? অনেক পরিবারে মেয়েদের যথেষ্ট পরিশ্রমের কাজ না থাকায় তাহাদের শরীর অকর্ম্মণ্য ও মন অসাড় হইয়া যায়, অথচ তাঁহারা বলেন সময় কোথায় যে পরসেবাব্রত পালন করি? অবশ্য এ কথা স্বীকার্য্য যে গায়ের জোরে কোন কাজ হয় না. আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি হৃদয়ে প্রেম ও মনে দৃঢ়সঙ্কল্প থাকিলে ঈশ্বর তাহার মনস্কামনা পূর্ণ করিবার সুযোগ ও সুবিধা করিয়া দেন। যদি এ বিষয়ের কেহ প্রমাণ চাহেন, মেরী আন্ ক্লাফের জীবন আলোচনা করিতে আমরা তাঁহাকে অনুরোধ করি।

কুমারী বাসন্তী।

হামিদার পর আর একজন চলিয়া গেলেন। ইনি কুমারী বাসন্তী। ইনি এক গরিব হিন্দু পরিবারের মেয়ে। বিধাতার ব্যবস্থায় ব্রাহ্ম পরিবারের মধ্যে পড়িয়া ছিলেন। জীবনের উষাকালে মাতৃহীনা হইয়া বৃদ্ধ বিকলাঙ্গ পিতার স্নেহের ক্রোড়ে প্রথমে লালিতা পালিতা হইয়া ছিলেন, তৎপরে পিতার প্রতিকূল অবস্থানিবন্ধন কয়েকটী ব্রাহ্মবন্ধু ইহার লালন পালন ও শিক্ষাভার গ্রহণ করেন। অবশেষে বাঁকিপুরস্থ অঘোর পরিবারের তত্ত্বাবধানে ইহার জীবনপথ ক্রমশঃ আরও খুলিয়া আসিতেছিল। শিক্ষা ও নৈতিক উন্নতি ইহার জীবনকে ক্রমবিকাশের দিকে অগ্রসর করিতেছিল। পিতার প্রতিকূল অবস্থানিবন্ধন ইহার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি বন্ধু বান্ধব দিগের সাহায্য সাপেক্ষ ছিল, পাটনা মিউনিসিপালিটী ও অত্রত্য ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ কমিং মহোদয় ইহার শিক্ষোন্নতি-সম্বন্ধে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। বাঁকিপুরে উচ্চ শ্রেণী ইংরাজি বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। বিগত ফেব্রুয়ারি মাসে ভীষণ দুরারোগ্য ক্ষয়কাশ রোগে আক্রান্ত হইয়া শ্রীমতী বাসন্তী বিগত ১লা এপ্রেল তারিখে বারাণসী নগরে সন্ন্যাস-ধর্ম্মাবলম্বী পিতার সন্নিধানে পরলোক গমন করিয়াছেন। সপ্তদশ বর্ষীয়া বাসন্তীর ভিতরে যে একটা ধর্ম্মজীবনের বিকাশ লক্ষণ অস্ফুটাকারে দেখা দিতেছিল তাহার আর সন্দেহ নাই। শৈশবে অদ্ভুত পিতৃভক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। অপূর্ণ বয়সে যখন ২।১ জন ব্রাহ্মবন্ধুর তত্ত্বাবধানে অবস্থিতি করিতেন তাঁহার সেই অদম্য পিত্রানুরাগ তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিত। তিনি সময়ে সময়ে তত্ত্বাবধায়কের অজ্ঞাতসারে পিতৃভবনে পলাইয়া আসিতেন। তাঁহার দরিদ্র পিতা সে সময়ে অন্নদীর দাতাগণের সাহায্যে বাঁকিপুরে

এক সামান্য ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বাস করিতেন। শৈশব অতিক্রমের পরও তাঁহার ভিতরে অচলা পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখা গিয়াছিল। অঘোরপরিবারে অবস্থান কালেও দুঃখী পিতার জন্য তাঁহার ব্যস্ততা ও অনুরাগের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। পিতার বাঁকিপুর ও তৎপরে বেণারসে অবস্থান কালে যখন পিতার সামান্য অসুখের সংবাদ শ্রবণ করিতেন পিতৃভক্তিপরায়ণা বাসন্তী অমনই ভয়ানক অস্থির হইয়া পড়িতেন। এমন কি মৃত্যুর অল্পদিন পুর্ব্বে যখন অঘোর পরিবারে সঙ্কটাপন্নরূপে পীড়িতা, দুঃখিনী বাসন্তী সর্ব্বদাই সমবয়স্কদিগের নিকটে বলিতে থাকিতেন যে পিতার স্বর্গারোহণের পূর্ব্বেই যেন তাঁহার পরলোকগমন ঘটে। পিতৃভক্তিজনিত ব্যস্ততাই তাঁহাকে শেষে কাশীধামে পিতৃ সন্নিধানে উপস্থিত করিয়াছিল। দুঃখিনী বাসন্তীর ভিতরে উচ্চশিক্ষা লাভের আকাঙ্ক্ষাও খুব প্রবল ছিল। বাঁকিপুরে রোগ শয্যায় শায়িতাবস্থাতেও বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর নিকট দৈনিক পাঠ্য বিষয়ের তত্ত্ব গ্রহণ করিতেন। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদিগের প্রতিও খুব ভালবাসা ছিল। অবস্থার প্রতিকুলতাবশতঃ ছোট ছোট মেয়েদের জন্মদিন উপলক্ষে উপহার দিবার তাঁহার কিছুই ছিল না। তাঁহার সামান্য পদ্য রচনার একটা ক্ষমতা ছিল, তাহাই তিনি রচনা করিয়া তাহাদিগকে উপহার দান করিতেন। এক সময়ে তিনি অঘোরপরিবারস্থ খণা মাইটানুগেল নামক শিশু কন্যার জন্মদিন উপলক্ষে একটী ক্ষুদ্র পদ্য রচনা করিয়া উপহার দান করিয়াছিলেন সে পদ্যটী এখনও সেই শিশুকন্যা কর্ত্তৃক সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। আজ সে ক্ষুদ্র পদ্যটীর অবিকল অনুলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল। আশা করি শ্রদ্ধেয়া পাঠিকা ভগ্নীদিগের নিকট ইহা অনাদরের বস্তু হইবে না।

"কি দিই তোমারে আজ শুভ জন্মদিনে,
ভাবিতেছিলাম বসি তাই মনে মনে,
হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা দিই দয়াময়ে,
করুণার উৎস আজ ফুটুক হৃদয়ে,
যিনি এ সুন্দর হাসি সুন্দর আননে,
দিয়াছেন জ্ঞান বুদ্ধি হৃদয় কাননে,
ভাল মেয়ে হও তুমি এই অনুরোধ,
স্বদেশ উজ্জ্বল ক'রে কর ঋণ শোধ,
পরমেশ পদে আজ এই ভিক্ষা চাই,
সুপথে ভ্রমণ তুমি করো সর্ব্বদাই,
পিতৃ মাতৃ আজ্ঞা সদা শিরোধার্য্য করি,
ভক্তি করো সদা সবে হরিপদ স্মরি,
আশীর্ব্বাদ করো পিতঃ প্রিয় ভগ্নীধনে,
তব প্রতি যেন মতি থাকে সর্ব্বক্ষণে।
তোমার বোন বাসন্তী।

আজ সে প্রিয় কন্যা বাসন্তী কোথায়? আজ তাঁহার পবিত্র চিতাভস্ম পবিত্র কাশীধামে ঋষি তপস্বীদিগের চিতাভস্মে মিশ্রিত! বিগত ১লা তারিখে ঋষিজনবাঞ্ছিত বারাণসীবক্ষে সন্ন্যাস-ব্রতধারী পিতৃকক্ষে তাঁহার প্রাণবায়ু বিনির্গত হইয়াছে।

মহিলাদিগের রচনা।

পরলোকগত সাধু সাধ্বী।

(স্বর্গগতা হামিদা দেবী কর্ত্তৃক বিরচিত।)

কেহ যেন মৃতদিগের জন্য শোক প্রকাশ না করে। তাঁহারা তাঁহাদের কাজ শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, আমাদের এখনও বাকী রহিয়াছে, তবুও কি আমাদের বলিতে ইচ্ছা হয় যে আমাদেরও কাজ শেষ হউক, আমরাও তাঁহাদের মত পরলোকে চলিয়া যাই। মৃত্যু কি ভয়ঙ্কর! ইহার কি এক আকর্ষণী শক্তি আছে, যাহা আমার সমস্ত আত্মাকে কম্পিত করে এবং মনে হয় যেন আমাকে ইহার দিকে টানে। মৃত্যুর চক্ষে কি এক মোহিনী প্রভা আছে যা আমাকে স্তম্ভিত করে দেয়।

প্রকৃত পক্ষে মৃত্যু হইতে জীবনকেই আমাদের বেশী ভয় করা উচিত। কারণ জীবন, এবং জীবনের অন্তর্গত যা কিছু চিন্তা, ভাষা, কার্য্য, এবং ইচ্ছা, মৃত্যু হইতে অধিকতর গভীর এবং ভয়ানক রহস্যে পরিপূর্ণ। জীবনেই ভাল মন্দের সংগ্রাম। জীবনেই পাপের আসর এবং ক্ষমতা। এখানে কোন বিশ্রাম নাই, কোন আশ্রয় নাই, নিরাপদ অবস্থা নাই। এই ক্ষুদ্র চঞ্চল অপব্যয়িত মানব জীবন কি দায়িত্বে পরিপূর্ণ? ইহার প্রত্যেক মুহূর্ত্তে আমাদের হয় ভাল না হয় মন্দ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। আমরা আরও ভাল হইতেছি, অথবা মন্দ হইয়া পড়িতেছি। ভগবানের আরও নিকট হইতেছি, অথবা তাঁহা হইতে আরও দূরে চলিয়া যাইতেছি, স্বর্গ অথবা নরকের সান্নিধ্য লাভ করিতেছি। নশ্বর জীবনের এই সকল পরিবর্ত্তন এবং সম্ভাবনায় কাহার না ভীতি উৎপাদন করিবে? আমার যদি সংকল্প অতি দৃঢ়ও হয় তথাপি আমি যে ভীত হইব না তা বলিতে পারি না। কে বলিতে পারে এই মুহূর্ত্ত হইতে এবং মৃত্যু অবধি আরও কত কি ঘটিবে? কত অজানিত বিপথগমন, কত স্খলন, কত অধঃপতন আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে। কে বলিতে পারে এই সমস্ত অবস্থার মধ্যে অধ্যবসায় গুণে কেহ রক্ষা পাইবে? কে এমন আছে যে আপনি আপনার নিকট প্রতারিত হইবার আশঙ্কা না রাখে? অতএব আমরা জীবনকে ভয় করিব, এবং মৃত্যুর আশঙ্কা রাখিব না।

যাঁহারা শান্তিধামে চলিয়া গিয়াছেন, চিন্তা যোগে এস আমরা তাঁহাদিগের সহিত আরও অধিক নৈকট্য লাভ করি। তাঁহারা আমাদিগের আগমনের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছেন। কারণ আমাদিগকে ছাড়িয়া তাঁহারা পূর্ণতা লাভ করিতে পারিবেন না। অতএব এস আমরা তাঁহাদিগকে স্মরণ করি, তাঁহাদিগের প্রতি অনুরক্ত হই এবং তাঁহাদিগকে অনুসরণ করি। আমাদের স্বর্গস্থ প্রিয়গণ এখনও সেইরূপই নিকটে রহিয়াছেন। মোহান্ধ জীব আমরা, সহজে তাই তাহা অনুভব করিতে পারি না, তাঁহাদের দেখিতে পাই না। মনে করি আমাদের নিকট হইতে বহুদূরে তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা শরীরের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, আত্মার দিব্য জ্যোতিঃ

ধারণ করিয়াছেন। জীবনের যত দুর্ব্বলতা, ক্ষুদ্রতা, নীচতা সব চলিয়া গিয়াছে, তাঁহারা এখন উৎকৃষ্ট শক্তি লাভ করিয়াছেন, দিব্য আলোকে আলোকময় হইয়াছেন, ব্যাকুল প্রেমে আচ্ছন্ন হইয়াছেন। পতিত মানবের উর্দ্ধে উচ্চ অবস্থা লাভ করিয়া দিব্যধামবাসীদিগের সৌসাদৃশ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। তবুও কেন আমরা মৃতদিগকে কৃপার চক্ষে দেখি? কেন তাঁহাদিগকে ভাগ্যহীন বলি? তাঁহাদের পরিত্যক্ত মাটির শরীরের জন্য কেন অশ্রুপাত করি? ইহাতে কি আমাদের লজ্জা বোধ হয় না যে জীবিতেরা কি না মৃতদিগকে দয়ার চক্ষে দর্শন করিবে? কি ভয়ঙ্কর আত্মম্ভরিতা? কি অন্ধ নির্ব্বুদ্ধিতা? বরং ইহাই হইতে পারে যে তাঁহারাই বিষাদে এবং আগ্রহাতিশয় সহকারে আমাদের কথা, এবং আমাদের শান্তিশূন্য ভারগ্রস্ত জীবনের কথা ভাবিতেছেন।

যদি লোকেরা এক অভিন্ন আধ্যাত্মিক বংশ পরম্পরাকে সম্মান করিতে স্বীকৃত হয়, তবে তাহাদের পরস্পরের সঙ্গে প্রায় মিলন হইয়া যায়, তাহাদের সঙ্কীর্ণতা দূর হয়; অহঙ্কার এবং আত্মম্ভরিতা চলিয়া যায়। হায়, আমরা ভগবানের মহিমার নাম করিয়া ও সত্যের প্রতি অনুরাগের ভাণ করিয়া অন্যের প্রতি এবং আমাদের নিজেদের প্রতিও কত বার কত সময়ে কত অসন্তোষ ও সঙ্কীর্ণতা আরোপ করিয়া থাকি, ইহাতে আমাদের কত নীচতার পরিচয় প্রকাশ পায়। চির নিদ্রায় যাঁহারা এখন নিদ্রিত তাঁহারা যদি তাঁহাদিগের জীবনগ্রন্থ হইতে আমাদিগকে এখন পড়িয়া শুনাইতেন, তাহা হইলে আমাদের স্বীয় জীবনের দৈন্য অনুভব করিয়া লজ্জায় একেবারে অভিভূত হইতে হইত। অতএব তাঁহাদের সম্মানার্থে এবং আমাদের নিজেদেরও হিতার্থে এই সামান্য সাধনে যেন কখনও আমরা কুণ্ঠিত না হই। প্রতিবৎসর শ্রদ্ধার সহিত যেন আমরা তাঁহাদের নামের স্মৃতি সূচক অনুষ্ঠান করিতে পারি। তাঁহারা যা ছিলেন তাহা যেন স্মরণ করি, তাঁহারা এখন যা হোয়েছেন তাহা যেন স্থির দৃষ্টিতে বিলোকন করি। তাঁহাদের যদি এখন কথা বলিবার শক্তি থাকিত তাহা হইলে তাঁহারা যে প্রকার আদেশ করিতেন তদনুসারে যেন জীবন যাপন করি, এবং তাঁহাদের জ্ঞাত আজ্ঞা সকল যেন জীবনে পালন করিতে পারি। তাঁহারা যে সমস্ত অনুষ্ঠানের আরম্ভ এখানে করিয়া গিয়াছেন আমরা যেন তাহা পূর্ণ করিতে পারি, এবং যে সমস্ত পবিত্র দায়িত্ব আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন তাহা যেন রক্ষা করি। তাঁহাদের মতন হওয়া, আর তাঁহাদের সঙ্গে বাস করা একই কথা, অতএব আমরা জীবনে যত পুণ্যলাভ করিতে পারিব ততই আমরা আমাদের পরলোকগত প্রিয়গণের নিকটবর্ত্তী হইব।

নব অভ্যাগত।

কে গো তুমি অয়ি ক্ষুদ্র মানবক সুকুমার?
এত দিন ছিলে কোন্ দেশে?
অস্তিত্ব ছিল কি আগে?

কি ছিলে? কেমন ছিলে?
শরীরী না অশরীরী বেশে?
কেন বা আসিলে হেথা?
এ স্নেহ সম্বন্ধ ডোরে
কেনইবা বাঁধিলে মোদের?
কয় মাস মাত্র আগে
কেহ তুমি ছিলে না কো
কোথাও ছিলে না জগতের,
আজ কোথা হ'তে আসি
মরমের মর্ম্ম স্থলে
পাতিয়াছ আসন আপন?
আজ তোমা বিনা যেন
উদাস ও অর্থ হারা
মনে হয় সমস্ত ভুবন।
বারেক হেরিতে তব
মুখের হাসিটী মধু
সরবস্ব দিতে যেন পারি।
অসুখ বেদনা যদি
কালিমা ঢালে ও মুখে
—নয়নে উথলে অশ্রু বারি।
কদিনের পরিচয় তবু মনে হয় কেন
আপনার চির জনমের?
তুমি যে ছিলে না কভু
মনেও করিতে ইহা
ব্যথা লাগে সাথে বিস্ময়ের।
ক্ষুদ্র পুষ্পকলি টুকু জনমে কেমন ধীরে
লোকের চক্ষুর অগোচরে,
কেমনে বিদীর্ণ করি শুভ্র আবরণ খানি
উষার প্রথম রবি-করে
কেমনে নির্ম্মল নীল
আকাশের তলে, খোলে
মুদিত নয়ন সন্তর্পণে;
তারি তরে বন শোভা
থাকে যেন অপেক্ষায়
পূর্ণ হয় তারি বিকশনে!
আমাদেরো গৃহখানি তব আগমনে যেন
লভিয়াছে শোভা সার্থকতা।
পরশি ও অঙ্গ যেন ধন্য মানি সমীরণ
চৌদিকে সঞ্চারে পবিত্রতা।
এস তুমি, এস তুমি,
হর্ষ আশা প্রীতি ভরে
তোমারে করিগো অভ্যর্থনা
অয়ি তুমি অকলঙ্ক মানব-কোরক নব,
সদা-স্ফুট আত্মা মনোরমা!

আলীপুর। শ্রীমতী মৃ—

নিত্যব্রত।

লাহিরিয়া সরাইস্থ বালক বালিকাদের নীতি সমিতির সম্পাদিকা হইতে প্রাপ্ত।

১। প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গকালে ঈশ্বরকে স্মরণ ও ন্যস্ত-জানু হইয়া নমস্কার।

২। স্নান বা অঙ্গশুদ্ধি অন্তে স্তোত্র-পাঠ ও শুদ্ধ চরিত্রের জন্য প্রার্থনা।

৩। ভোজনকালে অন্নদাতা ঈশ্বর-চরণে কৃতজ্ঞতা-দান ও নমস্কার।

৪। শয়নকালে বিশ্রাম-দাতা ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা ও ভক্তিসহকারে নমস্কার।

৫। সাধু সাধ্বীর জীবন, এবং জ্ঞান, নীতি ও ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ।

৬। সত্যকথা, শুদ্ধাচার, সদ্ব্যবহার, সৎসঙ্গ ও সদনুষ্ঠান দ্বারা দেহ মনের স্বাস্থ্যরক্ষা।

৭। পান ভোজন এবং সময় ও

ধনাদি ব্যবহার প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়ে মিতাচার।

৮। সংসারের তাবৎ বিষয় ও ব্যক্তির প্রতি কর্ত্তব্যপালন, অথচ ইন্দ্রিয়াসক্তি বিনাশ ও অঋণী থাকার চেষ্টা।

৯। নিঃস্বার্থ পরসেবা, ও সময়ে সময়ে সংযম নিয়মাদি দ্বারা চরিত্রগঠন।

১০। নারীগণের পক্ষে, রন্ধন ও চিত্রাদি শিল্প সাধন।

১১। নারীগণের পক্ষে, গৃহকার্য্যে অনুরাগ ও পারিপাট্য সাধন।

১২। নারীগণের স্বভাব-সুলভ কোমলতা, লজ্জা, নম্রভাব, মিষ্টবচন, প্রেম, শুচি, বাধ্যতা, নিষ্ঠা, বিশ্বাস ও ভক্তি প্রভৃতি রক্ষার জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা।

১৩। ধর্ম্মশিক্ষা ও সাধন।

উল্লিখিত মত বিশ্বাসে ও ব্রতাচরণে জীবনযাপন দ্বারা ধর্ম্মপথে প্রবিষ্ট হইয়া আমি ধর্ম্মদীক্ষার্থে অগ্রসর হইতে অভিলাষ করি। মঙ্গলময় বিধাতা আমার জ্ঞান, ভক্তি ও শ্রদ্ধা পুণ্যপথের সহায় হউন!

সেবাব্রত।

রমণী ও পুরুষ প্রকৃতি যে খানিকটা ভিন্ন উপাদানে গঠিত আশা কার সকলেই তাহা স্বীকার করিবেন। রমণী স্বভাবতঃই অত্যন্ত পরদুঃখকাতরা ও কোমলহৃদয়া এবং ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা তাঁহাদের অঙ্গের ভূষণ। সকল দেশেই দেখা যায় পুরুষ বাহিরের কাজে ও অর্থ উপার্জ্জনে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকেন আর রমণী গৃহকার্য্য সন্তানপালন সাংসারিক সুশৃঙ্খলা সাধন ইত্যাদি কার্য্য সম্পাদন করেন। ইহাতেই সুস্পষ্ট ভাবে বুঝা যায় যে রমণীগণ সহিষ্ণু ও সেবাপরায়ণা বলিয়াই সংসারের এই সকল ভার নতমস্তকে গ্রহণ করিয়াছেন এবং প্রতিদিন পিতামাতা, ভাই বোন স্বামী পুত্র কন্যা ও আত্মীয় স্বজনগণের সেবা করিয়া প্রাণে অপার আনন্দলাভ করিতেছেন। ভগবানের বিশেষ করুণায় নারীগণ এই অমূল্য সম্পদের অধিকারিণী হইয়া ছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহাদের প্রেম সীমাবদ্ধ থাকিয়া যাইতেছে। আপনার জনকে সকলেই ভাল বাসেন, এবং আপনার জনের সেবা করিয়া সকলেই প্রাণে অপার আনন্দ লাভ করেন কিন্তু তাহাতে মহত্ব কিছুই নাই। নিতান্ত পাষাণ হৃদয়, স্বার্থান্ধ মানবও নিজ আত্মীয় স্বজনকে ভালবাসে।

সেই সর্ব্বদর্শী বিধাতা পুরুষ আমাদের হৃদয়াভ্যন্তরে এমন প্রেম সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন যাহা সমস্ত জগৎকেও আলিঙ্গন করিতে পারে। কিন্তু হায়! সেই প্রেম আমরা সঙ্কীর্ণতার আঁধারে ঘিরিয়া রাখিয়াছি। আমরা আমাদের আত্মীয় স্বজনগণকেই শুধু ভালবাসি, অপরকে ঘৃণা করিতে খুব জানি কিন্তু ভালবাসিতে জানি না, কাজেই আমাদের প্রেমের প্রসার প্রায়ই দেখিতে পাই না। কাহারও অশ্রু মুছাইতে আমাদের স্নেহ অঞ্চল খুব কমই প্রসারিত হয়। তাহার প্রধান কারণ আমাদের প্রেমচর্চ্চার অভাব। কেহ আশ্চর্য্য হইবেন না, প্রেমেরও চর্চ্চা করা আবশ্যক।

আমরা যত ভালবাসিব ততই ভালবাসিতে শিখিব। কিন্তু হায় আমরা যে শুধু আপনাকে লইয়াই বিব্রত রহিয়াছি, শুধু পরিবারস্থ সকলকে ভালবাসিয়া ও তাঁহাদের সেবা করিয়াই পরিতৃপ্ত থাকিতেছি। অন্য কাহারও জন্য কিছু করা সেরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রায়ই আমাদের প্রাণে উদয় হয় না। ইহার ভিতর আর একটী কারণ যে পূর্ণভাবে বিরাজিত রহিয়াছে তাহা শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই চক্ষে পড়ে, সেটী বঙ্গনারীর শিক্ষার অভাব। ইহা অতি ধ্রুবসত্য যে অজ্ঞানান্ধকার মানবহৃদয়ের সুন্দর সুন্দর ভাব কলিকাগুলিকে প্রস্ফুটিত হইতে বাধা প্রদান করে। যে চিন্তা হৃদয়কে সুন্দর পবিত্র ও বিকশিত করে তাহার সঙ্গে সে চিরদিনই অপরিচিত থাকিয়া যায়। স্ত্রীপুরুষ সকলের জীবনেই সুশিক্ষা একান্ত অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। অনেকে হয়ত মনে করেন "আমি স্ত্রীলোক আমার অধিক জ্ঞানার্জ্জনের কি প্রয়োজন?" ইহা অতি ভুল ধারণা। বিধাতার রাজ্যে সকলেরই সমান অধিকার। পুরুষ বিদ্যা, জ্ঞান ও ধর্ম্মবলে দিন দিন উন্নত হইতে উন্নততর পথে অগ্রসর হইবেন আর রমণী কি চিরদিন অন্ধকার কোণে পড়িয়া থাকিয়া সেই উজ্জ্বলালোক হইতে বঞ্চিত থাকিবেন?

অধিকাংশ বঙ্গমহিলারই জীবনের লক্ষ্য অত্যন্ত ক্ষুদ্র। অল্প বয়সেই তাঁহারা বিবাহিতা হন, তাঁহাদের যাহা কিছু কর্ত্তব্য মাত্র দুইটী পরিবারের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। অধিক লেখাপড়া শিক্ষাও ততটা আবশ্যক বলিয়া মনে করেন না। কোনরূপে দুই এক খানা বাঙ্গালা বই পড়িতে পারিলে ও দুই এক খানা চিঠি লিখিতে পারিলেই যথেষ্ট মনে করেন। সংবাদ পত্রাদি পাঠে ভিন্ন দেশের সংবাদ জানা দূরে থাক নিজ দেশের সংবাদ জানিতেও অনেকেরই আগ্রহ খুব কম দেখা যায়। সত্য বটে ঐ দুইটী পরিবারে রমণীর হৃদয়ের প্রেম সর্ব্বতোভাবে বিতরণ করা ও পরিবারস্থ সকলের সেবা করা কর্ত্তব্য কিন্তু ইহাতেই নারী জীবনের সম্পূর্ণ সার্থকতা সাধন হয় না। তাঁহাদের প্রেম বিতরণের ও সেবাব্রত গ্রহণের প্রশস্ত ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। সেবাপরায়ণা রমণী পিতৃগৃহে কমনীয় শৈশব সুখের মধ্যেই সেবা ও প্রেমের শিক্ষা গ্রহণ করেন। এ শিক্ষা আমরা প্রথম মায়ের নিকট হইতেই লাভ করি। মায়ের প্রেম সকলের উপর কেমন অজস্র ধারায় বর্ষিত হইতে দেখি। তাঁর দুখানি নিপুণ হস্ত কেমন দিনরাত্রি সকলের সেবায় রত থাকে দেখিতে পাই। ইংরাজীতে একটী কথা আছে Charity begins at home. সত্য সত্যই এ প্রেমের শিক্ষা আমরা গৃহেই প্রথম লাভ করি। পিতা মাতা ভাই বোনদিগকে ভালবাসিয়া তবে আমরা অপরকে ভালবাসিতে শিখি। পাশ্চাত্য প্রদেশে আমরা অনেক সেবাব্রতধারিণী রমণীর পবিত্র জীবন দেখিতে পাই, আমাদের দেশে সেরূপ জীবন দুর্লভ। কুমারী মেরী কার্পেন্টারের নাম হয়ত অনেকেই শুনিয়াছেন। মেরী কার্পেন্টারের জন্মস্থান ইংলণ্ডে। আজ তাঁহার জীবনের

দুই একটী কথা বলিব। মেরী কার্পেণ্টার শৈশব হইতেই অত্যন্ত ধর্ম্মপ্রবণ হৃদয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার সেই ধর্ম্মপ্রবণ হৃদয় সুশিক্ষার গুণে আরও সুন্দর ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি বিভিন্ন ভাষা যেরূপ শিক্ষা করিয়াছিলেন বিজ্ঞান, গণিত, প্রাণিবিদ্যা ভূতত্ত্ব ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়েও সেরূপ শিক্ষা করিয়াছিলেন। ঈশ্বরের প্রতি অটল বিশ্বাস বলে তিনি তাঁহার ঐ একটী জীবনে কত কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন কত হীন চরিত্র স্ত্রী পুরুষ ও বালকবালিকাদিগকে সুপথে আনয়ন করিয়াছিলেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কত গৃহহীন বালক বালিকা যাহারা চৌর্য্য প্রভৃতি অসৎ উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত ও ইংলণ্ডের সেই দারুণ শীতে যেখানে সেখানে পড়িয়া রাত্রিযাপন করিত, মেরী কার্পেণ্টার সেই সকল নীতি-হীন বালক বালিকাদিগকে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন এবং তাহাদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া নিজে তাহাদিগকে বিদ্যা ও ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই সকল পশুপ্রকৃতি দুরন্ত মানবশিশুদিগকে সৎপথে আনয়ন করিতে তাঁহাকে যে কত কষ্ট সহিতে হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। এই মনস্বিনী মহিলা ভারতেও আগমন করিয়াছিলেন। সে সময় ভারত রমণীরা আরও শোচনীয় অবস্থাপন্ন ছিলেন, তিনি তাঁহাদের দুর্দ্দশা মোচনকল্পে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের জন্য অনেক প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সেই উন্নতা রমণীর প্রেম বিলাত হইতে এই সুদূর ভারতেও ব্যাপ্ত হইয়াছিল।

এই সকল জীবনেই আমরা রমণী-জীবনের কার্য্য ও রমণীহৃদয়ের প্রসার, রমণীর প্রেম ও সেবাপরায়ণতা শিক্ষা করি। সত্য সত্য আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়াভ্যন্তরেই এই সকল বীজের অঙ্কুর নিহিত রহিয়াছে। আমাদের প্রাণগত চেষ্টা যত্নেই তাহা অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইতে পারে। কিন্তু সে চেষ্টা আমাদের কোথায়? কোন্ রমণী, জননী, ভগিনী ও পত্নীর কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিতে পারেন? রমণীর অধিকার কত উচ্চে তাহাই বা হৃদয়ঙ্গম কয়জনে করিয়া থাকেন? অনেক সময়ই আমাদের দিবসের অবসর শুধু গল্পে ও আলস্যে কাটিয়া যায়। সময়টাকে বিশেষ ভাবে কাজে লাগাইবার জন্য প্রাণের ভিতর একটা ব্যগ্রতা প্রায় কখনই অনুভব করি না। আকাঙ্ক্ষা থাকিলে আমরা কতকিছু করিতে পারি। পাড়াপ্রতিবাসী, দাসদাসী, আত্মীয় অনাত্মীয় ও দেশের সেবায় আমাদের ক্ষুদ্রশক্তি যথাসাধ্য নিয়োগ করিতে পারি। কেন এ সাধনার ধন মনুষ্যজীবন লাভ করিয়াছি, শুধু, বিলাস বাসনা আমোদ প্রমোদই কি জীবনের শেষ পরিণতি। একবার স্থিরাচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে জীবনকে ঘোর অপরাধের ভারে ভারাক্রান্ত বলিয়া মনে হয়। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে জ্ঞান ও ধর্ম্ম যে দিকেই দেখি না কেন মেয়েরা সকল বিষয়েই পিছু পড়িয়া থাকেন। কলের পুতুলের মত মেয়েরা তাঁহাদের সীমাবদ্ধ গণ্ডির ভিতরে অনবরত ঘুরিতেছেন। তাঁহাদের এটুকই কাজ এবং এটুকুই শক্তি, এ গণ্ডীর বাহিরে

পদক্ষেপ করা তাঁহাদের সাধ্যাতীত। আজকাল পুরুষ সমাজে স্ত্রীশিক্ষার বেশ একটু আন্দোলন জাগিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু মেয়েদের হৃদয়স্রোত সেইদিকে প্রবাহিত না হইলে এ দুর্দ্দশা কিছুতেই নিবারিত হইবে না। শিক্ষা ব্যতীত আমাদের বুদ্ধি মার্জ্জিত ও চিন্তা প্রস্ফুটিত হইতে পারে না। আমরা যত জ্ঞানলাভ করিতে পারিব ততই সেবাব্রত গ্রহণের উপযোগী হইব এবং দেশের ও দশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া প্রাণে অপার আনন্দ লাভ করিতে পারিব। ভগবান্ আশীর্ব্বাদ করুন আমাদের জীবনে সে শুভদিন অবতীর্ণ হোক। আমরা যথার্থ সেবাপরায়ণা ও ধার্ম্মিকা হইয়া যেন জীবন ধন্য ও সার্থক করিতে পারি।

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী সেন।
নারায়ণগঞ্জ
(ঢাকা)

প্রাপ্ত।

জাপানের কথা।

আয়তনে জাপান বৃহৎ রাজ্য নহে। ভারতের দশমাংশাপেক্ষাও ছোট, প্রায় মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির সমান, গ্রেটব্রিটন অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড়। চারিটী বৃহৎ দ্বীপ এবং চার হাজার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ সমষ্টিতে জাপান সাম্রাজ্য গঠিত। এদেশে ভূকম্প এবং অগ্ন্যুৎপাত হইয়া থাকে। প্রায় প্রতি বিশ বৎসরে এক একটি ভীষণ ভূকম্পে বহু জনপদ এবং প্রাণ বিনষ্ট হয়। জল হাওয়া এত পরিবর্ত্তনশীল যে একজন আগন্তুকের পক্ষে স্বাস্থ্যরক্ষা করা বড় কঠিন হইয়া পড়ে। শীতকালে পর্ব্বত, উপত্যকাভূমি, সমভূমি, বৃক্ষাদি বরফাবৃত হইয়া চতুর্দ্দিক শুভ্রাকার ধারণ করে। জাপান কৃষিতে সৌভাগ্যবান্, এখানে প্রচুর পরিমাণে চাউল, চা, প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে। এখানে শতকরা ১৩ ভাগ ভূমি চাষের যোগ্য, ইউরোপে ৩৭ ভাগ। অথচ শস্য পরিমাণে অধিক জন্মায়। রেসমের কারবারের বিলক্ষণ উন্নতি। খনিজ দ্রব্য প্রচুর। শিল্পজাত দ্রব্য উৎপন্নে জাপান কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন। জাপানের প্রকৃতির সৌন্দর্য্য অতি চমৎকার। এখানে বাঙ্গলার মত সমতলভূমি নাই। ইতস্ততঃ পার্ব্বত্য ভূমি থাকাতে জমি ঢেউয়ের মত উচুনীচু। পর্ব্বতভূমির উপর বড় বড় বৃক্ষরাজি আর উপত্যকাতে ধান এবং অন্যান্য ফল শস্য দৃষ্ট হয়। এদেশে গ্রামসমূহ ছোট ছোট কাঠের ঘরে পূর্ণ।

ব্রিটিশ জাতির ন্যায় জাপানেরা বহু জাতির মিশ্রণ। মোঙ্গল, তাতার, মালয়বাসী কোরিও এবং ভারতবর্ষের লোকেরা দলে দলে এই দেশে আসিয়া বাস করিয়াছে এবং গ্রামে মিশিয়া একজাতি হইয়াছে। এই বিভিন্ন সম্প্রদায়ীর মধ্যে বহুকাল যুদ্ধবিগ্রহ চলিয়াছিল। তন্মধ্যে যামাতু বংশীয়েরা প্রাধান্য লাভ করেন এবং তাহাদের নেতাই মিকাডু হইয়াছেন। চীন দেশীয় সাহিত্য এবং সভ্যতার প্রচলন সহকারে সামরিক ব্যবস্থা এবং সুমারাইদের অভ্যুদয় হইয়াছে। কোরিয়ার লোকেরা চীন হইতে সভ্যতা, শিল্প, শিক্ষা ধর্ম্ম লাভ

করিয়া জাপানকে সেই সমস্ত শিক্ষা দিয়াছেন। জাপানের যাহা কিছু উন্নতি সমস্তই অন্য দেশ হইতে প্রাপ্ত। ভারত হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম, চীন হইতে কনফুসিয়ানের ধর্ম্ম, কোরিয়া হইতে প্রাচীন সভ্যতা এবং পাশ্চাত্য জাতি হইতে আধুনিক সভ্যতা গৃহীত হইয়াছে। অন্য হইতে ভাল যাহা তাহা গ্রহণের ভাব এবং ক্ষমতায় জাপান আজ এত বড়। আর ভারতের অন্য হইতে বিমুখতাই ভারতের উন্নতির অন্তরায়। জাপানে জাতিভেদ নাই, যোগ্যতালাভে সকলেই অতি নিম্ন অবস্থা হইতে অত্যুচ্চ পদবী লাভ করিতে পারে। আর ভারতে তেমন সাধু গুণী জ্ঞানীলোকও মূর্খ ব্রাহ্মণের হীন।

সংবাদ।

রাঙ্গা আলুর পায়স, ও "মোচাপোড়া" ব্যঞ্জন কিরূপ প্রণালীতে প্রস্তুত করিতে হয়, উৎকলকন্যা শ্রীমতী রেবাদেবী পূর্ব্ব বঙ্গের একটী অপ্রাপ্তবয়স্কা কুমারী কন্যার নিকটে তাহা শিক্ষা করিয়া বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসের মহিলাতে প্রকাশ করিয়াছেন। বালিকাটী স্বীয় পিতামাতার সঙ্গে কটক নগরে বাস করিয়া রেবা দেবীর প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছে। সে একদিন রাঙ্গা আলুর পায়স ও মোচাপোড়া নিজহস্তে প্রস্তুত করিয়া রেবা দেবীকে খাওয়াইয়াছিল। তিনি ভক্ষণে তৃপ্ত হইয়া উহার প্রস্তুতির প্রণালী বালিকার প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া আমাদের নিকটে তাহা প্রকাশ করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে উক্ত বালিকা উৎকৃষ্ট রন্ধনের জন্য মিশনারী পাঠশালা হইতে বিশেষ পুরস্কার লাভ করিয়াছিল। রন্ধনকার্য্যে সে পরীক্ষায় সর্ব্ব প্রথম হইয়াছিল। এখানেও আমাদের বালিকাবিদ্যালয়ের কোন কোন বালিকা শুনিতে পাইয়াছি রন্ধনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু কার্য্যতঃ কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। এ অঞ্চলে বালিকা কি অনেক বয়স্থাও উনানের নিকটে যাইতেই যেন ভয় পায়। পূর্ব্ববঙ্গের ১০।১২ বৎসরবয়স্কা এক একটী বালিকা এক একটী বড় পরিবারের সমস্ত লোককে প্রত্যহ রন্ধন পরিবেশন করিয়া খাওয়াইয়াছেন আমরা স্বচক্ষে ইহা দেখিয়াছি।

বর্ত্তমান আষাঢ় মাসেই মহিলার দ্বাদশবর্ষ পূর্ণ হইল। অধিকাংশ গ্রাহক গ্রাহিকার নিকট হইতে এই বৎসরের মূল্য পাওয়া যায় নাই। তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ পত্র লিখা গিয়াছে। আমাদের সানুনয় প্রার্থনা যে গ্রাহক গ্রাহিকাগণ যেন দয়া করিয়া অবিলম্বে মূল্য পাঠাইয়া আমাদিগকে উপকৃত করেন।

ময়মনসিংহ জিলার জামালপুর সবডিভিশনের অন্তর্গত দেওয়ানগঞ্জে একজন মোসলমান একটী হিন্দুরমণীকে ধরিয়া লইয়া গিয়া বিবাহ করিয়াছিল। বিচারে ৮ বৎসর এবং তাহার সাহায্যকারী অপর দুই জন মোসলমানের ৬ বৎসর কারাবাস দণ্ড হইয়াছে।

সিন্ধুজর্ণালের একজন সংবাদদাতা

লিখিয়াছেন ;—করাচি জেলার একস্থানে একটী প্রায় সোত্তর বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধা স্ত্রীলোক দেখিতে পাইলাম। তাহার চেহারা বৃদ্ধমস্থার পরিচায়ক। এই বুড় বয়সেও সে ঘোড়ায় চড়িতে সমর্থা। আমাদের ভূতপূর্ব্ব সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার লিখিত একখানি চিঠী তাঁহার নিকট আছে। প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে এই স্ত্রীলোকটী মহারাণীকে দেখিবার জন্য বিলাত গমন করিয়াছিল। বহু বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া ভিক্ষালব্ধ অর্থে পাথেয় যোগাড় করিয়া এই নারী ইংলণ্ডে উপনীত হয়। সে ইংরেজী জানিত না। নানা জনকে ধরিয়া কোনও রূপে একখানা আবেদন পত্র লেখাইয়া লইল। একদিন মহারাণী গাড়ীতে বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন এমন সময়ে সে সঙ্কেত দ্বারা জানাইল যে সে তাঁহার কাছে দরখাস্ত দিতে চাহে। মহারাণী বুঝিতে পারিয়া তাহার আবেদন গ্রহণ করিলেন এবং একখানা চিঠীর কাগজে লিখিয়া দিলেন যে তিনি ভারতীয় ভিক্ষুণীকে দেখিয়াছেন সে এক মনোজ্ঞ ব্যক্তি, এবং তাহাকে করাচিতে পাঠাইয়া দিলেন। সিন্ধুদেশে ফিরিয়া আসিয়া সে উক্ত পত্র স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষকে দেখাইল এবং তাঁহারা তাকে ২০০ একরা জমী প্রদান করিলেন। সে উহা চাস আবাদ করিয়া বেশ সুখ স্বচ্ছন্দে পুত্র পৌত্রাদি গোষ্ঠীসহ বাস করিতেছে।

প্রায় এক বৎসর যাবৎ নববিধানে ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত ভিক্টোরিয়া মহিলা বিদ্যালয়ের গৃহে প্রতি শনিবার অপরাহ্ণ বালিক দিগকে নীতি উপদেশ প্রদত্ত হইয়া থাকে। কতিপয় শিক্ষিতা ব্রাহ্মিক শিক্ষা দানের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

দিনাজপুরের শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মজুমদার জাপান হইতে পেন্‌শীল ও মোমবাতীর কার্য্য শিখিয়া আসিয়াছেন। দেশে তিনি তাঁহার স্ত্রীকে মোমবাতি প্রস্তুত প্রণালী শিখাইয়াছেন। গুণবতী পত্নী স্বামীর উপদেশানুসারে কয়েকটি স্ত্রীলোক লইয়া মোমবাতীর কারখানা খুলিয়াছেন। তাঁহাদের প্রস্তুতি মোমবাতি আসাম কিংবা রেঙ্গুণ বাতির ন্যায় গলিয়া যায় না। ১৬ আউন্স বাতির বাণ্ডিল ।৵১০ দামে বিক্রয় হয়।

মহিলাদের শিক্ষার ভার মহিলা শিক্ষয়িত্রীর উপর ন্যস্ত হওয়াই প্রার্থনীয়। মহিলা শিক্ষয়িত্রীর অভাবে এদেশে অনেক বালিকা বিদ্যালয়ে পুরুষ শিক্ষকগণ শিক্ষা দিয়া থাকেন। এজন্য অনেকে কন্যাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে অনিচ্ছুক। এই অভাব মোচনের জন্য কলিকাতায় একটি শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুতির কালেজ খুলিবার কথা চলিতেছে। শিক্ষয়িত্রী কালেজেও মহিলারাই শিক্ষাদান করিবেন। শিক্ষাদান প্রণালী শিখিবার জন্য কিছুদিন হইল দুইটী মহিলা গভর্ণমেণ্টের ব্যয়ে বিলাত প্রেরিত হইয়াছেন। তাঁহারা ফিরিয়া আসিলে প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইবে।

প্রেরিত।

স্ত্রীলোকের সীমা অতিক্রম।

বিগত জ্যৈষ্ঠ ও তৎপূর্ব্বে আমাদের

মহিলা পত্রে স্ত্রীস্বাধীনতার দূষণীয়তা সম্বন্ধে অনেক বার অনেক কথা বলা হইয়াছে, জানি না সে তীব্র সমালোচনা কত স্ত্রীস্বাধীনতাপ্রিয় ব্রাহ্মের হৃদয়ে আঘাত প্রদান করিয়াছে। যাঁহারা ইহার বিষময়ত্ব এখনও বুঝিতে পারেন নাই সময় আসিতেছে তাঁহাদিগকেও তাহা বুঝিতে হইবে। জীবনের নবীন উদ্যম ও নবীন উৎসাহের সময় আমিও এ মত আংশিকরূপে সমর্থন করিয়াছি, এখন জীবনের পরিণত বয়সের অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষায় সে সমর্থন যে ভ্রমপূর্ণ তাহা বুঝিতেছি। নব্য যুবক ও স্বাধীনতাপ্রিয় ব্রাহ্ম! তোমাদিগকেও ইহা বুঝিতে হইবে। 'আচার্য্য কেশবচন্দ্র স্বাধীন ভাবে কত স্বাধীন মত ও সত্য প্রচার করিয়াছেন, তিনি কি স্ত্রী স্বাধীনতা প্রচার করিতে পারিতেন না? তোমরা এতকাল ধরিয়া "স্ত্রীস্বাধীনতা" "স্ত্রীস্বাধীনতা" করিয়া চীৎকার করিয়া আসিতেছ, এখনও সেরূপ কিছু করিয়া উঠিতে পারিলে না। কেশবচন্দ্র যদি একদিন দাঁড়াইয়া স্ত্রীস্বাধীনতা মুখে উচ্চারণ করিতেন, সেই দিনই এ স্বাধীনতার যুগান্তর উপস্থিত হইত, তোমাদিগকে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে এত পরিশ্রম করিতে হইত না। মানবচরিত্র অধ্যয়নশীল ও পবিত্রতার সমর্থনকারী কেশবচন্দ্র দেশ কাল পাত্র বিচার করিয়াও বলিলে অত্যুক্তি হইবে না ওজন করিয়া মত ও সত্য বিতরণ করিতেন। ভাই সব! তোমাদের সে তুলাদণ্ড কোথায়? তোমাদের সে অধ্যয়নই বা কোথায়? দেখ মহাপুরুষের মত উপেক্ষা করিয়া তোমাদের পরিবারে কত কলঙ্ক আসিতেছে। হইতে পারে তোমাদের মধ্যে কোন মহিলাবিশেষের জীবনে তোমরা অকলঙ্কিত স্বাধীনতার নিদর্শন দেখিয়াছ, কিন্তু তাহাই কি তোমাদের নজীর। হইতে পারে তোমাদের মধ্যে এক আধ জন মহিলা অবস্থাবিশেষে অক্ষুণ্ণ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারেন কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা এ সম্বন্ধে একটা Authority হইতে পারেন না। হায়! আমার দেখিয়া হৃৎকম্প উপস্থিত হইতেছে যে কোন কোন পরিবারে এ সম্বন্ধে অযথা বাড়াবাড়ি আরম্ভ হইয়াছে। আমি বলিতেছি, এ বাড়াবাড়ির ফল বিষময় অবশ্যম্ভাবী। স্বাধীনতাপ্রিয় ব্রাহ্ম ভাই! তোমাদিগকে ঠেকিতে হইবে। তোমরা গৃহের বাহিরে রেলপথে সভা সমিতিতে তোমাদের মহিলাদিগকে স্বাধীন ও অব্যাহত ভাবে বিচরণ করিতে দিতেছ। চারিদিকে সংবাদপত্রে সতী নারীর প্রতি যে লোমহর্ষণ অত্যাচার সংঘটিত হইতেছে তাহা দেখিয়া কি তোমাদের চৈতন্যোদয় হইতেছে না? সংবাদ পত্রে বীরজাতি ইংরাজমহিলার প্রতি অত্যাচারের সংবাদও সময়ে সময়ে প্রচারিত হইয়াছে। তোমাদের কে মানিবে বল। ইংরাজ রাজ-জাতি না হইলে এ অত্যাচার কোন্ সীমায় উপস্থিত হইত তোমরা দেখিতে পাইতে। ব্রাহ্মসমাজে এক আধ জন পদস্থ ব্যক্তির পরিবারে স্ত্রী স্বাধীনতার নিদর্শন দেখিয়া নজীর করিও না। পদস্থ পরিবারের মহিলা না হইলে ইহাদেরও লাঞ্ছনার সীমা থাকিত না। ভাইগণ! যদি পরিবারের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাও তবে সতর্ক হও। ২।১ জন স্ত্রীস্বাধীনতাপ্রিয় ব্রাহ্মের কুহকে ভুলিও না।

ভিক্টোরিয়ামহিলাবিদ্যালয়।

পর্ব্বতের উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও ক্ষয় *।

গত বারে আপনাদের নিকট পৃথিবী সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছি, আজ পর্ব্বতের উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও ক্ষয় সম্বন্ধে বলিব। এই যে গ্রহ এবং উপগ্রহ সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে, ইহাকে আমরা আমাদের সৌরজগৎ বলিয়া থাকি। ইহা প্রথমে বাষ্পাকারে ছিল এবং উত্তপ্ত ও তরল এই দুই অবস্থায় ছিল। যখন তরল অবস্থায় ছিল সেই সময়ে পৃথিবীতে কোন প্রাণী বাস করিতে পারিতেছিল না। ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর উপরিভাগে জল এবং স্থল দেখা গেল। স্থল যেমন সমতলভূমি ও পাহাড় ইত্যাদি, আর জল যেমন সমুদ্র। পৃথিবীতে এখন যেমন জল ও স্থল দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা বরাবরই এরকম অবস্থায় ছিল, না কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছে? আমরা এখন প্রমাণ করিতেছি যে, প্রথমে যে স্থানে জল ছিল তাহা এখন স্থল হইয়াছে। পৃথিবীর বয়স দশ কোটী বা তাহা অপেক্ষা আরও কিছু বেশী হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে কি ঘটনা ঘটিয়াছে এবং কি অবস্থায় আসিয়াছে ইহা অনুসন্ধান করাই ভূতত্ত্ব-বিদ্যার উদ্দেশ্য। বর্ত্তমান সময়ের নদনদী পাহাড় পর্ব্বত যে সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনা হইতেছে ইহা জানাই ইহার উদ্দেশ্য। যেমন এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেলে পরই কি ঘটনা হয় তাহা জানা দরকার। মনে করুন এই যে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া বৃষ্টি পড়িল তাহা কোথায় গেল। ঐ যে জল মাটিতে পড়িল তাহা ঐ মাটির মধ্যেই জমিয়া বসিয়া গেল। জমি যদি flat হইত তাহা হইলে সমস্ত জল জমিয়া থাকিত, কিন্তু জমি সব স্থানে সমান নয়, কোন স্থান সমান কোন স্থান ঢালু। যে স্থান ঢালু, সেখানে বৃষ্টি পড়িলেই গড়িয়ে যাইবে এবং নিকটে যদি পুকুর বা নদী খাল, বিল কিছু থাকে, জল গড়াইয়া সেই স্থানে যাইয়া পড়িবে। মাটিতে জল পড়িলেই তাহা অপরিষ্কার হইয়া গেল এবং সেই অপরিষ্কার জল যাইয়া নদীর জলকে অপরিষ্কার করিল। বৃষ্টির জল কখন ঘোলা বা অপরিষ্কার নয়। গঙ্গার জল শীতকালে পরিষ্কার থাকে এবং বর্ষাকালে ঘোলা হয়। ইহার কারণ আর কিছুই নয়, চারিদিকের দেশ বিদেশের যত মাটী ধোয়া অপরিষ্কার রাশি রাশি জল আসিয়া পড়ায় নদীর জল ঘোলা হয়। এই যে মাটীধোয়া কাদা জল, ইহা কিছুক্ষণ একটা গ্লাসে রাখিলেই দেখিতে পাওয়া যায় নীচে কাদা রহিয়াছে এবং উপরে জল। এই যে মাটী জিনিষ ইহা কি? ইহা বালি ও কাদা, একত্রে মিশ্রিত রহিয়াছে। ইহাকে ইংরাজীতে Alluvium বলে। ইহাকে

* ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯০২, ভিক্টোরিয়া মহিলা বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত বাবু পার্ব্বতীনাথ দত্ত মহাশয় যে বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন তন্মূলক।

যদি ধোয়া যায় ২ অংশ জিনিষ পাওয়া যাইবে। গঙ্গার জল যদি একটা জালাতে রাখা যায়, কিছুক্ষণ পরে দেখা যাইবে এই জালার নীচে কেবল Alluvium রহিয়াছে। গঙ্গার উত্তর দিকে যতই যাওয়া যায়, দেখিতে পাওয়া যায় মাটীর অংশ কম এবং বালির অংশ বেশী। বারাণসীর দিকে গেলেও দেখিতে পাওয়া যায় ঐ মাটী যাহা বালু ও কাদা মিশ্রিত। দার্জ্জিলিঙ্গের দিকে যতই যাওয়া যায় দেখিতে পাওয়া যায় এই বালির অংশ ও অভ্রর অংশ। সেখানে কাদা দেখা যায় না, কাদার পরিবর্ত্তে অভ্র ও বালি একত্রে মিশ্রিত রহিয়াছে। তারপর যদি আরও উত্তরে যাওয়া যায় সেখানে কেবল পাথর দেখা যায়। সেই সব পাথর বেশ সমান প্রায় দেখা যায় না, সব কোণওয়ালা পাথর দেখা যায়। প্রথমে এই পাথর ছিল বালুকার মত, তারপর যখন আরও একটু দূরে যাওয়া গেল তখন দেখা গেল বেশ সুন্দর পাথর, যেন কে ঘসিয়া মাজিয়া রাখিয়াছে। ইহা দেখিতে বড় সুন্দর, মনুষ্য নির্ম্মিত নহে, প্রাকৃতিক নিয়মে প্রস্তুত। দেখিলে মনে হয় যেন মনুষ্য নির্ম্মিত। যখন পাহাড়ের আরও উপরে যাওয়া যায় যে সব ঝরণা দেখা যায়, তার পার্শ্বে আরও একটু বড় পাথর দেখা যায়। তার পর আরও উপরে গেলে দেখা যায় যে বড় বড় পাথর সব ভাঙ্গিতেছে। এই যে পাথর ভাঙ্গিতেছে, ইহা কে ভাঙ্গিতেছে? ইহা স্বভাবতঃ ভাঙ্গিতেছে। দিনের বেলায় সূর্য্যের উত্তাপে খুব গরম হয় এবং যেই সূর্য্য অস্ত যায় তখন উত্তাপ কমে আসে, এবং এই উত্তাপের বিভিন্নতায় ইহা ফাটিয়া যায় ও তাহাতেই ভাঙ্গিতে থাকে। ইহা পরীক্ষা করা বড় সহজ নহে। উত্তাপে সব জিনিষের আয়তন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যেমন উত্তাপে জলের আয়তন ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং শীতে কমিয়া যায় সেই রকম এই পর্ব্বতও ক্ষয় প্রাপ্ত ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে! ইহাতে সমস্ত পাহাড় চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। একটা কারণ এই পাহাড়ের ভিতর যে সমস্ত cracks ছেঁদা আছে তার ভিতরে অনায়াসে জল যাইতে পারে, এবং যখন এই সমস্ত ছেঁদা ও ফাটা শীতে জমিয়া আয়তনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তখনই এই পাহাড় ফাটিয়া ভাঙ্গিতে থাকে। যখন জমিয়া যায় তখন তার শক্তি অত্যন্ত বেশী হয়, ইহা একটী কারণ। আর একটী এই বৃষ্টিতে ইহা গলিয়া যায়। বৃষ্টির সহিত যে carbonic gas আছে তাহা বায়ুর সহিত মিশ্রিত আছে এবং ইহা দ্বারাই পাথর গলিয়া যায়। ক্রমে ক্রমে একটু একটু করিয়া গলিতে থাকে। carbonicএর গতিতে এই যে রেণুর পর রেণু গলিয়া যায় তাহা দেখিতে ঠিক কাদার মত এবং রং শাদা। এই শাদা কাদার মত যে জিনিষ তাহাকে granade বলে। ইহাতে চায়না বাসন হয়। জলের সহিত এই granade যে আসে তার মধ্যে বালু আছে। উত্তাপে শীতে ও বৃষ্টির জলে এই যে granade ভেঙ্গে যাইতেছে তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাই বালু। বালুর মধ্যে লোহার ভাগ আছে। পাহাড়ের ঘর্ষণেতে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা বাহির হয় তাহাই বালুর আকারে পরিণত হয়। যে সব স্থানে বৃষ্টি হয়

সেখানে পাহাড় ভাঙ্গিতেছে বেশ দেখা যায়। যখন পাহাড় ভাঙ্গিয়া ক্রমে ক্রমে নদীর দিকে আসে তখন বালুর আকারে দেখা যায় তারপর যখন আরও একটু দূরে যাওয়া যায় দেখা যায় তার চেয়ে বড় বড় পাথর নুড়ির মত, তারপর আর একটু গেলে তার চেয়ে বড় পাথর, তারপর আরও উপরে যাইলে বড় বড় পাথর যাহা পাহাড়ে দেখা যায়। পাহাড় ধুইয়া যে সমস্ত মাটীর স্তর সমুদ্রের মুখে আসিয়া পড়ে তাহাকে clay বলে। সমুদ্রের পারে ২০০।৪০০ পর্য্যন্ত বালু জমিয়া যে পাথর হয় তাহা হইতে এই sandstone প্রস্তুত হয়। আমরা শুনেছি অনেকে বলেন সমুদ্রের জল ঘোলা নয় খানিক দূরে গেলে দেখা যায় যে জল নীলবর্ণ। যদি আরও খানিক দূরে যাওয়া যায় খুব পরিষ্কার জল দেখিতে পাও। সমুদ্রের জল লোণা। যখন গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের জল আসিয়া সমুদ্রের জলে মিশে তখন সেই খানকার জল অপরিষ্কার ও ঘোলা দেখা যায়। ভারতবর্ষের কতটা জমি আছে এবং তাহার কতটা সমুদ্রে যাইতেছে তাহা আমরা গণনা করিতে পারি। প্রতি বৎসর প্রায় ১ হাজার মণ বালি ও কাদা সমুদ্রে যাইতেছে। সমুদ্রের মুখে যে সব Alluvium এসে স্তূপাকার দেখিতে পাওয়া যায় তাহাকে detum বলে। কতটা মাটি যায় তাহা ওজন করা গিয়াছে। সমুদ্রের যে স্থানে কাদা মাটী যেতে পারে না, সেখানকার জল খুব পরিষ্কার। সেখানে চুণা পাথর প্রস্তুত হয়। সমুদ্রের নীচে যেখানে উদ্ভিজ্জ জন্মে, তার নীচে শামুক জন্মে। এই জন্তুরা এক সময়ে জীবিত ছিল। পাহাড় হইতে এক এক স্তর আসিয়া পড়াতে এই সব জন্তুরা (যাহারা সমুদ্রের তটের নিকট ছিল) বদ্ধ হইয়া যায় এবং তাহা দ্বারা ক্রমে ক্রমে ঢাকিয়া ফেলিতে দেখা যায়।

আমরা যে চুণ খাই তাহা এই শামুক হইতে হয়। পূর্ব্বে যে স্থান জল ছিল এখন তাহা স্থল। যেখানে সমান স্থান তাহাকে সমতলভূমি, যে স্থান বেশী উঁচু নয় তাহাকে valley বলে, আর যে স্থান বেশী উঁচু তাহাই পাহাড়। এই পাহাড় তিন প্রকারে ক্ষয় পায়, উত্তাপ শীত এবং বৃষ্টিতে। যখন পাহাড় ভাঙ্গে তখনই আমরা এই সব জন্তুদের পাই। ইহাতে আমরা জানিতে পারি যে এই পৃথিবীতে একটার পর একটা পরিবর্ত্তন হইতেছে। পাহাড়ের ঘর্ষণেতে যে কাদা আসিয়া পড়ে এবং তাহাতে যে বালি মিশ্রিত আছে তাহাই প্রথমে পাথর ছিল। বালুর আকারে প্রথমে, তারপর ছোট ছোট নুড়ির আকারে তারপর কোণা কোণা পাথরের আকারে তারপর বড় বড় পাথরের আকারে পরিণত হয়। ইহাতেই আমরা পর্ব্বতের উৎপত্তি বৃদ্ধি ও ক্ষয় জানিতে পারি।